KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5" × 8.5"
Vol. & Number : 18/1 18/2 18/4 19/2	Year of Publication : Sep - 1995 Jan - March 1996 Feb - 1997 Oct - 1997 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আরতি সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা : ১৪০২

প্রধান সম্পাদক ।। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ।। আরতি সেনগুপ্ত

IMPORTANT PUBLICATION
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY

1.	Bama Bodhini Patrika - Dr. Bharati Ray	Rs. 150/-
2.	Asutosh Mukhopadhyer Sikkha Chinta - Dr. Dinesh Chandra Sinha	Rs. 75/-
3.	Purba Banger Kabi Gan - Dr. Dinesh Chandra Sinha	Rs. 90/-
4.	Mymansingha Gitika - RayBahadur D. C. Sen	Rs. 90/-
5.	Banglar Baul - Pt. Kshiti Mohan Sen Shastri	Rs. 30/-
6.	Agrarian System of Ancient India - U. N. Ghosal	Rs. 15/-
7.	Kavi Kankan Chandi - Srikumar Banerjee	Rs. 60/-
8.	Bankim Smarak Sankha - Dr. Ujjal Kr. Mazumdar	Rs. 55/-
9.	Hand Book of the C. U. - Calcutta University	Rs. 15/-
10.	The Science of Sulba - B. B. Dutta	Rs. 40/-
11.	Anchalik Bangla Bhashar Abidhan - Dr. A. K. Bandyopadhyay	Rs. 100/-
12.	Bangla Chhander Mulsutra - Amalendu Mukhopadhyay	Rs. 35/-
13.	Introduction to Tantric Buddhism - Dr. S. Dasgupta	Rs. 16/-
14.	Yoga Philosophy of Patanjali - H. Aranya	Rs. 125/-
15.	An Introduction to Indian Philosophy - Dutta & Chatterjee	Rs. 35/-
16.	Elements of the Science of Language - I. J. S. Taraporewala	Rs. 60/-
17.	History of Sanskrit Literature - Dr. S. N. Dasgupta & S. K. Dey	Rs. 60/-
18.	Nabacharyya Pada - Dr. Sasibhusan Dasgupta	Rs. 35/-
19.	Temples of Ranipur Jharial - D. R. Das	Rs. 145/-
20.	Studies in Indian Antiquities - H. C. Ray Chaudhury	Rs. 55/-
21.	Vaishnab Padavali (Chayan) - Calcutta University	Rs. 30/-
22.	Sakta Padavali - Amarendra Nath Ray	Rs. 35/-

For further Details Please Contact

MANAGER, BOOK-DEPOT, CALCUTTA UNIVERSITY

48, Hazra Road, Calcutta - 700 019

ALL THE PUBLICATIONS WILL BE AVAILABLE AT
THE CALCUTTA UNIVERSITY SALES COUNTER,
COLLEGE STREET CAMPUS,
CALCUTTA - 700 073

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০২ উনবিংশ বর্ষ

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

জীবন উজ্জীবন ১ সলিল চৌধুরী

প্রবন্ধ

আঞ্চলিকতাবাদ ও জাতীয় সংহতি ৩৯ অরুণ মুখোপাধ্যায়

কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৫০ সমীর সেনগুপ্ত

পুরাতনী

অধিকার হরণ ১২৩ কল্যাণী দত্ত

কবিতা

আলোক সরকারের কবিতা ৬৪ অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

মুহাম্মদ সামাদের কবিতা ১০৯ কাজল চক্রবর্তী

তুষার চৌধুরীর কবিতা ১১৩ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ভূমেন্দ্র গুহর কবিতাগুচ্ছ ১৩৩ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

গল্প

হারাবার পালা ৭২ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ডিস্‌চার লেটার ৭৯ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

চেনা স্বর অচেনা মুখ ৮৯ কল্যাণ মজুমদার

'ডাভ কটেজ' ১০০ বন্দনা সান্যাল

জাহাজডুবি ১২৬ রামকুমার মুখোপাধ্যায়

টিকটিকির চোখ ১৪১ অজয় দাশগুপ্ত

উপন্যাস ক্রোড়পত্র

সতী, বিনোদিনী ও আমি ১ এষা দে

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার বন্দনা সান্যাল চন্দ্রশেখর রুদ্র
ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল দেবীপ্রসাদ মজুমদার সাধন সরকার

প্রধান সম্পাদক :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক :
আরতি সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলকাতা ৬৮

প্রচ্ছদ :
রনেন আয়ন দত্ত

দাম : ত্রিশ টাকা

সডাক : পঁয়ত্রিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

এই বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যার সঙ্গেই বিভাব উনিশ বছরে পা দিল। সময়ের এই সুদীর্ঘ পরিসরে নানা নিয়ন্ত্রণঅসাধ্য বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছি আমরা, দু-একবার প্রকাশ বন্ধ করে দেবার ঘোষণাও হয়েছিল, তবু সম্পাদকমণ্ডলীর অদম্য এষণায় বিভাবের প্রকাশনা শেষ অবধি অব্যাহত থেকেছে। তবে আমরা অশঙ্কিত নই। শঙ্কার কারণটি নিতান্তই ব্যবহারিক। যে হারে মুদ্রণব্যয়, কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ আকাশপ্রমাণ হয়ে উঠছে এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের বদান্যতার সিংহভাগই টি.ভি. নামক আপাদমস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে নিচ্ছে, তাতে ব্যাপক অর্থে বাংলাভাষাই আজ বিপন্ন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত পঁচিশে বৈশাখের যে অনুষ্ঠানগুলি এ বছর টি.ভি.-তে সরাসরি দেখানো হয়েছিল সেখানেও মাঝে মাঝেই বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্য দেখে আমরা লজ্জায় অধোবদন হয়েছি। টি.ভি.-র বণিকবৃত্ত রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দেয়নি। এর পাশাপাশি কাগজের যুক্তিহীন যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধিও আমাদের বিমর্ষ করছে। কাগজ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিকাশের প্রধান উপাদান। কেন্দ্রীয় সরকার ও এবং রাজ্য সরকার উভয়ের দায়িত্ব রয়েছে এর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সুষম বিপণন নিশ্চিত করা। কাগজ অন্যান্য ব্যবহারিক পণ্যের মত লাভের কারণে গুদামজাত করার মতো সামগ্রী নয়। এই একটি মাত্র ক্ষেত্র যেখানে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কারণগুলিই পরবর্তী বিপণনের আওতায় আসে। সরকার অন্যান্য ভবিষ্যহীন বাণিজ্য ও আপাত-প্রয়োজনহীন ক্ষেত্রগুলি থেকে ভর্তুকি কমিয়ে যদি কাগজব্যবসাকে সেই ভর্তুকির কিছুটা দিয়ে কাগজের মূল্যকে নিয়ন্ত্রণে আনেন তবে তা আমাদের অনেকটাই আশ্বস্ত করবে। স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরেও শিক্ষা এখনো এদেশে প্রার্থিত মান ও শতাংশহিসাবে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। সাক্ষরতা বাড়ানোর সঙ্গে কাগজের দামও বাড়বে, এমন যুক্তিহীন সংঘটন কেবল এদেশেই সম্ভব।

নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চন্দ্রস্বামীপূত কেন্দ্রীয় সরকারের যে অনির্বচনীয় কাণ্ডকারখানা চলছে তাতে আমরা আতঙ্কিত। কিছু কিছু রাজ্য সরকারও নক্কার সংঘটনে পিছিয়ে নেই। দলের জন্যই দেশ না দেশের জন্য দল — এর উত্তর নাবালকেও জানে, তবে নেতারা অনেকেই তা জানেন বলে মনে হয় না। মিছিল, মহামিছিল, ঘেরাও, বন্ধে এযাবৎ এ দেশের কতটা উন্নতি হয়েছে জানি না, তবে এতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের পরিভাষায় যত "ম্যান-আওয়ার" নষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, তা নিয়ে গভীর চিন্তার সময় এসেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে অকৃত্রিম অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস দেখা গেছে সেখানে দৈনন্দিন "কার্যসময়ের" অপচয় এখনি কঠোর হাতে বন্ধ না করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সিনেমার শতবর্ষপূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সিনেমার ইতিহাস ও পশ্চাৎপটের

বিবরণসহ নিবন্ধ ও দশটি চিত্রনাট্যের যে বিশেষ সংখ্যাটি এই শরৎকালীন সংখ্যার আগেই প্রকাশিত হবার কথা ছিল তার মুদ্রণকার্য ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। সেই বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যার সঙ্গে সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসাবে যারা জড়িত তারা দেশে ও আন্তর্জাতিক সিনেমা পরিমণ্ডলে সকলেই স্বনামধন্য। একসঙ্গে একই দিনে মঞ্চে একত্র করা কষ্টসাধ্য। সকলের সুবিধার দিক লক্ষ্য রেখে তাই অনিবার্য ভাবেই সংখ্যাটির প্রকাশ-উৎসব খানিকটা পিছিয়ে দিতে হলো। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে নন্দনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তা প্রকাশিত হবে। প্রকাশের সময় তারিখ যথাসময়ে কাগজে বিজ্ঞাপিত হবে।

সলিল চৌধুরীর প্রয়াণ সঙ্গীতজগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। একদা বামপন্থী আন্দোলনে পরে আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা আমাদের আপ্লুত করে রেখেছিল। আধুনিক বাংলা গানে যে বৈচিত্র্য তাঁর সুর ও গীতরচনার মেলবন্ধনে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল তা হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল। বাংলা গানের ইতিহাসে এমন অসামান্য প্রতিভা খুব বেশি আসেনি। এ সংখ্যায় তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীর কিছুটা প্রকাশিত হলো। প্রতিক্ষণ সম্পাদিকা স্বপ্না দে-র কাছে এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বিভাবের এই উনিশ বছরে পদার্পণের সূচনায় সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই কৃতজ্ঞতা। অরিজিৎ কুমার তথা প্যাপিরাস প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ নতুন করে দেবার নেই কেননা তারা এখন বিভাবেরই অঙ্গ ও সামগ্রিকভাবে প্রকাশনার পরিপূরক। সকলের শুভ হোক।

বিভাবের সম্পাদকমণ্ডলী

With Best Compliments

From
A
Well Wisher

SENBO
ENGINEERING
LTD.

CONSULTING ENGINEERS,
ARCHITECTS, PLANNERS & CONTRACTORS

87, LENIN SARANI, CALCUTTA - 700 013

PHONE : 244-1395, 245-0816, 249-0441,

FAX : (033) 244-9485

জীবন উজ্জীবন

সলিল চৌধুরী

[আমার একটা মস্ত বড় দুর্বলতা যা জীবনী লিখতে বসে বিশেষ করে উপলব্ধি করেছি যে দিনক্ষণ, সন তারিখ আমার কিছুই মনে থাকে না। কেমন করে যেন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, আর মনে হয় এই তো সব সেদিনের ঘটনা। ইতিহাসের সময় আর স্মৃতির সময় বোধহয় দুটো একেবারে আলাদা। স্মৃতির ক্যালেণ্ডার ব্যক্তিবিশেষে আলাদা আলাদা রূপ নেয়। সময়কে সেখানে ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। যা ছিল এক বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা তা হয়ে-ওঠে বাকহীন কালজয়ী এক চেতনা। তার কোনো বয়স থাকে না, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা থাকে চিরনবীন।

তাই মনের 'সময়' অনুভূতির 'সময়' আর দিনক্ষণ সন-তারিখের 'সময়ের' মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ইতিহাসেও তো তাই। হাজার হাজার বছর ধরে ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে চলতে একটা বিপ্লব বা একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এক লাফে সময় একটা Quantum jump মেরে পাঁচশ হাজার বছর এগিয়ে যায়। —স. চ.]

আমার তখন বছর তিনেক বয়স হবে। আমার বাবা ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী দুম্ করে এক কাণ্ড করে বসলেন। আসামের শিবসাগর জেলার লতাবাড়ি চা বাগানের সাহেব ম্যানেজারের তিনটে দাঁত এক ঘুষিতে ভেঙে দিলেন। তখনকার কালের হিসেবে সাহেব খুব একটা অন্যায় করেননি। শুধু বাবাকে বলেছিলেন 'কাম হিয়ার ডার্টি নিগার।' বাবা গেলেন এবং কিছু না বলে—দুম্!! এবং নক আউট!! তখনকার দিনের চা বাগানের সাহেব ম্যানেজাররা ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কুলি নেটিভদের খুন করে গুম করে ফেললেও কেউ কিছু বলতে পারতো না। এ হেন সাহেবকে মার! সারা বাগানে চাপা হৈচৈ। "ডাগ্‌দারবাবু সায়েবটির দুটা দাঁত ভাঙিয়া দিলেন।" বাবা একটি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। সেটা হল মারার পর কোম্পানির হাতির মাহুতের কথা রেখেছিলেন। সে বলেছিল "তু ইহাঁসে ভাগ্ যা ডাগ্‌দারবাবু সায়েব গুলি মারি দিবেক।" হাতির পিঠে চেপে বাবা গেলেন সোজা সি.এম.ও. ডাঃ মালোনির কাছে। চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ম্যালোনি ছিলেন আইরিশ এবং বাবার কাছে শুনেছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর তাঁর ছিল সহানুভূতি। তিনি রাতারাতি আমাদের স্টিমারে তুলে শীলঘাট থেকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। আমরা বলতে তখন ছিলাম আমার মা, আমার দাদা, আর আমার ছ'মাসের ছোট বোন। সেই দ্রুত পলায়নের তাগিদে আমাদের বাড়িতে যা কিছু ছিল বাবা হয় বিলিয়ে নয়ত জলের দরে বেচে দিলেন। শুধু একটি জিনিস বাবা সঙ্গে নিয়ে চললেন—সেটা হল একটা চোঙা দেওয়া

কুকুর মার্কা কলের গান আর শতখানেক ইংরেজি বাজনার রেকর্ড। ডাঃ মালোনি বাবাকে দিয়েছিলেন। আমার বাবার একাধারে এই দুঃসাহস আর আত্মসম্মান-জ্ঞান অন্যদিকে অসম্ভব সংগীতপ্রীতি আমার পরবর্তী জীবনকে গড়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। জ্ঞান হওয়া থেকে এইসব সিম্ফনি রেকর্ড আর হঠাৎ হঠাৎ বাবার দরাজ গলায় আলাপ আমার চৈতন্যে মিশে গেছে। আজ যখন ছোটবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করি বুঝতে পারি আমার বাবা আমার জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল আসামের কাজিরাঙ্গা অরণ্য আর তার গাছপালা পশুপাখি আর কীটপতঙ্গের অসাধারণ আরণ্যক সিম্ফনি। আজ যখন ছোটবেলার দিন আর বাবার কথা ভাবতে চেষ্টা করি কিছুতেই সেই পরিবেশ বাদ দিয়ে আলাদা করে আর তাকে মনে করতে পারি না।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। আসামের চাকরি ছেড়ে আমার বাবা আমাদের পৈতৃক দেশ দক্ষিণ বারাসতে ডিসপেনসারি খুলে বসলেন। কিন্তু ২/৩ বছরের মধ্যেই আবার পাততাড়ি গুটিয়ে আসামমুখী হতে হল। সমস্ত গাঁয়ের লোককে ধারে এবং বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাবা যখন পাওনা আদায়ে বেরোতে শুরু করবেন অমনি শুরু হয়ে গেল বিচিত্র সব কুৎসা। "আসামের জংলী ডাক্তার কিচ্ছু জানে না। কুলির ডাক্তার ভদ্রলোকের চিকিৎসা জানে না" ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আরও ২/৩ জন ডাক্তার এসে বসেছে গাঁয়ে। বাবা উক্তক্ত হয়ে আবার ডাঃ মালোনিকে স্মরণ করলেন, আবার তিনিই কাণ্ডারী হলেন। এবার যে বাগানে আমরা গেলাম তার নাম একড়াজান।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে আসামের গহন অরণ্য, তার আলোছায়া বিচিত্র গন্ধ আর শব্দ চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। সভ্যতা বাড়ছে—জঙ্গল সাফ করে বসতি বসেছে—বিদ্যুৎ এসেছে—মালবাহী ট্রাক আর যাত্রীবাহী বাস ঘড়ঘড় শব্দে ছুটে চলেছে। পশুপাখিরা ভয়ে দূর-দূরান্তে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। যারা পারেনি তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের সর্বগ্রাসী আরো অর্থ আরো মুনাফা আরো ক্ষমতার রথচক্রে আমার সেই ছোটবেলার দিনগুলো পিষ্ট হতে হতে অবলুপ্ত প্রায়। তাকে উজ্জীবিত করে আজকের মানসপটে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা! বাবা বিশাল একটা চিতল মাছ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের সামনের মাঠটায় ঢুকছেন। মাছের ল্যাজ মাটিতে ঘষছে। বাবার ডাক শুনতে পাচ্ছি—বাচ্চু! খোকা! শিগ্‌গির দেখবি আয়। দাদা আমি ধরাধরি করে সেই বিশাল মাছ নিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। মার মাথায় হাত। এতবড় মাছ কুটবে কে? বাবা নিজেই লেগে গেলেন বটি, দা, ডাক্তারি স্ক্যালপেল ইত্যাদি নিয়ে মাছ কুটতে। তারপর সেই মাছ বিলোন হল কম্পাউণ্ডার, নার্স, ড্রেসার, টানা পাখাওলা, জমাদার সকলকে ডেকে ডেকে। হাসপাতালের প্যানট্রিতে পাঠানো হল রুগীদের জন্য। তারপর বাবা বললেন: আজ আমি রান্না করব। ব্যস! হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। বাবার রান্না করা মানে তিনি গ্যাঁট হয়ে একটা মোড়া পেতে বসবেন উনুনের ধারে খুন্তি হাতে, তারপর শুরু হবে: আদা বাটা নিয়ে আয়। ওরে প্যাঁজগুলো কুচিয়ে ফেল, সরষের তেল মাত্র এইটুকু?—যা দৌড়ে পাঁইয়ার দোকান থেকে নিয়ে আয়। এই জগা। ধনে জিরে বাটার কি হল! মানে সে তুলকালাম কাণ্ড! তার ওপর এক একদিন বাবার সখ হত তিনি আমাদের খাইয়ে দেবেন। আমরা তখন পাঁচ ভাইবোন সব গোল হয়ে বসব। আর বাবা তরকারি মাখা ভাত এক একজনের গালে তুলে দেবেন—নাক-মুখ ভাতে মাখামাখি। অনুযোগ করলে বাবা সেই ভাত মাখা হাত দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতেন। তাতে আরো ল্যাবড়া লেবড়ি। তার উপর বাবার গল্প চলত "বুঝলি! আজ ওই বুড়ো মুহুরির পাছার ফোঁড়াটা কাটলুম! ওঃ সে কি থাবা থাবা পুঁজ। নে খা—" বলে মুখে ভাত গুঁজে দিতেন। আমরা চীৎকার করে উঠতাম। "ওমা! দেখ না!" মা রাগে গজগজ করতেন—ঘেন্নাপিত্তি বলে যদি কিছু থাকে, নিজেই ওয়াক ওয়াক করতে করতে মা বেরিয়ে যেতেন। বাবা গম্ভীর মুখে বলতেন—'ঘেন্না জয় করতে শেখো! লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়।' এমনিতে বাবা ছিলেন ভীষণ রাশ-ভারী। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যখন বিদেশ থেকে আগত নানারকম মেডিক্যাল জার্নাল নিয়ে পড়তে বসতেন—কারো সাধ্য থাকত না ট্যাঁ-ফুঁ করবার। আমরা রান্নাঘরে গিয়ে মার কাছে বসতুম। কিংবা একটা বই নিয়ে বসে পড়তুম। কখন নটা বাজবে। নটা বাজলেই কলের গানে বাবা রেকর্ড লাগাবেন আর খাবার দিতে বলবেন। তখন আবার বাবার অন্য চেহারা।

একবার বাবা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন এক বিশাল ষাঁড় হাসপাতালের সিমেন্টের চত্বরে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে একেবারে যাতায়াতের পথের ওপর। রুগীরা ভয়ে তাকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করছে না। বাবা কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে নিজের চেম্বারে গিয়ে ডাক ছাড়লেন 'কম্পাউণ্ডারবাবু!' 'দরোসী' (মানে ড্রেসার) ঘনিয়া এক লাফে ষাঁড় ডিঙ্গিয়ে ঘরে ঢুকল। বাবার হাতে তখন স্মেলিং সল্টের বিরাট জার। ঢাকনা খুলে বললেন—"ষাঁড়কা নাককে পাকড়ো!" ড্রেসার ইতস্তত করতেই বাবার এক ধমক! ঘনিয়া তো পা টিপে টিপে এসে ষাঁড়ের নাক থেকে দেড় হাত দূরে বসে কাঁপতে কাঁপতে সেই খোলা জার ষাঁড়ে নাক বরাবর নিয়ে এল। তারপর যা ঘটল তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই বিশাল বিশমণী ষাঁড় গাঁক একটা শব্দ করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল প্রায় ছ'ফুট উঁচু। তারপর ভূমিস্থ হয়ে আর একটা আর্তনাদ করে পুচ্ছ তুলে প্রচণ্ড স্পিডে এক নিমেষে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। রেখে গেল আষমণ গোবর। এদিকে হাসতে হাসতে মেয়ে রুগীরা লুটোপুটি খাচ্ছে। বাবার গম্ভীর মুখে কোন বিকার

নেই। "দাওয়াই আলমারিমে রাখ দো"— বললেন ড্রেসারকে। এমনি বহু খুঁটনাটি ঘটনায় বাবার মধ্যের শিশুটি বাইরে বেরিয়ে পড়ত। আমরা একদিকে যেমন বাবাকে শ্রদ্ধা করতাম, সমীহ করতাম, অন্যদিকে আবার একবয়সী বন্ধুর মতো ভালোবাসতাম। আমরা ভাইবোনেরা মাঝেমধ্যে এক হয়ে যখন বাবার গল্প করতে বসি তখন শেষই হতে চায় না। অথচ দেখতে দেখতে তিরিশ বছর পেরিয়ে গেল বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এখনও কি জীবন্ত সাম্প্রতিক মনে হয় সব ঘটনা। বাবা নিজে ডাক্তার ছিলেন বলেই হয়ত আমাদের কারো সামান্য অসুখ করলেই ভীষণ নার্ভাস হয়ে যেতেন। দূরের কোনো বাগান থেকে অন্য ডাক্তার ডেকে আনতেন। আমরা পাশের ঘরে গল্প করতে করতে হঠাৎ কেউ জোরে হেঁচে ফেললাম হয়ত, ব্যস! হয়ে গেল!—কে হাঁচল রে? বাবার আওয়াজ এল। আমার ছোটভাই বাবু সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল—ছোড়দি বাবা! তখনকার দিনে কাশির মিষ্টি সিরাপ ছিল না। খেতে হত ভীষণ তেতো কুইনিন অ্যামোনিয়া মিক্সচার। ছোড়দি মানে আমার ছোটবোন লিলির বানানো প্রতিবাদ —আমার সর্দি হয়নি বাবা! আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হেঁচেছি। 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা বাবা! নাকে কিছু না দিয়েই হেঁচেছে' বলতে বলতে বাবুই আচমকা হেঁচে ফেলল। দুজনকেই খেতে হল কুইনিন অ্যামোনিয়া। এমনি কত ঘটনার কথা মনে পড়ে। অসম্ভব স্নেহশীল সুরসিক অথচ কর্তব্যে দৃঢ় সেই পিতার পক্ষচ্ছায়ে আশ্রিত আমাদের সেই সুন্দর ছোট্ট সংসার ভেঙে-চুরে তছনছ হয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেল! মাও চলে গেলেন। ভাইবোনেরা কেউ বোম্বে কেউ ত্রিপুরা কেউ গ্রামে কেউ কলকাতায় নিজের নিজের সংসার আর বাঁচার তাগিদে সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই সব দিন! গন উইথ দ্য উইণ্ড!!

লতাবাড়ির চাকরি ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত বাবা পোশাকে-আশাকে ছিলেন খাঁটি সাহেব। স্যুটবুট ছাড়াও রুমালটা পর্যন্ত আসত তখনকার হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডল'র বাড়ি থেকে। বারাসাতে ফেরার পর মনে আছে আমাদের বাড়িতে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আর বিদেশী বয়কটের ঢেউ আসতে শুরু হল। কি একটা উপলক্ষে বাবা দু-তিন ট্রাংক ভর্তি দামী দামী স্যুট সব পোড়ালেন ঠাকুরদালানের সামনের মাঠে। গুজব রটল বাবাকে জেলে নিয়ে যাবে। আতঙ্কে কদিন কাটল কিন্তু বাবার স্বাদেশিকতা এটুকু পর্যন্ত ছিল বলেই বোধহয় ইংরেজ আর তাঁকে ঘাঁটায়নি। সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাবা ধুতি আর টুইলের সার্ট পরে কাটিয়েছেন। সার্ট কোনোদিন কেনেননি। মা নিজে কলে সেলাই করে দিতেন। আমার পরবর্তী জীবনে বাবার ঐ বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ঘটনা গানের মধ্যে এসেছে। 'নাকের বদলে নরুণ পেলুম' গানটিতে আছে :

"আমার বাবাও বোকা ছিল
আমিতো তার ছেলে

সে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে
গিয়েছিল জেলে
আর তোমরা কেমন দেশী সুতোয়
বানালে গাঁটছড়া
তার এক কোণ বাঁধলে গাউনের সাথে
আর এক কোণ গলায় দিয়ে ঝুললুম॥"

আমার মনে আছে আমাদের বারাসতে থাকাকালীনই চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেলেন দার্জিলিং-এ। মনে থাকার কথা নয়, কারণ আমার তখন বছর পাঁচেক বয়স। কিন্তু একটি বাউলের মুখের গানের মধ্যে আমার সেই স্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে। তাঁর গান শুনে বাবা তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন। তাঁর চেহারার কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু সেই গানের প্রথম কয়েকটি কলি সুর সমেত আজও আমার মনে আছে। গানটি হল :

"চিত্তরঞ্জন
স্বদেশের প্রাণধন
তাজিলেন জীবন
দার্জিলিং গিয়ে—"

পরে বুঝেছি আশাবরী রাগাশ্রিত এই সামান্য কটি কথা সুরের যাদুতে কি অসামান্য বিস্তার সৃষ্টি করেছিল আমার শিশু মনে। ছন্দ এহং সুর যে ব্যবহারে জীর্ণ সাধারণ কথাকে কোথায় নিয়ে কোন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে—এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত অখ্যাত এক কবি সুরকারের গানটি তার নজীর হয়ে আছে।

নিজের দেশ গ্রাম থেকে অপমানিত এবং একরকম বিতাড়িত হয়েই বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কখনো দেশে ফিরবেন না। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বাবা ঐ জঙ্গলে নিজেকে বনবাস দিয়েছিলেন। বই, বিদেশী জার্নাল, ম্যাগাজিন পত্র-পত্রিকা আর গানের রেকর্ড ছাড়া সভ্য জগতের সঙ্গে তাঁর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। একড়াজান থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি হয়ে বাবা এলেন কাজিরাঙ্গা অরণ্যের গা ঘেঁষা হাতিখুলী, ডিরিং আর রাঙ্গাজান এই তিনটি বাগানের এ. এস. ও. হয়ে। হাজার হাজার একর বিস্তৃত এই বিশাল বাগানের বাবা যেন ছিলেন একছত্র রাজা। কুলিকামিন থেকে চা বাগানের শিলেটি অসমীয়া মুহুরী কেরানি সকলেই শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। অসম্ভব স্বাধীনচেতা, সহৃদয়, ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত, স্নেহশীল সেই মানুষটির মতো করে পৃথিবীতে আর কাউকে কোনোদিন আমি ভালোবাসতে পারিনি। একেবারে শেষের দিকে জোর করে রিটায়ার করিয়ে, মা এবং আমাদের পীড়াপীড়িতে বাবা যখন দেশে ফিরতে সম্মত হলেন—তাঁকে এনে তুললুম কসবার এক ঘিঞ্জি গলিতে দুকামরার ছোট এক ফ্ল্যাটে। বাবা হাঁপিয়ে উঠতেন। বারবার

ফিরে যেতে চাইতেন সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্বাধীনতায়। তারপর তিনমাসও বাঁচলেন না। কসবায় কলেরার মহামারী তাঁকে গ্রাস করলো। আজ যখন কখনো তাঁকে স্বপ্নে দেখি—দেখি সেই হাতিখুলী বাগানের হাসপাতালে বাবা একা বসে আছেন। কসবার গলির সেই ছোট্ট ঘরে অবচেতন মনেও তাঁকে যেন ভাবতে পারি না। ক্ষোভে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করে। কেন মুক্ত নভোচারী ঈগলকে খাঁচায় বন্দী করলাম। আমার মাঝেমাঝে ভাবতে অবাক লাগে যে বাবার মতো অখ্যাত অজ্ঞাত কত অসাধারণ মানুষ যে আমাদের বাবা কাকা মামা দাদা বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন যাঁদের কথা কেউ কোনোদিন জানবে না। অথচ কয়েকটি প্রচার যন্ত্রের মহিমায় কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রের দাক্ষিণ্যের সুযোগে কত অতি সাধারণ নগণ্য মানুষ যে প্রখ্যাত বিখ্যাত হয়ে লাঠি ঘোরাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। দুঃখ করে অবশ্য লাভ নেই। বর্তমান যুগই হচ্ছে প্রচারের যুগ, ঢাক পেটানোর যুগ। কোথায় গেল অজন্তা-ইলোরা-কোণারক আর দক্ষিণের শয়ে শয়ে মন্দিরের সেই সব অসাধারণ শিল্পীরা—যাঁদের নাম কেউ কোনোদিন জানবে না। কোন মানসিকতা উদ্বুদ্ধ করেছিল শুধু সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করতে—স্বাক্ষর না রাখতে! বর্তমান সভ্যতার এজাতীয় মানসিকতা কল্পনারও অসাধ্য! আমাদের সিনেমা লাইনে তো কার নাম আগে যাবে কার নাম পরে, কার অক্ষর বড় হবে কার অক্ষর ছোট তাই নিয়ে কত তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে এবং ঘটছে। শুধু সিনেমা কেন এই সেদিন আমাদের এক গণনাট্য শিল্পীর নাম ঘোষণার আগে ঘোষককে বলা হল পৃথিবী-বিখ্যাত অমুক বলুন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় জানলুম যে তিনি যুব উৎসবে নাকি কিউবা ঘুরে এসেছেন। সে যাকগে।

বাবার কথা শেষ করার আগে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ তথা ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়ার আগে আমরা দুধ কিনতাম এক টাকায় আট সের। খাঁটি ঘি ছিল এক টাকা সের। আসামের গোয়ালারা ছিল অধিকাংশই নেপালী। জঙ্গলের মধ্যে ছিল তাদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। তাদের মোষ চরত জংলী মোষেদের সঙ্গে। তাদের ঔরসেই জন্মাত। অনেক সময়ে প্রেমের অমোঘ মায়ায় জংলী মোষও এসে ধরা পড়ত এদের খোঁয়াড়ে। জীবনব্যাপী লড়াই করে জঙ্গল সাফ করে এরা চাষবাসও করত এবং দুধের ব্যবসা করত। আজ শুনছি এরা নাকি আসামে বিদেশী। সে যাই হোক—যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে বাগানের কাঁইয়া মাড়োয়ারী এই অতি দরিদ্র গোয়ালাদের মোটা টাকা দাদন দিয়ে সব দুধ এবং ঘি হাত করে বসল যুদ্ধে চালান দেবে বলে। একদিন ঘি কিনতে গিয়ে বাবা হঠাৎ শুনলেন, কাঁইয়া বলল —ঘিউ নেহী হ্যায়! মগর আপকে লিয়ে হ্যায় চার রুপয়া সের। কেন? চার টাকা সের কেন?—বাবা জিজ্ঞেস করলেন। কাঁইয়া জানাল যুদ্ধ বেধেছে। নিয়ে যান—আজ চার টাকায় পাচ্ছেন কাল দশ টাকাও হয়ে যেতে পারে। বাবার

অকাট্য যুক্তি "যুদ্ধ যেখানে বেধেছে সেখানে বেধেছে বাগানে তো বাধেনি। এখানে দর বাড়বে কেন?" সাহেব ম্যানেজারের কাছে নালিশ করেও কিছু হল না। তিনি বাবাকে বোঝালেন যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে প্রধান জাতীয় কর্তব্য ইত্যাদি। মনের রাগ মনে গুমরে বাবা চুপ করে গেলেন। যুদ্ধ যে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাবে, যুদ্ধে সাপ্লাই করে আর কালোবাজারী করে আজকের অনেক রথীমহারথীদের বাবা, দাদা যে কত কোটি টাকা কামিয়ে সমাজের মাথায় চেপে বসবে এবং একমাত্র বাংলায় যে পঞ্চাশ-লক্ষ মানুষ 'ফেন দাও ফেন দাও' করে মারা যাবে সেকথা কল্পনাও করা বাবার কেন কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ভাবলেন ঐ কাঁইয়াটাই বদমাস। ও বেটাকে শায়েস্তা করতে হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

এক মাস যেতে না যেতেই একদিন সকালে আমরা চা খাচ্ছিলাম, খবর এল কাঁইয়া এসেছে হাসপাতালে এক্ষুনি বাবাকে তলব করেছে। কেন জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তার দাঁতের গোড়া ফুলে ঢোল। অসম্ভব যন্ত্রণায় কাঁইয়ারূপী গাল ফোলা গোবিন্দর বাবা যন্ত্রণায় ছটফটাচ্ছে। বাবা কম্পাউণ্ডারকে বললেন 'ঠিক আছে—বসিয়ে রাখুন শালাকে।' —অ্যাসপিরিন দেব? —'কিচ্ছু না—থাক বসে।' আমাদের বাড়ি থেকে হাসপাতাল প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। সেখান থেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছি কাঁইয়ার গোঙানি—'আরে বাপরে, মর গয়া! ডাগদারবাবু বাঁচাইয়ে।' বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর মা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বাবাকে পাঠালেন। আমরা জানলা দিয়ে দেখছি বাবা গিয়েই বললেন 'কম্পাউণ্ডারবাবু দাঁততোলার বড় সাঁড়াশিটা নিয়ে আসুন।' কাঁইয়া আর্তনাদ করে উঠল 'মর যায়েগা ডাকদার-বাবু—দাওয়াই দিজিয়ে।' কাঁইয়ার চিৎকার ইণ্ডোর আউটডোরে রুগীদের বেশ একটা ভিড় জমেছে। বাঘের গলায় হাড় ফোটার মতো অবস্থা আর কি। হাতে সাঁড়াশি নিয়ে বাবা এক ধমক দিলেন 'হাঁ করো'—হাঁ করতেই সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতটা বাবা চেপে ধরে একটু করে নাড়ান আর কাঁইয়া চেঁচিয়ে ওঠে—'মর গয়া'। বাবা বলেন—'অব বাতাও ঘিউ কা ভাও কেয়া হ্যায়—!' বাগানের কুলী রুগীরা তো হেসে লুটোপুটি! ব্যাস ঐ পর্যন্তই। মাড়ি ফোলা অবস্থায় দাঁত তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এমনিই ছিল বাবার প্র্যাকটিক্যাল জোক। এবং এটা ছিল শুধু জোকই। কাঁইয়াকে জব্দ করার পিছনে রাগের চেয়ে কৌতুকবোধই তাঁর মধ্যে বেশি কাজ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২

আমার বাবার গান বাজনা ছাড়া ছিল নাটকের সখ। হাতীকুলি চা-বাগানে বাঙালি অসমীয়া সবাইকে দিয়ে দুর্গাপূজার প্রবর্তন বাবাই করেন এবং সেই পূজা উপলক্ষে প্রতিবছর নাটক অভিনয় হতো। বাগানের কেরানি-মুহুরি-বাবুরাই

অভিনয় করতেন—পরিচালনা এবং সংগীত পরিচালনা বাবা করতেন। একবারের কথা মনে আছে—তখন আমার বয়স হবে ১২/১৩ বছর। সংগীতে হাতেখড়ি এবং বেশ কিছু যন্ত্রপাতি বাজানোর কিছুটা দক্ষতা তখনই আমি অর্জন করেছি। কেমন করে সে কথা পরে বলব। পুজোর ছুটিতে আসামের বাড়িতে গিয়ে শুনলুম, সে বছর নাটক হচ্ছে ঠিকই তবে বাবা তার মধ্যে নেই। নাটক বাছাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় বাবা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু অত্যন্ত মনঃকষ্টে আছেন। নিজের হাতে গড়া দল থেকে বেরিয়ে আসতে হল।···কিন্তু তার বদলে মনে মনে যে প্ল্যান বাবা নিয়েছিলেন তখনকার দিনে তা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক। বাবা ঠিক করেছিলেন 'বেহুলা' পালা নাটক পালটাভাবে করবেন এবং তা করবেন বাগানের মজুর-কুলি ছেলেমেয়েদের দিয়ে। তখনকার দিনে ছেলেরা গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজত। বাবার ধারণা ছিল যে ভদ্রঘরের মেয়েরা পর্দানশীন হতে পারে কিন্তু চা-বাগানের কামিন মেয়েদের তো সে বালাই নেই, কাজেই এটাই হবে নাটকের নতুন দিগন্ত খুলে দেবার রাস্তা। এই সব আদিবাসী কোল ভীল সাঁওতাল কয়া জাতির মেয়েদের মধ্যে এমন সব সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা থাকে যারা অনায়াসে ফিল্মের হিরোইন হতে পারে। কাজেই বাবার মনেমনে একটা ওয়ান আপ জাতীয় ফিলিং ছিল। আমি যেতে বাবা খুশি হয়ে বললেন, এই প্রথম ছেলে মেয়ে একসঙ্গে নাটক করবে, বারোটা গান আছে। ছটাতে তুই সুর কর আর ছটা আমি সুর করে রেখেছি। আর কাস্টিং করে ফেলেছি, সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানায় রিহার্শাল। অভিনয় ওরা ওদের চেয়ে ভালো করবে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাংলা ডায়লগ নিয়ে। কিছুতেই বলানো যাচ্ছে না। ভাবছি কুলি ভাষাতেই যদি বেহুলা করি, কিন্তু তোর মার ভীষণ আপত্তি। মা বললেন, দেখ তো, ঠাকুর দেবতা নিয়ে কি ছেলেখেলা! মা মনসা কুলি ভাষায় কথা বলবে? বাবার যুক্তি '—মা মনসা মোটেই বৈদিক দেবতা নন। তিনি লৌকিক দেবী, কাজেই তিনি যদি কথা বলেন তো আদিবাসীদের ভাষাতেই বলবেন।' আসামের চা বাগানের মজুরদের মধ্যে সারা আসাম জুড়ে এক বিচিত্র ভাষা প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে হিন্দী বাংলা অসমীয়া এবং লৌকিক ভাষার এক অদ্ভুত খিচুড়ি। 'কাঁহা যাচ্ছিস?'-'কে দিবেক?'-'মাইকী মোটা ছোকরা-ছুকরি সব পাত তুলতে যাইছেং'—মাইকী মোটা—অসমীয়া ভাষায়—স্ত্রীপুরুষ—শেষ-অবধি ঠিক হল মা মনসাকে কষ্টে সৃষ্টে বাংলা বলিয়ে নেয়া যাবে—বাকি সবাই কুলি-ভাষায় কথা বলবে। এক চশমা-পরা কোমর ভাঙা কানী বুড়িকে বাবা মনসার পাট দিয়েছিলেন আর এক দো-আঁসলা সাঁওতালী মেয়েকে বেহুলার পাট। সুখিয়া নাম্নী এই মেয়েটির মা সাঁওতাল এবং বাবা ঐ বাগানের এক প্রাক্তন ব্রিটিশ ম্যানেজার। রং মাজা-মাজা চোখ কটা এবং চুল যাকে বলে ব্রণ্ড-সোনালি রঙের। অসাধারণ সুন্দরী ছিল মেয়েটি। আমার যৌবনে

এই মেয়েটির একটি ভূমিকা ছিল। সে কথা পরে বলব। তখনকার দিনে সায়েব ম্যানেজাররা ভালো মাইনে দিয়ে ভালো দেখতে কুলি মেয়েকে 'মেম' করে রেখে দিত। তারা ভালো শাড়ি পরত, গয়না, মাথায় পাতাকাটা চুল, পায়ে জুতো সঙ্গে সঙ্গে একজন আয়া থাকত। বাইরে বেরুলে সেই আয়া মাথায় ছাতি ধরত। হাটের দিনে কতবার এই মেমদের দেখেছি। সাধারণত তারা ছিল ঘৃণার পাত্রী কিন্তু কুলিরা তাদের সমীহ করে চলত। বিলেত চলে যাবার সময় সাহেব তাদের কিছু মোটা টাকা দিয়ে যেত। সুখিয়া ছিল এমনি এক মেমের মেয়ে। শুনেছি অনেক সাহেব অন্য বাগান থেকেও তাকে মেম করতে চেয়েছিল। সুখিয়া পাত্তা দেয়নি। চাঁদ সওদাগরের রোলে ইয়া লম্বা চওড়া বিশাল গোঁফওয়ালা হাসপাতালের জমাদার মান্নিয়াকে বাবার পছন্দ, কিন্তু মুশকিল হল সে কুলি ভাষাটাও ভালো করে শেখেনি, বলে তেলেগু ভাবা। বাবা তার ডায়লগ যথা-সাধ্য কেটেকুটে হুঁ হাঁ-হুঙ্কারের মধ্যেই রাখবেন ঠিক করলেন। রিহার্শাল শুরু হল। সারা বাগানে হৈচৈ মেয়েদের স্টেজে নামানো হচ্ছে। এটা কী ভালো হচ্ছে? বাগানের বাবুদের মধ্যে কলরব। আমি দুটো গান একটু পঙ্কজ মল্লিক স্টাইলে সুর করে বাবাকে শোনালুম। তার আগেই অবশ্য মা আর বোনেরা শুনে ভালো বলেছেন। বাবা শুনে খানিক চুপ করে থেকে বললেন 'আমার গান-গুলোও তুই সুর কর, আমারটা এত ভালো হয়নি।' তাতে অবশ্য আমরা সবাই আপত্তি তুললাম। বলতে গেলে বাবার সহযোগী হয়ে সেই আমার প্রথম সংগীত পরিচালনা। হাতীকুলি থেকে ছ মাইল দূরে ডিরিং চা-বাগানের হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন বাবার সিনিয়র কম্পাউণ্ডার সুকুমারবাবু। তিনি ছিলেন শিলেটের লোক। অসাধারণ সঙ্গীত রসিক এবং বেশ ভালো তবলিয়া ছিলেন এই সুকুমার কাকা। ছুটিতে আসামে গেলে সন্ধ্যায় বাড়িতে আসর বসত। আর সুকুমার কাকাই হতেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। আমি বাংলা সিনেমার গান এবং রেকর্ডের মৃণাল-কান্তি ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমলা ঝরিয়া ইত্যাদির গান হুবহু নকল করে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতাম, সুকুমার কাকা সঙ্গত করতেন। আর আমি গাইতাম পঙ্কজ মল্লিকের গান। তখনকার 'ডাক্তার' ছবির গান 'ওরে চঞ্চল' ছিল আমার প্রিয় গান, তাছাড়া হিমাংশু দত্তের চাঁদ কহে চামেলি গো, কিংবা রাতের ময়ূর ছড়াল যে পাখা, বা নজরুলের 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ' ইত্যাদি ছিল আমার কণ্ঠস্থ। বাবা বাগানের বাবুদের সস্ত্রীক বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আমার গান আর বাঁশি শোনাবার আসর বসাতেন প্রায়ই। আবার গান শুনে সবাই তারিফ করলে বাবার মুখে গর্ব ফুটে উঠত। বলতেন—আরো ভালো হওয়া উচিত, তারপর খাওয়া-দাওয়া হতো। এসবই আমার গলাভাঙার বয়ঃসন্ধির আগের কথা। মেয়েদের মতো মিষ্টি গলা ছিল আমার। তখন ভাবিনি যে সেই গলা ভেঙে একদিন হেঁড়ে আর ভারী হয়ে যাবে। সে যাই হোক বেহুলার মহড়া রীতিমতো

চলতে লাগল। ঠিক হল বেহুলার গান আমি গাইব, সুখিয়া ঠোঁট নাড়বে, আর চাঁদ সদাগরের গান গাইবেন বাবা। সবচেয়ে ভালো হল সখীদের সঙ্গে বেহুলার একটা নাচের সীন—মাদলের তালে বাঁশির সঙ্গে একটা সাঁওতালী নাচের দৃশ্য বাবা ঢুকিয়ে দিলেন বেহুলার বিয়ের উৎসবে। বাছাবাছা সাঁওতালী ছেলেমেয়েদের ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই এল বিনামেঘে বজ্রপাত। পুজোকমিটির মিটিং-এ স্থির হল পুজো প্যাণ্ডেলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানো চলবে না। বাবা গুম হয়ে গেলেন। রিহার্শাল বন্ধ হয়ে গেল। কোনো কথা কাউকে না বলে দুদিন বাবা হাসপাতাল যাওয়া, কলে বেরনো সব করলেন চুপচাপ, যেন কিছুই হয়নি। তৃতীয় দিনে বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে ঘোষণা করলেন 'নাটক হবে।' কুলিরাই করবে এবং ছেলেরা মেয়ে সাজবে। কাস্টিং হয়ে গেছে।

সেই নাটক মঞ্চস্থ হল। বাবুরা করেছিলেন 'সাজাহান' আর আমরা করলাম 'চাঁদ সদাগর'। একবাক্যে সবাই বললেন, কুলিদের নাটক অনেক ভালো। পরের বছর থেকে পুজোই বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে আছে সে বছর আমি স্টেজে নবদ্বীপ হালদারের কিছু 'কমিক' অভিনয় করেছিলাম। নাকে ক্লিপ দেওয়া এক বিশাল গোঁফ এঁটে খইনী টেপার তালে তালে একবার ডানদিক একবার বাঁদিক করার সময় অট্টহাসিতে চতুর্দিক ভরে গিয়েছিল আজও মনে পড়ে। আমার মা সে কথা মারা যাবার আগে পর্যন্ত প্রায়ই বলতেন, আর বলতেন "তুই ইচ্ছা করলে খুব বড় কমেডিয়ান হতে পারতিস।" প্রসঙ্গত বলি আমার মা অসাধারণ হাসতে পারতেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ রসবোধ—সূক্ষ্ম কৌতুককেও তিনি উপভোগ করতে পারতেন। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের কসবার বাড়ির বাড়িওয়ালার একছেলের নাম ছিল 'গোদে', তার বড় ভাইয়ের নামটা কারও মনে আসছিল না। আমি বললাম বোধহয় 'বিষফোঁড়া' হবে। মা হেসে লুটোপুটি, ঘরে অন্য যারা ছিল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মা-ই বললেন তুই জানিস না গোদের ওপরে বিষফোঁড়া। তখন সবাই হাসল। মায়ের কথা পরে বলব। আজকে যখন ভাবি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের বাবার সেই কুলিদের দিয়ে নাটক করানোর দুঃসাহসিকতার কথা, মনে হয় পরবর্তী যুগে গণনাট্য আন্দোলনে আমার সামিল হবার এবং সংগীতকার হবার বীজ বাবাই নিজের অজানতে বপন করেছিলেন আমার মধ্যে।

আমাদের বাড়িতে পুজো-আচ্চা ঠাকুর-দেবতা এসবের বিশেষ রেওয়াজ ছিল না, যদিও বাবা-মা ঠিক যে নাস্তিক ছিলেন তা নয়। মনে আছে মা একবার লক্ষ্মী পেতেছিলেন এবং পণ করেছিলেন প্রতি বৃহস্পতিবার প্রসাদ চড়িয়ে ধূপধুনো দিয়ে পাঁচালী পড়বেন। দু'একবার হবার পর মালক্ষ্মী ধুলি ধূসরিত হয়েই পড়ে থাকতেন। তার অবশ্য একটা কারণ ছিল—মার অসুস্থতা। পিত্তথলিতে পাথর জমায় মা অসম্ভব যন্ত্রণায় পাঁঠার মতো ছটকাতেন। গলব্লাডার অপারেশন

তখনকার দিনে মৃত্যুরই নামান্তর ছিল। তাই বাবা কোনোদিন মত দেননি। কিন্তু তাঁর অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বাবা প্রথম প্রথম পেথিড্রিন, পরে মরফিন ইনজেকসন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। মার এই অসুখ ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। মা তাঁকে ফেলে আগে মারা যাবেন একথা তিনি চিন্তাও করতে পারতেন না। সেই বাবা চলে যাবার পর ২২ বছর মা বেঁচে রইলেন এবং বাবার ভয় এবং সেই দুর্বলতার অভিশাপ মাকে শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে মরফিন এ্যাডিক্ট বা নেশাগ্রস্ত হয়ে। দুমাসে একবার থেকে মাসে একবার পরে সপ্তাহে হয়ে তখন শুধু যে প্রতিদিন তা নয় দিনে ৪ বার ৪ বার অবধি মার ব্যথা উঠত এবং মরফিন ছাড়া তার উপশম হত না, এই অভিশাপ কাটিয়ে ওঠার বহু চেষ্টা করেও তিনি পারেননি শেষ দিন পর্যন্ত। এই অভিশাপের আর একজন বলি হল আমার সবচেয়ে ছোট বোন কাজল। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের পাশাপাশি থেকে তাঁকে ইনজেকশন দেওয়া থেকে খাওয়ানো, পরানো—তাকেই করতে হয়েছে। তাতে তার লেখাপড়ার, মানসিক বিকাশের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। মা সেটা জানতেন, তাই তাঁর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা ছিল কাজলের ওপর। যখন মারা যাচ্ছেন তখন এই কাজলই কাছে ছিল না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাই শুধু তাকে খুঁজেছেন—হ্যাঁরে, কাজল এল না? কাজল আসেনি? এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

যে কথা বলছিলাম ঠাকুর দেবতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বাবার একটা থিওরি ছিল, সেটা অনেকটা হেগেলের 'God is not a being. He is the becoming' গোছের। বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, দেখ, আগে যখন কুইনিন বেরোয়নি ম্যালেরিয়া হয়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত তখন ম্যালেরিয়া হলে রুগীকে বলতুম 'ভগবানকে ডাকো।' কুইনিন বেরলে ভগবান ম্যালেরিয়া থেকে পিছু হটে কালাজ্বরে বসলেন। আসামে কালাজ্বরে শয়ে শয়ে রোগী রক্ত পায়খানা পেচ্ছাব করে মারা যেত। তারপর এল ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওষুধ। ভগবান কালাজ্বর ছেড়ে নিউমোনিয়ায় এবং টাইফয়েডে বসলেন। বেশ কয়েক বছর গেল। তারপর এল পেনিসিলিন এবং অন্যান্য wide spectrum এ্যান্টিবায়োটিক। এবার ভগবানকে একসঙ্গে অনেকগুলো গদী ছাড়তে হল। এখন আছেন ক্যানসারে এবং থ্রমবোসিসে। হলে বলি 'ভগবানকে ডাকো।'

হাসির ছলে এইসব কথা বললেও বাবার এই জাতীয় কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। খুব ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর ভাগ্য নিয়তি জন্ম মৃত্যু নিয়ে মনে আলোড়ন এসেছে। তার ফলে একটা একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা হৈ-হট্টগোল ভিড়ের মধ্যে থেকেও বারবার আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। তার ফলে বিশেষ একটা সময়ে দেখা অনেক চেনা মানুষকেও হঠাৎ চিনতে ভুল হয়ে যায়। লোকে ভাবে অহংকারী—জীবনের এক একটা পিরিয়ডকে কেমন ধোঁয়াটে স্বপ্নময় মনে হয়, তার মধ্যে থেকেও যেন থাকিনি। একটা বিচিত্র দ্বৈত অস্তিত্বের

অনুভূতি উদভ্রান্ত করে মনকে। সেই জন্যই বোধহয় আমার মধ্যে Possession বা নিজস্বতাবোধটা কম। এর কারণ এও হতে পারে যে আমি প্রায় জন্ম থেকেই প্রবাসী। কলকাতাতেও যখন থেকেছি হয় বোর্ডিং-এ, নয়ত ভাড়াবাড়িতে। তাই যখন বম্বেতে আমার প্রাসাদোপম প্রায় কুড়িলক্ষ টাকার বাড়ি—ক্রাইসলার, বুইক ওপেল ফিয়াট সমেত ছটা গাড়ি এবং ১৬ লক্ষ টাকার ছবি কনট্রাকট এক দুর্ঘটনায় ছমাসের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল—আমি জানতাম আমার প্রচণ্ড দুঃখ হওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই দুঃখ পেতে পারিনি। তার কারণ আমি মনে প্রাণে ওগুলোকে possessই করিনি। আমি যখন বাসে চেপে কানু ঘোষের হাত ধরে স্টুডিও গিয়েছি বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবাক হয়ে ভেবেছেন কেন আমি এখনও পাগল হয়ে রাস্তায় না ঘুরে দিব্বি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। আমার এই জাতীয় মানসিকতার জন্য আমাকে কষ্ট পেতে হয়েছে প্রচুর। হেনস্থা হয়েছি অপমানিত হয়েছি, স্ত্রী বাচ্চাদের চূড়ান্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলেছি। প্রতিবারেই ভেবেছি এবার আমার শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু কোথায়? নতুন নতুন স্বর বেরিয়েছে, চিন্তায় ধার এসেছে, ব্যাঙ্ক ঐটুকুই লাভ। শিক্ষা আমার কোনোদিনই হবে না এ জীবনে। জীবনের জুয়ায় বোকার মতো বারবার ব্লাইণ্ড খেলে সর্বস্বান্ত হতে হতে আবার বেঁচে উঠেছি। পথ হারাব বলেই বারবার পথে নেমেছি। তার ফলে কত যে দেখেছি শুনেছি বুঝেছি—কত মন কত মানুষ কত মুখ কত শরীর কত নিমজ্জন শোকে ভেসে উঠে তীরে ফেরা তার ইয়ত্তা নেই। তাই যখন নিজের কথা লিখব ভাবি খেই হারিয়ে যায় কোথা থেকে শুরু করব—কী ভাবে এগোব—কোথায় জীবনের মধ্যবিন্দু—কোথায় আলাপ, কোথায় গৎ কোথায় ঝালা—কোন রাগ?—কীসে তাল? হাজার মুখ এসে উঁকি মারে, আমাকে দেখ আমাকে লেখ আমাকে ভুলে গেছ?—বছর দশেক আগের লেখা কয়েকটা কবিতার ছেঁড়া পাতা সেদিন খুঁজে পেয়েছি। তার একটিতে শেষ কটি লাইন—

"হঠাৎ কেন যে 'তুমি'
হয়ে যাও 'তোমরা'?
আর আমি?
বিচিত্র ফুলের বনে
একা এক ভোমরা॥"

যে কথা বলছিলাম। বাবার জীবনদর্শন বলতে যে বিশিষ্ট কিছু নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। আমাদের কারোরই বোধহয় তা অব্যয়ভাবে থাকে না। তবে বাবা সংগীতনাটক প্রেমী হলেও তাঁর মনটা ছিল মূলত বৈজ্ঞানিক। কার্যকারণ বাদ দিয়ে কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করতেও চাইতেন না। সাহিত্যপ্রীতি বাবার চেয়ে আমার মায়ের মধ্যে ছিল অনেক বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র মার প্রায় কণ্ঠস্থ। মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, গল্পলহরী, দীপালী এইসব পত্রিকার মা ছিলেন

নিয়মিত গ্রাহিকা এবং পাঠিকা, বাবা পড়তেন Modern Review আর বিলিতি মেডিক্যাল জার্নাল আর জুরিসপ্রুডেন্সের বই। সেই জন্য—যখন কোনো তথাকথিত অলৌকিক বা আধিভৌতিক কোনো ব্যাপার ঘটত—তাকে ব্যাখ্যা না করতে পারলে বাবা স্পষ্টতই বিব্রত বোধ করতেন। আমাদের বাড়ির গুদাম ঘরের জানলা থেকে দেখলে হাসপাতাল মাত্র তিরিশ গজ দূরে ছিল। এই হাসপাতালে এক এক রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটত যার কোন ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারত না। বাবার চেম্বারের মধ্যেই সারিসারি আলমারি ভর্তি ওষুধের ডিসপেনসারি। হঠাৎ একদিন রাত বারোটা নাগাদ ঝড় নেই বৃষ্টি নেই প্রচণ্ড শব্দে মনে হল আলমারি শুদ্ধ শিশি বোতলগুলো কে যেন আছড়ে ফেলে দিল ঝন ঝন করে। পুরো হাসপাতালটা যেন কেঁপে উঠল, ঘেউ ঘেউ করে কয়েকটা কুকুর ডাকতে লাগল। বাবার এবং মার মুখটা যেন শুকিয়ে গেল—আমাদের বললেন: যাও তোমরা শুয়ে পড়। ভয়ে বললাম, কে সব শিশি বোতল যেন ভেঙে ফেলল। বাবা একটা টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কিছু ভয় নেই—আমি দেখছি। আমাদের রাত-চৌকিদার জগা তার বিশাল লোহার বল্লম আর হ্যারিকেন নিয়ে ততক্ষণ এসে গেছে। বাবা বললেন, চল দেখি। মাকে জিগ্যেস করতে মা বললেন, এর আগেও দু' একবার ঐ রকম শব্দ হয়েছে। অথচ শিশি-বোতল যেমন তেমনি থাকে। কী যে হয় কে জানে! বাবা ফিরে এসে বললেন কিছু নয়—সব ঠিক আছে। তাহলে ঐ আওয়াজটা কিসের? বাবার অবশ্য একটা ব্যাখ্যা ছিল সে কথা বলছি। জগার গল্প ছিল এবং সেটা মোটামুটি সব কুলিরাই বিশ্বাস করতো যে অনেক আগে এক সায়েব ডাক্তারকে এক নার্স ছুরি মেরে ঐ ঘরে খুন করে, তার পর সে নিজে বিষ খায়। মাঝে মধ্যে সেই ডাক্তারই নার্সের ওপর রাগ দেখায়। বাবার থিওরি হচ্ছে—হাসপাতালে টিনের চাল। সারা দিন রোদ্দুরে গরমে বড় হয়ে সেটা ফ্রেমের মধ্যে বেঁকে যায়। রাতে যখন সেটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় নিজের সাইজে এবং স্থানে ফিরে আসে তখন ঐ প্রচণ্ড শব্দ হয় এবং সেই শব্দে কাঁচের আলমারিগুলোও কেঁপে ঝনঝন করে ওঠে। আর একটা ব্যাপার ঘটতো।

৩

চা-বাগানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে মিকির পাহাড়ে মধ্যরাতে একটা পাখি ডাকতো ঠিক মেয়েমানুষের কান্নার মতো। সেই কান্না সারা পাহাড় বেড়িয়ে যেত মাইলের পর মাইল। যেদিনই ঐ পাখি ডাকতো হাসপাতালে কেউ না কেউ রোগী মরতো। এর কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বাবাও আমার মনে হতো ঐ পাখিটাকে ভয় পেতেন। ঐ পাখির ডাক শুনলে হাসপাতালের রোগীরা সব ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত—বলাবলি করতো আজ কাকে নেবে কে জানে।

এবং সত্যিই একজন না একজন মারা যেত। এই অলৌকিক ব্যাপারটা বাবাকে এত বিব্রত করতো যে উনি রীতিমতো নিজের ওপরই রেগে যেতেন যেন ওর অক্ষমতার জন্যই রুগীটা মারা গেল। বাবা যেন নিজেকেই নিজে বোঝাবার জন্য বলতেন—হাসপাতালে এমারজেন্সী ওয়ার্ডে প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো রুগী থাকেই। এদের কুসংস্কার এত গভীর এবং এত ভয় পায় যে ডাক শুনে সিরিয়াস দুর্বল রোগী হার্টফেল করে মারা যায়। জগার কাছে শুনেছি সে এবং কেউ কেউ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে নাকি ঐ পাখিটাকে দেখেছে। বিরাট কালো রঙের পাখি সাদা সাদা গোল গোল চোখ আর মাথায় একরাশ মেয়েদের মতো খোলা চুল। বাবা হেসে বলতেন ন্যাচারাল সায়েন্সে এ জাতীয় কোনো পাখির অস্তিত্বই নেই, ওটা গুল। মা বলতেন একবার নাকি হাসপাতালে সিরিয়াস কোনো রুগী ছিল না, ঐ পাখিটা ডাকল আর ডিসেন্ট্রি ওয়ার্ডে একটা রুগী গলায় দড়ি দিয়ে মরল। বাবা উড়িয়ে দিতেন ও বেটা মেনটালি ডিরেঞ্জড আধপাগল ছিল।

পাখিটা না ডাকলেও ও আত্মহত্যা করত। একবার এমন ঘটনা ঘটল যে বাবা অবধি তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে চুপ করে গেলেন। সালটা হবে ১৯৩৭-৩৮, ঠিক মনে নেই। আমার দাদু মানে মার বাবা বেনারসে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন ডবল নিউমোনিয়ায়। টেলিগ্রাম করা হল কেমন আছে জানান। সপ্তাহ খানেক পরে খবর এল দাদু অনেক ভালো আছেন, পরের সপ্তায় দেশে ফিরবেন। মা যেন চিন্তা না করেন। ঘটনাটা ঘটল সেই দিন সন্ধ্যায়। হলঘরে আমরা সবাই গল্প করছি। মা একা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। আমাদের রান্নাঘরটা ছিল হলঘরের দরজার বাইরে একটা চওড়া দাওয়া পেরিয়ে উঠোনের বাঁপাশে। হঠাৎ মার প্রচণ্ড আর্তনাদ—বাবা—চমকে উঠে এক দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—হাতে খুন্তি তখনও শক্ত করে ধরা। ধরাধরি করে মাকে এনে বিছানায় শুইয়ে জলের ঝাপটা, স্মেলিং সল্ট ইত্যাদি দিয়ে জ্ঞান ফেরাতেই মার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—বাবা গো—তুমি কেন অমন করলে? বাবার অনেক সান্ত্বনা এবং অভয়ের পর মা যা বললেন তা হল এই—রান্না করতে করতে হঠাৎ পিছনে যেন শুনতে পেলেন দাদুর গলা—'ভূমা!' আমার মায়ের নাম ছিল বিভাবতী আর ডাক নাম ভূমা। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখেন দরজায় দাদু দাঁড়িয়ে। মা ভাবলেন হয়ত হঠাৎ অবাক করে দেবেন বলে না বলে কয়ে দাদু আসামে চলে এসেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে মা সবে বলতে গেলেন—'তুমি হঠাৎ!' চেহারাটা মিলিয়ে গেল। চিৎকার করে মা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। বাবা অনেক বোঝালেন, দুশ্চিন্তা থেকে মানুষ ওরকম হ্যালুসিনেসন দেখে, ওটা কিছু নয়। পরের দিনও সারা দিনরাত মার কেঁদে কেঁদেই গেল 'আমি কেন বাবাকে দেখলুম।' তার পরের দিন এল

টেলিগ্রাম। শনিবার রাত্রি নটা পনের মিনিটে দাদু মারা গেছেন। আর শনিবার রাত্রেই নটা পনের মিনিটে মা দাদুকে দেখেছিলেন। এর কি ব্যাখ্যা? সিক্সথ্ সেন্স—টেলিপ্যাথি ইত্যাদি আমি আর দাদা ব্যাখ্যা করতে গেলাম। বাবা গুম মেরে গেলেন। পরে একসময় বলেছিলেন—দেখ! একটা কোকিলেই বসন্ত হয় না। লক্ষকোটি ঘটনার মধ্যে একটা বুদ্ধির অতীত অলৌকিক কিছু যদি ঘটেই থাকে তারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যেটা আমরা জানি না—যেমন আমরা এখনও ক্যানসারের কারণ জানি না। তাই নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বাবা শেষ পর্যন্ত জীইয়ে রাখতে পারেননি। ভাগ্য নিয়তি 'অদৃষ্ট'কে বাদ দিয়ে বহু কিছু অঘটন বা অপ্রত্যাশিতকে ব্যাখ্যা করার রাস্তা খুঁজে পেতেন না। বিশেষ করে আমার দাদা ও আমাকে বাবা যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আমরা তার ধার কাছ দিয়ে না যাওয়ায় তাঁর প্রচণ্ড আশাভঙ্গ হয়েছিল। দাদাকে ডাক্তার করার জন্য বাবা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন। স্কুল জীবনে লেখাপড়ায় দাদা ছিলেন অত্যন্ত ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। তাছাড়া লেখায় অভিনয়ে সংগীতে দাদার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আমার চেয়েও দাদার ওপর মা বাবার প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। সেই দাদা যখন শেষ পর্যন্ত কি জানি কি কারণে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে রেলে কেরানির চাকরি নিলেন বাবা এটা দাদার 'কপালের লিখন' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন না। আমার সম্বন্ধেও একই কথা। আমার ঠাকুরদাদা রামতারণ চৌধুরী সেকালের খুব নামজাদা উকিল ছিলেন। বারুইপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের কোর্টেও তিনি ওকালতি করেছিলেন। সে যাই হোক বাবার ইচ্ছে ছিল আমি ঠাকুরদাদার নাম রাখব অর্থাৎ বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার হব। সেই আমি যখন সংগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলুম, বাবা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। গানবাজনা ভালো কিন্তু তাকে যারা পেশা করে তারা আর যাই হোক সমাজে গণ্যমান্য বলতে যাদের বোঝায় তাদের থেকে অনেক নিচে তাদের স্থান। কথাটা যে মিথ্যে নয় জীবনে অনেকবার হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। বাবার যুগে তো ছিলই কিন্তু আজ আমাদের যুগেও অরিজিনাল কম্পোজার বা স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা বলতে আমরা যাঁদের বুঝি ইউরোপ বা আমেরিকায় এমনকি জাপানেও তাঁদের যে সম্মান সে তুলনায় এদেশে তাঁদের সম্মান কোথায়? তা যদি থাকত কাজী নজরুলকে তাঁর দীর্ঘ শেষ জীবন পাঁচশ টাকা সরকারি দাক্ষিণ্য নিয়ে মরতে হতো না। তিমিরবরণের মতো সুরস্রষ্টা যাঁকে ভারতীয় অর্কেস্ট্রেশনের জনক বলে আমরা জানি তাঁকে মাসিক দুশো টাকা সরকারি ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকতে হতো না। উনি যদি স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টি না করে সরোদটা নিয়েই চর্চা চালিয়ে যেতেন দেশের লোক মাথায় তুলে নাচত এবং আমেরিকা ইউরোপের সমঝদার মহলের ধনভাণ্ডার খুলে যেত। ধনতান্ত্রিক

বিকাশ ঘটতে না ঘটতে পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চার মতো সামন্ততান্ত্রিক পিসির কোলে যে দেশ মানুষ হচ্ছে, সে দেশে এটাই স্বাভাবিক। শিল্পে সাহিত্যে পোশাকে-আশাকে জীবনযাত্রার ধরনে সবেতেই আমরা মডার্ন—আধুনিক হতে পারি, কিন্তু সংগীতে আধুনিক হতে গেলেই পিসিদের 'গেল' 'গেল' রব উঠবে। আলখাল্লা পরে নেচে বাউল গাও—দেখবে বছরে দুবার আমেরিকা যেতে পারবে—সেতার বাজাও সরোদ বাজাও সারেঙ্গী তবলা বাজাও—ইউরোপ আমেরিকা মাথায় তুলে নেবে। আর ওরা যাদের মাথায় তুলবে, তারা তো আমাদের কাছে ভগবান।

নিজস্ব সৃষ্টি কিছু করতে যেও না—তাহলে আমেরিকাও তোমাকে চাইবে না, আমরাও চাইব না। ওরা আমাদের সাপুড়ে মূর্তিটাই দেখতে ভালোবাসে—যোগী মূর্তি দেখতে ভালোবাসে—কাজেই হয় 'বাবা' হও নয়ত সাপুড়ে হও। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমাদের যে সমস্ত সংগীত সাধক ভারতীয় সংগীতকে বিদেশের মানুষের কাছে পরিচিত করেছেন, দেশে সম্মান এনে দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই আমার নমস্য ব্যক্তি, আমার গুরুস্থানীয়, ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার পাত্র। আমার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে নয়। আমার অভিযোগ ভারতীয় সংগীতকে যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় বেঁধে রাখতে চান, তাকে মিউজিয়ামের বাইরে যেতে দিতে যাঁদের আপত্তি, তাঁদের বিরুদ্ধে। তাতে অর্কেস্ট্রা করতে গেলে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাদ্যবৃন্দের মতো ভ্যাদভেদে রাগসংগীত বাজাতে হবে। সম্প্রতি দিল্লিতে বাদ্যবৃন্দের একজন কম্পোজার কণ্ডাকটর নির্বাচনের জন্য সিলেকশন কমিটিতে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল বিশ্বাসও ছিলেন কমিটিতে। ছ'সাত জন পদপ্রার্থী তাঁদের অর্কেস্ট্রা রেকর্ড করে এনে শোনালেন। তাঁরা সকলেই যন্ত্রী হিসেবে প্রথিতযশা—কিন্তু তাঁদের কল্পনার হাত-পা বাঁধা। লিখিতভাবে না বললেও অলিখিত নির্দেশ বোধহয় আছে রাগ ছাড়া অর্কেস্ট্রা হবে না। তাতে না হচ্ছে রাগ না হচ্ছে অর্কেস্ট্রা। রাগটা খালি বিচারকদেরই হল ফলে কাউকে নির্বাচন করা গেল না। এত বড় দেশ, যে দেশে হাজার হাজার সংগীত শিক্ষায়তন ছড়িয়ে আছে, শয়ে শয়ে ইউনিভার্সিটিতে সংগীতের ডিপ্লোমা দেয়া হয়—সে দেশে কোথাও কি আছে কি করে কম্পোজ করতে বা স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টি করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি?—নেই। যা চলছে, যা গতানুগতিক তাই শেখ, নতুন কিছু করতে যেও না। বহুবার বহুস্থানে এ আলোচনা আমি করেছি কিন্তু 'হা হতোস্মি'! কে কার কড়ি ধারে।

স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা হিসেবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এদেশে যা কিছু কৌলিন্য পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনে কি সুরসৃষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়?—না হয় না। রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হয় এবং কিছু হিন্দি ভজনটজন শেখানো হয়, অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। কারণ রবীন্দ্রসংগীতই হচ্ছে

সমকালীন বাংলা গানের জমিনের শেষ প্রান্ত—তারপরেই বঙ্গোপসাগর। রবীন্দ্রনাথ যে নিজে একথা বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ তাঁর বহু লেখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বোধহয় বছর কুড়ি আগে একবার মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার কথা ও সুরে এইচ. এম. ভি-র জন্য দুখানা গান রেকর্ড করেন। রেকর্ডের টেস্টপ্রিন্টও আমার কাছে এল, এক কথায় অনবদ্য। বম্বেতে হঠাৎ আমার কাছে মোহরদির স্থানে স্থানে চোখের জলে অস্পষ্ট একখানা চিঠি এল—'কর্তৃপক্ষ বলেছেন তোমার গান গাইলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে, কাজেই আমাকে ক্ষমা কোর ভাই'—ইত্যাদি। গান দুটি ছিল :

আমার কিছু মনের আশা
কিছু ভালোবাসা
তাই দিয়ে বেঁধেছি আমার বড় সাধের বাসা
তোরা দেখে যারে।

আর অন্যটি :

প্রান্তরের গান আমার
মেঠো সুরের গান আমার
হারিয়ে গেল কোন বেলায়
আকাশে আগুন জ্বালায়
মেঘলা দিনের স্বপন আমার
ফসল বিহীন মন কাঁদায়।

গান দুটি পরে শ্রীমতী উৎপলা সেন রেকর্ড করেন। ভাগ্যিস সুচিত্রাদি শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, তাহলে তাঁকে দিয়ে 'সেই মেয়ে' গানটি গাওয়ানো আমার ভাগ্যে ঘটত না।

সম্প্রতি এলিজাবেথ এ্যালিসন নাম্নী এক ব্রিটিশ মহিলা বম্বেতে প্রায় ছয় ঘণ্টাব্যাপী আমার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। বিষয়বস্তু—'হিন্দি সিনেমার গান—তার ক্রমবিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সংগীতে তার প্রভাব'। এটি হচ্ছে ওঁর ডক্টরেটের থিসিস। আমেরিকার illinois university-র সংগীতে উনি এম মিউজ্ করে Ethnomusicology-র ওপর রিসার্চ করতে ভারতবর্ষে এসেছেন একবছরের জন্য স্কলারশিপ নিয়ে। আছেন পুনাতে। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের archive-এ একেবারে হিন্দি ছবির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তৈরি যা যা আছে দেখছেন। রাইচাঁদ বড়াল, তিমিরবরণ, পঙ্কজ মল্লিক থেকে নওশাদ, শচীনদেব, শংকর জয়কিষণ মায় বাপী লাহিড়ী পর্যন্ত কাউকে বাদ দেননি মহিলা। বেশ কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় সংগীত শিখছেন বাজাচ্ছেন বাঁশের বাঁশি আর ওঁর আমেরিকান স্বামী যিনি বাজান চেলো শিখছেন সরোদ। পৃথিবীর নানা দেশের সংগীত সম্বন্ধে এত ওয়াকিবহাল মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ওঁদের কাছেই জানলাম যে পৃথিবীতে জনপ্রিয়তায় হিন্দি

সিনেমার গানের স্থান পপ্ সংগীতের ঠিক পরেই। মহিলা যে কথা বললেন তা হলো এই যে সমকালীন ভারতীয় ফিল্ম সংগীতে আধুনিকতম অর্কেস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং ভারতীয় সংগীতের সঙ্গতে পাশ্চাত্য রীতির হারমোনি ও কাউন্টার পয়েন্ট ইত্যাদির ব্যবহার যে সার্থকভাবে এ দেশে হয়েছে এবং হচ্ছে একথা পাশ্চাত্যে কেউ জানে না বললেও হয়। আমি ওঁকে বললাম—শুধু পাশ্চাত্যে কেন, এদেশে আমাদের সংগীত সমালোচকরাও জানেন না, রিসার্চ করা তো দূরের কথা হিন্দি সিনেমার গানের নাম শুনলেই তাঁরা নাক সিঁটকে বসে থাকেন। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রধানত সিনেমার মাধ্যমে সমকালীন ভারতীয় সংগীতে যে পরিমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘটেছে—তার বিবর্তনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংগীত মার্গসংগীত এবং পাশ্চাত্যের ক্লাসিকাল এবং লোকসংগীত ও পপ্ সংগীতের যে মিশ্রণ ঘটে তাকে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীতে পরিণত করেছে এবং একটি সর্বভারতীয় সাংগীতিক ভাষা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, এ-বিষয়ে গবেষণার জন্য আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তার জন্য সাগরপার থেকে ছেলেমেয়েরা আসবে। আর আমরা তার অবক্ষয়ের দিকটাকেই বড় করে দেখে তাতে থুথু ছেটাব। সে থুথু স্বভাবতই পড়বে যাঁরা স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা তাঁদের সবার মুখে। কাজেই আমার বাবার ভীতি যে নেহাৎ অমূলক ছিল তা নয়। কিন্তু বেঁচে থাকতেই বাবা আমার রচিত গণনাট্যের গান, গাঁয়ের বধূ, রানার, অবাক পৃথিবী ছাড়া পরিবর্তন, বরযাত্রী, পাশের বাড়ি ইত্যাদি ছবির গান শুনে গেছেন এবং তাঁর শুধু সমর্থনই নয়, প্রাণভরা আশীর্বাদ আমি পেয়েছিলাম। বলছিলাম বাবার যুক্তিবাদী মনের ভিত ক্রমশ নড়ে যাবার কথা। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেদনাদায়ক বাবার সেই অসমসাহসী সাহেবের নাকে ঘুসি মারার মন, সাধারণ্যে ঢালাও করে হাজার হাজার টাকার বিলিতি কাপড় পোড়াবার মনটাকে অন্যায় আর অবিচারের সামনে কুঁকড়ে যেতে দেখা—অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা। একে একে আমরা আট ভাই বোন তখন তাঁর ঘাড়ে এসে ভর করেছি এবং ক্রমশ বড় হচ্ছি। তাদের মানুষ করার দায়িত্ব, দুরারোগ্য রোগে পীড়িতা মাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এবং নিজের দেশে ফেরার বিড়ম্বনার স্মৃতি বাবাকে অস্থির করে তুলত। বাবাকে বরাবর দেখেছি হাসপাতালের ওষুধ ইনডেন্ট বা আমদানি করার ব্যাপারে সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে—তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে যে হাসপাতালে কুলিদের জন্য যে ওষুধ আনা হয় তা সবই প্রায় obsolete অচল, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই তার ব্যবহার হয় না। বাবার দৃঢ় ধারণা ছিল যত রোগী মরে তার শতকরা ৫০ জনকে অন্তত বাঁচানো যায় যদি ঠিক ওষুধ পড়ে এবং শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে মজুরদের যদি একটু স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা যায়। শেষপর্যন্ত ডাঃ মালোনিকে দিয়ে সই করিয়ে পাস করিয়ে নিতেন বটে কিন্তু যা দামী ওষুধ আসত সাহেবদের জন্যে তোলা থাকত ম্যানেজারের বাংলোয়।

মরণাপন্ন কুলি রোগীকে বাঁচাবার সে ওষুধ আছে জেনেও তা আদায় করতে পারতেন না বাবা—রোগী মরত।

অসহায় আক্রোশে আউটডোর রোগীদের বাবা গালাগাল দিতেন—'তোরা মর!— সব শুয়োরের মতো মর, তোদের মরাই ভালো।' অপারেশন করার যন্ত্রপাতি ছিল না। ছিল কয়েকটা স্ক্যালপেল আর কাঁচি। বহু অনুরোধ উপরোধ করেও একটা মাইক্রোস্কোপ বাবা আনাতে পারেননি। রক্ত, বাহ্য, পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের কোনো উপায় ছিল না। রোগ নির্ণয় সবই আন্দাজে হত। সবচেয়ে ট্র্যাজিডি ছিল যে মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে পড়ে এবং অভিজ্ঞতায় বাবার ডাক্তারি মন ছিল অত্যাধুনিক আর হাতে ছিল বিগত যুগের অচল চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রায়ই রেগে বলতেন—'বুঝলি আমি ডাক্তার নই—নিধিরাম সর্দার। ছেড়ে দোব শালার চাকরি।' আবার পরের দিন সুড়সুড় করে হাসপাতালে বেরোতেন। বাবার অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অসহায়তাকে তখন না বুঝে তাঁকে একসময়ে ভীরু ভাবতাম। আজ বুঝতে পারি কত বড় অন্যায় করতাম।

প্রায়ই বলতেন, 'কবে তোরা বড় হবি মানুষ হবি—এই দাসত্বের অপমান থেকে আমায় বাঁচাবি।' সেই আমি কোথায় পাশটাশ করে চাকরি করে বাবার ভার লাঘব করব—তা না করে বাবার কানে গেল আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকেছি। দাদার ডাক্তার না হওয়ার পর আমার এই বিচ্যুতি বাবাকে পাগল করে তুলেছিল। আজ করজোড়ে স্বীকার করব বাবার সেদিনের মানসিক যন্ত্রণাকে বোঝার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমাদের দু'ভায়ের পর ছ'-ছটা ছোট ছোট ভাইবোন এবং রুগ্না মায়ের দায়িত্ব এবং বাবার কিছুটা অন্তত ভার লাঘবের দায়িত্বকে কি করে অস্বীকার করে একটা বেআইনী পার্টিতে আমি যোগ দিলাম —এই কথা লিখে বাবা আমাকে একটা চিঠি লিখলেন পত্রপাঠ পার্টির সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করে পড়াশোনায় মন দিতে এবং মানুষ হতে। বাবার যন্ত্রণা এবং হতাশাকে না বুঝে আমি উল্টে রেগে গেলাম আমার স্বাধীনতায় উনি হস্তক্ষেপ করছেন বলে। লিখলাম আমাকে আর টাকা পাঠাবেন না, আমি নিজের ভার নিজে নিতে পারব। বাবাকে যে কত বড়ো আঘাত দিয়েছিলাম তা আজ কল্পনা করতেও আমার চোখে জল আসে। যে মানুষ স্বেচ্ছায় বনবাস নিয়ে নিজের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নিজের রক্তজল করা পয়সায় বি. এ পাশ করালেন ছেলেকে, সে ছেলে আজ নিজের দায়িত্ব নিজে নিল, আর কিছু তার দায়িত্ব নেই। 'এসবই আমার অদৃষ্ট।'—এই হাহাকার তখন থেকেই বাবার জীবনে প্রবেশ করল। আজ ভাবি কমিউনিস্ট পার্টি করে কি এমন তীর মারলাম। মা-বাবার মনে বড় একটা আঘাত দিয়ে, তাঁদের প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে জীবনের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছরকে ছাই করে দিয়ে কার কি লাভ হল? যা হারালাম তা তো চিরকালের জন্যই গেল।

৪

আজ জীবনের প্রায়ান্তে এসে পিছন দিকে যখন সে দিনগুলোর দিকে তাকাই ভাবি সেই জলন্ত সূর্যের মতো স্বপ্নগুলো কোথায় গেল ? কিসের প্রত্যাশায় বাবা-মা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে পথকে ঘর করেছিলাম ? চোখের সামনে কত তরতাজা ফুটন্ত ফুলকে আগুনে ঝলসে যেতে দেখলাম—তাদের কে মনে রেখেছে ? —ছাত্র শহীদ রামেশ্বরের রক্তে আমার গা ভেসে গেছে—বুলেট আমাকেও বিদ্ধ করতে পারত। তাতে পৃথিবীর কার কি যেত আসত এক আমার মা-বাবা ছাড়া ? জানি বিপ্লবের জন্য আত্মাহুতি চাই—বিপ্লব কেউ হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু যে বিপ্লবকে চল্লিশের দশকে পথের মোড়েই আমরা দেখতে পেতাম—আহার নিদ্রা স্বাস্থ্যচ্ছন্দ্য এবং বেঁচে থাকাকে অবধি বাজি রেখে নেতাদের কথায় যার জন্য ব্লাইণ্ড খেলেছিলাম সে বিপ্লবটা গেল কোথায় ? কে সৃষ্টি করেছিল সে মরীচিকা যার প্রলোভনে হাজারো কয়েকের ঘর পুড়লো—শয়ে শয়ে অহল্যা মরলো—শ্রমিক ছাত্রের রক্তে রাজপথ ভাসলো ? আমাদের সে দিনের স্বপ্নের সারথি স্তালিনকে, মাও-সে-তুংকে কারা হত্যা করলো ? রুশকে চীনের—চীনকে রুশের শত্রু কারা করালো ?

বিপ্লবকে আতসবাজীর মতো শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে কারা দল ভাঙালো ? এর জবাব কে দেবে ? যাঁরা বলবেন সেদিনের নীতি ভুল ছিল, তাঁরা তো দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়ে গেছেন—সে ভুলের মাশুল যারা দিল তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে ? জানি এর জবাব দেবার কেউ নেই। উত্তরে শুধু কয়েকটা বিশেষণ শোনা যাবে—'প্রতিক্রিয়াশীল ! সুবিধাবাদী ! কেরিয়ারিস্ট !' যে বয়সে এসব কথা শুনলে মনে হতো জীবনটাই বৃথা গেল, সে বয়েস বহুদিন পেরিয়ে এসেছি। এখন এত দেখেছি—এত শুনেছি যে এসব কথা শুনলে কাতুকুতু লাগে—হাসি পায় ভীষণ !

বাবাকে লিখলাম বটে টাকা পাঠাবেন না, কিন্তু বাবা প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন মামার বাড়ির ঠিকানায়। আমি নিতাম না।

সে টাকা ফেরত চলে যেত। মায়ের কাছে শুনেছি এক একবার টাকা ফেরত যেত আর বাবার চোখ থেকে নিঃশব্দে জল পড়ত। মা রাগ করতেন—খবরদার তুমি আর টাকা পাঠাবে না—ও ছেলে উচ্ছন্নে গেছে—চুলোয় যাক। কিন্তু বাবা পাঠাতেন যতদিন আমার ঠিকানা ছিল ততদিন। তারপর আমার ঠিকানাই গেল হারিয়ে। সেটা ছিল ১৯৪৬ সাল। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছি তখন। বোধহয় তিনটে কিম্বা চারটে পেপার পরীক্ষা দিয়েছি, টেলিগ্রাম এলো বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে শিলং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে—appendix অপারেশন হবে। একা আছেন। বাবা জানতেন আমার পরীক্ষা চলছে তাই নির্দেশ ছিল কিছুতেই যেন আমি না টের পাই। পরীক্ষা চুলোয় গেল। আমি ছুটলাম শিলং। যেদিন পৌঁছলাম সেদিনই সকালে বাবার অপারেশন হয়েছে। তখনও জ্ঞান হয়নি। শেষে যখন নার্স ভেতরে যাবার অনুমতি দিল বাবার

আচ্ছন্ন চোখ আমাকে দেখে যেন হঠাৎ ঝলসে উঠলো, বললেন—পরীক্ষা ? মিথ্যে কথা বললাম, 'শেষ হয়ে গেছে'। বাবা চোখ বুজলেন প্রশান্তিতে। হাসপাতালে বাবার দশ দিন থাকাকালীন সে মিথ্যাকে জিইয়ে রেখেছিলাম। তারপর হাতিকুলি ফেরার পথে ট্রেনে বাবাকে বললাম—তিনটে পেপার দিতে পারিনি।—'কেন ?' বললাম টেলিগ্রামের কথা। আসলে বাবা যে বারণ করেছিলেন এবং মা ভয় পেয়ে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন আমি তা জানতাম না। মায়ের ওপর বাবার যে রাগ আমি দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। যে মাকে বাবা কোনোদিন একটা কড়া কথা অবধি বলেননি, সেদিন তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, অশিক্ষিতা, গেঁয়ো ইত্যাদি বলে বাবা বকলেন। মার কাঁদা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। সবচেয়ে অপরাধী লাগলো আমার নিজেকে ! কেন বললাম টেলিগ্রামের কথা। যাই হোক বাবাকে কথা দিলাম পরের বছর আমি পরীক্ষা দেব এবং ফার্স্ট ক্লাশ পাবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আসাম থেকে ফিরেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিপ্লবে। এম. এ.-র ছাপ নেওয়া আর হলো না। এর আগে বি. এ. ডিপ্লোমা দেবার কনভোকেশন আমরা বয়কট করেছিলাম—গভর্নর ফেসী যার হাত ছাত্রদের রক্তে রাঙ্গানো তার হাত থেকে নেবো না বলে। বাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল আমার গ্রাউন পরা হাতে ডিপ্লোমা নেয়া ছবি ঘরে বাঁধিয়ে রাখবেন। তাঁর এই সাধের মূল্য সেদিন বুঝিনি—বলেছিলাম কি হবে বাবা ক্লাউনের মতো ঐ ছবি ঘরে রেখে ? আজ বুঝতে পারি কত সামান্য জিনিসই তিনি চেয়েছিলেন এবং চাইবার তাঁর হাজার বার অধিকার ছিল, আর সেটুকু সাধও নিজের অহংকারে আমি ভরাতে পারিনি। তাঁকে কেবল আঘাতের পর আঘাতই দিয়েছি আমার তথাকথিত বিপ্লবী মন দিয়ে। বাবা দ্বিতীয়বার কোনো কথা বলেননি। নিশ্চয় বুঝেছিলেন অর্বাচীনকে বলে কোনো লাভ নেই। বাবার এক অদ্ভুত আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল এবং সেটাকে তিনি মৃত্যুর শেষ নিশ্বাস অবধি জিইয়ে রেখেছিলেন। বাবার হয়েছিল কলেরা কিন্তু চিকিৎসা বিভ্রাটে তিনি মারা গেলেন স্যালাইন ওভার ডোজে। কসবায় সেবার কলেরার মড়ক লেগেছে—ডাক্তারদের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। কাকে কি ওষুধ দিচ্ছে কতবার দিচ্ছে তার হিসেব রাখবারও সময় নেই। শকুনির মতো ভাগাড়ে ভাগাড়ে ঘুরতে হচ্ছে। আমার মনে আছে বাবা ডাক্তারকে বারণ করেছিলেন স্যালাইন আর দিতে, কিন্তু তাঁরা বাবাকে চুপ করিয়ে দিলেন এই বলে যে আপনি এখন ডাক্তার নন রোগী, কাজেই তাঁর চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়। শুধু বাবা একা নন আমার তিন বছরের ছোট বোন কাজল এবং ৯ বছরের ছোটভাই মুন্নুরও (সুহাস চৌধুরী—এখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর এ. এম. ডি) কলেরা। দুজন মেঝেতে পড়ে আছে স্যালাইনের টিউব লাগিয়ে। বাবা মারা যাবার ঘণ্টাখানেক আগের কথা বলছি। মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে—কাজল মুন্নুর সমানে বমি আর পায়খানা চলছে, বোনেরা দেখছে। বাবার পেচ্ছাপ

বন্ধ হয়ে গেছে—ইউরিমিয়া। কিডনীর অসম্ভব যন্ত্রণায় ছটকাচ্ছেন। বাবার যা কিছু ময়লা আমি নিজহাতে পরিষ্কার করতুম—তিনদিন তিনরাত পরপর জেগে মাঝে মাঝে চুলুনি আসছে। তখন সন্ধ্যা প্রায় আটটা, বাবা আমায় ডেকে বললেন —'বাচ্চু আমার ঐ কাঠের বাক্সে দেখবি পেথিড্রিন আছে আর সিরিঞ্জ। একটা এ্যাম্পুল ভেঙে আমাকে একটা ইনজেকশন দে বাবা—আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

আমি জানতুম বেলেডোনায় চামড়া টেনে ধরে আরো ছোট করে দেয়—কাজেই পেচ্ছাপের থলি নিশ্চয় আরো shrink করবে। বলতে বাবা বললেন, 'আমি জানি, আমাকে শেখাসনি। আমি যা বলছি তাই কর।' তখনও যদি জানতাম বাবা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে যাবেন নিশ্চয় দিতাম ইনজেকশন, বাবাকে অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে। আমি বললাম 'না বাবা, ডাক্তার না বললে আমি দিতে পারব না।'

—আমি ডাক্তার নই? কত হাজার কলেরা রোগীর আমি চিকিৎসা করেছি। আমি যা বলছি শোন্। বাবা কাতরভাবে বললেন। আমি বললাম 'না আমি দেব না।' একটি বার শুধু স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকিয়ে আর একটি কথাও না বলে বাবা চোখ বুঝিয়ে পাশ ফিরলেন। তার ঠিক পরেই তাঁর শ্বাস উঠল। মারা যাবার মিনিটখানেক আগে আমার মাথাটা বুকের ওপর টেনে বললেন, 'সব রইল, বেঁচে থাক বাবা'—সেই তাঁর শেষ কথা।

মাথার উপর বিশাল বটগাছের মতো যে বাবা এতদিন সব চিন্তা ভাবনার ঝড়-ঝাপ্টা কড়া রোদ্দুরকে ঠেকিয়ে এসেছেন তিনি চলে গেলেন। আমার পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল। সেটা ১৯৫১ সাল। আমার সমস্ত দায়িত্বহীনতা আত্মমগ্নতাকে চূড়ান্ত সাজা দিয়ে মাথার ওপর বিধবা মা চার বোন দুই ভাইকে চাপিয়ে বাবা হয়তো মনে মনে বলে গেলেন 'এবার দেখি তুই কি করিস।' আমার পুরোনো পৃথিবী চোখের সামনে বিরাট ধ্বসের মতন তলিয়ে গেল—সেদিন থেকে আমার জীবনের মানে গেল বদলে। মাকে বাঁচাতে হবে, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে হবে, এই প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তা আমায় পেয়ে বসলো।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে বাবা মারা যাওয়ার পর বিধবা মা আর ছটি ছোট ছোট ভাইবোনের দায়িত্ব মাথায় চাপল বলেই আমার জীবনের মানে বদলে গেল। মানে বদলাচ্ছিল আগে থেকেই। বাবার মৃত্যুটা ছিল শেষ আঘাত, যাকে বলে last nail in the Coffin. আমার সৃষ্টিশীল শিল্পীজীবনের সঙ্গে সমাজে সুস্থ মানসিকতা এবং বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলার কাজে শিল্প সাহিত্য সংগীতের ভূমিকা নিয়ে সংকীর্ণতাবাদী স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির বারবার সংঘাত ঘটেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে প্রগতি সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন ধ্যান ধারণার অভাব এবং সংকীর্ণ নীতি গণনাট্য আন্দোলনকে বারবার দিশা-

হারা করেছে। সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলন থেকে আমাদের শুনতে হয়েছে তৎকালীন পার্টি সম্পাদক অজয় ঘোষ বলেছেন—'সংস্কৃতি ফংস্কৃতি নিয়ে এখন ভাববার সময় নেই, নেতৃত্বে রদবদলেরও প্রয়োজন নেই। যা চলছে চলুক!' স্বভাবতই পার্টি নেতৃত্বের সংস্কৃতি আন্দোলন সম্বন্ধে যখন কোনো পরিষ্কার নীতিই নেই, তখন পার্টি সময়ে সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের যে কৌশল বা নীতি নির্ধারণ করে তাকেই গানে নাটকে রূপ দেওয়াটাকেই আমাদের শিল্পীরা কমিউনিস্ট শিল্পীর দায়িত্ব বলে মনে করলেন। এরই ফল হল শ্লোগানধর্মী গানের পর গান এবং স্থূল চরিত্রের কিছু নাটক। আমি এই জাতীয় শিল্পরচনার বারবার বিরোধিতা করেছি, মৌলিক রচনা করতে চেয়েছি, ফলে চূড়ান্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পার্টির বিভিন্ন গণআন্দোলনের ভিত্তিতেই আমার অধিকাংশ গণসংগীত রচিত হয়েছে বটে কিন্তু সততই সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি যাতে সেগুলি স্থানকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামের সাথী হতে পারে। কতটা পেরেছি না পেরেছি সেটা আলাদা কথা। স্বাধীনতার পর পার্টি লাইনের ভ্রান্তি এবং উগ্র বাম বিচ্যুতিই গণনাট্য আন্দোলনকে শেষ করে দিল। সাহিত্যিক-শিল্পী-সংগীতকার-নাট্যকার-অভিনেতার মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এসে যেখানে ভীড় করেছিলেন অতিষ্ট হয়ে পালাবার পথ পেলেন না। যাঁরা কামড়ে পড়ে থাকলেন চূড়ান্ত অবহেলায় আর দুর্দশায় জীবনপাত করে একদিন হয় শেষ হয়ে গেলেন নয়তো ধ্বংসস্তূপের মতো বেঁচে রইলেন। প্রচুর বেদনার স্মৃতি এইসব শিল্পীদের কেন্দ্র করে জমা হয়ে আছে মানে। প্রসঙ্গত এসে পড়লেও এসব কথা আলোচনার আদৌ ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ আমি আমার জীবনের কথা বলতে বসেছি—গণনাট্যের ইতিহাস লিখতে বসিনি। সে ক্ষমতাও আমার নেই। তবু একথাও ঠিক আমার শিল্পী জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায় সৃষ্ট হতে পেরেছিল গণনাট্য আন্দোলনের দৌলতে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যে বিচিত্র সংস্কৃতির ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে মানুষ জিইয়ে রেখেছে—তার সঙ্গে পরিচিতিও ঘটেছে প্রধানত সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনগুলির মধ্য দিয়ে। কত সুর কত ছন্দ কত প্রকাশভঙ্গি কত বাদ্য এক জায়গায় একত্রে আর কোথায় পেতে পারতাম? গর্কির মতো বলতে ইচ্ছে করে, 'এগুলিই ছিল আমার সংগীতের বিশ্ববিদ্যালয়!'

চল্লিশ দশকের একেবারে শেষের দিকের কথা। আমি বুঝতে পারছিলাম চূড়ান্ত বাম-বিচ্যুতির মধ্যে শিল্পী হিসেবে দম আটকে মরা ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই। 'গাঁয়ের বধূ' গানকে গণনাট্যের আসরে নিষিদ্ধ করা হল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাঙ্কির গান' প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষিত হল। আর একটি গান, যেটি আমাদের তখনকার ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে ঝড় তুলেছিল :

সেটি হল সন্ধ্যা মুখার্জীর গাওয়া এইচ এম ভি রেকর্ডে আমার গান—'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে'। সংস্কৃতি নেতারা ঘোষণা করলেন এটি একটি

প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ফসল। ওটা গণনাট্যে গাওয়া তো যাবেই না বরং এই ধরনের গীত রচনার জন্য একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। আপত্তি হল প্রধানত 'বিধি' এই কথাটি ব্যবহারের জন্য। গানটির কথা লিখে দিচ্ছি পাঠকদের সুবিধার জন্য।

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেবো মেপে
আয় রিমঝিম বরষার গগনে
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।
হায় বিধি বড়ই দারুণ
পোঁড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না
হায় বিধি বড়ই দারুণ
ক্ষুধার আগুন জলে আহার মেলে না
কি দিব তোমারে নাই যে ধান খামারে
মোর কপাল গুনে
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে' ইত্যাদি ইত্যাদি

আপত্তি হল 'হায় বিধি' কেন বলা হবে তাই নিয়ে। কমিউনিস্ট শিল্পী হয়ে ভগবানের নাম দেওয়া কেন? 'হা ভগবান'! বা 'হায় আল্লা'! যে বাংলা ভাষায় একটি এক্সক্লামেশন বা উচ্ছ্বাসের প্রয়োগ—শাব্দিক অর্থে তার মানে হয় না—একথা বোঝানো গেল না। আমি যখন প্রশ্ন তুললাম—আপনারা 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' গানটা কি করে গান গণনাট্যের মঞ্চে? ওঁদের যুক্তি হল ওটা প্রচলিত গান। কাজেই ওতে বাধা নেই।

'বিধি' কথা ব্যবহার করে আমি নাকি 'ঈশ্বরবাদ' এবং 'ভাগ্যবাদ' প্রচার করছি। এরপর কিছু বলার থাকে না। প্রধানত আমাকে সেনসর করার জন্য বিচারকমণ্ডলী তৈরি হল।

তাঁরা গান শুনে পাস করলে তবে সে গান গণনাট্য মঞ্চে গাওয়া যাবে। কারা হলেন বিচারক? সে কথা আর বললাম না। জলে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মতো তাঁদের কেউ কেউ বক্ষে ফুটো নিয়ে আজও বেঁচে আছেন চূড়ান্ত হতাশার শিকার হয়ে। তাঁরা আজ পার্টিতেও নেই।

মন বিদ্রোহ করে উঠল, আমি শোনাব না। কতকগুলো অসুরের কাছে আমায় পরীক্ষা দিতে হবে? এরাই পার্টির সংস্কৃতির ধারক-বাহক? ছ বছর বয়স থেকে সংগীত শিক্ষা শুরু করে, সংগীতকেই ধ্যান-জ্ঞান করে কত শত ঘণ্টা তার পিছনে ব্যয় করে সেই শিক্ষাকে দেশের কাজে ব্যয় করব বলে জীবনের এতগুলি অমূল্য বছর পথে পথে অনাহারে পুলিশের তাড়া খেয়ে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরেছি

কিসের জন্য, কোন আদর্শে? সেই আদর্শের ধ্বজাধারীদের বুদ্ধির আর মুখের চেহারা কি এই?

এতদিন পার্টি বলতে এক বিমূর্ত আদর্শ উদ্বুদ্ধ করত আমাদের, তার জন্য হেলায় প্রাণ দিতেও পিছপা হতাম না আমরা। তখন পার্টি বলতে কতকগুলো মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল যাঁরা সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে বসেছেন। আমার আত্মত্যাগের এক শতাংশও যাঁরা করেননি—শহরে বসে লাঠি ঘুরিয়ে যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল হয়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনে কোনোদিন হননি। আমি তার বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ করলাম। শুনলাম ডিসিপ্লিন ভঙ্গের অপরাধে আমাকে পার্টি থেকে বের করে দেয়া হবে। গণনাট্যের যতগুলি বিখ্যাত গান তার অধিকাংশই তখন আমি রচনা করেছি, সুকান্তর 'অবাক পৃথিবী', 'রানার' সুর করেছি—সাধারণ্যে তা আগুনের মতো ছড়িয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, একবার নয় দুবার নয় বারবার ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি—তা সত্ত্বেও, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর অঞ্চলে কোদালিয়া, মালঞ্চ, মাহিনগরে পার্টির ভিত্তি আমিই স্থাপন করেছি—। চব্বিশ পরগনায় স্থানে স্থানে গণনাট্যের শাখা আমিই গড়ে তুলেছি—তা সত্ত্বেও। অপরাধ? ডিসিপ্লিন ভঙ্গ। কার ডিসিপ্লিন? পার্টির। পার্টি কে?—ঐ কতকগুলি মুখ। এ সবই ঘটে গেছে বাবার মৃত্যুর আগেই। তাই বলছিলাম, পার্টির সাংস্কৃতিক নীতি ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটছিল বেশ কিছু বছর ধরেই। বাবার মৃত্যু তাতে শীলমোহর লাগিয়ে দিল। সেটা ১৯৫১ সাল ৫ মে। মহম্মদ আলি পার্কে তখন বিশ্ব শান্তি সম্মেলন চলছে। সে উপলক্ষে আমার শান্তির গান রচিত হয়েছে এবং সম্মেলনে গেয়েছিলাম 'যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি'—! সেই যুগে গণনাট্যের জন্য রচিত সেইটিই বোধহয় আমার শেষ গান। এক বছরের মধ্যেই ১৯৫২ সালে আমি দেশ ছাড়লাম সংসারের চাপে।

বাবার মৃত্যু ছাড়াও ঐ ১৯৫১ সাল আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে আর দুটি কারণে। ঐ বছরই পৃথিবীখ্যাত চিত্রপরিচালক পুদভকিন ও বিশ্ববিদিত অভিনেতা চেরকাশভ কলকাতায় আসেন। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে ও আরও কয়েকটি সম্বর্ধনায় ওঁদের আমার গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। চেরকাশভ তাঁর অসম্ভব ভারি গলায় গাইতেন—'আর রোকতো নই নই! আর ধোংসো নই নই' দেশে ফিরে ওঁরা ভারতের স্মৃতি কথায় 'ওগোনিয়ক' পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখেছিলেন। চেরকাশভ আমাকে বলেছিলেন প্রধানত মেজর স্কেল-এ রচিত আমার গান তাঁকে Repin-এর পেন্টিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালে রাশিয়ায় প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ডেলিগেট হয়ে যখন মস্কো হয়ে লেনিনগ্রাদ যাই চেরকাশভ লেনিনগ্রাদ স্টেশনে নিজে এসেছিলেন ডেলিগেশনকে স্বাগত জানাতে। প্রায় সাত ফুট লম্বা সেই শিশুর মত মানুষটি তাঁর

কম্বুকণ্ঠে 'সালিল! সালিল!' বলে আমার ক্ষুদ্র দেহকে শূন্যে তুলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং গেয়েছিলেন ঐ দু লাইন। তারপর ১৯৬৪ সালে হেলসিংকি থেকে ফেরার পথে মস্কোতে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। তখন মনে হয়েছিল মানুষটি যেন ভেঙে পড়েছেন। বললেন: মায়াকোভস্কির ভূমিকায় অভিনয় করবেন—তাঁর জীবননাট্যের প্রস্তুতি চলছে। সে নাটক হয়েছিল কিনা জানি না তবে চেরকাশভের জীবননাট্যের ওপর যবনিকা নেমে এসেছিল বোধহয় ২।৩ বছরের মধ্যেই। 'ওগোনিয়ক' পত্রিকায় ওঁদের সেই লেখা এদেশে সোভিয়েট ল্যাণ্ড-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

৫

বাংলায় বেরিয়েছিল 'সোভিয়েত দেশেও। বোধহয় ১৯৫১ সালেই জীবনের অন্যান্য বহু কিছুর মতো ঐ সংখ্যা দুটিও আর আমার কাছে নেই। যদি কোনো সহৃদয় পাঠকের কাছে তা থেকে থাকে জানালে বাধিত হব। ঐ ১৯৫১ সালেই গ্র্যাণ্ড হোটেলে আমি আর ঋত্বিক (ঘটক) পুদভকিন চেরকাশভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং সেখানেই ওঁদের হাত থেকে রাশিয়ান পিবা বা বিয়ার পানই ঋত্বিকের ও আমার জীবনের প্রথম মদ্যপান। আজ কেউ বিশ্বাস করবেন না যে সেদিন 'ঋত্বিক' সেই একটা ছোট টিন বিয়ার খেয়ে এমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে ওঁরা একটি সংবর্ধনায় বেরিয়ে যাবার পরও প্রায় আধঘণ্টা ব্যালকনিতে একটা সোফায় বসে রইল। বলল, 'আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে—চলতে পারছি না'। সেই ঘটনা নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের অনেক হাসাহাসি হয়েছে। গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে ঋত্বিক বলল, 'চল একটু ফাঁকা হাওয়ায় যাওয়া যাক।' হাঁটতে হাঁটতে আমরা ইডেন গার্ডেন ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলুম। ঋত্বিক বলেছিল, 'দূর শালা! মহা বাজে জিনিস। আর কোনোদিন নয়।' অদৃশ্য থেকে নিয়তি বোধহয় সেদিন অট্টহাস্য করেছিল।

সেই মদ্যপানই ঋত্বিকের জীবনের অভিশাপ হয়ে দেখা দিল এবং আমার জীবনেরও বহু অমূল্য মুহূর্তের জলীয় সমাধি ঘটাল। ১৯৪৭ সাল থেকেই ঋত্বিক, মৃণাল (সেন) এবং আমি ছিলাম অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। মৃণালেরই অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল। ও ছিল বোধহয় 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ', আমরা ছিলাম বেকার। কাজেই ওর পয়সাতেই আমাদের চা-সিগারেট চলত। প্যারাডাইস কাফের আড্ডা জমত। ঋত্বিক বিড়ি খেত। তখন এক আনায় দু'টো ক্যাপসটান পাওয়া যেত। একদিন এক আনাই ছিল মৃণালের কাছে। তাই দিয়ে দুটো সিগারেট কিনে আমি পানওয়ালাকে বলুম: 'ভাই, এই যে লম্বা লোকটি দেখছ ওর সিগারেট খেলেই ভীষণ মাথা ঘোরে, রাস্তায় পড়ে যায়। একটা বিড়ি ফাউ দেবে?' —দিয়েছিল কিন্তু লোকটা। আমাকে গালাগাল দিতে দিতে বিড়িটাও ঋত্বিক

খেয়েছিল। উত্তর-জীবনে আমি আর ঋত্বিক দুজনেই বয়ে গেলাম—মৃণালটাই কি করে জানি সচ্চরিত্র রয়ে গেল। মদ ছুঁল না জীবনে।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বোম্বে যাওয়া পর্যন্ত এই এক বছর কিভাবে এক দুঃস্বপ্নের মতো আমাদের কেটেছে তার বিবরণ যদি কখনো প্রসঙ্গত এসে পড়ে বলব। এই সময়কার আমার মানসিক এবং আর্থিক টালমাটালের কথা জানতেন ক্ষেপুদা (কমরেড খগেন রায়চৌধুরী—২৪ পরগনা জেলার কৃষক এবং পার্টি নেতা। এখন মারা গেছেন)। আমি মূলত ২৪ পরগনার ছেলে এবং কৃষক আন্দোলন থেকেই আমার সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রবেশ। তার মূলে ছিলেন প্রধানত ক্ষেপুদা এবং হরিধন চক্রবর্তী (২৪ পরগনা জেলার কৃষক নেতা)। কৃষক আন্দোলনের ওপর গান লিখতে শুরু করি এঁদেরই প্রেরণায় ১৯৪০-৪১ সালে। তখন গণনাট্য জন্মায়নি এবং আমি ১৬/১৭ বছরের কিশোর। ক্ষেপুদাই আমায় বলেছিলেন 'যাই বল শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তির কাজ—সমবেতভাবে তা হয় না। তোমার সৃষ্টি তুমি করে যাও। আর তোমাকে কে বলেছে যে দেশের সংস্কৃতিকে উদ্ধার করার যত দায় সব তোমার? তাই নিয়ে এত দলাদলিই বা কিসের, কাদা ছোঁড়াছুঁড়িই বা কেন?'

ক্ষেপুদা এবং কমরেড হরিধন দুজনেই জানতেন যে ভূমিহীন কৃষকের রিক্সা-ওয়ালা হবার কাহিনীর স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি বোম্বে যাচ্ছি বিমল রায়ের কাছে। সেই হবে ভারতে প্রথম কৃষিজীবন এবং দিনমজুরের জীবনের ওপর ছবি (যার নাম হল 'দো বিঘা জমিন')। কাজেই তাঁদের পুরোপুরি সায় ছিল। ভাবতে অবাক লাগে কলকাতা শহরের অনেক বড় বড় নেতাদের চেয়ে আমাদের এই কৃষক নেতা কমরেডদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কত স্বচ্ছ এবং উদার। 'দো বিঘা জমিন' যখন পৃথিবীর সিনেমার প্রাঙ্গণে প্রথম ভারতীয় ছবির দরজা খুলে দিল, ক্ষেপুদা গর্ব করে বলতেন, শুনেছি: 'সলিল আমাদের জেলার ছেলে—কৃষক আন্দোলনে ওর হাতেখড়ি আমার কাছে।'

কলকাতার গণনাট্য এবং পার্টি বলল, 'সংস্কৃতি আন্দোলনের পিঠে ছুরি মেরে সলিল চৌধুরী কেরিয়ার বানাতে বোম্বে গেছে।'

সিনেমা কি সংস্কৃতির বাইরে?—কে বলবে!

নিজের দুঃখের আশা ভঙ্গের প্যানপ্যানানি গাইতে আমার চিরকালের অনীহা। কিন্তু যখন অন্যায়ভাবে খোঁচা খাই মুখ খুলতেই হয়। অপপ্রচার মিথ্যা-ভাষণ জীবনেই বলুন রাজনীতিতেই বলুন প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, হাওয়ায় ভর করে বীজ ছড়াতে থাকে, সে তুলনায় 'সত্য'-র জমি বরাবরই অনুর্বর। বোধহয় সত্যের তুলনায় মিথ্যা অনেক বেশি মুখরোচক, কারণ মিথ্যার মতো সত্যের মধ্যে কল্পনা নেই, তার সাহিত্যমূল্য কম। মিথ্যা বা নিন্দার কোনো যুক্তির জমির প্রয়োজন হয় না—ক্যানসার সেলের মতো দেহের মধ্যে

জন্মালেও সে দেহনির্ভর নয়—নিজে নিজেই বাড়তে থাকে। মার কাছে একটা গল্প শুনেছিলুম। এক ভদ্রলোকের স্ত্রী এসে তার সইকে বললেন : 'সই! সই! কাউকে বলিসনি! আজ ওঁর পায়খানার সঙ্গে পালকের সোঁয়ার মতো দু-তিনটে বেরিয়েছে।' সই গিয়ে পাড়ায় তাঁর এক বান্ধবীকে বললেন—'শুনেছিস? কাউকে যেন বলিস না—আমাদের পদ্মর স্বামীর পায়খানার সঙ্গে একটা পাখির পালক বেরিয়েছে।' বান্ধবী তাঁর সইকে বললেন—'শুনেছিস পদ্মর স্বামীর কি হয়েছে? কাউকে যেন বলিস না—যতবার পায়খানা যাচ্ছে একটা করে পাখি বেরোচ্ছে।' —ক্রমশ গাঁয়ে গঞ্জে রটে গেল 'পদ্মর স্বামীর পায়খানার সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরোচ্ছে আর উড়ে যাচ্ছে'। এই কল্পনাশক্তি সত্যের কোথায়? তাই 'সত্য' পড়ে পড়ে মার খায়, 'মিথ্যে' হাওয়ায় গজায়। হাল আমলে কিছুদিন আমার স্ত্রী সবিতার গলায় 'সিঙ্গার্স নোড' বা অত্যধিক ব্যবহারে একজাতীয় ছোট দানা জন্মানোয় ডাক্তার ওকে এক-দেড় মাসের জন্য গান গাইতে এমন কি কথাও বলতে বারণ করেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের শ্রোতারা তো সে সব বিশ্বাস করেন না ভাবেন ধাপ্পা দিচ্ছে। কাজেই তার থেকে বাঁচবার জন্য তথাকথিত 'ফাংশান পার্টি এলেই আমাকে বলতে হতো—'সবিতা কিন্তু গাইবে না—ওর নাম দিও না।' তিন চার মাসের মধ্যেই বাড়িতে টেলিফোন আসতে লাগল, 'শুনলাম সবিতা চৌধুরীর গলায় ক্যানসার হয়েছে?' —যত বলি 'না না বাজে কথা। এখন ভালো আছে নিয়মিত গান করছে'—ওঁদের যেন বিশ্বাস হয় না। এতবড়ো একটা মুখরোচক খবর মিথ্যে হয়ে গেল? একে কি বলবেন? মানব প্রকৃতি? যাই হোক আবার পিছন ফিরি।

জীবনকে যদি টেপের মতো Rewind করা যেত? তা হলে হয়ত অনেক কিছুই ধরা পড়ত যা পরিণত মনকে আর নাড়া দেয় না। জীবন তো আর গল্প নয়। তার বাঁধুনি তাই ঢিলেঢালা, গতি মন্থর—শ্লথ তালে তার গড়ে ওঠা, খুব টিমে তেতালায় যেমন তবলচি একটা তাল ঠুকে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে 'সম'-এ পড়তে পারেন। কিন্তু ভাবি সেদিন যে মন নিয়ে বেঁচেছিলুম সেই একেবারে ছোটবেলার মন, তাকে কি করে খুঁজে পাব? আজকের মন দিয়ে যখন সেই মনটাকে ধরবার বোঝবার চেষ্টা করি তাতে তো ফাঁকি থেকেই যায়। কল্পনার মশলা মিশিয়ে ভদ্রলোকের পাতে দেবার মতো করে রাঁধতে হয়। সেই যে বিশাল আমাদের দক্ষিণ বারাসতের তিনমহলা বাড়ি, তার বিশাল ঠাকুর দালান, বার-বাড়ি, মন্দির পেরিয়ে অন্দর মহলে, সেই ভীষণ উঁচু উঁচু সিঁড়ি ডিঙিয়ে রান্নাঘর পেরিয়ে বারান্দা আর ছাদ একদিকে অন্য দিকে আমাদের দুখানা বড় বড় শোবার ঘর। কিছুদিন আগে গিয়ে দেখি কি করে কুঁকড়ে সব ছোট হয়ে গেছে। সিঁড়িগুলো তেমন আর উঁচু নয়! সেই যে সিঁড়ি থেকে মা পড়ে গিয়েছিলেন! তখন আমার ছোট বোন লিলি পেটে। এমনিতেই সিঁড়িটা

অন্ধকার তায় সন্ধ্যাবেলা, মা যেন দেখলেন জ্যাঠাইমা দাঁড়িয়ে আছেন! 'দিদি' বলে যেই ধরতে গেলেন ছায়ামূর্তি সরে গেল। মা তিন চারটে সিঁড়ি গড়িয়ে নিচে পড়লেন। সেই ভয়ঙ্কর উঁচু বিশাল সিঁড়িটাকে কেমন যেন নিচু আর নিরীহ মনে হল। সেই জন্যই নিশ্চয় মার খুব লাগেনি—লিলিও বেঁচে গেছে। কতদিন স্কুল থেকে ফিরে ঐ সিঁড়ি ভেঙে উঠেই সোজা রান্না ঘরে মার পাতে বসে আম বা কলা চটকে দুধ ভাত খেয়েছি। সেই সিঁড়ি আর স্থানে স্থানে ইঁট উঠে ফোকলা বুদ্ধের মতো পড়ে থেকে শেষের দিন গুনছে। মন্দিরের সামনে সেই বেলগাছটা আজও বেঁচে আছে। ওরই তলায় মার সেলায়ের কলের মাকুটা পুঁতেছিলাম। মনে পড়ে প্রায়ই মার কলের মাকু বা ববিন যথেষ্ট পাওয়া যেত না। তাই মার এই সমস্যার সমাধান করলে মাকু গাছ হবে বলে মাটিতে পুঁতেছিলাম। ঐ গাছে শয়ে শয়ে মাকু ফলে থাকবে আর আমি পেড়ে এনে দেব! মা বলবেন, দেখত! আমার বাচ্চুর কী বুদ্ধি! তারপর একদিন মা আর মাকু খুঁজে পান না। দাদাকে বলেন, হ্যাঁরে খোকা তুই দেখেছিস! আমাকে বলেন, হ্যাঁরে বাচ্চু তুই দেখেছিস! দুটো ঘাড়ই নড়ল—কেউ দেখেনি। সেদিন সেলাই হল না। পরের দিন মাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হল। বেলতলায় গেলুম মাকুটা তুলে আনতে। কিন্তু কোথায় পুঁতেছি খুঁজে পাই না। দাদা বলল, কি খুঁজছিস? কিছু বললাম না। দাদা কিন্তু গিয়ে মাকে বলল, বাচ্চু তোমার মাকু বেলতলায় পুঁতেছে গাছ হবে বলে—এখন আর খুঁজে পাচ্ছে না। সেই মাকু পরে অবশ্য পাওয়া গেল। কিন্তু কি হাসাহাসি! শুধু বাবাই গম্ভীর হয়ে বললেন 'আহা দু চারদিন আরও দেখলেই পারতে, কে জানে হয়ত মাকু গাছ বেরোত!' তখন আমরা সবে লতাবাড়ি থেকে দেশে ফিরেছি। বছর ৩।৪ হবে আমার বয়স। সেদিনের দেখা বাবার সেই বিরাট শোবার ঘরটাও কত যে ছোট হয়ে গেছে আজ দেখলে কষ্ট হয়। ঐ ঘরের মেঝেয় একদিন আমার ছোট বোন হাসি শুয়ে ঘুমোচ্ছিল—তখন মাসছয়েক বয়স তার। ঘরে প্রাইমাস স্টোভ জ্বলছে, বোধহয় জল গরম হচ্ছিল। পাশেই পড়ে রয়েছে পোকারটা। এখন যদি ঐ পোকারটা স্টোভে তাতিয়ে হাসির পায়ে চেপে ধরি তাহলে কি হয়? ও তো আর কথা বলতে পারে না। কি করে মা বুঝবে কি হয়েছে? হাসি জন্মাবার পরে মার বুকের দুধে ভাগ বসিয়েছিল। (তখনও আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মার দুধ খেতুম—হিংসে হওয়া স্বাভাবিক!) যা ভাবা তাই কাজ। গরম পোকারটা পায়ে ঠেকাতেই হাসি ককিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি সেটা ফেলেই এক ছুট। এত জোরে চেঁচাবে বুঝতে পারিনি। মা ছুটে এলেন—'কি হল?' কেন এত কাঁদছে কেউ বুঝতে পারে না। জ্যাঠাইমাও ছুটে এসেছেন। আমি দূর থেকে শুনছি সব। তার পরে বোধহয় মার হাতে ঠেক্‌ল গরম পোকারটা এবং দেখতে দেখতে হাসির পায়ে একটি নিরেট ফোস্কা গজিয়ে উঠল। আর কারও বুঝতে বাকি রইল না। মা বললেন 'এ নিশ্চয় বাচ্চুর কাজ।'

ডাক পড়ল 'বাচু! বাচু!' আমি একছুটে সেখান থেকে হাওয়া। বাবা ডিসপেনসারি থেকে ফিরে এসে সব শুনে কি করেছিলেন আজ আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে আমরা ভাইবোনেরা বাবা মার হাতে মার খাওয়া তো দূরের কথা কানমোলা অবধি খাইনি। সেই জন্যই বোধহয় বাবার একটু কড়া কথাতেই আমাদের হৃদকম্প শুরু হতো।

বাবার ঘরের পাশেই ছিল আমার আর দাদার শোবার ঘর। সেই ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে বসে মা প্রতি দুপুরে চোঙ্গা দেওয়া কলের গান বাজাতে বসতেন। পাড়ার মেয়ে বৌরা এসে গোল হয়ে বসত। মা পালা বাজাতেন 'আলিবাবা' 'দক্ষযজ্ঞ' 'শ্রীমন্ত সদাগর', 'সিরাজদৌলা'। চোঙ্গার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কৌতূহলী সব চোখ বিস্ময়ে উঁকি দিত—যদি মানুষটাকে দেখা যায়। গান বাজত 'কে মল্লিক', 'গহরজান', 'আঙ্গুরবালা', 'ইন্দুবালার'। চোখের সামনে আজও যেন দেখতে পাই মার দীর্ঘ খোলা চুল মাদুরে লুটোচ্ছে—মা কলের গানের চাবি ঘুরিয়ে গ্রামোফোনে দম দিচ্ছেন।

দক্ষিণ বারাসতে এসেই বাবা আমাকে আর দাদাকে বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমাদের হাতে খড়ি হয়েছিল মার কাছে। ঐটুকু বয়সেই মার তালিমে আমি প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ (ঈশ্বরচন্দ্রের) শেষ করে কথামালা পড়তাম। ধারাপাতও আমার ছিল মুখস্থ। মনে আছে পর পর দু বছরই আমি ডবল প্রমোশন পেয়েছিলাম কিন্তু বাবা আমাকে উঠতে দেননি, পাকা হয়ে গড়ার ভিৎ তৈরি হবে বলে। বাংলা স্কুলে আমাদের ইংরেজি পড়ানো হতো না, ইংরেজি পড়তাম বাড়িতে মাস্টারমশায়ের কাছে। তখনকার ইংরেজি লেখার যে বঙ্গানুবাদ আমরা শিখতাম তা ছিল মজার—মানে বুঝতাম না কিছুই। যেমন I am—আমি হই, He is—সে হয়, I am up—আমি হই উপরে, A sly fox met a hen—একটি ধূর্ত খেঁকশিয়াল সাক্ষাৎ করিল একটি মুরগীর সহিত, Wine made him mad—মদে করিয়াছিল তাহাকে পাগল, ইত্যাদি। শুধু পাখির মতো মুখস্থ করতাম। আমার মনে আছে আমার আর দাদার জন্য দুজন আলাদা মাস্টার-মশাই ছিলেন। দাদার মাস্টারমশাই ছিলেন অল্পবয়সী যুবক—আর আমার ছিলেন সাদা-চুল বৃদ্ধ। দাদার মাস্টারমশায়ের নাম মনে নেই, আমারটা যে মনে আছে তার কারণ দাদা আমাকে খ্যাপাবার জন্য তাঁর নামে একটা দুলাইনের ছড়া বেঁধেছিল। সেটা শুনলে আমি ভীষণ রেগে গিয়ে মার কাছে নালিশ করতাম, কারণ আমার মাস্টারমশাইকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। তাঁর নামে অশালীন উক্তি আমি সহ্য করতে পারতাম না। তাঁর নাম ছিল প্রসন্ন দত্ত। ছড়াটা ছিল—'প্রসন্ন দত্ত/পাছায় তিনটে গর্ত'।

দক্ষিণ বারাসতে বোধহয় আমরা বছর দুয়েক ছিলাম। সেই প্রথম এবং সেই শেষ আমাদের নিজের দেশের বাড়িতে থাকা। তার কারণ আগেই বলেছি। সে

সময়কার স্মৃতি কয়েকটা টুকরো টুকরো ছবির মতো যেটুকু মনে আছে—বাকিটা ধোঁয়াটে আবছা। আমার মনে আছে আমাদের বাড়িতে বিরাট দুর্গোৎসব হতো—তিনদিন ধরে যাত্রা, পুতুল নাচ, ঢপ নাচ, কবির লড়াই হতো। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে শুনত। মার কোলে বসে চিকের আড়াল থেকে যাত্রা দেখেছি আজও মনে পড়ে। আর একবারের কথা মনে আছে আমরা রেলে চেপে বোধহয় ধপধপির দক্ষিণেশ্বরের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। ওদিকে বোধহয় সবে রেললাইন বসেছে তখন। ট্রেন ছাড়ার সময় আর থামার সময় এমন হ্যাঁচকা দিত যে ভালো করে না ধরে থাকলে এক বেঞ্চের লোক অন্য বেঞ্চের লোকের ঘাড়ে পড়ত। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম ট্রেন চড়ার অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি, তাঁর আশাভঙ্গ ঘটেছিল। আমার অভিজ্ঞতা উল্টো। ট্রেন ছাড়ল আর বাবার কোল থেকে ছিটকে মার কোলে গিয়ে পড়লুম। ধপধপির মেলায় গিয়ে আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম মনে আছে। কখন মার আঙুল ছাড়িয়ে একটা মনিহারীর দোকানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ এক সময় দেখি মা বাবা দাদা কেউ নেই, শুধু শয়ে শয়ে লোকের পায়ের মিছিল চলেছে তো চলেছেই। ভাগ্য ভালো মাকে খুঁজতে ঐ ভিড়ে ঢুকিনি। সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম ভয়ে পাথর হয়ে। এক সময় বাবা এসে উদ্ধার করলেন। আর মনে পড়ে আমাদের বাড়ির পিছনে ছিল লম্বা টানা দুই বিঘাব্যাপী এক পুকুর। নাম ছিল পদ্মপুকুর। পানা ছিল তাতে, পদ্ম কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আসলে ওটা মজে যাওয়া আদি গঙ্গা, ঐ গঙ্গা দিয়েই নাকি শ্রীমন্ত সদাগর তাঁর সপ্তডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। পুকুর ধারে একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ছিল। তার গায়ে নোঙ্গর করা জাহাজের লোহার চেন বাঁধার দাগ নাকি তখনও ছিল। ঐ অশ্বত্থকে বারি দিয়ে পুজো করেছিলেন শ্রীমন্ত সদাগর। তাই বারি-অশ্বত্থ থেকে নাকি জায়গার নাম 'বারাসত' হয়েছে। সেই ছোটবেলায় শোনা এইসব গল্প বলতেন আমার বড়ো জ্যাঠাইমা। রূপকথা মনে হতো বলেই হয়ত আজও মনে আছে। আমার মনে আছে ঐ পদ্মপুকুরের ঘাটে নামবার পথটা ছিল বেশ ঢালু। একবার এক দৌড়ে ঐ ঘাটে পৌঁছতে গিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছিলুম ডুবজলে। কে যেন দেখতে পেয়ে তুলে এনেছিল। জীবনে আর একবার আমি ডুবে গিয়েছিলুম। তখন আমি বঙ্গবাসী কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। ডুবেছিলাম যশোরে একটা দিঘিতে। কেন যশোরে গিয়েছিলুম কেন ডুবতে গেলুম সে এক মজার ব্যাপার। কলেজ জীবনে যদি যাই তো তখন সে কথা বলা যাবে। বারাসতের ঐ পদ্মপুকুরের কাছেই ছিল উঁচু একটা ঢিবি আর তার তিনপাশ জুড়ে বাঁশবন। বড়দের জন্য খাটা পায়খানা ছিল। ছোটদের পায়খানা ছিল ঐ ঢিবি। ঐ ঢিবি কাঠি দিয়ে খুঁড়ে একবার আমি অনেক পুরোনো তামার পয়সা পেয়েছিলুম মনে আছে। বাবা বলতেন 'হয়ত সেকালে কোনো জাহাজ ডুবী হয়েছিল ঐখানে কে জানে? আর

একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল ঐ ঢিবিতে একবার। ঐ বাঁশবনটা ছিল শেয়ালের আড্ডা। দিনে দুপুরে রাত্রে অষ্টপ্রহর শেয়াল ডাকত। আমার ছিল ভীষণ শেয়ালের ভয়। মা না দাঁড়ালে আমি পায়খানা যেতাম না। একবার দুপুরে ঢিবিতে গিয়েছি—মা জ্যাঠাইমা কাছেই ঘাটে আছেন। হঠাৎ পিছনে মনে হলো গরম হাওয়া লাগছে। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি একটা পেটমোটা ভুঁড়ো শেয়াল আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে—তার দুটো সতৃষ্ণ চোখ আমার দিকে তাকিয়ে। ও মাগো! বলে চিৎকার করে এক লাফে ছুটে সোজা মার কাছে। ঘটনাটা বলতেই জ্যাঠাইমা শেয়ালের উদ্দেশে বললেন: আ মরণ! মুখপোড়ার আর তর সইছে না! পেটের গু টেনে বের করে খাবে। শেয়ালের ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন নির্বিকারে সে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে। সেই ঢিবি এখনও নিশ্চয় আছে।

৬

সেই বাঁশবনও হয়ত আরো বিস্তার করেছে। সেই ভুঁড়ো শেয়ালের বংশধররা এখনও নিশ্চয় অষ্টপ্রহর চিৎকার করছে। শুধু আমার মা জ্যাঠাইমা আর বেঁচে নেই। সেই দিনও নেই। সেই মনও নেই। বেঁচে থাকলেও আমিও আর নেই। বারাসত তবু আছে বারাসতেই।

বছর পাঁচেক বয়সের মধ্যেই আমি যে কোনো বাংলা বই গড়গড় করে পড়তে পারতুম। 'বসুমতী' 'ভারতবর্ষ' ছাড়া মা নিতেন 'গল্পলহরী' পত্রিকা। আমি বিশেষ কিছু না বুঝলেও সব পড়তুম। একবার বারাসতে আমার দাদু (মার বাবা) এসেছিলেন। দাদুর ছিল ভীষণ মাছ ধরার সখ। পুকুর থেকে বড় মাছ ধরলেই বারাসতে দিতে আসতেন। তাছাড়া আনতেন মামার বাড়ির বাগানের আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেল বস্তা ভর্তি করে। দাদু ছিলেন ভীষণ গোঁড়া মানুষ। টেরি কাটা, গুনগুন করা, শিস দেওয়া, বড়দের কথার মধ্যে কথা বলা সবই ছিল তাঁর কাছে বখাটের লক্ষণ। সেদিন আমি আমাদের শোবার ঘরে খাটে শুয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ছিলুম। দাদু হঠাৎ কখন ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে বলে উঠলেন—'এই! ওটা কি পড়ছ তুমি?' বললাম—'চরিত্রহীন!' দাদুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল! 'এ্যাঁ?' ততক্ষণে মা এসে ঘরে ঢুকেছেন। দাদু বললেন—'দাও। দিয়ে দাও এ বই।' মা বললেন—'না বাবা অশ্লীল কেন হতে যাবে, তাছাড়া ও আর কতটুকুই বা বুঝবে? তাছাড়া ও সব বই-ই পড়ে—আমরা বারণ করি না।' —'না না এটা মোটেই ভালো নয়'—দাদু বললেন—'এখন নাড়াচাড়া করছে ঠিক আছে—যখন পড়তে শিখবে সরিয়ে রেখ।' মা হেসে বললেন—'ও আমার চেয়ে ভালো পড়ে বাবা। আমার মাথা ধরলে ওই আমাকে পড়ে শোনায়।'

তারপর আমার কৃতিত্ব দেখাবার পালা—মার কথায় আমি গড়গড় করে এক-পাতা পড়তেই দাদু আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন—'বাঃ দাদু বাঃ।'

কিন্তু মাকে আড়ালে কি সব বললেন। মা পরে বলতেন—'অত ছোটোবেলায় আমার কাছে তোরা পড়তে শিখে আজ কত বিদ্বান হয়ে গেলি আর আমি যেখানে ছিলুম সেখানেই রয়ে গেলুম। মুখ্যু নাম আর আমার ঘুচল না।' হাসতে হাসতে বলতেন বটে কিন্তু মার একটা বেদনা ছিল। মামার বাড়ি গোঁড়া হলেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় তাঁদের সায় ছিল। মা ছিলেন বাংলা স্কুলের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী। ১৪ বছর বয়সেই তাঁর হলো বিয়ে আর ১৬ বছর বয়সেই হলেন জননী। তাও সব সভ্যতার বাইরে আসামের দুর্গম জঙ্গলে। সেই আসামেই মার কাটল দীর্ঘ ৩৫ বছর।

বিবাহিত জীবনে আমার বাবা মায়ের মতো পারস্পরিক নির্ভরতা এবং উজাড় করা ভালোবাসা আমি আমার জীবনে দেখিনি। ৩৫ বছরেরও বেশি বিবাহিত জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত পারতপক্ষে একদিনের জন্যও একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকেননি। বাবার মৃত্যুর পর যে মা বেঁচে রইলেন দীর্ঘ ২২ বছর সে এক চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাসের জীবন। প্রায় এক বছর তিনি প্রায় বোবা হয়েই কাটিয়ে দিলেন। তারপর ছোট ছোট শিশুদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় জীবন-ধারণের সূত্র খুঁজে পেলেন। আমার সেই ছোটবেলার কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনের দেখা মা, সেই শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, হাঁটু ছাড়িয়ে খোলা চুলের ঢল, দীর্ঘ আয়ত প্রতিভ চোখের চাহনি, আত্মসন্তুষ্টির গর্বে ঋজু যে মা, যাকে মা বলে ডাকতে গর্বে বুক ভরে উঠত তাঁকে আমরা চিরদিনের জন্য হারালাম বাবার মৃত্যুর সাথে সাথেই। বাবার মতো সূর্যের আলোতেই মায়ের মুখে চোখে ছিল ভরা পূর্ণিমা—সেটা স্পষ্টতই নিভে গেল।

আমাদের হাতিখুলির আসাম জীবন ছিল স্বচ্ছন্দ। মনে আছে বাবার ঘরে টানা-পাখা টানার জন্য গ্রীষ্মকালে সকাল রাত্তির দুজন করে পাখাওয়ালা থাকত পালা করে। এক বিশাল চুলোয় পিপেয় করে গরম জল করার আলাদা লোক ছিল—ঠাণ্ডা কাঁচা জলে আমরা কেউ চান করতাম না। ঝর্না থেকে বাঁকে করে জল বয়ে আনার লোক ছিল। কাঠ কাটার লোক ছিল। তাছাড়া মার ছিল প্রায় দুবিঘে জমির ওপর শাকসব্জীর বাগান। তার জন্য দুটো মালী। আলু, মূলো, কপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন থেকে শুরু করে টম্যাটো গাজর ওলকপি শালগম সব মা নিজ হাতে ফলাতেন। গোয়ালে তিনটে দুগ্ধবতী গরুর দুধ রোজ সকালে নেপালি গোয়ালা এসে দুয়ে দিয়ে যেত। ছাগল, হাঁস, মুরগী, পায়রা সব ছিল মায়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। এই জাতীয় প্রায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী পরিবেশে মা ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। তাছাড়া ছিল মার সেলাই। বাবার সার্ট কখনো কেনা হতো না, মা সেলাই করতেন। আমাদের ছোটবেলায় ভাইবোনেদের সার্ট প্যান্ট ফ্রক ইজের সবকিছু ছিল মার হাতে তৈরি। তাছাড়া সাহায্য করার লোক থাকলেও রান্না মা নিজ হাতে করতেন। আজ ভাবতে অবাক লাগে এত কিছু মা একসঙ্গে

কি করে করতেন! এই মোটামুটি প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও আমাদের জীবনে সঞ্চয় বলে কোনো জিনিস ছিল না। যা কিছু উদ্বৃত্ত হতো মা দুহাতে বিলোতেন কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার, রোগী থেকে শুরু করে বাগানের মজুর কুলি কামিনদের। অভাব কাকে বলে বাবার মৃত্যুর আগে মা কোনোদিন চোখে দেখেননি। চিরদিন ভাইবোন আত্মীয়স্বজনকে মা দিয়েই এসেছেন, কারো কাছে কিছু নেননি। আগেও বলেছি আসামের ঐ পরিবেশ থেকে কসবায় ঘিঞ্জি গলির মধ্যে দুখানা ঘরে এসে ওঠায় কি বিড়ম্বনায় বাবার দিনগুলো কেটেছিল। বাবা তো তিনমাসেই রেহাই পেয়ে গেলেন কিন্তু মাকে সেই সাম্রাজ্য ছেড়ে এসে দীর্ঘ ২২ বছর কখনো কখনো চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে ঐ কসবাতেই কাটাতে হল। কিন্তু উপায় ছিল না। প্রথম কারণ ছিল আমার পরের দুটি বোন বড়ো হচ্ছিল। এবং পরের দুটি ভাইকে লেখাপড়া শেখার জন্য আমাদের মতো তাদেরও পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা মা বাবার ছিল না। তাছাড়া আমাদের দু-ভাইকে দীর্ঘ ১৬ বছর ছেড়ে থাকার পর ওঁরা চেয়েছিলেন দেশে ফিরে একসঙ্গে সবাই থাকব। প্রবাস জীবন একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মায়ের ভাগ্যে একসঙ্গে সবাই মিলে থাকার সুখ তিনমাসও সইল না। শুধু তাই নয় বাবার মৃত্যুর পর এক বছর পেরোতে না-পেরোতে মাকে ছেড়ে আমাকেও প্রবাসী হতে হলো এবং আমার সেই প্রবাস জীবনকালীনই মারও মৃত্যু ঘটল। একসঙ্গে থাকা তাঁর ভাগ্যে আর ঘটল না।

আগেই বলেছি বারাসতের বাড়ি ছেড়ে আসামে যে নতুন বাগানের এ্যাসিস্টাণ্ট মেডিক্যাল অফিসার (এ. এম. ও.) হয়ে বাবা গেলেন তার নাম একড়াজান। ঐ চা-বাগান সম্বন্ধে আমার যেটুকু মনে পড়ে তা হলো বারাসতের জন্য আমার ভীষণ মন কেমন করত। বিশেষ করে স্কুলের জন্য, আমার মাস্টার-মশায়ের জন্য আর আমার খেলার সাথী দুই জ্যাঠতুতো বোন পদ্মদি আর জয়ার জন্য। জয়া ছিল আমার খেলাবাড়ির বৌ। ধপধপে ফর্সা গোলগাল বেঁটেখাটো তিন বছরের বৌ। স্বভাবতই স্বামী হিসেবে আমি ডাক্তার হতুম। পদ্মদি হতো কোনো পড়শী। আমি আর জয়া পাশাপাশি শুয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছি, পদ্মদির ডাক আসত—'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! শিগ্‌গিরী চলুন—মেয়েটার বড্ড বাড়াবাড়ি।' জয়া বৌ তার আধো আধো ভাষায় বলত—'আবার লাত দুপুরে দালাতন করতে কে এল?' আমি উঠে গলায় কাল্পনিক স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে হাতে কচুপাতার মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম। সামনেই উঠোনে একটু চক্কর মেরে এসে বলতুম বাবার মতো সুর করে—'নাগো মেয়েটাকে বোধহয় বাঁচাতে পারব না। বাচ্চা হয়ে একলেমশিয়া ধরেছে'—। আর এক আমার জ্ঞাতি বোন ছিল সরমাদি। আমাদের থেকে অনেক বড়ো ১৫।১৬ বছরের। ভারি স্বাস্থ্যবতী আর সুন্দরী ছিল সে। আমার মনে পড়ে ঐটুকু বয়সেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেলে গা শিরশির করত। আমি বুঝতে পারতুম

পাড়ার বড়ো ছেলেরা সরমাদির পিছনে লাগত। সরমাদির ছিল বে-পরোয়া ভাব। গাছকোমর বেঁধে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে জোরে জোরে স্কিপিং করত। একবার গণেশ বলে একটা বড়ো ছেলে আমাকে শিখিয়ে দিল—'যা তো সরমাকে জিজ্ঞেস কর—"আমার ফিতের" ইংরেজি কি?' আমি কিছু না বুঝে সরমাদিকে জিজ্ঞেস করতে সরমাদি আমার একটা কান ধরে বললে—My Ribbon—কে শিখিয়েছে রে তোকে? আমি বললুম—ঐ গণশাদা। সরমাদি একটা বিছুটি গাছ তুলে নিয়ে গণশার দলকে তাড়িয়ে পাড়াছাড়া করে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। সরমাদি ছিল আমার Calf love, বাছুরে-ভালোবাসার প্রথম প্রেমিকা। তার চলা, বলা, হাসি, সবকিছু ভীষণ ভালো লাগত, চোখ ফেরাতে পারতুম না। এক এক সময় সরমাদি বলত—'ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছিস রে—ছোঁড়া?' বলতুম—'তোমাকে'। সরমাদি হেসে হাঁটু গেড়ে বসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। আমি বর্তে যেতুম। আজ জয়াও বেঁচে নেই—সরমাদিও বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে শুনেছি পদ্মদি নাতি নাতনি নিয়ে এখনো বেঁচে আছেন।

বারাসতের শোক ভুলতে অবশ্য আমার বেশি দিন লাগল না। আমি ছেলেদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতুম। বই আর ছুঁতুম না। মা বলতেন বাবাকে—'ওর আর লেখাপড়া কিছু হবে না। ওকে ঐ কুলির দলে ভর্তি করে চা বাগানের খাতায় নাম লিখিয়ে দাও'। এই তীর ধনুক প্রসঙ্গে একটা স্মৃতি এখনও আমার মনে গেঁথে আছে। আমাদের হাতীখুলীর বাড়ির পিছন দিকে একটা উঁচু কাঁঠাল গাছ ছিল। কেন জানি না বাবুই পাখিদের ঐ গাছটাই ছিল পছন্দ। প্রতি বছর শয়ে শয়ে ঝুলন্ত ফলের মতোন বাবুই পাখির বাসা গজিয়ে উঠত ঐ গাছটায়। বারবার উড়ে উড়ে মুখে কুটো নিয়ে নিয়ে দক্ষ তাঁতির মতোন অক্লান্তভাবে সারাদিন ধরে তাদের বাসা বুনত। একবার একটা বাবুইকে তাক করে মারলুম তীর। তীরটা লাগল তার বুকে আর টুপ করে পাকা ফলের মতো সেটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আমার যেন নিজের তীরন্দাজিতে বিশ্বাস হল না। এ কী হল! ছুটে গিয়ে পাখিটাকে দুহাতের চেটোয় তুলে নিলুম। মুখে তার তখনো কুটোটা ধরা আছে। ছোট ছোট তার ভীত চোখ দুটো দেখে কি যেন আমার হল। সারা শরীর কাঁপিয়ে কান্না বেরিয়ে এল। পাখিটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মার কাছে এসে বললাম—'মাগো! পাখিটাকে আমি মেরেছি—ওকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।' মা খুব বকলেন—'এখন ওরা বাসা বাঁধছে—বাচ্চা দেবে। এখন কি ওদের মারতে আছে?' আমি কাঁদতে লাগলুম। মার হাতে পাখিটা মরার মতো পড়ে রইল। মা হাত ভিজিয়ে ওর মাথায় বুকে প্রলেপ দিতে লাগলেন। মনে হল এবার যেন একটু একটু নড়ছে। একমুঠো খড়ের ওপর ওকে শুইয়ে ঝুড়ি চাপা দেয়া হল। আমি বিছানায় শুয়ে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে

পাখির অসহায় চোখটা মনে করে করে কাঁদতে থাকলুম। মার শত ডাকাডাকিতেও কিছু খেলুম না। বাবা এসে সব শুনে বললেন, 'নিয়ে আয় দেখি পাখিটার কি হয়েছে।' বাবা ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন—'ওর ডান পাটা জখম হয়েছে আর পড়ে গিয়ে একটু শক্ পেয়েছে। বেঁচে যাবে!'—প্রেসক্রিপশন হল তুলো গরম করে সেঁক আর ডুপারে করে একফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ—আরনিকা। মাকে বললেন—'বাচ্চুকে খাবার দিয়ে দাও।' তিনদিন ধরে সেবা করে একটু একটু করে পাখিটা সেরে উঠল। বাবা তাকে হাতে করে নিয়ে বাইরে দাঁড়াতেই ব্যাস! পাখিটা উড়ে গিয়ে কাঁঠাল গাছে বসল। সেই থেকে আমার ধন্বন্তরিগিরির শেষ।

একড়াজনের অনেক কথা আমার ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। ছানিপড়া স্মৃতির চোখ দিয়ে তাকালে একটা মুখই বারবার জলন্ত ভেসে ওঠে—বাগানের এসিস্টান্ট ম্যানেজার কিত্ সাহেবের মুখ। তার নামের বানান Keith ছিল কি Keats ছিল আজ আর জানার উপায় নেই। এক মাথা লাল চুলের নিচে রুডলফ্ ভ্যালেনটিনো ধাঁচের অসাধারণ সুন্দর সরু গোঁফওয়ালা এক মুখ মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় তীরবেগে দৌড়ে আসা এক ঘোড়ার হঠাৎ লাগামটানা থামায় সামনের দুটো উঁচু পায়ের পিছনে ছিপছিপে এক ঘোড় সওয়ার—স্টিরাপের ওপর দু-পা দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে। আর তার চিৎকার—'হেই ডকটর বাবু।' দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত বলতে যা কিছু বোঝায় শেষ অক্ষর অবধি তাই ছিল এই কিত্ সাহেব। বাবা নিজে ঘোড়া চড়তেন—বলতেন 'কিত্ সায়েব হচ্ছে ঘোড়ার পোকা।' সেই শিশু বয়সে আমার মনে এক রূপকথার জাল বুনত ঐ কিত্ সাহেব। গভীর রাতে ঠাঁই! ঠাঁই! রাইফেলের আওয়াজ মিকির পাহাড়কে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলিয়ে জাগিয়ে দিত—সবাই জানত কিত্ সাহেব শিকারে বেরিয়েছে। কোনো সঙ্গী ছাড়া একা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঐ শ্বাপদসঙ্কুল কাজিরঙ্গার জঙ্গলে একটা লম্বা টর্চ আর দুটো রাইফেল নিয়ে কিত্ সাহেবের নৈশ অভিযান চলত সপ্তাহে দু দিন কখনো তিন দিন। আর অবশ্যম্ভাবিভাবে আমাদের বাড়িতে আসত কখনো হরিণের ঠ্যাং কখনো আস্ত হরিণ। কুলিরা যমের মতো ভয় করত তাকে। পাতা তুলতে তুলতে হয়ত এক অবসরে তারা জটলা করছে। নিঃশব্দে ঘোড়ায় চেপে আসা কিত্ সাহেবের চামড়ায় বোনা চাবুকের হিস হিস শব্দ ওদের পিঠে কালসিটে ধরিয়ে দিত। ওরা ছুটত যে যার কাজে। বলত 'শালা সাক্ষাৎ শয়তান।' এ হেন কিত্ সাহেব কেন যে দিন নেই রাত নেই হঠাৎ হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে হাসপাতালে যেত এবং গল্প করত তা ছিল আমার কাছে একটা রহস্য। কিত্ সাহেবের ছিল খাস বিলিতি মেম। এই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত কিত্ সাহেব ছিল ঐ মেমের কাছে জুজু। সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো কখনো ফোর্ড গাড়ি চেপে এসে রাত দুপুরে বাবাকে

তাদের বাংলোয় নিয়ে যেত। দু তিন ঘণ্টা পরে বাবা ফিরে এসে ফিসফিস করে মাকে কি সব বলতেন—আর মা রাগ করে বলতেন—'মরণ!' সমস্তটা ছিল আমার কাছে একটা ধাঁধা।

একবারের কথা মনে পড়ছে। বাবা গেলেন রাত্রি নটায় আর ফিরলেন পরদিন ভোরে। মেমসাহেব নাকি ভীষণ অসুস্থ। এদিকে মা সারা রাত জানলায় দাঁড়িয়ে। পরদিন মা-বাবার কথাবার্তায় যেটুকু বুঝেছিলাম তা হচ্ছে এই যে সাহেব তো বোতল-খানেক হুইস্কী পান করে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু মেমসাহেবের কখনো মাথায় ব্যথা কখনো বুকে ব্যথা কখনো পায়ে কিংবা কোমরে ব্যথা। বাবার হাত ধরে সব দেখালেন এবং তাঁর শুধু একটিই কথা 'কিওর মি ডকটর'। শেষ পর্যন্ত কড়া ঘুমের ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে বাবার রেহাই! মার সেই এক কথা—'মরণ!' সময় নেই অসময় নেই বাবা হয়ত কোনো সিরিয়াস রোগী নিয়ে বিব্রত, সাহেবের আর্দালি এসে খবর দিল, 'মেমসাব নে সেলাম দিয়া'—মানে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাবাকে সব ফেলে ছুটতে হতো। একবারের কথা মনে আছে, বাবা গিয়েছেন মেমসাহেবকে দেখতে। ড্রয়িং রুমে বসে আছেন তো বসেই আছেন, মেমসাহেবের পাত্তা নেই। এদিকে কিত্ সাহেবও বেরিয়েছেন। হঠাৎ দোতলা থেকে এল মেমসাহেবের প্রচণ্ড আর্তনাদ। বেয়ারা আর্দালি সবাই ছুটল, বাবাও ছুটলেন। দরজা বন্ধ করে মেমসাহেব তখন আছেন বাথরুমে আর মাঝে মধ্যে ভিতর থেকে তাঁর চিৎকার আসছে। তারপর সব চুপচাপ! বাবা বললেন—'দরজা ভাঙো!' ইতিমধ্যে কিত্ সাহেবও এসে পড়েছেন। দরজা ভেঙে যা দেখা গেল তাতে সবার চক্ষু চড়কগাছ। মেমসাহেব অজ্ঞান হয়ে বাথরুমের মেঝেয় পড়ে আছেন আর একটা বিশাল ময়াল সাপ জানলা থেকে ঝুলে প্রায় মেমসাহেবের মুখের কাছাকাছি তার বিরাট হাঁ নিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। কিত্ সাহেবের রিভলবার গর্জন করে উঠল পর পর তিনবার। আটজন কুলির কাঁধে চেপে সেই মৃতপ্রায় পঁচিশ ফুট লম্বা ময়াল সাপ সারা বাগান প্রদক্ষিণ করল। সেই থেকে মেমসাহেব হলেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এবং বাবার প্রাণান্ত। এই নিয়ে বাড়িতে হতো অশান্তি। অনেক পরে যা আন্দাজে বুঝেছিলাম তাহল যে ঐ দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত কিত্ সাহেবের ছিল যৌন অক্ষমতা। বেশ কয়েক বার ঐ মেমসাহেবের রাত বিরেতের ডাককে মার কথায় অবহেলা করায় বাবাকে প্রচুর অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই এক সোনালি চুলওয়ালী উদ্ধত শ্বেতাঙ্গিনী বাবার নিচু মাথার ওপরে অকথ্য গালিবর্ষণ করে যাচ্ছে, শাসাচ্ছে এবং একবার ঘা-খাওয়া বাবা বলছেন—'আই অ্যাম সরি ম্যাডাম।'

১৯৫৩ সালে প্রথম বার রাশিয়াতে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে মস্কো যাবার পথে আমরা সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় তিন চার দিন ছিলাম। কার্পেট-

মোড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে আমার পা মচকে যায়। একজন শ্বেতাঙ্গিনী লাল চুলওয়ালী ওয়েট্রেস মহিলা আমার পা প্রতিদিন মাসাজ করত কয়েক ঘণ্টা ধরে। আমার কেমন যেন মনে হতো আমি বাবার অপমানের শোধ নিচ্ছি। পরে অবশ্য মহিলাকে অন্তরঙ্গভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল—কিন্তু সে অন্য কথা। প্রধানত ঐ মেমসাহেবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই বাবা ডঃ মলোনিকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে হাতিখুলীতে বদলি হতে পেরেছিলেন। মার ছিল ঐ সুন্দরী খামখেয়ালী মেমসাহেবকে ভয়,—কি জানি বাবাকে কি করে বসে। বাবা যখন বলতেন সাতজন্মে স্নান না করা ঐ মহিলার গায়ের গন্ধে তাঁর বমি উঠে আসে, মা বোধহয় মনে মনে প্রার্থনা করতেন 'হে ভগবান—ও যেন জীবনে চান না করে।'

এরপরে আমরা 'কাজিরঙ্গা' পোস্ট অফিসের আওতায় পড়া হাতিখুলীতে এলাম। প্রায় এক বছর ধরে দাদার এবং আমার 'মুখ্যু' হয়ে বাড়িতে বসে থাকার থেকে নিষ্কৃতির উপায় বাবা-মা প্রাণপণে খুঁজেছিলেন। শেষ অবধি ঠিক হল আমরা দু-ভাই কলকাতায় পড়তে যাব। সুকিয়া স্ট্রিটে মেজ জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা পাকাপাকি হল। বাবা চললেন সঙ্গে, আমাদের স্কুলে ভর্তি করে কলকাতায় রেখে চলে আসবেন বলে। (অসম্পূর্ণ)

[প্রতিক্ষণ সম্পাদিকা স্বপ্না দে-র সৌজন্যে]

আঞ্চলিকতাবাদ ও জাতীয় সংহতি

অরুণ মুখোপাধ্যায়

'সব বর্ণ মিলে হোক ভারতের শক্তির সংহতি'—এই রবীন্দ্র-ভাবনার মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিন্যস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতি, ঐক্য-বোধের প্রয়োজনের ইঙ্গিতটি স্বাভাবিক কারণেই নেই, অথবা অখণ্ড জাতীয়তা-বোধের উজ্জীবনের অভিপ্রায়ও সেভাবে উপস্থিত নয়; কেননা, কবি চেয়েছিলেন ভারতীয় সমাজের সমগ্র মানুষের সব বৈচিত্র্য মিলেমিশে সমবেত শক্তির উদ্বোধন। তিনি বলেছেন: 'মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয় সেখানেই বর্বরতা।...বহুজনের চিত্তবৃত্তির সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদ সম্মিলিত করার দ্বারা সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানুষের লক্ষ্য।...ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেছে সেখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানব-ধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।' (পল্লীসেবা, ফাল্গুন, ১৩৩৭)

রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশের সংহতির সমস্যা যতটা সামাজিক ছিল ততটা রাজনৈতিক ছিল না, কিন্তু বর্তমান ভারতের জাতীয় সংহতির সংকট যতটা রাজ-নৈতিক ততটা সামাজিক নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, জাত-পাত, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে ভারতীয় সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে বিচ্ছিন্ন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই সামাজিক ভেদবুদ্ধি দূর করে সমাজের শক্তিকে সংহত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। বর্তমানের ভারতীয় শাসকবর্গ সমাজের অভ্যন্তরের ভেদবুদ্ধি ও অসহযোগিতাবোধ নিরসনে সচেতন ও সক্রিয় ঠিকই, কিন্তু আজ তাদের সামনে অসংহতি ও বিচ্ছিন্নতার রূপ আঞ্চলিকভাবে আরও ব্যাপক ও গভীর। ভারতের মাটিতে আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) খুব তীব্রভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে প্রাদেশিকতা-বাদ (Provincialism) নামে বিচ্ছিন্নতাবোধের যে সংজ্ঞা প্রচলিত তা এই আঞ্চলিকতাবাদ থেকে ভৌগোলিক অর্থে ব্যাপকতর হলেও প্রকৃতি ও গুণগত অর্থে এ দু'টোকেই অভিন্ন মাত্রায় সনাক্ত করা সম্ভব। তবুও ভারতের আঞ্চলিকতার একটা সংজ্ঞা নির্ণয়ের সরকারী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারতে প্ল্যানিং কমিশন প্রচারিত 'Economic Development in Different Regions in India'

নামের পুস্তিকা The States Reorganisation Act of 1956-র যে সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে তা হল : একটি অঞ্চল একটি রাজ্য অথবা একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের সমতুল্য। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এ অঞ্চল কখনো রাজ্যের সমান অথবা তার চেয়ে ছোট। এমনই অঞ্চলের মানুষ যখন তাদের চিন্তা ও কর্মে শুধু ঐ অঞ্চলেরই নানা স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে ব্যাপৃত থাকে এবং সেখানে নানা ধর্ম বর্ণ ভাষা জাতি থাকা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলের স্বার্থবোধ-ভিত্তিক এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে সমগ্র দেশের স্বার্থ ভুলে, তখন তাদের এই সংকীর্ণতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয়, তারা পর-শাসন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, স্বশাসন চিন্তায় মেতে ওঠে, আঞ্চলিকতাবাদের মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়ে। আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয় যে, কোন কোন অঞ্চলের মানুষের স্বভাবে কর্মোদ্যম, কঠিন পরিশ্রম এবং জীবনের নানা কাজে ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহ বেশ প্রবল এবং এই গুণগুলি তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের খুবই অনুকূল হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এর উদাহরণ। কিন্তু এ মন্তব্য আপাতবিরোধী হলেও সত্য যে, পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদের খালিস্থানী আন্দোলনের বীজ তাদের ঐ স্বাচ্ছন্দ্যবোধের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

ভারতে এই আঞ্চলিকতাবাদের উৎস-সন্ধানে তার ইতিহাসের ছায়াপথ ধরেই পিছিয়ে যেতে হয়। প্রাচীন ভারতে বহুর মধ্যেও ঐক্য ছিল—এমন একটা মন্তব্য জাতীয় সংহতির আলোচনা-সূত্রে প্রায়ই উল্লিখিত হতে দেখা যায়। মন্তব্যটি বাস্তবে কতখানি সত্য ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। রবীন্দ্রনাথের ভারতের ইতিহাস-ভাবনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণার সুরটি বেশ স্পষ্ট। তিনি তাঁর কবিতায় (বিশেষত 'ভারততীর্থ' কবিতায়), প্রবন্ধে, ভাষণে ভারতীয় সমাজে ভাবগত ঐক্যবোধের ভাবনাকে তুলে ধরেছেন এবং এর অপরিহার্যতায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'সেই গৃহ প্রতিষ্ঠা, স্বদেশ প্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়দের প্রতি স্বদেশীয়দের বাহু সম্প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ...শিক্ষা এবং ঐক্য এই দুটোই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল।...বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্রিত ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব।' ('ভারতী', আশ্বিন, ১২৯১) রবীন্দ্রনাথের এই ঐক্যের বাসনা খুবই প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই এবং সামগ্রিক স্বদেশী চিন্তার মধ্যে সে ঐক্যের উদ্বোধন ও স্থায়িত্ব সম্ভব। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ভারতের ইতিহাসের গতি কিন্তু এই ঐক্যচিন্তার উলটোমুখী এবং তা আজ চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভারতবাসীর এই অনৈক্যের আশংকায় সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন এবং সে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন :

'দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে একস্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য, আমি যে একটি 'স্বদেশী সংসদ' গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা একদিনেই হইবে এমন আমি আশা করি না।...কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা যত ক্ষুদ্র আকারেই হউক আরম্ভ করিতে হইবে।... দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে এবং সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে।' ('বঙ্গদর্শন', চৈত্র, ১৩১১)

রবীন্দ্রনাথ হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি যে, এতদিনে 'দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তি' এমন সংহারক মূর্তি ধারণ করতে পারে। স্বীকার্য যে, ভারত বহু ভাষা, ধর্ম জাতি-বর্ণ প্রভৃতি নিয়ে এক বিচিত্র, বিভিন্ন-মাত্রিক দেশ এবং তার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও বড় কম নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত সম্রাটদের আমলে দেশে ঐক্যবোধের স্বরূপ যাই পাই, তবে ব্রিটিশ-শাসনের প্রাক্কালে ভারতে অসংখ্য আঞ্চলিক সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশের কেন্দ্রীয় শাসন (Unitary Form of Government) রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ভারতকে কঠিন হাতে একত্রিত করতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। সেই একত্রীকরণের মধ্য থেকেই জন্ম নিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (Indian Nationalism) যা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তিকে সংহত করতে পেরেছিল। একথা অবিশ্বাস্য নয় যে, ভারতে আঞ্চলিক ভেদ-বুদ্ধির সূত্রপাত ঘটেছিল স্বাধীনতার জন্য ভারত-বিভাগের কারণে। সমগ্র ভারতবাসী সবিস্ময়ে দেখল—কীভাবে একটি বিশাল অখণ্ড দেশ রাতারাতি দু'ভাগ হয়ে গেল ধর্মের ভিত্তিতে। এটা ভৌগোলিক বিভাগে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম শুধু নয়, সারা দেশের মানুষের মনেও অখণ্ডতার বিশ্বাসে চিড় ধরে গেল, একটা ভাঙ্গনের সুর গুঞ্জিত রইল, তাই একদিন উস্‌কে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের আগুন ছড়িয়ে দিল, দিল বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্প। যদিও ভারতীয় সংবিধান ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সমদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে দিল, ভারতীয় মানসিকতায় ভারত-বিভাগের স্মৃতি-বাহিত ভেদবুদ্ধির বীজটি রইল কোথাও লুকিয়ে, কিন্তু তার অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটল পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি রাজ্য পুনর্বিন্যাসের আমলে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৭১ ধারায় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের যে কর্মসূচী ১৯৫৬ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য অসাধু ছিল না—প্রদেশগুলির ভাষাগত রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটবে স্বশাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এবং এভাবে সে সময়ে এবং তার পরবর্তীকালে অনেক নতুন প্রদেশ / রাজ্যের জন্ম হল বটে, কিন্তু এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বশাসনের নতুন এ সুযোগ তাদের সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবোধের

উন্মেষের সুযোগ করে দিল। এই সুযোগ নিয়েই ধীরে ধীরে আঞ্চলিকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আজ জাতীয় সংহতির চরম সংকট সৃষ্টি করেছে। বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করে দেখা গেছে—এই আঞ্চলিকতার স্বরূপ প্রধানত চার শ্রেণীর : (১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলা ; (২) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই পৃথক রাজ্য গড়ে তোলা ; (৩) আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা এবং (৪) ভূমিপুত্রের (Son of the Soil) দাবি প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা

এটি আঞ্চলিকতাবাদের এক চূড়ান্ত রূপ। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে, কোথাও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে এবং বিচ্ছিন্নতার পদ্ধতি সর্বত্র একই রকম—সন্ত্রাসবাদ, জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে আতংক সৃষ্টি। ভারতের কোন কোন রাজ্যে স্বঘোষিত কিছু নেতা, কখনো ধর্মীয়, কখনো রাজনৈতিক নেতা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের দাবি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলা। তাদের আন্দোলনের পদ্ধতি সশস্ত্র, আতংকবাদী। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্তবর্তী পাঞ্জাব ও কাশ্মীর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাঞ্জাবের সশস্ত্র খালিস্থানী আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা শুরু হয়, অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরকে সংগ্রামের দুর্গে পরিণত করে আন্দোলন চলে। 'অপারেশন ব্লু-স্টার' ও ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর সে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে, যদিও এ আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি, মাত্র ৬ শতাংশ পাঞ্জাববাসী এ আন্দোলনের সমর্থক ছিল এবং বিদেশ থেকেও খালিস্থান সমর্থকদের মদত ছিল, আর ছিল পাকিস্তানের সক্রিয় উসকানী। পাঞ্জাব ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল রাজ্য, তবে কেন তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের এই দুর্মতি? তারা কি আত্মপরিচয়ের সংকটে (Identity Crises) ভুগছিল? ভারত সরকার কর্তৃক বঞ্চনায় ক্ষিপ্ত হয়ে আলাদা হয়ে যেতে চাইছিল? আমাদের সাচ্ছন্দ্য একমাত্র আমরাই ভোগ করব—এমন স্বার্থপর মনোভাব নিয়ে স্বাধীন হতে চাইছিল? আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে স্বশাসনের অহেতুক স্বাধীনতা লিপ্সা ছাড়া পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আশার বিষয় এই, এ আন্দোলন আজ প্রশমিত বলা যায়।

কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পাঞ্জাবের খালিস্থানী আন্দোলনের সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নয়। কাশ্মীর আগ্রাসনে পাকিস্তানের অবিরাম সন্ত্রাসবাদী মদত সমস্যাকে প্রায় এক স্থায়ী ডাইমেনশন দিয়েছে। ভারতকে একই

সঙ্গে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঠেকানো এবং কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাশ্মীরে প্রস্তাবিত গণভোট অবস্থাকে কতটা স্বাভাবিক করবে তা লক্ষ্য করার বিষয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে সপ্তকন্যার দেশে আঞ্চলিকতা-ভিত্তিক বিচ্ছিন্নবাদের চেহারাটা আরও জটিল। আসাম, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশে অসংখ্য উপজাতি সম্প্রদায়ের (Ethenic groups) বাস। এদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ মায়ানমারের (বার্মা) সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। স্বাধীনতার আগে থেকেই এদের মধ্যে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, স্বশাসনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এতে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিশনারী সংস্থাগুলি অনেকটা মদত যুগিয়েছিল। স্বাধীনতার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়েও তাদের ভারতীয় জনসমাজের মূল স্রোতে ধরে রাখার চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয়নি তার প্রমাণ বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদের আঞ্চলিক প্রবণতার তীব্রতা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ফিজোর নেতৃত্বে নাগাল্যাণ্ডে বিচ্ছিন্নতার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনই এ অঞ্চলের প্রথম সংগঠিত পদক্ষেপ। নাগাল্যাণ্ডকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্যের মর্যাদা দিয়েও আত্মগোপনকারী নাগাদের শান্ত করা যায়নি, তারা সুযোগ বুঝে অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও রাজীব গান্ধীর আমলে মিজোরামের মুক্তি আন্দোলনের ধার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মিজোরাম একর্ড' করে, তবুও তাদের বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব আজও যায়নি, যেমন যায়নি জি. এন. এল. এফ.-র নেতা সুবাস ঘিসিং-এর মন থেকে গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পরেও। আসামে উলফা ও বোড়ো সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন যদিও আপাত ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন নয়, এবং সেইমত ১৯৯৪ সালে বোড়োল্যাণ্ড অটোনোমাস্ কাউন্সিল্ গঠিত হয়, তবু মনে মনে তারা ভারত-বিচ্ছিন্নতাকামী। মণিপুরে পিপলস্ লিবারেশন আর্মি, ত্রিপুরার ত্রিপুরা টাইগ্যাল ফোর্স, মেঘালয়ে খাসি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন এবং অরুণাচলে অরুণাচল প্রদেশ স্টুডেন্টস্ ফ্রন্ট প্রভৃতি সংগঠনের কমবেশী সন্ত্রাসবাদের মূল লক্ষ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসা। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় সবগুলি সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাকামী সংগঠনের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদীদের যোগ আছে। সীমান্ত পথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী চলে এবং ভেতরে ও বাইরে (বিশেষত সীমান্তবর্তী মায়ানমার অঞ্চলে) সন্ত্রাসবাদীদের মিলিটারী ট্রেনিং চলে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার LTTE Socialist Council of Nagaland-র ব্যবস্থাপনায় মায়ানমারের সীমান্তবর্তী কাচিনের তিনটি জঙ্গল-ক্যাম্পে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ট্রেনিং দিতে শুরু করেছে সন্ত্রাসবাদীদের। বিচ্ছিন্নতাকামীদের এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুধু ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, প্রতি রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়গুলি পারস্পরিক

সংঘর্ষেও লিপ্ত, এখানেও কারণ আঞ্চলিক আগ্রাসন—বড় সম্প্রদায় ছোট সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করে রাজ্যের অথবা অঞ্চলের কর্তৃত্ব দখল করা।

সাম্প্রতিককালে উত্তর-পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে এইভাবে : UNO ১৯৯৩ সালকে International Year of Indigenous People বলে ঘোষণা করে এবং সে উপলক্ষ্যে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় তাতে Socialist Council of Nagaland-র সভাপতি ইসাক চেসি স্যুকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্রীইসাক সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের দাবি জানায়। যদিও ভারতের প্রতিনিধি প্রতিবাদ জানায়, তবুও সে সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাবে Indigenous People-র আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃতি পায়। এরপর ইসাকের কাউন্সিল এ ধরণের আরও দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ পেয়ে যায়। ফলে দারুণ উৎসাহিত বোধ করে ইসাকের কাউন্সিল তড়িঘড়ি করে North-east Indigenous and Tribal People's Forum নামের সপ্তকন্যা সমন্বিত একটি সংগঠন তৈরি করে ফেলে এবং গত বছর গুয়াহাটিতে তাদের প্রথম সম্মেলনে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি সোচ্চার করে তোলে। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি রাজ্য ও গোষ্ঠীসমূহ এমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলে তাদের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনও ন্যায্যতার (Legitimization) স্বীকৃতি পাবে এবং ভারতের পক্ষে তাকে সামাল দেওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠবে।

রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা

এ প্রবণতা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত তীব্র ও চূড়ান্ত না হলেও এটা ভারত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কাছে খুব লঘু সমস্যা নয়। একটা রাজ্য ভেঙ্গে একাধিক রাজ্য তৈরীর যে কাজ শুরু হয়েছিল ভারত সরকারে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কর্মসূচী অনুসারে, তারই ফল সুদূর-প্রসারী হয়ে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। কে. প্রকাশনের নেতৃত্বে তেলুগু ভাষাভাষীদের তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্ম সম্ভব হয়েছিল মাদ্রাজকে ভাগ করে। অন্যদিকে আসাম থেকে নিয়ে তৈরী হল মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় ও মণিপুর এবং পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে নিয়ে তৈরী হল হরিয়ানা ও হিমাচলপ্রদেশ। এইভাবে নতুন রাজ্য তৈরীর উদ্দেশ্য ছিল ঐ সব রাজ্যগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীন স্বশাসনের অধিকার ও নিজেদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ দেওয়া ও স্বপরিচয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু তার ফল হল বিপরীতমুখী (Counter productive) বিশেষত অন্য সব রাজ্যের ক্ষেত্রে। রাজ্যের কোন অঞ্চল কখনো ভাষার ভিত্তিতে

কখনো আত্মপরিচয়ের বাসনায়, কখনো বঞ্চনাবোধের উগ্রতায় মূল রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে স্বশাসনের দাবি নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের GNLF ও বিহারের ঝাড়খণ্ডীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আপাতত বন্ধ করা গেছে তাদের জন্য Autonomous Council তৈরী করে দিয়ে। এখন সামনে রয়েছে এ ধরণের আরও অনেক বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের দাবি উঠেছে উত্তর প্রদেশের পাহাড়ী মানুষদের অবহেলা ও বঞ্চনাবোধ থেকে। কিছুকাল আগেও যিনি উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন তাঁকে কেন্দ্রীয় কেবিনেটের খাঁচায় পুরে সে আন্দোলনের দাবিকে আপাতত প্রশমিত করা হয়েছে। যদিও খুব তীব্র নয়, তবুও স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবির বর্তমান তালিকাটি খুব ছোট নয় : মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ, কাশ্মীরের লাদাক, ওড়িষ্যার কোশল রাজ্য, তামিলনাড়ুর পাঙ্গাল মাঙ্গাল রচি (নিম্ন বর্ণের দাবি) বিহারের বনাঞ্চল প্রভৃতি। উত্তরাখণ্ড আন্দোলন ছাড়া বাকি আন্দোলনগুলি খুব জোরদার নয় উত্তর-পূর্ব ভারতের আন্দোলনগুলির, আসামে বোড়ো, উল্‌ফা, বরাকভেলি (কাছাড়) ও পার্বত্য কাছাড় (উত্তর)-এর মত।।

সম্প্রতি (১৯৯২) উত্তর কাছাড়ে Karbianlong Dismas Antonomus Council তৈরী হয়েছে ; ত্রিপুরায় Tripura Tribal Antonomous Council প্রতিষ্ঠার পরেও ত্রিপুরা উপজাতির বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন থেমে যায়নি ; মিজোরামে আর একটি উপজাতিকে নিয়ে Hmar Antonomous Council তৈরী হয় ১৯৯৪ সালে ; নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন এখন National Socialist Council of Nagaland-র হাতে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের এইসব বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য হল—প্রায় সব ক'টি আন্দোলনের জন্মদাতা ও পরিচালক ছাত্র-যুবগোষ্ঠী এবং এদের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে যে কোন কোন রাজনৈতিক নেতার মদত আছে সে কথাও অনুমানের অসাধ্য নয়। সম্প্রতি নাগা স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন ডাক দিয়েছে—তারা মণিপুরের চারটি জেলা অর্থাৎ মণিপুরের ৭০ শতাংশ জায়গা নিয়ে বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড গড়ে তুলবে। অপর পক্ষে অল্ মণিপুর স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। মনে হয়, যেহেতু বর্তমান মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী একজন নাগা সেহেতু নাগাল্যাণ্ডের ছাত্র-যুবগোষ্ঠী বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড তৈরী করার সে সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে। সপ্তকন্যার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ কমবেশী লেগেই আছে। এই সূত্রে সাম্প্রতিককালের একটি মজার ব্যাপার হল—নিজ নিজ রাজ্যের পুনর্বিন্যাসের চিন্তা : আসাম, ত্রিপুরা ও মায়ানমারের (বার্মা) কিছু কিছু অংশ জুড়ে গড়ে তুলতে চাইছে বৃহত্তর মিজোরাম যেটি Silo Plan বলে পরিচিত ; মণিপুর পার্বত্য কাছাড় ও মায়ানমারের কিছু কিছু অঞ্চল জুড়ে নাগাল্যাণ্ড গড়ে তুলতে

চায় সংযুক্ত নাগাল্যাণ্ড এবং মিজোরামের মার (Hmar) উপজাতি গোষ্ঠী মিজোরাম ও মায়ানমারের কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠন করতে চায় Hmar Homeland। এ সব খুব অবাস্তব চিন্তা হলেও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতার ধরণটা ধরা যায়। এখন এসব আন্দোলনের দু'টি মুখ—একটি ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দিকে, অন্যটি নিজ নিজ প্রতিবেশীর দিকে যেটি প্রায়শই সীমান্ত সংঘর্ষে রূপ নেয়।

রাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ

এই আঞ্চলিকতাবাদের বয়স ভারতীয় রাজনীতিতে এখনো খুব বেশী হয়নি। তার প্রকাশ ঘটেছে প্রধানত অঞ্চল / রাজ্য ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন ও তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম্ বোধহয় এর অগ্রদূত। তামিলনাড়ুর ডি. এম.কে, এই. আই. ডি. এম.কে; মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, পাঞ্জাবের আকালী দল (বাদল), বিহারের ঝাড়খণ্ডীদল, ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি, মিজোরামে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, মণিপুরের পিপলস্ পার্টি, আসামের অহম গণপরিষদ, সিকিম ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট, সিকিম সংগ্রাম পরিষদ, উত্তরাখণ্ড ক্রান্তিদল, হরিয়ানা বিকাশ পার্টি, কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি দল প্রধানত রাজ্য/ অঞ্চল ভিত্তিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব আঞ্চলিক দলের ভিত্তি কোথাও সম্প্রদায়, কোথাও জাতি-বর্ণ, কোথাও ধর্ম, আবার কোথাও ভাষা। ভারতীয় সংবিধানে এমন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠনে ও কাজে কোন বাধা নেই, কিন্তু এ সব দলের জনপ্রিয়তা প্রধানত তৈরী হচ্ছে সে অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্বার্থ-সংকীর্ণ মনোভাবকে জাগিয়ে দিয়ে, সর্বভারতীয় স্বার্থের দিকে অন্ধ করে তুলে। রাজ্যপ্রশাসন দিয়ে অঞ্চলের সর্ববিধ উন্নতি অবশ্যই কাম্য, কিন্তু তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থার নয়। এ কথা অবিশ্বাস্য নয় যে, ঐসব আঞ্চলিক দলগুলি মানুষদের প্রাদেশিকতাবোধে সুড়সুড়ি দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, তাদের আঞ্চলিক স্বার্থে বাইরের চিন্তা করতে দিচ্ছে না। জাতীয় সংহতির মনোভাব তৈরি হচ্ছে না। আবার অন্যদিকে একই কারণে রাজ্যে রাজ্যে সীমান্ত সমস্যা বাড়ছে, নদী-নালার জল-বণ্টন নিয়ে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। মহারাষ্ট্র-কর্ণাটকের, পাঞ্জাব-হরিয়ানার, মণিপুর-নাগাল্যাণ্ডের এবং মিজোরাম-ত্রিপুরার সীমান্ত বিরোধ সর্বাধুনিক ঘটনা। আবার কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ু-কর্ণাটকের এবং নালার জল বণ্টন নিয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিরোধ এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

সম্প্রতি একটু অন্যধরণের আঞ্চলিকতাবোধের এক দুর্ভাগ্যজনক পরিচয় পাওয়া গেছে। বিচারক রামস্বামী চরম দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে Impeachment-র তোড়জোড় চলতে থাকে। যেহেতু রামস্বামী

দক্ষিণ ভারতের লোক সেহেতু দলমত নির্বিশেষে দক্ষিণ ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলির সংসদরা দক্ষিণ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ঐ Impeachment বন্ধের আবেদন জানায় এই মর্মে যে, ভারতে Impechmemt-র ঘটনা এটাই প্রথম হবে এবং দণ্ডিত হবেন একজন দক্ষিণ ভারতীয়—এ ঘটনা শুধু রামস্বামীর পক্ষে অবমাননাকর নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের বদনাম হবে। যদিও Impechment-র মত এত যোগ্য কেস পার্লামেন্টে কখনো আসেনি, তবুও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের 'আঞ্চলিক স্বার্থে' প্রধানমন্ত্রী সুকৌশলে তা বন্ধ করে দেন। একজন দুর্নীতিগ্রস্ত, ভারতীয় আঞ্চলিকতাবোধের কারণে, দক্ষিণভারতীয় হওয়ার জন্যে অন্যায়ভাবে মুক্তি পেয়ে গেলেন।

ভূমি-পুত্র নীতি

সন্ অব্ দ্য সয়েল ফরমূলা বা ভূমি-পুত্র নীতি কিন্তু ঐ সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদেরই ফলশ্রুতি। এটা আমাদের রাজ্য বা অঞ্চল, আমরা এ মাটির সন্তান। এর সুফল ফলাব আমরা, ভোগ করব আমরা, এর বাইরে ভারতের আর কেউ নয়—এমন এক স্বার্থ-সংকীর্ণ চিন্তা থেকে এই ভূমিপুত্র নীতি জন্ম নিয়েছে। আসামে 'বঙাল খেদাও' আন্দোলন অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছিল, উড়িষ্যায়ও বাঙালী বিতাড়ন চলেছিল কয়েক দশক আগে। আসামে আজ বহিরাগতের প্রশ্নটি 'বঙাল খেদাও' আন্দোলনেরই ব্যাপকতর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে এবং এ আন্দোলন ১৯৭৯ সাল থেকে All Assam Student Union এবং Assam Gana Sangram Parisad—এ দু'টি সংগঠন শুরু করেছিল। Assam Accord (August 14-15, 1985) হওয়ার পর বহিরাগত বিতাড়ন পর্ব শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু বহিরাগতের সংজ্ঞাটি এখনো বিতর্কিত। অথচ এই বহিরাগতের প্রশ্নের ভাইরাস্ আসাম সংলগ্ন অন্যান্য রাজ্যের ছড়িয়ে পড়ছে। মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ডে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারা যাচ্ছে—কীভাবে শিলং-এ খাসি ছাত্ররা বহিরাগত খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং বহিরাগত সন্দেহে তাদের মেঘালয় থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য চাপ দিচ্ছে, অত্যাচার চালাচ্ছে, কী ভাবে অরুণাচল প্রদেশের ছাত্ররা ২০ বছর আগে আগত চাকমা ও হজংদের শরণার্থী ক্যাম্পে ঢুকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে আর সরকার সব মুখ বুজে দেখছে, এবং কীভাবে মণিপুরের নাগারা কুকিদের হত্যা করছে এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, আবার কুকিরাও বদলা নিচ্ছে সুযোগ বুঝে। ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতা, এক রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা বা ভূমিপুত্র নীতির আন্দোলন এখানে কমবেশী সন্ত্রাসবাদী ও সশস্ত্র। ফলে শুধু জাতীয় সংহতির বিনষ্টি নয়, এ আন্দোলনে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্থিক উন্নতি ও শান্তি অবিরাম বিঘ্নিত হচ্ছে, ৪ কোটি মানুষ জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলছে।

পরিতাপের বিষয় হল এই—রাজনৈতিক নেতা ও সরকার বিশেষত ছাত্রদের আন্দোলনের চাপের কাছে মাথা নত করে আছে, কেননা ঐসব নেতারা ছাত্রদের চেষ্টায় নির্বাচনে জয়ী হয়, তাদের চটালে ফল বিপরীত হবে ভোট-যুদ্ধে। সম্প্রতি অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী আপাং-র ভোট-যুদ্ধ জয় এবং চতুর্থবার (জ্যোতি বসুর পরেই স্থান) মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভূমিপুত্র নীতির রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রয়োগ খুব বেশী প্রকট নয়। পশ্চিমবঙ্গে 'আমরা বাঙালী' পার্টির এমন আন্দোলন এবং মহারাষ্ট্রে শিবসেনা তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। শিবসেনা প্রধান বাল ঠেকারের সাম্প্রতিক মহারাষ্ট্র থেকে বাঙালী বিতাড়নের হুমকি বহু-সমালোচিত বিষয়—সংযুক্ত বি. জে. পি.-শিবসেনা সরকার এমন সংকীর্ণ ভূমি-পুত্র নীতি আঞ্চলিকতাবাদের অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করে তুলবে। ভূমি-পুত্র নীতি প্রয়োগ করে শিক্ষা ও সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের লোকদের ভীতি প্রদর্শন ও বিতাড়ন খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে পড়েছে এবং এ ব্যাপারে রাজ্য-প্রশাসনও মদত যোগাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। এ ধরণের আঞ্চলিকতা-বাদ শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা বলি : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় এক সভায় ঘোষণা করলেন—বিহারে চাকুরি খালি হলে একমাত্র বিহারীরাই তা পাবে। দ্বিতীয় ঘটনাটি হায়দরাবাদের এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যেখানে অর্থনীতির একজন তামিল অধ্যাপক এবং নৃতত্ত্বের একজন বাঙালী অধ্যাপক নানা প্রকার নির্যাতনের পর চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তেলুগু অধ্যাপকদের পক্ষে। এমন ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতের তীব্র বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্বন্ধে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, ঐ অঞ্চলের উপ-জাতিদের ভারতীয়দের জীবনের মূল স্রোতে আজও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি বলে বা বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে বলে আজকের এই বিপত্তি। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে রাজ্যের মর্যাদা দান সহ নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতাবাদের ভূত তাদের মাথা থেকে যায়নি, কেননা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহা রয়েছে বোধহয় তাদের রক্তে। বাকি রাজ্যগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এসেছে কখনো বাস্তব, কখনো কল্পিত বঞ্চনাবোধ থেকে। তবে একথাও সত্য যে, আজকাল যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা বাড়ছে, সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী ভেদ-বুদ্ধি সক্রিয় হচ্ছে তার পেছনে জাতীয় স্তরের এবং আঞ্চলিক দলীয় নেতাদের উস্কানী রয়েছে নির্বাচনের ভোট-ব্যাঙ্ককে নিশ্চিত করার আশায়।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলি এই আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ বন্ধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

(১) অঞ্চলের লোকদের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য বড় রাজ্য ভেঙে ছোট রাজ্য তৈরী ভাষার ভিত্তিতে। (২) আঞ্চলিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বড় রাজ্যের অংশবিশেষকে নিয়ে এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলি ধরে রাজ্যের মর্যাদা-দান। (৩) আবার সেই আঞ্চলিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সংগে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের চুক্তি (Accord) করা কতগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার শর্তে। (৪) ঐ একই কারণে রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বসে Autonomous Council গঠন করা। North-East Hill Council থেকে শুরু করে সারা ভারতে এ পর্যন্ত ছোট-বড় অন্তত কুড়িটি Autonomous এবং Development Council গঠিত হয়েছে। আরও দাবি জমে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ফাইলে। একমাত্র কাশ্মীরেই তিনটি Council দাবি আছে—লাদাকে, জম্মুতে এবং অনন্তনাগে। (৫) ভারতের চার প্রান্তে চারটি Zonal Cultural Centre প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করে। (৬) রেডিও, টিভি ও লিখিত জনপ্রচার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় সংহতির অপরিহার্যতা সম্পর্কে অবিরাম প্রচারকার্য চলছে। (৭) আঞ্চলিক সম্পদের বৃদ্ধি ও বণ্টনে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দুর্বল রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারের অর্থবণ্টনে অনেকটাই মুক্তহস্ত হয়েছে সরকার (৮) পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় শক্তি রক্ষার চেষ্টা (৯) National Inte-gration Council তৈরী করে জাতীয় সংহতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশ করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

উপরের কোন ব্যবস্থাই যে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার আশাপ্রদ ফল দেবে না একথা এখন আর অস্পষ্ট নেই। তাই অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। এখন একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হল রাজনৈতিক রাজ্য বিন্যাসের আমূল পরিবর্তন—Federation আর নয়, Confederation-র কথা ভাবতে হবে—একগুচ্ছ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত সংগঠন। নানা পন্থার।

কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সমীর সেনগুপ্ত

'কৃত্তিবাস' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ ১৩৬০, অর্থাৎ জুলাই-অগস্ট ১৯৫৩। দ্বিতীয় সংকলন বেরোয় হেমন্ত ১৩৬০, তৃতীয় সংকলনের তারিখ ১৩৬১, চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম সংকলনের তারিখ ১৩৬১।

শক্তির লেখা প্রথম পাচ্ছি ষষ্ঠ সংকলনে, ১৩৬২। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বর্গী এলো দেশে' নামক ছড়াসংগ্রহের আলোচনা, লেখকের নাম স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার। আমরা জানি এটি শক্তির ছদ্মনাম, এ-নামে তখন তিনি নানা পত্রিকায় গদ্য লেখেন। এখানে বানানটি অবশ্য ছাপা হয়েছে 'স্ফুলিংগ'।

কেমন গদ্য লিখতেন শক্তি তখন? লেখাটির কিছু অংশ এইরকম:

"...আধুনিক জীবনের শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা, মানুষের প্রতি হীন অপমান, জীবনের দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়, গলিত ধিক্কৃত জীবনব্যবস্থা—তারপর সেই শোষণের জগৎকে ভেঙে, গুঁড়িয়ে, বর্গীদের তাড়িয়ে নতুন করে বাঁচা—এই সমস্তই ছড়াগুলির বিশেষত্ব। আমি উদাহরণ দিয়ে সেই বিশেষত্বগুলি দেখানর পক্ষপাতী নই। উৎসাহী পাঠক বইখানি অবশ্য পড়বেন—আমার ধারণা।

"জীবনের আধুনিক যান্ত্রিকতা, সমাজব্যবস্থার যে প্রাণহীনতা সেগুলি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ—কিন্তু সেই ব্যঙ্গের সঙ্গে অন্তরশায়ী এক সুগভীর বেদনাবোধ রয়েছে। সেইজন্যে ভালো লাগলো আরো বেশি। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা বোধ থেকেই এই কাব্যের উৎসারণ—এই কবির কাছে তাই পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট কাব্য আশা করছি।"

মনোযোগী পাঠক এই অনুচ্ছেদ দুটিতে অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ করবেন। আমি কেবল একটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল "জীবনের দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়" বাক্যশটিতে পরিষ্কার রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার (তু : "সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি / দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়")।

'কৃত্তিবাস' সমগ্রতই বানান ও মুদ্রণের অস্থিরতায় সমাচ্ছন্ন, এই অনুচ্ছেদ-দুটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এখানে সেগুলোকে শোধন করে দেয়া হল, কারণ বারংবার শব্দের পাশে বন্ধনীর মধ্যে (যদ্দৃষ্ট) বা (sic) লিখলে পাঠকের ধৈর্যের উপর অত্যাচার করা হয়। বাস্তবিক, এমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা জুড়ে বাংলা ভাষার প্রতি এই অবহেলা বড় চোখে লাগে। বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় শক্তির একটি শব্দ বুঝতে না পেরে ভুল ছেপেছিলেন, সেটি ইতিহাস হয়ে

আছে। 'কবিতা' যাঁদের দেখবার সুযোগ হয়নি, তাঁরা 'হাওয়া ৪৯' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৯৯ সংখ্যায় শান্তি লাহিড়ীর 'অনুস্মৃতি'তে 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা পুনর্মুদ্রণ করতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়ে নেবেন। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে অন্তত, 'কবিতা'র সঙ্গে 'কৃত্তিবাসে'র কোনো তুলনা চলে না।

কৃত্তিবাস সপ্তম সংখ্যা বেরোল ১৩৬৩ বৈশাখে। শক্তির প্রথম কবিতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল: 'সুবর্ণরেখার জন্ম'। কেন যে শক্তি কুড়ি বছর ধরে এ কবিতাটিকে কোনো গ্রন্থে স্থান দেননি সে এক রহস্য। কবিতাটি গ্রন্থিত হয় 'জলন্ত রুমাল'-এ, তার প্রকাশকাল মে / ১৯৭৫। এর অল্প আগেই, ১৩৬২ চৈত্র সংখ্যা 'কবিতা'য় তাঁর 'যম' প্রকাশিত হয়েছে, ফলে কবিকুলে দ্বিজ বলে গৃহীত হয়েছেন শক্তি। * এবং এই ব্যাপারটি—'কবিতা'য় লেখা ছাপা হওয়া—তাঁর আত্মবিশ্বাস কী পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছেন তা যে-কোনো পাঠক 'যম'-এর পাশে 'সুবর্ণরেখার জন্ম' রেখে পড়লেই বুঝতে পারবেন। 'যম' একটি আড়ষ্ট পদ্য—খাঁটি অর্থেই পদ্য, শক্তির অর্থে নয়—বড় গুণে গুণে অক্ষর মেলানো, মৃত শব্দে গিজগিজ

---

* কৃত্তিবাসের কয়েকজন নিয়মিত লেখকের 'কবিতা'য় প্রকাশিত 'কবিতা'য় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার কবিতার মোট সংখ্যা তারিখ / কবিতার নাম

আষাঢ়	১৩৫৫ : অরবিন্দ গুহ ॥ "অনামী" ও "তোমাকে"	১১
চৈত্র	১৩৫৬ : শঙ্খ ঘোষ ॥ "পাথেয়"	১
আশ্বিন	১৩৫৮ : আনন্দ বাগচী ॥ "বাক্‌দান" ও "শনিবারের ডায়েরী"	৭
পৌষ	১৩৫৯ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ "নাম খোদাই"	২১
আশ্বিন	১৩৬০ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ "প্রেমের কবিতা"	৯
আষাঢ়	১৩৬১ : আলোক সরকার ॥ "আপনার সুর"	৫
পৌষ	১৩৬২ : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ॥ "চেনা পাখী"	৯
চৈত্র	১৩৬২ : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥ "যম"	১৫
ঐ	: শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ "মধুর বিস্মৃতি" ['নমিতা মুখোপাধ্যায়' ছদ্মনামে]	৮
আষাঢ়	১৩৬৩ : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ "ভিলানেল"	১
আশ্বিন-পৌষ	১৩৬৪ : তন্ময় দত্ত ॥ "বাসর"	২
ঐ	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ "তিন শূন্য"	১২
পৌষ	১৩৬৫ : তারাপদ রায় ॥ "দুটি অপ্রাকৃত কবিতা"	১১
আষাঢ়	১৩৬৬ : দীপক মজুমদার ॥ "সমর্পণ অনুক্ত এখনো"	১

উৎস : 'কবিতা পত্রিকা : সূচিগত ইতিহাস'। প্রভাতকুমার দাস

করা একটি শিক্ষানবিশি রচনা। "স্বর অনুত্তম"-এর সঙ্গে "জ'লে জ'লে সোম" মিলটি ছাড়া চোদ্দ মাত্রার চোদ্দ পঙ্‌ক্তির রচনাটিতে প্রশংসা করার মতো কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর 'সুবর্ণরেখার জন্ম' কবিতা হিশেবে কেমন তা কবিতাটি যিনি পড়েছেন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা বাহুল্য, এবং যিনি পড়েননি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। যেন তমসাচ্ছাদিত যজ্ঞবহ্নির ভিতর থেকে ধনুর্বাণ হাতে দিগ্বিজয়ী কিশোর উঠে এল। এ সম্পর্কে শক্তি নিজেও পরে লিখেছিল :

"...রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে হিসেব মিলিয়ে একটা সনেট খাড়া করি। পরের দিন সুনীলের বাসায় যাই। লেখাটা অতি সাধারণ 'যম', ওর কাছ থেকে 'কবিতা'র ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধদেবকে পাঠাই। উনি চিঠি দেন, সামান্য সংশোধন করে ছাপবেন। হাতে স্বর্গ পাই—কিংবা, মনের মধ্যে কী যেন এক অবাস্তব হাওয়া বাড়তে থাকে। প্রায় দৌড়ে সুনীলের কাছে গিয়ে চিঠিটা দেখাই এবং...দু-তিনটা টানা গদ্যে লেখা···'সুবর্ণরেখার জন্ম' আর 'জরাসন্ধ'।"

—ভূমিকা, কাব্যসংগ্রহ (১ম খণ্ড) : বিশ্ববাণী প্রকাশনী

স্বর্গই পেয়েছিলেন শক্তি—হাতে নয়, হৃদয়ে। উল্লেখ্য, 'জরাসন্ধ'ও প্রথম বেরোয় 'কবিতা'য়*—এর সাত মাস পরে, পৌষ ১৩৬৩ সংখ্যায়।

কবিতাটি ছাড়া আরো একবার শক্তির নামের উল্লেখ পাচ্ছি কৃত্তিবাসের এই সংখ্যায়—সেটি কৃত্তিবাস গল্পসংকলনের বিজ্ঞাপনে :

"...কৃত্তিবাস গল্পসংকলন বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের চমক না আনলেও একটি বলিষ্ঠ অধ্যায়ের সংযোজনা করবে।
৬৪ পৃষ্ঠার বই—দাম আট আনা
বাংলাদেশের সমস্ত তরুণ লেখকদের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে।
সম্পাদক—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সংকলনটি প্রকাশিত হলে অবশ্য দেখা গেল, সম্পাদক হিশেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরই নাম রয়েছে।

অষ্টম সংকলনের সূচিপৃষ্ঠায় তারিখ দেয়া রয়েছে ২৫ বৈশাখ ১৩৬৪—চতুর্থ প্রচ্ছদে ছাপা রয়েছে ১৮৬৯ শকাব্দ। হঠাৎ শকাব্দ কেন বোঝা যায় না—বিশেষ করে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ যখন ১৮৬৯ শকাব্দ ছিল না, ১৮৭৯ শকাব্দ ছিল। এই সংখ্যাতেও শক্তির একটি কবিতা রয়েছে, 'যমজ' ("প্রাচীন কবির মতো সেই ভগ্ন...")। এ লেখাটি শক্তি নিজে কোনো গ্রন্থে স্থান দেননি, এটি ছাপা হয়েছে

* একটি ধারণা চলিত আছে—এমনকি সুমিতা চক্রবর্তীও লিখেছেন—যে 'যম'কে প্রথম ধরলে 'জরাসন্ধ' শক্তির দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা, এবং 'সুবর্ণরেখার জন্ম' তৃতীয়। কিন্তু শক্তির নিজের লেখায় 'সুবর্ণরেখার জন্ম'ই আগে উল্লেখিত হয়েছে, এবং সেটির প্রকাশকালও অনেক পূর্বে।

'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' সংকলনে (জানুয়ারি ১৯৯০)।

নবম সংকলনেও (আশ্বিন ১৮৭৯ শকাব্দ, সেপ্টে-অক্টো ১৯৫৭) শক্তির একটি কবিতা পাচ্ছি, 'তির্যক' ("কব্জির মাথায় একটি ঝিঁঝি বসে···")। এটি অবশ্য যথাপ্রত্যাশিতভাবে 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দশম সংকলন, বৈশাখ ১৩৬৫। শক্তি এখন কৃত্তিবাসের অপরিহার্য কবি হয়ে উঠেছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো সংখ্যা বেরোতে পারে এরকম আর ভাবা যাচ্ছে না। এ সংখ্যায় তাঁর তিনটি কবিতা বেরিয়েছে :

ঝর্ণা (সারঙ্গ, যদি ঝর্ণা ফোটাই···) হে প্রেম...দ্র.
কারনেশন ১ (প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত···) ঐ
কারনেশন ২ (হাওয়া খোলে মাটি, নীহার অরব...) ঐ

যাকে আমরা 'কৃত্তিবাস গোষ্ঠী' বলে ভাবতে অভ্যস্ত, সেই ধারণাটি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে-ধীরে। এটি একটি স্ববিরোধময় ধারণা—এর বর্ণনা হয়ত করা যায় খানিকটা, কিন্তু সংজ্ঞা দেয়া যায় না। যেমন, কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যা থেকে নিয়মিত লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটিই তাঁর। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও প্রথম সংখ্যা থেকে নিয়মিত লিখেছেন, অরবিন্দ গুহও তাই। কিন্তু 'কৃত্তিবাস গোষ্ঠী' নামক ধারণার মধ্যে এঁদের নাম যুক্ত করলে এঁরা যতটা বিস্মিত হবেন, আধুনিক কবিতার নিয়মিত পাঠকও হয়ত ততটাই। আবার, সপ্তম সংকলন থেকে কৃত্তিবাসে লিখতে শুরু করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়, অষ্টম সংকলন থেকে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তন্ময় দত্ত ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। এঁরা যতখানি কৃত্তিবাসের সৃষ্টি, কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর ধারণাও তত-খানিই এঁদের নির্মাণ, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। কৃত্তিবাস প্রকাশনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি' যাঁর রচনা সেই সমীর রায়-চৌধুরীর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল কৃত্তিবাসের ত্রয়োদশ সংকলনে। বেলাল চৌধুরীর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় বিংশ সংকলনে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর খ্যাতি বা অখ্যাতির যে মূল কারণগুলি—প্রচলবিরোধিতা, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা, ঐতিহ্যের নরম ও সহজ মাটিকে অবহেলা করে আধুনিক রাজনীতি ও সমাজের বিপর্যয়ের মধ্য থেকে কঠিনভাবে রস টেনে বাঁচার চেষ্টা করা, যেমনভাবে বাঁচে পুরোনো বাড়ির কার্নিশে, উদ্ভাত, উদ্ধত বটচারা—এবং নৈরাজ্যকে প্রতিফলিত করা শুধু কবিতায় নয়, নিজের জীবনেও—এই সমস্ত ধারণা পাঠকের মনে দৃঢ়মূল হতে হতে কৃত্তিবাসের আয়ুর অর্ধেকেরও অধিককাল ক্ষয়িত হয়ে গিয়েছিল।

একাদশ সংকলনের চতুর্থ প্রচ্ছদেও, খুবই সরলভাবে তারিখ দেয়া আছে—১৩৬৫। এ সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে, "কয়েকটি শীঘ্র প্রকাশিতব্য কাব্য-গ্রন্থ" এই শিরোনামের তলায় একটি নাম পাচ্ছি—"শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

'কেলাসিত স্ফটিক'"। প্রকাশক বা বিজ্ঞাপনদাতা বলে কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ নেই—ফলে, বোঝা যায় না এটি বিজ্ঞাপন, না কৃত্তিবাসেরই তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি। এখন আমরা জানি বইটি প্রকাশিত হতে আরো দু'বছর সময় লেগে যাবে, নামটিও বদলে গিয়ে হবে 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'।

এই গ্রন্থের প্রকাশক দেবকুমার বসুর স্মৃতিচারণ :

"…শক্তিকে বললাম, কী হল ভাই, প্রুফ দিচ্ছ না কেন ?

শক্তি কিছুক্ষণ হাসিমুখে চুপ করে থেকে বলল, নির্মলবাবুর প্রেসে দিয়ে এসেছি।

…বিকালের দিকে নির্মলবাবু এসে বেশ রাগতস্বরেই বললেন, এইভাবে প্রুফ দেখলে কী করে বই শেষ হবে ? আর আমিই বা কতবার কম্পোজ করব ? বইয়ের প্রায় অর্ধেক কবিতা বাদ দিয়ে কবি নতুন কবিতা দিয়েছেন কম্পোজ করার জন্যে। কী মুশকিল !

…আবার প্রুফ এল। আবারও কাটাকাটি। পুরাতন বাদ দিয়ে আবার নতুন নতুন কবিতা দেওয়া। নতুন সংযোজন। আবার শক্তির হারিয়ে যাওয়া। এই খেলা চলল…বই বার না হওয়া পর্যন্ত।

…দুলু একদিন এল। দুলু অর্থাৎ পৃথীশ গঙ্গোপাধ্যায়। পবিত্রদার ছেলে। শিল্পী, শক্তির বন্ধু এবং লক্ষ্মঝম্পর সহযোগী। বলল, দেবুদা, বইয়ের নাম তাহলে 'নিকষিত হেম'ই থাকছে ত ?

আমি বললাম, টাইটেল ত তাই করতে দিয়েছি। কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে ?

—না, তা নয়—বলে চলে গেল। একদিন পর দুলু মলাট দিয়ে গেল 'নিকষিত হেম'। শক্তির প্রথম কবিতার বইয়ের মলাট। মলাটের রঙটা একটু চড়া ছিল। বড় দেবুদা [চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়] বললেন এতটা চড়া রঙ না হলেই হত। দুলু চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পর শক্তি হাজির। বই সম্পর্কে দুয়েকটা কথা বলার পর একটু সংকোচের সঙ্গে বলল—দেবুদা, বইটার নাম পালটে 'কেলাসিত স্ফটিক' করতে চাই। আপনার কি আপত্তি হবে ?

বললাম—টাইটেল তৈরি। দুলুও আজ মলাটের ডিজাইন দিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তুমি যা বলবে তাই হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল শক্তি—দুলুকে ম্যানেজ করে নেব। বাকিটা আপনার। আপনি রাজি থাকলেই হবে। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম। এ ছাড়া উপায় বা কী ?

দিন সাতেক পর পৃথীশ মলাটের ব্লক তৈরি করিয়ে নিয়ে হাজির। 'কেলাসিত স্ফটিক'।…শক্তি এসে আবার নাম বদলের আর্জি জানাল।

তাও মঞ্জুর করে টাইটেল নতুন করে তৈরি হল। শক্তিকে বললাম, এবার

তোমাকে না দেখিয়েই বই শেষ করব। আমার কথায় সহাস্য স্বীকৃতি জানিয়ে শক্তি চলে গেল।

…কিন্তু এবার দুলুর পাত্তা নেই। সর্বদা ভয়—এই বুঝি শক্তি এসে আবার নাম পাল্টায়।

অবশেষে ধরা পড়ল পৃথীশ। নতুন নামের মলাটের ডিজাইন ও ব্লক তৈরি হল—'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'। প্রকাশিত হল শক্তির প্রথম কবিতার বই। শক্তির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।"

—সাহিত্যসেতু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা ॥ ১৬ই জুলাই ১৯৯৫

আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি তৈরির গ্রহণ-বর্জনের ইতিহাসটি। কিন্তু তা জানার বোধহয় কোনো উপায় নেই।

এই সংখ্যায় শক্তির কবিতা 'প্রতিধ্বনি, প্রতিবিম্ব' ("তা পারে দেবতা শিলা নক্ষত্র…")। এটি এখনো কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

দ্বাদশ সংকলনে (১৩৬৬) তিনটি কবিতা।

'পাবো প্রেম কান পেতে রেখে' ("বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে বসে আছো…")। হে প্রেম…দ্র.।

'উৎকণ্ঠা' ("তমসাদীর কূলে কাজ ভুলে…")। কোনো বইতে নেই।

'কোরক' ("অব্যর্থ কোরকে লিপ্সা, যার মুখ…")। কোনো বইতে নেই।

ত্রয়োদশ সংকলনে (১৩৬৭) শক্তির একটি কবিতা,

'সেনেট ১৯৬০' ("তোমাদের শেষ নেই, যবে শুরু…")। হে প্রেম…এর অন্তর্ভুক্ত।

এই সংখ্যার শেষদিকে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় রয়েছে, আধকলম×২ ইঞ্চি :

"সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য
কাব্যগ্রন্থ অচিরকালের মধ্যে প্রকাশিত হবে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য"

এখানে অবশ্য প্রকাশক হিশেবে গ্রন্থজগৎ-এর নাম রয়েছে। এবং এ-সংখ্যায় আরো এক জায়গায় শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। চতুর্থ প্রচ্ছদের নিচের দিকে :

"সম্পাদক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই সংখ্যার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ সাহায্য করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়"।

বাক্যটি পড়ে কৌতূহল হয়, জানতে ইচ্ছে করে "সম্পূর্ণ সাহায্য" মানে কী ? তাঁকে 'সহসম্পাদক' বা 'সহযোগী সম্পাদক' জাতীয় কোনো আখ্যা দেয়া হয়নি—আগেকার অন্যান্য সংখ্যায় অন্যান্যদের সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে।

চতুর্দশ সংখ্যা (১৩৬৭) 'সনেট সংখ্যা' আখ্যাত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ-সংখ্যায় শক্তির কবিতা 'সাতটি রুপোলি মাছ' ("সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়…")।

চতুর্দশপদী কবিতাবলির ৭১ সংখ্যক কবিতা এটি।

এই সংখ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাচ্ছি, বহু প্রতীক্ষিত সেই বিজ্ঞাপনটি—যদিও এখনো সেই আধকলম×২ ইঞ্চি।

"হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই স্বতন্ত্র, তীব্র
স্বাদের কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হল।"

এটিকে বিজ্ঞাপন না বলে কৃত্তিবাসের পক্ষ থেকে ঘোষণা বলে ধরা সংগত বলে মনে হয় কারণ বক্সের মধ্যে এটুকুই শুধু বলা হয়েছে, প্রকাশকের নাম নেই। এবং সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ সম্পূর্ণ ফাঁকা—চতুর্থ প্রচ্ছদে কৃত্তিবাস প্রকাশনীর বই, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকার বারান্দা'র পৃষ্ঠাজোড়া বিজ্ঞাপন। অবাক লাগে এই ভেবে, ফাঁকা যাওয়া সত্ত্বেও এই বিজ্ঞপ্তিটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রচ্ছদে দেয়া হল না কেন? কে জানে!

পঞ্চদশ সংকলনেও (১৩৬৮) শক্তির তিনটি সনেট প্রকাশিত হয়েছে, 'জাহাজ' ১, ২, ৩—

জাহাজ ১ ("তোমার সংকেত শুধু তুমি জানো···")। চতুর্দশপদী কবিতাবলি, ৪৭ নং।

জাহাজ ২ ("লাবণ্যে কে পর্যুদস্ত নয়?···")। কোনো বইতে নেই।

জাহাজ ৩ ("জাহাজ রপ্তানি করে···")। চতুর্দশপদী কবিতাবলি, ৪৬ নং।

কৃত্তিবাস, "১৬শ সংকলন ১৩৬৯ চৈত্র"। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ-এর পর হঠাৎ মফস্‌সলি "১৬শ" হবার কারণ বোঝা যায় না। এ-সংখ্যায় শক্তির সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

'বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে' ("বহুদিন বেদনায় বহুদিন...")। হেমন্তের অরণ্যে...দ্র।

'আমিনের ঘর' ("আমাদেরও শরীরের আস্ফালন···")। চতুর্দশপদী কবিতাবলি, ১৯নং দ্র।

'গোলাপ' ("গোলাপ ফুটেছিলো, গোলাপ ঝ'রে গেছে...")। কোনো গ্রন্থে নেই।

'চাবি'।"আমার কাছে এখনো পড়ে আছে...") ধর্মে আছো...দ্র।

'পাগল' ("পাগল তোমার আগল যখন খোলা···") সুখে আছি দ্র।

'অবাস্তব মার্চ মাস' ("১৯৬৩, মার্চ, গ্রীষ্মকাল, পতনবিমুখ...")। সুখে আছি দ্র।

'নূতন মারবেল তুমি' ("অবাধ জ্যোৎস্নার মাঝে...")। সুখে আছি দ্র।

দেখা যাচ্ছে, সবকটি কবিতা গ্রন্থভুক্ত হতে বারো বছর সময় লেগেছে—'সুখে আছি'র প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪। বাস্তবিক, শক্তির গ্রন্থগুলি পরপর পাঠ করে গেলে কবিতায় অভ্যস্ত পাঠকের সহজেই প্রতীতি হবে যে কবিতা সাজানোয় কালক্রমের প্রতি কোনোরূপ মনোযোগ দেয়া হয়নি—খানিকটা যেন ইচ্ছাকৃত-ভাবেই। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির কালক্রম, পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের তারিখ থেকে নির্ধারিত করে সেইভাবে কবিতাগুলি বিন্যস্ত করতে পারলে, খুবই সম্ভব যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামক কবির সম্পূর্ণ নতুন এক পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে।

সপ্তদশ সংকলনে (আশ্বিন ১৩৭০: তার মানে, শারদীয় সংখ্যা) শক্তির কোনো কবিতা নেই। কৃত্তিবাসে তিনি লিখতে আরম্ভ করার পর আট বছরে এই প্রথম সংখ্যা যেখানে শক্তি অনুপস্থিত। অথচ আমরা জানি এই সময় তিনি সব্যসাচীর মতো দুহাতে লিখে যাচ্ছেন, তাঁর বহুপ্রসূ ছয়ের দশকের আরম্ভকাল এটি। এই সংখ্যার তৃতীয় প্রচ্ছদে শারদীয়া 'চতুষ্পর্ণী'র বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, শক্তি সেখানে প্রবন্ধ লিখছেন।

অষ্টাদশ সংকলন, মাঘ ১৩৭০। রাইটার্স ওয়ার্কশপের আমন্ত্রণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকায়, পরপর দুটি সংখ্যার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। চতুর্থ প্রচ্ছদে পত্রিকার তারিখ February 1964, পত্রিকা-বিষয়ক অন্যান্য জ্ঞাতব্যও (সম্পাদকের নাম ইত্যাদি) ইংরেজি হরফে। শক্তির দীর্ঘ কবিতা: 'পুনর্বিবেচনা' ("তুমি কেন যথেচ্ছাচারের কাছে···")। সোনার মাছি···র অন্তর্ভুক্ত।

ঊনবিংশ সংকলন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১, চতুর্থ প্রচ্ছদে May 1964।

শক্তির দুটি কবিতা এই সংখ্যায়—

'ধর্ম' ("পুবের বাতাসে নড়ে ধর্মের কল···")। ধর্মে আছো···দ্র।

'অধর্ম' ("ভালোবাসা, আমি অযোগ্য তার কানে···")। ঐ

দেখা যাচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত কবিতা গেছে ষষ্ঠ বইতে (সোনার মাছি..জুলাই ১৯৬৭), কিন্তু মে মাসে প্রকাশিত কবিতা দ্বিতীয় বইতে (ধর্মে আছো..অক্টোবর ১৯৬৫)।

বিংশ সংকলন (১৯৬৫)। শক্তির কোনো লেখা নেই।

"একুশ নম্বর সংকলন: ১৯৬৫": এতেও শক্তির কোনো রচনা নেই। পত্রিকার প্রারম্ভে "এই সংখ্যার লেখক" শিরোনামে একটি লেখক পরিচিতি আছে, যা আগের বা পরের আর কোনো সংখ্যায় নেই। এর কারণ হয়ত এই যে এই সংখ্যার লেখকদের মধ্যে রয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও কমলকুমার মজুমদার। এই পরিচিতির শেষাংশে, বক্সের মধ্যে মুদ্রিত দেখা যায়:

"শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমীর রায়চৌধুরী আমাদের অজ্ঞাত কোনো কারণে, কৃত্তিবাসের সঙ্গে আর সহযোগিতা করতে চাইছেন না।"

"২২ নম্বর সংকলন ১৯৬৬": আগের সংখ্যার ঘোষণার প্রতিবাদ হিশেবেই

কিনা, নাকি কৈফিয়ৎ হিশেবে, পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে শক্তির তিনটি কবিতা এই সংখ্যায় :

'সে বড়ো সুখের সময় নয়…' ("পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে…")।
সোনার মাছি…দ্র।

'একদা এবং আমি' ("সমুদ্রতীরে পৌঁছেই…")। ঐ

'মুঠোভরা রঙ বেরঙ টিকিট' ("অনেকদিন কোনো সেতুর·· ")। পাড়ের কাঁথা…দ্র।

'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' বেরিয়েছিল নভেম্বর ১৯৭১—বারো বছর বাদে।

"২৩ সংকলন। শরৎকাল ১৩৭৩"। এ-সংখ্যায় শক্তির চারটি কবিতা দুভাগে ভাগ করা। শক্তি এবং কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর প্রিয় বন্ধু তন্ময় দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি অনাময় দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের সঙ্গে প্রথমটি, 'অনাময়ের উদ্দেশ্যে' ("দরজা বন্ধ থাকলে তোমাকে ডাকতে পারতুম…"), পরে 'পাড়ের কাঁথা'…য় প্রকাশিত হয়। পরে, কবিতার অংশে 'যৌন ছড়া' নামে তিনটি কবিতা।

ডোঙায় চড়বো—তুমি আমার…
বুকজলে তুই কী সুখ পাবি…
ঐ লিচু ঝুলছিলো ডালে…

তিনটি কবিতাই 'ঈশ্বর থাকেন জলে' গ্রন্থে মুদ্রিত। প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৫। ন'বছর পর।

এই সংখ্যায় শান্তিকুমার ঘোষের কবিতা-বিষয়ক পত্রপ্রবন্ধে শক্তির কবিতা-বিষয়ক আদ্যপৃষ্ঠার আলোচনা। শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক' নামক পত্রাকার প্রবন্ধে শক্তির ছন্দ ও আবৃত্তির আলোচনা। জ্যোতির্ময় ঘোষের 'কয়েকজন সাম্প্রতিক কবি' নামক প্রবন্ধে তিনি শক্তির কবিতার আলোচনা করবেন বলে জানান, কিন্তু প্রবন্ধটি মধ্যপথে শেষ হয়ে যায়, "পরবর্তী পর্যায়" আর প্রকাশিত হয়নি।

"২৪নং সংকলন ১৯৬৭" : প্রথম পর্যায়ের কৃত্তিবাসের এই শেষ সংখ্যায় শক্তির কবিতা :

'পোকায় কাটা কাগজপত্র' ("পোকায় কাটা কাগজপত্র…")। পাড়ের কাঁথা…দ্র।

১৪ বছরে (১৯৫৩-১৯৬৭) ২৪টি সংখ্যা বেরিয়েছিল কৃত্তিবাসের। আসলে ২৩টি, কারণ 'চতুর্থ-পঞ্চম' আখ্যাত যুগ্ম সংকলনটিকে পৃষ্ঠাসংখ্যা বা অন্য কোনো লক্ষণেই যুগ্ম বলা যায় না। এর ১৬টি সংখ্যায় আমরা শক্তির রচনা পাচ্ছি। গদ্যের সংখ্যা ১, কবিতার সংখ্যা ৩১। শক্তির গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ৩, শক্তি-বিষয়ক বিবিধ বিজ্ঞপ্তি ৩, অপরের লেখা প্রবন্ধে শক্তির উল্লেখ ৪। ৩১টি কবিতার মধ্যে পাঁচটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

পরিশিষ্ট

কৃত্তিবাসের কয়েকজন নিয়মিত লেখকের প্রথম কবিতা কৃত্তিবাসে প্রকাশিত হবার তারিখ		কবিতার নাম	কৃত্তিবাসে প্রকাশিত কবিতার মোট সংখ্যা
প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬০	শঙ্খ ঘোষ	'দিনগুলি রাতগুলি'	৩৭
	আলোক সরকার	'ছায়ারঙ্গ' ও 'অপবর্গ'	২৩
	অরবিন্দ গুহ	'অমৃতাক্ষরা'	৩০
	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	'অবিনশ্বর'	৩৮
	আনন্দ বাগচী	'একটি ব্যক্তিগত পত্র'	১৩
	দীপক মজুমদার	'বীর্যশুল্কা' ও 'এক সূর্য'	২৮
	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	'নীলীরাগ'	৩৮
দ্বিতীয় সংকলন, হেমন্ত ১৩৬০	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	'জাতিস্মরের গান'	২৬
	মানস রায়চৌধুরী	'ডায়েরির পাতা থেকে'	৫
	উৎপলকুমার বসু	'প্রান্তরের পাখি'	৩০
	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	'সপ্তক'	২৮
	শংকর চট্টোপাধ্যায়	'পঞ্চরঙ্গ'	৪৪
সপ্তম সংকলন ১৩৬৩	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	'সুবর্ণরেখার জন্ম'	৩১
	তারাপদ রায়	'বসন্ত'	৫৪
অষ্টম সংকলন ২৫ বৈশাখ ১৩৬৪	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	'চিত্র'	৩০
	তন্ময় দত্ত	'যন্ত্রণা'	৯
	শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	'হাসপাতালে'	৩০
ত্রয়োদশ সংকলন, ১৩৬৭	সমীর রায়চৌধুরী	'একচক্ষু হরিণ'	২১
বিংশ সংকলন, ১৯৬৫ (খৃ.)	বেলাল চৌধুরী	'অনশনের দীর্ঘ দিন'	৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রথম পর্যায় কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ নথি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন তারাপদ আচার্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি অগ্রন্থিত কবিতা

[প্রথম পর্যায় কৃত্তিবাসে প্রকাশিত একত্রিশটি কবিতার মধ্যে এই পাঁচটি কবিতা শক্তির কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে গিয়ে আমরা শক্তির তৎকালীন বানানপদ্ধতি অপরিবর্তিত রেখেছি—কেবল একটি শব্দ, যা স্পষ্টতই মুদ্রণপ্রমাদ, সংশোধন করে দেয়া হল। এগুলিকে অগ্রন্থিত বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন সমীর সেনগুপ্ত। —সম্পাদক, বিভাব]

প্রতিধ্বনি, প্রতিবিম্ব

তা পারে দেবতা শিলা নক্ষত্র নীলিমা অরুন্ধতী
প্রবাল পাথর পারে নির্মম মৌনের পঙ্‌ক্তিশোভা
জগন্ময় হে বিরহ, দুঃস্থ হরিদ্রাভ ম্লানে ফেলে
ওরা তুষ্ট, মৃত থাকে, অকম্পিত, দুর্গম, বাধির।
পারো প্রেম এই শিল্প ? নতুবা সামান্য তাৎক্ষণিক
মৃত্যুশীল হ্রস্ব কেন চিরকাল মুগ্ধ রবে, নরে
ভজে শূন্য করগ্রাস, ক্লান্ত প্রৌঢ় প্রকৃতিস্থ নয়
কুড়ালে অরণ্যে ছিল শুষ্কপাতা, ঝরাফুল, ছায়া···

দুর্গমতা দিব্য, তবে ভালোবাসা পাতালসৈকতে
স্বচ্ছ পাপ রক্তপাত শয়তান সে স্বচ্ছতম তাঁত
নারকীয় ব্যাধিকুণ্ডে সব বন্ধুমাত্র আত্মীয়তা
কী গভীর উচ্ছ্বসিত সফেন স্বপ্নের মত ভাসে
মুণ্ড, ধড়, সিক্ত চোখ, বুঝিনা গরল কার নাম
বাঁচি বা অমৃতে বাঁচি যাই হোক, করো প্রতিধ্বনি
শোকার্তে জানাও আছো সহমর্মী ব্যথায় বিধুর
শয়তান শয়তান প্রেম তুমি প্রেম অমোন আমার
না দেবতা শিলা তারা নীলিমা নির্মম···সুদূরতা···
প্রতিধ্বনি, প্রতিবিম্ব কে আছো সুদীর্ঘ নেত্রপাতে ?

কৃত্তিবাস ॥ একাদশ সংকলন, ১৩৬৫

কোরক

অব্যর্থ কোরকে লিপ্সা, যার মুখ মেলে না সন্ধ্যায়
শিল্পের অতীত ক্ষয়ে, অনুরাগে সমবেদ্য রসে ;
যারে ভালোবাসে তারে দেখি ব'লে তোলে না নয়ান
ভবিষ্যের ভারহীন, মগ্নতায় অন্ধ, বিনা প্রেমে।
দিন ব'সে রুক্ষতায়, পাতাগুলি বাসনাবিন্যাসে
অগ্রজ ফুলের কীর্তি বুকে ক'রে ম্লানতম হয়।
সুগমতা, হৃদয়ের কোন্ রাজ্যে শূন্য, মুক্ত, স্বেদ ;
ঝরে যাই হে কোরক, তুমি স্বপ্ন অমোঘ গর্ভের
অজাত, নীলিমালিপ্ত ; ব্যর্থতায়, গৌরবে বান্ধব
আমার পুরানো তুমি ; স্থৈরতায় আমারো আদিম,
স্বার্থে, অহঙ্কারে, বক্ষে, সমভোগী, ম্লান রাজসিক,
পাথেয়, পার্শ্বের স্তূপ, পাণ্ডুরতা, পারায় মহান
উজ্জ্বল ব্যাধিতে সব। গণিকার ওষ্ঠের প্রয়াণে
সম্ভাবনাহীন সন্ধ্যা ; মিলনের সন্তাপ, জন্মের
যেন মাতা নাই কোনো, অথবা কলঙ্কভয়ে দূরে
প্রশংসার সূত্রহীন। হে আমার অব্যর্থ কোরক,

কোনোদিন সন্ধ্যায়, সকালে, কালে বালিকা
লবে না ভ্রমে মাথে,
বিকশিত ফুলে পূর্ণ তুমি শিল্প, অশুদ্ধ নিষেধ।

কৃত্তিবাস ॥ দ্বাদশ সংকলন, ১৩৬৬

উৎকণ্ঠা

তমসা নদীর কূলে কাজ ভুলে শুয়ে থাকো কবি
উঠো না, ও ডাক দিয়ে কোনোদিন ফিরে চলে যাবে।
ঘুমাবে না কেন তুমি, সাড়া দিতে কাঁপিবে সংশয় ?
সে এক অভ্রান্ত ডাক ফিরে ফিরে তোমায় জাগাবে।

আরো তো নদীর কূলে বনানীর শ্যামল প্রতিমা
আজন্ম শুইয়া আছে, পাছে তার স্বপ্ন টুটে যায়…
দূরের দিগন্ত হ'তে মেঘ সরে ময়ূরের মতো,
ও-রাঙা বিভ্রান্ত শৃঙ্গ আজো তব মৃত্যুরে জাগায় ?

চিরদিন জেগে রবে কাজ ভুলে, চুল খুলে যেন
তোমার তমসা করে মুহুর্মুহু বাদলবিস্তার
কর্ণ, কণ্ঠ ভ'রে দেয় লবণে, সৈন্ধব—সর্বনাশে
ঘুরে ঘুরে ওর ডাক মুছে যায়, সুন্দরতমার।

কৃত্তিবাস ॥ দ্বাদশ সংকলন, ১৩৬৬

জাহাজ : ২

লাবণ্যে কে পর্যুদস্ত নয় ? তুমি বলো তার কথা—
বলো না আবার, আমি শুনে শুনে করি অধিগত।
সত্যরে দুহাত ভরে নিতে যেন হই না বিমুখ,
হে ভ্রাম্যমানিনী, তুমি কাল কালান্তরের বারতা।
হে ভ্রাম্যমানিনী, তুলি বলে যাও লাবণ্য নিহত—
যেখানে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভেঙ্গে আছে কালের কলস ;
বিদেশের মালপত্রে লেগে যায় দেশি পদচ্ছাপ,
হে ভ্রাম্যমানিনী, তুমি এখনো কি নও পরবশ ?

উদ্ধার আমারও চাই, চাই-ই ; আমি উদ্ধার বিলাসী
নতুবা, দ্বিরুক্তিহীন বন্ধনে আবদ্ধ করযোড়ে
ডুবতাম। লাবণ্য তুমি আজো করো পর্যুদস্ত মুখ,
কে আর মুখের চেয়ে বেশি রূপ হৃদয়ে রেখেছে ?
কে আর লাবণ্য অয়ি ? অভিমান-আহত মকরে
পায় উনপঞ্চাশৎ মণিমরকত-তমোচ্ছটা ?

কৃত্তিবাস ॥ পঞ্চদশ সংকলন, ১৩৬৮

গোলাপ

গোলাপ ফুটেছিলো, গোলাপ ঝরে গেছে।
দীর্ঘদিন আমি তোমারে দেখি নাই,
নূতন জামা তুমি কেবল ভালোবাসো—
তোমার ভালোলাগা আমারও ভালো লাগে।

গোলাপ ফুটেছিলো, গোলাপ ঝরে গেছে।
অমন কতো ফুল ফোটে ও ঝরে যায়—
কে তার খোঁজ রাখে ? হিসাবে বাধা কতো !
গোলাপ ফুটেছিলো, গোলাপ ঝরে গেছে।

কৃত্তিবাস ॥ ষোড়শ সংকলন, ১৩৬৯ চৈত্র

[চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দটি 'তোমরা' ছাপা হয়েছিল—যা স্পষ্টতই মুদ্রণপ্রমাদ। এটি শোধন করে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ।]

আলোক সরকারের কবিতা

অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

পাঁচটি কবিতা। মাত্রই পাঁচটি কবিতা? যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। এত কিছু ভরা আছে এই পাঁচটি কবিতার সাকুল্যে!

ধরা যাক্ এমন কোন পাঠক কোথাও আছেন, যিনি জানেনই না যে আলোক সরকার নামে কবি আছেন কেউ বাঙলা ভাষায়, অথচ, কবিতা পড়ে, প্রকৃত কবিতা পড়ে সাড়া দেবার মত সংবেদনশীলতা যাঁর আছে। ধরা যাক্ এই পাঁচটি কবিতা সহসা পড়লেন তিনি 'বিভাব' নামক পত্রিকাটির পাতা উল্টে। কী প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর?

ঈর্ষা, ঈর্ষা করি সেই কাল্পনিক পাঠককে। বিশেষ করে তিনি যদি হন কবিতার ধ্রুপদী জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কেউ। যদি হন সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার, অর্থাৎ গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের বাঙলা কবিতাআবহের মধ্যে নিমজ্জিত কেউ। কত বড় একটা জগৎ যে খুলে যাবে তাহ'লে তাঁর জন্যে! উঃ, কত বড় একটা জগৎ!

অনেকে ভাববেন, ঈশ্বরপ্রাণতার কথা উঠেছে এখানে। হ্যাঁ, সে কথা তো উঠছেই, কিন্তু কথা কেবল সেইটুকুই নয়। ঈশ্বরপ্রাণ কবিতার ধারা, বাঙলা কবিতার সৌভাগ্য, যে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের শত কোলাহলেও, কোনদিন চাপা পড়েনি একেবারে। অলোকরঞ্জন আছেন, সুধেন্দু মল্লিক আছেন, আছেন আরও শত ছেলে, কিন্তু কবি আলোক সরকারের সিদ্ধি অন্যত্র। সে সিদ্ধি, শেষত, তাঁর সরলতায়।

মনে পড়ে কমলকুমারের সেই প্রৌঢ়োক্তি, "আমরা হই অতীব সরল"। কথাটির অর্থ, সন্দেহ হয়, আলোক সরকার বুঝেছেন।

'স্বভাবোক্তি' বলে অলংকারশাস্ত্রে একটা বস্তু আছে। কোন অলংকার যেখানে শনাক্ত করা যাচ্ছে না, কোন শ্লেষ-অনুপ্রাস বা উপমা-উৎপ্রেক্ষা-বক্রোক্তির সহায়তা ছাড়াই বাক্ যেখানে সিদ্ধির এক আশ্চর্য স্তরে পৌঁছচ্ছে, সেখানে, অসহায় অলংকারশাস্ত্রী, অবশেষে, 'স্বভাবোক্তি' অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে বলে হাল ছেড়ে দেন। বস্তুত, কবির কাছে শাস্ত্রীর চিরকালীন পরাজয়ের একটি স্মারকস্তম্ভ এই অলংকারটি। রস কীভাবে নিষ্পন্ন হচ্ছে এই প্রসঙ্গটি ক্রমাগত বুদ্ধি দিয়ে খনন করতে করতে যেখানে গিয়ে বুদ্ধি আর কূল পায় না, সেই অকূলের বার্তা, এই তথাকথিত অলংকারটি বহন ক'রে আনে।

জীবনানন্দ দাশ 'উপমাই কবিত্ব', এই রচনার দ্বারা যতই লোকপ্রিয়তা লাভ

করুন, সর্বকালের সর্বদেশের মহত্তম কবিতাবলীর অধিকাংশই, এই 'স্বভাবোক্তি'র নিদর্শন, যথা:

(১) 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' (ঈশোপনিষৎ)

(২) 'To retire when the task is accomplished
Is the way of heaven.' (লাওৎ সু)

(৩) 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু': (কালিদাস)

(৪) 'হেস্‌পেরাস্, তুমি ফিরিয়ে আন' সবকিছু, যা উজ্জ্বল উষা দিয়েছিল ছড়িয়ে; ফিরিয়ে আন' ভেড়াগুলিকে, ফিরিয়ে আন' ছাগলটিকে, ফিরিয়ে আন' শিশুটিকে মায়ের কাছে।' (সাফো)

(৫) 'চন্দ্র সুর নাহি আদি অংত।
ওইঁ কবীর খেলেঁ বসন্ত॥' (কবীর)

(৬) 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর' (বিদ্যাপতি)

(৭) 'অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥' (ভারতচন্দ্র)

(৮) 'কথা রবে, কথা রবে মা, জগতে কলঙ্ক রবে' (রামপ্রসাদ)

(৯) 'Season of mists, and mellow fruitfulness' (কীটস্)

(১০) 'আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে, এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।
আমি প্রভাতে উঠিয়া দেখি, দয়াল আমার সম্মুখে জাহির।
রে সম্মুখে জাহির॥' (ঈশান ফকির)

(১১) 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব, বঙ্গে' (মধুসূদন)

(১২) 'Think where men's glory most begins and ends,
And say my glory was I had such friends.' (ইয়েট্‌স্)

দৃষ্টান্ত আরও অজস্র চয়ন করা সম্ভব, যদিও আমি এ প্রসঙ্গেও অবহিত, যে, এর বিপরীত শ্রেণীর দৃষ্টান্তও অবাধে সংগ্রহ করা যায় অনেক, দেখানো যায় যে অলংকার সর্বত্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয় না কবিতার মহত্ত্বের পথে। এমনকি, উপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যেও, দেখানো যায়, বিবিধ শব্দ ও অর্থালংকারের আভাস যে একেবারে নেই, এমনও নয়। কিন্তু কথা সেখানে নয়, কথা বস্তুত এখানে, যে, সর্বপ্রকার বাহ্য আভরণহীনতায় পৌঁছবার, প্রকাশের সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে নিঃশেষে মুক্তিলাভ করবার একটা গভীর সাধনা, প্রকৃতই মহৎ কবিদের রচনায়, আমরা দেখি, দেখতে পাই। বহু পথ পার হ'য়ে; অভ্যস্ত কাব্যসংস্কারের তথা মৌলিক প্রকরণসিদ্ধির বহু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে; একজন হপ্‌কিন্স্ অবশেষে আর্তনাদ ক'রে ওঠেন:

'Comforter, where, where is thy comfort?'

অথবা, আমাদের আরও পরিচিত কোন কবি, গেয়ে ওঠেন:

'এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা
অন্ধকারে নাই বা কারে গেল দেখা—'

বহু মৌলিকতা, বহু আশ্চর্য আলোক সরকার পেরিয়ে এসেছেন, পেরিয়ে চলেছেন ; এখন তিনি সরাসরি তাঁর দেবতার, তাঁর পরমাশ্চর্যের, চোখের জল মুছিয়ে দেবার, যোগ্যতা রাখেন। বাঙলা কবিতায়, এই ঘটনাটি, আরও একবার ঘটল, আমাদের জীবৎকালে। কী দিয়ে পরিমাপ করা যাবে আমাদের সৌভাগ্য !

আলোক সরকারের কবিতাগুচ্ছ

নিভৃত প্রাণের দেবতা

সকলে যখন দৌড়ে গিয়ে
তোমার অভ্যর্থনা জানালো
আমি যাইনি।
সেইখানেই আমার জিৎ।

আমার তখন স্নান করাই হয়নি
সাজগোছ তো দূরের কথা।
এমন কি হাতে যে একটা মালা নিয়ে যাব
তারও ব্যবস্থা হয়নি তখনও।

দূর থেকে দেখলুম
ওরা তোমায় সাজাচ্ছে। একটুও
পছন্দ নয় আমার ওইরকম সাজ।
দেখে সে কি কষ্ট !

তারপর যখন স্নান শেষ হলো
সাজগোছ হলো
মালাও পেয়ে গেলুম ভারি সুন্দর
গিয়ে দেখি তুমি নেই।

এদিকে খুঁজি, ওদিকে।
শেষটায় বাঁশবনের ভিতরে গেলুম।
দেখি দুচোখে জল টলটল করছে—
তাড়াতাড়ি মালা পরালুম গলায়।

সবকটা ফুলই পুরোপুরি ফুটেছে—
দেখে তোমার কী আনন্দ !
বললুম, কী, মন ভালো হয়েছে এবার ?
তাড়াতাড়ি চোখের জল মোছো তো দেখি।

হাসি

হঠাৎ দেখি
কোনোদিকে কোনো লোকজন নেই
একটা গোরু কিংবা একটা কুকুর।

আর অমনি মনে হলো
এই তো সুযোগ
এইবার খুব চেঁচিয়ে বলে নিই
এতদিনের
লুকোনো কথাগুলো সব।

বললুমও খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
মন প্রাণ উজাড় করে বললুম।
কতদিনের কত জমানো কথা
কত সবুজ রঙ, নীল রঙ।

কথাগুলো গাছের বুকে আছড়ে
পাহাড়ের বুকে আছড়ে
কতক্ষণ ধরে বাজতে থাকল—

শুনে আমার সে কি আনন্দ !
হঠাৎ চমকে উঠি চাপা হাসির শব্দে—
পাহাড় হাসছে, একি আকাশও হাসছে !

হাসছ কেন তোমরা ? হাসছ কেন ?
সব শুনে ফেলেছে ওরা !

নীল লজ্জা সবুজ লজ্জা সব।
লজ্জায় মুখ তুলতেই পারি না।

আকাশ হাসছে, পাহাড় হাসছে
বুড়ো বটগাছটাও হেসে উঠছে একসঙ্গে।
হাসি এমন ছোঁয়াচে, আমারও
সারা শরীর কেঁপে উঠছে হাসির ধমকে।

সিঁড়ি

অনেক হৈহৈ-এর পর
এই একটুকরো ঘর পেয়েছি
একে আর ছাড়ব না।

সকালবেলার সূর্য
ঘরের ঠিক মধ্যিখানে
দশ বারো রকমের রেখা পাঠায়।
হাওয়া আসে খুব থামা-থামা।

মনে হয় যার থাকার কথা
সে ঘর ভরেই আছে।
আর সারাদিনই থাকবে।

থাকেও সারাদিন
তার সঙ্গে কথাবার্তাও হয় খুব।
ঠিক কী কথা তা তোমরা জিগেস ক'রো না
তা আমি বলতে পারব না।

সারাদিন
খুব জেগে-থাকা সেই রঙটার কথাও
বলতে পারছি কই! কী-যে ইচ্ছে করে বলতে!

এই বলছি···
ধরো ধরো—কী করে যে বলি!
ধরো কালো দিঘির মাঝখানের সেই সিঁড়ি
সিঁড়ি নামছে সিঁড়ি নামছে—

কী-যে করি
কিছু বলতে পারছি না
স্পষ্ট করে।
সিঁড়ি আর শেষ হতেই চাইছে না।

অনন্তস্তব্ধতা

একটা পাতা, তার অল্প দূরে
আর একটা পাতা
তাদের মাঝখানে
একটা ফুল।

হাওয়া এলে
ফুলও দুলছে পাতাও দুলছে।

পাতার রঙ সবুজ
ফুলের রঙ সাদা
আর তাদের উপর যে রোদ্দুর নেমেছে
তার রঙ হলুদ।

ছবিটা মনে আসতেই
মনে হলো
কত বড় একটা নিঝুম।

কত বড় একটা অনতিরিক্ত।
যা কিছু অনতিরিক্ত
তাই তো কোলাহলহীন, যা কিছু অনভিগমন।

যেখানে কোনো অভাব নেই
যেখানে কোনো যাত্রা নেই
তাই তো অনন্তস্তব্ধতা।

খুব আস্তে ঘর থেকে বার হই
খুব আস্তে
উঠোনে গিয়ে দাঁড়াই।

দেখি
একটা পাতা, তার অল্প দূরে
আর একটা পাতা।
আর তাদের মাঝখানে
একটা ফুল।

পাতার রঙ সবুজ
ফুলের রঙ সাদা
আর তাদের উপর যে রোদ্দুর নেমেছে
তার রঙ হলুদ।

কত বড় একটা নিরভিগমন
কত বড় একটা রুদ্ধযাত্রা
খুব নিঝুম অনতিরিক্তের ভিতর দাঁড়াই।

ফুল আর পাতা দোলাতে দোলাতে
হাওয়া বলছে
কোলাহল শুনছ না তো কোনো ?
অনতিরিক্ত কোলাহল বাজাবেই বা কি করে !

কবি

আমি যে একজন কবি
তা কেবল
গাছেরাই জানে।

গাছেরাও কম কবি নয়
ওদের কবিতা
আমাকে কত শোনায়।

পথ দিয়ে যখন যাই
ওরা মুখ টিপে হাসে।
কবিতা তো আর
সবসময় সবার মধ্যে বলার নয়।

পথ দিয়ে যখন হাঁটি
কী যে মজা লাগে—
কেউ বুঝতেই পারছে না
তাদের সঙ্গে একজন কবি চলেছেন।

কেউ বুঝতেই পারছে না
তাদের বাঁ দিকে ডান দিকে
কত বড় বড় কবি দাঁড়িয়ে রয়েছে।
গাছেরা বলে

মজা দেখেছ ! গাছেরা বলে
একবার দুম করে বলে দাও না
ওরা একজন কবির সঙ্গে পথ হাঁটছে।
বলে দাও না

ওদের চারপাশে
কত বড় বড় কবি দাঁড়িয়ে আছে।
বলি, দুর ! আমার ওসব
ভালোই লাগে না।

বল্লেই বলবে
একটা কবিতা শোনাও দেখি।
আবার খাতা খোলো
আবার কবিতা পড়।

হারাবার পালা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সকাল থেকেই খুব অস্বস্তিতে ভুগছে নিখিল। ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারছে না। দু'বার সে মা মা বলে ডাকলো, মা সাড়া দিলেন না। অথচ মা কাছেই ছিলেন, দেয়ালের একটা ছবি বেঁকে গিয়েছিল, সেটা সোজা করছিলেন। নিখিল আর একবার বেশ জোরে ডাকলো, মা। তবু তিনি মুখ ফেরালেন না। একটু পরে, ছবিটা ঠিকঠাক করার পর, মা বাথরুমের দিকে যেতে যেতে একবার নিখিলের দিকে তাকালেন, কেমন যেন অন্যমনস্ক দৃষ্টি।

মা শুনতে পাননি, এরকম তো হতেই পারে না। মায়েরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও সন্তানের ডাক শুনতে পায়।

এর আগে ছোটবোন খুকিকেও সে তিনবার ডেকেছে, খুকি উত্তর দেয়নি। রান্নাবান্নার কাজ করে যে ছেলেটি, তাকেও সুখেন সুখেন বলে ডেকেছে, সে সাড়া দেয়নি। অথচ সুখেন চা দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে ডিম সেদ্ধ ও টোস্টও দিয়েছে। কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দেবার জন্য তাকে ডাকলে সাড়া দেবে না কেন?

বেলা দশটা আন্দাজ নিখিল বুঝতে পারলো, সে নিজের গলার আওয়াজ নিজেই শুনতে পাচ্ছে না। তার কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেছে। সে যে মাকে ডেকেছে, খুকিকে ডেকেছে, সুখেনকে ডেকেছে, এরা কেউই কিছু শুনতে পায়নি।

বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নিখিল 'পুরানো সেই দিনের কথা—' গানটা গাইবার চেষ্টা করলো, তার ঠোঁট নড়ছে, কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

নিখিল একটুক্ষণ চিন্তা করলো। ঠাণ্ডা লেগে গলা ভেঙে গেছে। তাতেও এক রকম ফ্যাস ফ্যাস শব্দ বেরোয়, কিন্তু তার গলায় কোনো শব্দ নেই! এটা আবার কী ধরনের রোগ?

সারা সকাল কেউ যে তার একটাও কথা শুনতে পাচ্ছে না, এই নিয়ে বাড়ির কারুর কোনো কৌতূহলও নেই? কেউ নিজে থেকে তার সঙ্গে কথা বলতে এলেই তো বুঝতে পেরে যেত। একটা মানুষ কি সারা সকাল চুপ করে থাকে?

নিখিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

হুট করে কী আর ডাক্তার দেখানো যায়? হাসপাতালে লম্বা লাইন। বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় অনেক আগে থেকে। পয়সা-কড়িরও প্রশ্ন আছে। আপাতত নিখিলের সম্বল সাঁইত্রিশ টাকা। আর দশদিন পর টিউশানির মাইনে আড়াইশো টাকা পাবে।

টিউশানি? গলার আওয়াজ না থাকলে সে ছাত্রীকে পড়াবে কী করে?

তার বিকাশের কথা মনে পড়লো। বিকাশ অনেক কিছু জানে। অনেককে চেনে।

বিকাশ থাকে চেতলায়। বাজারের ওপরে, দোতলায় খুপরি খুপরি ঘর, তারই একটা কী করে যেন সে পেয়ে গেছে। ভাড়া মাত্র একশো বাইশ টাকা। সে ভাড়াও তিন চার মাস জমিয়ে রাখা যায়।

বিকাশ চাকরি-বাকরি করে না। নিখিলও চাকরি পায়নি এখনো, তবে পাবার আশা আছে। এখনো মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ দেয়, কলেজ সার্ভিস কমিশানে তার প্যানেলে নাম উঠে গেছে, বুড়ো হবার আগেই যদি মরে না যায়, তাহলে সেখান থেকে একদিন না একদিন সে ডাক পাবেই।

বিকাশ চাকরি-বাকরির ঘোর বিরোধী। সে পড়ুয়া মানুষ, সারা জীবন শুধু পড়াশুনো করেই কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছে। সে জন্য সে এন্তার অন্যের বই চুরি করে, অনেক লাইব্রেরির বইও মেরে দেয়, কিছু কিছু কেনেও অবশ্য। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সে কোনো একটা ওষুধ কোম্পানির দালালি করে। মাসে দিন-পাঁচেক এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেই সে যা পায়, তার বেশি উপার্জনের লোভ করে না। তার ঘরে একটা খাট ও টেবিল চেয়ার ছাড়া সর্বত্র ছড়ানো বই আর নানা রকমের ওষুধের বাক্স, ফাইল, প্যাকেট।

ভবানীপুর থেকে চেতলা পর্যন্ত হেঁটেই গেল নিখিল।

দরজা টেনে খোলার পর দেখলো, মাটিতে অনেক রকম খবরের কাগজ ছড়িয়ে বসে আছে বিকাশ। মুখ তুলে বললো, কী রে, নিখিল, তোর পকেটে সিগারেট আছে?

নিখিল কোনো উত্তর না দিয়ে চেয়ারটাতে বসে পড়লো। টুকরো-টাকরা কাগজের অভাব নেই। একটা কাগজে সে লিখলো,

বিকাশ,

আমি কথা বলতে পারছি না। সকাল থেকে কী যে হয়েছে, কেউ আমার কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না। কণ্ঠস্বর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তুই কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারবি?

নিখিল।

কাগজটা সে এগিয়ে দিল। নিখিলের ব্যবহারে সে একটুও অবাক না হয়ে বললো, আমি খুব ধাঁধায় পড়ে গেছি রে নিখিল। আমার চোখের কোনো দোষ হয়েছে। আমার পড়াশুনোয় বারোটা বেজে যাবে। এ অসুখটার মাথা মুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না। কাল থেকে 'ক' শব্দটা আমি পড়তে পাচ্ছি না। 'ক' দিয়ে আরম্ভ এমন কোনো কথাও আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃষ্টি থেকে সমস্ত 'ক' মুছে যাচ্ছে। এটা কী ব্যাপার বল তো? এই যে তুই চিঠিখানা

লিখলি। এটাতে আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানিস ? আমি পড়ছি।

বিশ,

আমি বলতে পারছি না। সল থে যে হয়েছে, আমার শুনতে পাচ্ছে না। এবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তুই ডাতারের নিয়ে যেতে পারবি ?

নিখিল।

এটা দেখে আমি কী বুঝবো : বিশ মানে কি বিকাশ ? তুই কী বলতে পারছিস না ? না বলতে পারলে তোর গোপন কথা আমি বুঝবো কী করে ?

নিখিল এবার ভাবলো, 'ক' শব্দ বাদ দিয়ে কী করে লেখা যায়। এমন কিছু শক্ত নয়। সে আর একটা কাগজে লিখলো,

আমার গলা নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্যতম আওয়াজও বেরুচ্ছে না। মুখে বার্তা জানাতে পারবো না। নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারবি ?

এই পর্যন্ত লিখে সে 'করতে' কেটে দিয়ে 'নিতে' লিখলো।

বিকাশ বললো, হুঁ, বুঝলাম। তোরটা এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু আমার একী হলো বলতো ! মুখে সব কিছু বলতে পারছি, কিন্তু 'ক' অক্ষরটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাংলায় যে 'ক' দিয়ে এত শব্দ হয়, তা আগে খেয়াল করিনি। খবরের কাগজ পড়ে অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। কলকাতা শহরটারই কোনো অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। তুই আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস।

নিখিল ঘাড় নাড়লো।

বিকাশ বললো, দারুণ ভয় লাগছে রে আমার। আর 'ক' দেখতে পাচ্ছি না, কাল থেকে যদি 'খ' ও দেখতে না পাই ? তার পরের দিন 'গ', তার পরের দিন 'ঘ'...এইভাবে পড়তে ভুলে যাবো ?

নিখিল একটা কাগজে লিখলো, ইংরেজি পড়বি।

বিকাশ সেটায় চোখ বুলিয়ে বললো, ইংরেজিতেও 'এ' অক্ষরটা ঝাপসা হয়ে গেছে !

উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো ঠিক আছে, চল, বিষ্ণুদার কাছে যাই, কাছেই চেম্বার।

বিষ্ণু পাল নাম করা ডাক্তার। তার কাছে রোজ রুগী থই থই করে। বারোটায় চেম্বার বন্ধ হবার কথা, প্রতিদিনই একটা-দেড়টা বেজে যায়। আজ এখন পৌনে বারোটা বাজে, একজনও রুগী নেই, তাঁর দু'জন অ্যাসিস্টেন্টও নেই, মস্ত একটা টেবিলের ওপাশে বিষ্ণু পাল একা বসে আছেন। রাশভারি চেয়ারা, এই গরমেও থ্রি পিস স্যুট পরা, চোখে একটা রিমলেস চশমা।

বিকাশকে দেখে উদাসীন ভাবে বললেন, কী খবর ?

বিকাশ বললো, আমার সমস্যাটা পরে বলছি, সেটা বেশ জটিল। আগে আমার এই বন্ধুকে একটু দেখে দিন তো। ওর গলা চোকড হয়ে গেছে।

আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

বিষ্ণু পাল বললেন, আজ সব রুগীকে বিদায় করে দিয়েছি। বিষ্ণু পাল মরে গেছে জানো না !

বিকাশ হেসে বলল, বিষ্ণুদা, আমরা সবাই মাঝে মাঝে মরে যাই, সেটা আর এমন কী নতুন ব্যাপার। আবার বেঁচেও তো উঠি। মানে, যতদিন বাঁচা যায়।

বিষ্ণু পাল বললেন, তুমি বলছো, আবার বেঁচে ওঠা যায় ? ওষুধে, না বিনা ওষুধে ?

বিকাশ বললো, একই ব্যাপার, ওষুধ খেলেও হয়, না খেলেও হয়। তবে ওষুধ খেলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আপনি—আমি সান্ত্বনা বিক্রি করি। আমার এই বন্ধুটিকে একটু সান্ত্বনা দিন।

বিষ্ণু পাল নিখিলকে জিজ্ঞেস করলেন, গলা বসে গেছে, কানে শুনতে পাও ?

নিখিল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

বিষ্ণু পাল বললেন, তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট কমে গেল। এবারে একবার গলা ছেড়ে হাঁক দাও তো ? মনে করো, আমি সিকি মাইল দূরে আছি, এই ভাবে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকো, ডাক্তারবাবু !

নিখিল গলা ফুলিয়ে ডাকলো ক্ষীণ শব্দও অন্য দু'জন শুনতে পেল না।

বিষ্ণু পাল বললেন বাঃ ! এতে কোনো অসুবিধে নেই। ভগবানকে ডাকতে পারবে। লক্ষ-কোটি মাইল দূরে থাকলেও তিনি ঠিক শুনতে পাবেন।

বিষ্ণু পাল যেখানে বসে আছেন, তার পেছনেই একটা জানলা। বাইরে একটা মাঠ। জানলার কাছেই একটা চালতা গাছে বসে একটা কাক তারস্বরে কা-কা করে যাচ্ছে।

বিষ্ণু পাল নিখিলকে বললেন, তুমি এই কাকটাকে তাড়িয়ে দিতে পারো ?

নিখিল উঠে এসে জানলার কাছে দাঁড়ালো। কাকটা লাল চোখ দিয়ে দেখলো নিখিলকে। নিখিল বললো, হুস, যাঃ যাঃ !

কাকটা উড়ে চলে গেল।

বিকাশ বললো, বিষ্ণুদা, লক্ষ-কোটি মাইল দূরে যেতে হলো না। এই কাকটাই ওর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

নিখিল কিন্তু নিজেও এবার হুস ! যাঃ যাঃ শুনতে পেয়েছে।

বিষ্ণু পাল বললেন, ঐ মাঠে দেখো, দড়ি দিয়ে একটা গোরু বাঁধা আছে। ওর দিকে দু'বার হাম্বা হাম্বা করলে গোরুটা উত্তর দেয়। তুমি দু'বার ডাকো তো ?

এবারেও নিখিল দু'বার হাম্বা ডাক নিজে শুনতে পেল। গোরুটা সত্যি উত্তর দিল।

বিষ্ণু পাল খুশি হয়ে বললেন, বিকাশ, তুমি গোরুটার হাম্বা শুনেছো, কিন্তু তোমার বন্ধুর গলার আওয়াজ কি শুনেছো।

বিকাশ বললো, না।

বিষ্ণু পাল বললেন, আমিও শুনিনি। কিন্তু ও ডেকেছে, গোরুটা শুনেছে। তাহলে ওর গলার আওয়াজ একেবারে নেই, তা বলতে পারো না। সুতরাং এটা কোনো অসুখই না। যাক, আমাকে আর ওষুধ দিতে হলো না। সব ওষুধের নাম ভুলে যাচ্ছি। বুঝলে বিকাশ!

বিকাশ বললো, সে কি বিষ্ণুদা! আপনার তো কমপিউটারের মতন সব ওষুধের নাম মুখস্থ থাকে।

বিষ্ণু পাল বললেন, কমপিউটার ফেইল পড়েছে। তুমি গত সপ্তাহে কী ওষুধ নিয়ে গেলে?

বিকাশ বললো, টেট্রাসাইক্লিন!

বিষ্ণু পাল বললেন, হাজার চেষ্টা করেও আজ এই নামটা মনে করতে পারিনি। এ ওষুধে কী কাজ হয়, তাও ভুলে গেছি। এরকম আরও অনেক। রুগীদের প্রেসক্রিপশান লিখবো কী করে?

বিকাশ বললো, সত্যিই তো মুশকিলের ব্যাপার! তাহলে এবার আমার রোগদের কথা বলি?

বিষ্ণু পাল বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাদের আর একটা ব্যাপার দেখাচ্ছি। ঘরের সব কটা জানলা আর দরজা বন্ধ করে দাও তো। সুইচ অফ করে আলোও নিভিয়ে দাও। ঘরটা একেবারে অন্ধকার চাই।

তা হলো, ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু পাখা ঘুরছে।

বিষ্ণু পাল নিজের চশমাটা খুলে বললেন, এটা পরে বসো তো, তোমরা কিছু দেখতে পাও কিনা?

বিকাশ আর নিখিল দু'জনেই একবার করে পরে দেখলো। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

বিষ্ণু পাল চশমাটা ফেরৎ নিয়ে বললেন, এটা কোনো স্পেশাল চশমা নয়। আমার রিডিং গ্লাস, মাস দু'এক ধরে ব্যবহার করছি। কিন্তু তিনদিন আগে থেকে, সেদিন হঠাৎ লোডশেডিং হলো, অন্ধকারের মধ্যে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেলুম। এখনো আমি এই ঘরের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বিকাশ, তুমি এক কোণে গিয়ে দাঁড়াও, আঙুল তুলে আমায় জিজ্ঞেস করে, ক'টা আঙুল?

বিকাশ এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। বিষ্ণু পাল বললেন, দুটো আঙুল, ঠিক বলিনি? এবার তুমি পকেট থেকে যে-কোনো একটা টাকার নোট হাতে নাও—

বিকাশ কী দেখালো, তা নিখিল দেখতে পেল না। বিষ্ণু পাল বললেন, পাঁচ টাকার নোট, বেশ পুরোনো আর ময়লা, তাই না? দেখেছো, কী অদ্ভুত ব্যাপার! আলোতে আমার দৃষ্টি ক্রমশ কমে আসছে। তোমাদের খানিক আগে ঝাপসা-

ঝাপসা দেখেছি, এখন কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধুটির বাঁ ভুরুতে একটা কাটা দাগ আছে। কী সর্বনেশে কাণ্ড! আলোতে ভালো দেখতে পাই না, অন্ধকারে স্পষ্ট সব কিছু জলজল করে। একে মরে যাওয়া বলে না?

দরজায় ঠকঠক শব্দ হলো।

বিষ্ণু পাল ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই, এই, আগে দরজা না, আগে সব জানলা খুলে দাও, আলো জালো, নইলে লোকে আবার কে কী ভাববে!

দরজা খুলে দিতে দেখা গেল, একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। দামি শাড়ি পরা, অঙ্গে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ।

মেয়েটি এগিয়ে এসে বিষ্ণু পালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনিই ডাক্তার?

বিকাশ বললো, আমরা বাইরে যাই?

বিষ্ণু পাল বললেন, না, তোমরা বসো। আমি তো এখন চেম্বার করছি না।

মেয়েটি ওদের দু'জনের দিকে একবার চোখ বুলোলো। তারপর বললো, ডাক্তারবাবু, আমার এই শাড়িটার কী রং?

বিষ্ণু পাল বললেন, এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন মা? এটা তো শাড়ির দোকান নয়।

মেয়েটি অনুনয় করে বললেন, আমাকে মা বলবেন না, প্লিজ! আমার নাম এষা সেনগুপ্ত। মা ডাকটা শুনলেই আমার খুব কষ্ট হয়। কোনো অচেনা মহিলাকে মা বলে ডাকাটা খুব খারাপ!

বিষ্ণু পাল বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আরও ছোট মেয়েদের মা বলতে হয়, যাদের মা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তোমার বয়েসটা ঠিক বুঝতে পারিনি। শাড়ির বিষয়ে কী বলছিলে?

তরুণীটি বললে, আইস স্কেটিং রিংয়ে একটা খুব বড় শাড়ির একজিবিশান হয়েছিল। সেখান থেকে এই শাড়িটা কেনা। অনেক দাম নিয়েছিল। রংটা দেখেই আমার বেশি পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু নতুন শাড়ি, একবারও পরিনি, এর-মধ্যে রংটা পুরো বদলে গেছে। আপনারা এটা কী রং দেখছেন?

বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে বললো, নীল।

নিখিল একটা কাগজে লিখলো, ঠিক নীল বলা যায় না। খানিকটা কালচে-ভাব আছে। বলা যেতে পারে ঝড়ের মেঘের মতন।

কাগজটা সে বিষ্ণু পালের হাতে তুলে দিল। তিনি সেটা পড়ে নিয়ে বললেন, আমারও তো নীলই মনে হচ্ছে।

তরুণীটি বিকাশের দিকে ধমকের ভঙ্গিতে বললো, মোটেই না। এটা খয়েরি! আমি খয়েরি রং দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

হাতব্যাগটা খুলে সে একটা ধপধপে সাদা রুমাল বের করলো। চারপাশে লেশ লাগানো। সেটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী রং ?

বিকাশ বললো, সাদা।

তরুণীটি বললো, ছিল। আগে সাদা ছিল। এখন খয়েরি হয়ে গেছে। আমি সব কিছু খয়েরি দেখছি কেন ? ডাক্তারবাবু, এর কোনো চিকিৎসা হতে পারে ?

বিষ্ণু পাল বললেন, আমি জানি না। অন্য ডাক্তাররা বলতে পারবে।

তরুণীটির দু'চোখ জলে ভরে গেল। সে আর্তকণ্ঠে বললো, সাদা, হলুদ, কমলা, ময়ূরকণ্ঠ সব রং হারিয়ে যাচ্ছে। সব খয়েরি। আমি রং দেখতে পাচ্ছি না, কেন সব রং হারিয়ে যাচ্ছে, কেন, কেন।

মেয়েটি টেবিলে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদতে লাগলো।

ডিস্‌চার লেটার

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালের জানলায় রোদ তার আঙুল রাখার আগেই মনীশ শুনল, সামনের বাড়ির গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় রঙ্গিনীর কর্কশ কণ্ঠের চোপা, ওরা মুসলমান তাতে কী হয়েছে। মুসলমান কি ওদের গায়ে লেখা রয়েছে ? আমার ইচ্ছে, তাই ওদের বাড়ি কাজ নিয়েছি।

সামনের বাড়ির বিচিত্রামাসিমার বয়স পঞ্চাশের ওপর। বেশ ভারিক্কি চেহারা, কথাবার্তায়ও যথেষ্ট ধার ও ভার। বস্তুত এ পাড়ার তাবৎ গিন্নিবান্নিদের প্রায় অভিভাবিকাই বলা যায় তাঁকে, তাঁর মুখের ওপর চোপা করা একমাত্র রঙ্গিনীর পক্ষেই সম্ভব। রঙ্গিনীর ভাষায়, 'আমি কাউকে কেয়ার করিনে', কারণ এই মাঙ্গিগণ্ডার বাজারে আর যারই চাকরির অভাব হোক, রঙ্গিনীর চাকরির কোনো অভাব নেই। সে এ বেলা একটা চাকরি ছাড়ে তো ও বেলায় অন্য চাকরিতে রীতিমতো ডাঁট দেখিয়ে বহাল হয়ে যায়, আরও বাড়তি স্যালারি নিয়ে। সঙ্গে পার্কস্‌ও হয়তো বেশি-বেশি। অনিন্দিতা প্রায়ই মনীশকে বলে, এখন তো রঙ্গিনীদেরই বাজার। মুখের ওপর কিরকম কটকট করে কথা বলে দেখেছ ? যেন আমরা টাকা দিইনে ওকে। ওই যেন টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে আমাদের। কোনোদিন একটা কাজ বেশি করতে বলি তো মুখ খিঁচুনি দিয়ে বলে, ওটা আমার কাজ না।

সামনের বারান্দা থেকে তখন বিচিত্রামাসিমার রাশভারী কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, ছি-ছি-ছি, তাই বলে পাড়ার মধ্যে এরকম একটা অনাছিষ্টি ব্যাপার চলবে, আর আমরা তাই মুখ বুজে মেনে নেব ! উ-হু, এসব চলবে না। এই আমরা সাফ বলে দিলাম। তুই ওদের কাজ ছেড়ে দে—

রঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ চোখমুখ নেড়ে ক্যারক্যার করে আঙুল তুলে বলল, ছেড়ে দে বললেই ছেড়ে দোব ! আমরা কি কারও কেনা বাঁদি নাকি ? ছাড়তে হলে না হয় তোমাদেরটাই ছেড়ে দোব—

বলে তার দোহারা কোমরে ফিকে কমলা রঙের আঁচলটা দ্বিগুণ আঁট করে বেঁধে মেঝেয় পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁটাতে লাগল ওদের বারান্দা। বিচিত্রামাসিমার স্তম্ভিত শরীরটা তখনও বারান্দায় স্টিল ফোটোগ্রাফ হয়ে দাঁড়িয়ে। তার সামনে এমন হুড়মুড় করে ঝাঁট দিতে শুরু করল রঙ্গিনী, যেন পারলে, বিচিত্রামাসিমা সুদ্ধ ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যাবে।

রঙ্গিনী এহেন আলটিমেটাম দিয়ে দেওয়ার পর আহত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ বিচিত্রা মাসিমা বাধ্য হয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে তাঁর শাসানির বাণী তখন নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন এক অদৃশ্য হালদারবাবুর উদ্দেশে, আর হালদারবাবুকেও বলিহারি। এত সুন্দর পাড়া আমাদের। কত মিলমিশ সবার মধ্যে। আর এর মধ্যে উনি কিনা একঘর মুসলমান এনে জোটালেন। কী—, না ভাড়া যে বেশি দেবে তাকেই ঘর দেব। তিনটে হাজার টাকা কি মাগনা নাকি। ইস্, কী ঘেন্না কী ঘেন্না। ক'টা টাকা বেশি পেলেন বলে ঘেন্নাপিত্তিও কি থাকতে নেই। একই বাড়ির ওপর-নিচে—

অনেকদিন ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির পর হঠাৎ আজ সকালে নীল আকাশ। তার সঙ্গে ঝলমলে ভোর দেখে মনীশ সবে একটু প্রকৃতি দেবতাকে তারিফ করতে শুরু করেছিল, এর মধ্যে তার জানলার বাইরে এহেন ঝোড়োহাওয়া উঠতেই ভেঙে-ভুঙে গেল তার ভালোলাগার চটকাটুকু। এলোমেলো ঝাপটে ততক্ষণে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে অনিন্দিতা। ব্যারোমিটারের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তার তীক্ষ্ণ, আয়তচোখ ফেলে অতঃপর মুচকি হাসিতে উদ্ভাসিত করল তার মুখখানা। এবার বেশ টাইট হয়েছে, বিচিত্রামাসিমা। অ্যাদ্দিন ও শুধু আমাদেরই চোপা করত—

এতক্ষণের কথোপকথনের ঝাপট গায়ে মাখতে মাখতে মনীশ কিছুটা অনুধাবন করতে পারছিল সমস্যার গতিপ্রকৃতি, কিছুটা আবার পারছিলও না। ভোরের ঘুম-ভাঙা এলোচুল দু-হাতে সাপটাতে সাপটাতে অনিন্দিতা আবার বলল, দেখো, একটু পরেই বিচিত্রামাসিমা আমাদের বাড়ি আসবে। কাল সন্ধেবেলা ঘোষদি আর রায়দির বাড়ি গিয়েছিল, এ নিয়ে আজ একটা তুলকালাম করবে বলে। কিন্তু রঙ্গিনী এমন হার্ডনাট—

রঙ্গিনী যে একটি ঘোরতর শক্ত বাদাম, তার খোসা ভাঙা যে রীতিমতো শিভ্যালরির ব্যাপার তা এই বেহালার সূর্যশঙ্কর রায় থার্ড বাই লেনের গোটা দশ-বারো পরিবার হাড়ে-হাড়ে জেনে গেছে। রঙ্গিনীর বাড়ি সেই সুদূর ক্যানিংয়ে। গ্রামবাংলায় শোনা যায়, 'মেয়েদের স্বামীতে নেয় না'। রঙ্গিনীর কেস ঠিক তার উল্টো। তার ক্যানিং স্টেশনের মোট-বওয়া স্বামী রোজ রাতে ধেনো খেয়ে বাড়ি ফিরত বলে তাকে একদিন মারতে মারতে মাঝরাতে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে একখানা ধারালো শাবল দেখিয়ে রঙ্গিনী বলেছে, আর কোনোদিন যদি সে ঘরে ঢোকে তবে সে তার লাশ নিজেই মার্গে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে। তার স্বামী অবশ্য ভয়ে আজ তিন বছর হলো বাড়িমুখো হয়নি। অতএব তার তিন-তিনখানা ছেলেমেয়ে মানুষ করতে সে ঠেক খেতে খেতে কাজ জুটিয়ে নিয়েছে মনীশদের গলিতে। আজ তিনবছর ধরেই সে ক্যানিং লোকালের ডেলি-প্যাসেঞ্জার। রাত তিনটের সময় রোজ ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে বিছানায় তার মায়ের

জিম্মায় রেখে সে ক্যানিং থেকে ভায়া মাঝেরহাট এসে পৌঁছয় সূর্যশঙ্কর রায় থার্ড বাইলেনে। ন'খানা বাড়ির কাজ সেরে আবার সন্ধের আগেই রওনা দেয় ক্যানিংয়ের উদ্দেশে। যতক্ষণ এ গলিতে থাকে এহেন দাপুটে রঙ্গিনীর ভয়ে গলির লোকজন তটস্থ। প্রথম-প্রথম কোনো বাড়িতে তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হলে সে তড়পে উঠে বলত, জানো, আমাদের ইউনিয়ন আছে। ক্যানিং লোকালে একবার খবর দিলে তারা ছুটে আসবে এ পাড়ায়। এখন অবশ্য তাকে আর ইউনিয়ন দেখাতে হয় না, সে নিজে একাই একখানা ইউনিয়ন। তিনবছরে তিনখানা বাড়ির চাকরিতে সে রিজাইন করে অন্য বাড়িতে বহাল হয়ে গেছে মুচকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে। ফলে তাকে চট করে ঘাঁটাতে চায় না কেউ। চায় না, তার কারণ বেহালার এদিকে কোনো বস্তিটস্তি না থাকায় 'কাজের লোকে'র খুবই আকাল।

তো এতদিন রঙ্গিনীর সঙ্গে এভাবে লড়ালড়ি করে বেশ চালিয়ে নিচ্ছিল সবাই। কিন্তু এবার এমন মোক্ষম গোল বেধেছে যে ঘরে ঘরে মিটিং, তর্ক-বিতর্ক, প্রতিবাদ-সভা সবই শুরু হয়ে গেছে একের পর এক।

গোলমালটা হালদারবাবুর বাড়ির একতলায় নতুন ভাড়াটেকে কেন্দ্র করে। হালদারবাবু তাঁর নতুন রঙের কারখানাটা খুলতেই লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন হু হু করে। দু বছরের মধ্যে তাঁর একতলা বাড়ি দোতলা। এখন তিনতলা তুলবেন, না গাড়ি কিনবেন তাই নিয়ে টালবাহানার মধ্যেই হঠাৎ নিজেরা দোতলা উঠে গিয়ে এক ঘর ভাড়াটে ঢুকিয়ে দিলেন একতলায়। এ গলিতে এতদিন ভাড়াটে ছিল না। হঠাৎ হালদারবাবু ভাড়াটে বসানোয় এক-আধটু ভুরু-কোঁচকানি না ছিল তা নয়, কিন্তু ভাড়াটেদের চেহারা বেশ ফর্সা, সাহেব-সাহেবপানা, অ্যারিস্টোক্র্যাট ধরনের দেখে খুব একটা রা কাড়ছিল না কেউ; কিন্তু মাত্র মাসখানেক আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, লম্বা, ফর্সা, চিবুকে ফ্রেঞ্চ-কাট ভাড়াটির নাম ইউসুফ, ব্যস, তখন বিচিত্রামাসিমা, সঙ্গে ব্রজমেসো, অর্থাৎ ব্রজকুমার চক্রবর্তী একযোগে স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলেন, সে কি, হালদারবাবু শেষে মুসলমান ভাড়াটে বসালেন বাড়ির একতলায়।

তাঁদের কথার ঢঙে এমন ছড়িয়ে একটা সুর যেন গোটা পাড়াটাই অসুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু এই সেদিন বাড়ির সামনে নেমপ্লেটে বসতে একটু থতমত খেয়ে গেল পাড়ার সবাই। নেমপ্লেট জলজল করছে : ডঃ ইউসুফ আলি, এম. বি. বি. সি. (ক্যাল)। তারপর লণ্ডন আর বার্লিনের দু-তিনটি ডিগ্রিও। অর্থাৎ কিনা বেশ নামডাক-অলা ডাক্তার। ডাক্তার শুনে মনে অসন্তোষ থাকলেও ফিসফিসানি থেকে গিয়েছিল কদিন। ডাক্তারের চেহারা ভালো তো বটেই। তাঁর লম্বা-চওড়া বউটাও রীতিমতো অভিজাত চেহারার। একটিমাত্র ছেলে, তার নাম সঈফ, বছর ছ-সাত বয়স, সেও দিব্যি ফুটফুটে চেহারার।

কিন্তু ডাক্তার হলেও গম্ভীর, মিতবাক ইউসুফ আলি কথাবার্তায় জানিয়ে দিলেন তিনি ও পাড়ায় প্র্যাকটিস করবেন না। তাঁর চেম্বার মহেশতলার কাছে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে। ইতিমধ্যে একটি নার্সিং হোমও খুলেছেন সেখানে, চিকিৎসা যা করার সেখানেই করবেন, এখানে তাঁর বাড়িতে যেন কেউ পেশেন্ট এনে বিরক্ত না করে। এইজন্যই তিনি তার নিজের বাড়ি ফেলে রেখে এখানে পালিয়ে এসেছেন।

কদিন ওসব কথাবার্তা নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি গুনগুন ফিসফিস চলল, তারপর একসময় আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছিল না ব্যাপারটা নিয়ে। এখন হঠাৎ তিনমাস চুপচাপ থাকার পর কাল ঘোষগিন্নি দুপুরবেলা বিচিত্রামাসিমার ঘরে গিয়ে পান চিবুতে চিবুতে চোখ কপালে তুলে বলল, শুনেছেন মাসিমা, রঙ্গিনী ওই ইউসুফ লোকটার ঘরে কাজে ঢুকেছে।

মাত্র দিনসাতেক আগেই রঙ্গিনী ইস্তফা দিয়েছে মুখুজ্জে বাড়িতে। মুখুজ্জে-গিন্নি ভারী টিকটিক করেন রঙ্গিনীর কাজের খুঁত ধরে। অনেকদিন ধরেই দুজনে চোপাচুপি হওয়ার পর গত সপ্তাহে রঙ্গিনী মাইনে বুঝে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছে, আপনারা লোক দেখে নিন, দিদি। কাল থেকে আমি আর আসব না।

পুজোর মাত্র আর মাস দেড়েক দেরি। এসময় কোনো কাজের লোকই কাজ ছাড়ে না। কাজ ছাড়ার সিজন হলো পুজোর ঠিক আগে বা পরে। নতুন শাড়ি-জামা এবং অন্যান্য পাওনাগণ্ডা বুঝে নেওয়া হয়ে গেলে তখনই। কিন্তু রঙ্গিনী অন্য ব্যাকরণের 'কাজের লোক'। সে এক সেকেণ্ডের নোটিশে ইস্তফা দিতে পারে। তার তো আর কাজের অভাব নেই। কিন্তু তাই বলে মুখুজ্জেবাড়ির কাজ ছেড়ে শেষে ইউসুফ আলির ঘরে! আসলে তলে তলে আগেই কাজটা ঠিক করেছিল নিশ্চয়ই।

শুনে রঙ্গিনী অমনি ঝঙ্কার দিয়ে বলেছে, কেন নেবনি? আড়াইশো টাকা মাইনে কি তোমরা দিতে পারবে?

আড়াইশো শুনে থতমত খেয়ে গেলেও বিচিত্রামাসিমা বললেন, টাকাটাই তোর কাছে বড় হলো! জাত-বিচার বলে তো একটা ব্যাপার আছে।

রঙ্গিনী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছে, সে জাত তোমরা ধুয়ে খাও গে যাও। আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ। দিন আনি দিন খাই। যে আমাদের টাকা দেবে তার বাড়ি আমরা কাজ করব।

রঙ্গিনী এমন সাফ-সাফ জবাব দেওয়াতে গলির ভেতর একটা ছোটখাটো রণরোল। ঘোষগিন্নি, রায়গিন্নি, বাঁড়ুজ্জে মাসিমা, গুঁইনদিকে নিয়ে প্রায় একটা ঘোরতর বোর্ড মিটিং বসিয়ে দিলেন বিচিত্রামাসিমা। এমনকি গলির মুখে যে চারতলা ফ্ল্যাটে বাড়ি হয়েছে, তার থেকে অঞ্জলি, কান্তা, শ্যামলিমাও এসে হাজির। বিচিত্রামাসিমা দু-তিনবার 'অনিন্দিতা, অনিন্দিতা' বলে ডাক দিলে

অনিন্দিতা মনীশের কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞাসা করল, কী করি বলো তো। আমার আবার এ সব আলোচনায় যোগ দিতে ভাল লাগে না।

মনীশ হেসে বলল, তাহলে বলে দি খুব মাথা ধরেছে।

—নাঃ, আনন্দিতা ব্যাজার মুখে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। যাই একবার, না হলে পরে সবাই আবার ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলতে শুরু করবে। একেই তো সেদিন পার্কস্ট্রিটে বড়দিন পালন করতে গিয়েছিলাম শুনে বিচিত্রামাসিমা ঠোঁট উল্টে কান্তাকে বললেন, 'বুঝলে, অনিন্দিতারা বিলিতি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ওরা আবার টেপে ইংরেজি বাজনা শোনে।' কী আশ্চর্য, বেটোফেনের সিম্ফনিও শুনতে পারব না? বামুন অনেক দেখেছি, তবে এরকম বামুন—

মনীশরা ভটচায্যি, কিন্তু অনিন্দিতারা দত্ত বলে সে ব্যাপারেও ছেড়ে কথা বলেন না বিচিত্রামাসিমা। বাড়ির সামনে এরকম একজন ঘোর ব্রাহ্মণ থাকাতে মনীশদের অতএব নিদারুণ অস্বস্তি। ওঁদের বাড়ির ঠাকুরঘরটা বোধহয় শোওয়ার ঘরের চেয়েও পরিসরে বড়। শুধু বড়ই নয়। তার চার দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিই ঈশ্বরে ঈশ্বরে ছয়লাপ। এদেশে এমন কোনো ঠাকুর নেই, যার বাঁধানো ছবি দেওয়ালে টাঙানো নেই ওঁদের। চার দেওয়ালের ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত অজস্র, অনন্ত ঈশ্বরবৃন্দ বিভিন্ন রূপে। বিচিত্র পোশাকে সারবন্দি হয়ে বিরাজিত। এত এত ঠাকুরের একত্র সমাবেশ অনিন্দিতা নাকি তার ইহজীবনে দেখেনি।

মনীশ গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি গুনে দেখেছ, কতগুলো ঠাকুর?

—সেদিন গুনছিলাম। সে প্রায় আকাশে তারা গোনার মতো। গুনতে গুনতে কোনোটা দুবার তিনবার করে গোনা হয়ে যায়। কোনোটা আবার চোখের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। গোনা হয় না।

—তবু কতগুলো দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত?

অনিন্দিতা হাসল, তেত্রিশ কোটি থেকে দু-চারটে কম হবে।

মনীশ হেসে বলল, যে ঠাকুরগুলো ওঁদের দেওয়ালে নেই, একটা লিস্ট করে নিয়ে এসো তো। পুজোর পর কেদার-বদ্রি যাচ্ছি তো। সেইসব ঠাকুরদের ফটো তুলে এনে বাঁধিয়ে প্রেজেন্ট করব ওঁদের।

—তাহলে তুমিই দিয়ে এসো। আমি কায়স্থ ছিলাম তো। আমি হাতে করে দিলে হয়তো নেবেন না। আমি জল পুরে দিলে উনি খান না। তা জানো?

মনীশ জানত না, হেসে উঠে বলল, তাই নাকি!

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিটেল।

অন্তত ব্রজবাবুর মাথায় যে কয়েক গজ টেরিলিন-টেরিকট ভরা আছে সে ব্যাপারে মনীশ নিঃসন্দেহ। ভদ্রলোকের বয়স এখন ছাপ্পান্ন-সাতান্নর মতো। রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজ করেন। এখনও টেবিল ছেড়ে ইউরিন্যালে যাওয়ার সময় কানে পৈতে জড়াতে জড়াতে ইষ্টনাম জপ করেন নাকি। একদিন টেবিল থেকে

উঠে এগুতে এগুতে জামার ভেতর হাঁটকে কিছুতেই আর পৈতে খুঁজে পান না। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ হাঁটকে স্তম্ভিত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন, বস্তুটি তাঁর কাঁধে ঝুলে নেই নিশ্চয়ই স্নানের পর ধুতিশার্ট পরার সময় সেটি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে ঘরের মেঝেয় লাফ দিয়েছে। সেদিন নাকি অফিসে থাকাকালীন আর ভারমুক্ত হতে পারেননি। হেড-অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলেটলে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে তারপর—

মনীশের গলায় পৈতে নেই, কোনোকালেই থাকে না শুনে এমন চোখ কপালে তুলে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যেন এরকম অকাল-কুষ্মাণ্ড, পাপিষ্ঠ যুবক ভূ-ভারতেই আর তিনি দেখেননি।

অনিন্দিতা শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল, নিশ্চয় ভেবে নিয়েছেন কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করে তুমিও কায়স্থ হয়ে গিয়েছ এতদিনে। তা এহেন বামুন মানুষ, রঙ্গিনী মুসলমান বাড়িতে বাসন মেজে, ঘর ঝাঁট দিয়ে, তাদের বাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে মুসমান হয়ে গেছে তা তো ভাবতেই পারেন।

তো সেইজন্যেই তো বিচিত্রামাসিমার ঘটা করে এই বোর্ড-মিটিং বসানো। এ ধরনের মিটিং সাধারণত হয়ে থাকে মনীশদের বাড়ি আর ব্রজবাবুর বাড়ির মাঝখানে, চোদ্দ ফুট পরিসরের রাস্তার ওপর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। তাতে চেয়ারম্যানের পদ অবশ্যই বিচিত্রামাসিমার। মনীশ ঘরে বসেই শুনতে পাচ্ছিল, বিচিত্রামাসিমা বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলেছেন সমবেত ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশে, বুঝলে, কী দেমাক হয়েছে বলোতো মেয়েছেলেটার। মুখের ওপর অমনি বলে কিনা কাজ ছাড়তে হলে তোমাদেরটাই ছাড়বো, ওদেরটা নয়। কী বে-আক্কেলে মেয়েছেলে, অ্যাঁ? তিন-তিনটে বছর আমাদের গলিতে ওই কাজ করছিস, তোর বিপদে-আপদে আমরাই তো দেখি। এই সেদিন বললি, ছেলেটার খুব অসুখ, হাসপাতালে ভর্তি করেছি, পঞ্চাশটা টাকা দাও দেখি, দিদি। তা দিইনিকো তোকে? তা তোমাদের মেসোমশাই শুনে কী বললেন, বলো দেখি। বললেন, তোমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ডিস্চার করে দাও—

'ডিস্চার' শুনে কান্তা, শ্যামলিমা, অঞ্জলির মুখে এক ঝলক হাসি ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু এই মুহূর্তে রঙ্গিনীকে ডিসচার্জ করলে ঘরের কাজগুলো কে করবে ভাবতে ভাবতে ঘোষগিন্নি বললেন, আমিও তো রোজই ভাবি, কাল কাজ করতে এলেই বলে দেব, তোকে আর দরকার নেই, রঙ্গিনী। কিন্তু বলব কী, এ জায়গাটা এমন যে আর একটাও লোক পাওয়া যায় না!

রায়গিন্নি বললেন, সেদিন আমার মুখের ওপর ও বলে গেল, তোমাদের বাড়ি বড় আত্মীয়স্বজন আসে, দিদি। কাজে ঢোকার সময় বলেছিলে, মোটে চারজন লোক। এখন দু'বেলায় কতগুলো করে বাসন পড়ে বলো দেখি। তা ওমা, লোকের বাড়ি লোক বেড়াতে আসবে না? তার জন্যে মাইনে বাড়াতে হবে?

গুঁইনদি বললেন, তা বিচিত্রা, তোমার কর্তা তো খোদ সরকারের আপিসে চাকরি করে। কত লোকের সঙ্গে জানাশুনো। একটা ভালো কাজের লোক আনিয়ে দাও না। তাহলে এই আপদটাকে বিদেয় করে দি। যা মুখ—

বিচিত্রামাসিমা অমনি আমতা-আমতা করে বললেন, আমি তো রোজই বলি, দেখো না, মেদ্‌নিপুর-টেদনিপুর থেকে একটা মেয়েছেলে পাওয়া যায় কিনা। তা এই দেখছি, সেই দেখছি, ব্যস্। তা অঞ্জলি, কান্তা, তোমরাও দেখো না, যদি আর একটা লোক পাওয়া যায়। এ অনাচার তো আর সহ্য করা যায় না। তোমাদের মেসো বলছিলেন, কাগজে অ্যাডভাইস করো, তাহলে কাজের লোক ঠিক জুটে যাবে। কাজের লোকের আবার অভাব! লোকে কাজ পায় না—

কান্তা বিড়বিড় করে বলল, লোকে কাজ পায় না ঠিক, কিন্তু এদের কাজের অভাব হয় না। আমাকে সেদিন ধমকে দিয়ে বলেছে, বেশি ত্যাগুইম্যাগুই করলে বেহালার কাজ ছেড়ে দিয়ে যাদবপুরে কাজ ধরে নেব। তাহলে আর মাঝেরহাট ঠেঙিয়ে বেহালার বাস ধরতে হয় না।

মুহূর্তে বোর্ড মিটিং নিঃস্তব্ধ। রঙ্গিনী যে এতগুলো পরিবারের দুর্বলতা ভালোই বুঝে ফেলেছে তা উপলব্ধি করে কয়েক লহমা থম হয়ে গেল সবাই। অঞ্জলি বলল, সেদিন আমাকে কী বলল জানেন, ভাড়াটে বাড়িতে রোজ সকালে রুটির সঙ্গে মাংস খেতে দেয়।

বিচিত্রামাসিমা শুনে প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, বললেন, সে তো তাহলে গোরুর মাংস গো—

—না, বলল তো পাঁঠার মাংস। ওরা নাকি গোরুর মাংস খায় না, সস্তা বলে। অত বড়লোক সস্তা মাংস খাবে কেন?

বিচিত্রামাসিমা তখন চোখমুখ সিঁটকে বলছেন, ওগো, তোমরা একটা লোক দেখোগে, নইলে ওর হাতের মাজা বাসনে যে খেতেও গা কেমন করে আমার। ও কান্তা, ও অনিন্দিতা—

বোর্ড মিটিংয়ে যেমুহূর্তে 'আর একটা লোক দেখা হোক তাহলে' এরকম সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হতে চলেছে, সেমুহূর্তে দেখা গেল রঙ্গিনী ইউসুফ আলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে আসছে এদিকেই। তাকে দেখে তৎক্ষণাৎ বিচিত্রামাসিমাই বললেন, এই রঙ্গিনী, আগে আমার বাড়িতে কাজটা করে দিয়ে যা! উনি আজ একটু সকাল-সকাল অফিস যাবেন।

মিটিং অতঃপর ভেঙে গেল, কিন্তু সিদ্ধান্তটা কার্যকরী করার জন্য বিচিত্রা-মাসিমাই বারবার চাপ দিতে লাগলেন।

অনিন্দিতা মিটিং সেরে ফিরে আসতেই মনীশ বলল, কী হল, এত সিরিয়াস মিটিং হল, কিন্তু উইদাউট হাটং! অন্তত চা-ও আসতে পারত এককাপ করে। তা কী সব হল মিটিংয়ে?

অনিন্দিতা হাসতে হাসতে বলল, কী আর হবে, অশ্বডিম্ব। বিচিত্রামাসিমা নাকি রঙ্গিনী বাসন মেজে রেখে গেলে, তার ওপর গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন খুব করে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কাগজে হয়তো 'অ্যাডভাইস' করতে হবে—

কাগজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরুনোর আগেই হঠাৎ সেদিন দিনেদুপুরে একটা কাণ্ড ঘটে গেল সূর্যশঙ্কর রায় থার্ড বাইলেনে। সেটা ছিল বন্ধ-এর দিন। আজকাল রাজনৈতিক নেতারা হুটহাট করে বন্ধ ডেকে নিজেদের মাস্‌ল্‌-এর চেহারাটা সর্বসমক্ষে দেখানোর চেষ্টা করেন। মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার দু-দুটো ছুটি ছিল। হঠাৎ বুধবার বন্ধ ডেকে দেওয়ায় টানা তিনদিন ছুটির আমেজ। বন্ধের দিন ট্রেন-বাস চলে না এই অজুহাতে রঙ্গিনী অবধারিত অ্যাবসেন্ট হয়। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে রঙ্গিনী হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, সে হল্ট করবে এখানে, যাতে বুধবার কাজে আসতে পারে সবার বাড়ি। হঠাৎ রঙ্গিনীর মাথাটাথা খারাপ হল কিনা এ নিয়ে যখন কানাকানি হচ্ছে, তখন রহস্যটা খুঁজে বার করলেন রায়গিন্নি। তিনি হালদারদের পাশেই থাকেন। বললেন, ও কি আর আমাদের জন্যে হল্ট করছে। আসলে হল গিয়ে ওই মুসলমান বৌটার জন্যে। ওর নাকি আবার শিগ্‌গির বাচ্চা হবে। শরীর খারাপ, তাই রঙ্গিনীকে বলেছে থাকতে।

অনিন্দিতা বলল, না দিদি। ও একটু ভয় পেয়েছে। এতগুলো বাড়ির চাকরি গেলে ও কি চট করে আর পাবে কাজ!

রঙ্গিনী যে বেশ ভয় পেয়েছে তা তার কথা, ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল কদিন ধরে। তেমন মুখ করে না আর।

শুনে কেউ কেউ দাঁত কিড়মিড় করলেও এটা মেনে নিল, তাতে আদতে লাভ হয়েছে বাকি সবার। নইলে শুধু বুধবার নয়, ট্রেন ভোরে ছাড়েনি এই অজুহাতে রঙ্গিনী নির্ঘাত বৃহস্পতিবারও কামাই করত।

বন্ধের দিন বলে চক্রবর্তী বাড়িতেও বেশ ছুটির মেজাজ। আগের দিন সন্ধেয় বাজার থেকে মাংস কিনে এনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন। বিচিত্রামাসিমা সেই মাংসই বেশ মশলাটশলা দিয়ে রেঁধেছেন। তরিবৎ করে। সেই গল্পই একটু আগে হেসে হেসে বিচিত্রামাসিমাও শুনিয়ে গেছেন অনিন্দিতাকে। অনিন্দিতা অবশ্য ডিমের ঝোলই বরাদ্দ করেছে তাদের বাড়িতে। মনীশ স্নান সেরে সবে বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। হঠাৎ সামনের বাড়িতে চেঁচামেচি শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, কী হয়েছে, মাসিমা।

বিচিত্রামাসিমা তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন। ওরে আমার কী হল রে—

মনীশ-অনিন্দিতা দুজনেই ছুটে বেরুল বাইরে। ব্রজবাবুর বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল, ব্রজবাবু বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছেন সকালে। বেশ কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারেননি, জ্ঞান হারাননি পুরোপুরি। কিন্তু আচ্ছন্নের মতো পড়েছিলেন। এখন অবশ্য চোখ মেলে তাকিয়েছেন, তবে বাঁ-হাতটায় ভীষণ

যন্ত্রণা হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনীশ বরফ দিয়ে ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু যন্ত্রণা তো কমলই না, উপরন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত ফুলে ঢোল।

বিচিত্রামাসিমার চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে জড়ো হয়েছেন রায়বাবু, ঘোষবাবু, গুঁইনদা, পাড়ার দু-তিনজন ছেলে লাল্টু, বিশে, পকাই। তারা সবাই একযোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে হাড় ভেঙেছে, এক্ষুনি কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে নিয়ে আসতে হবে। একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ডাকো।

তৎক্ষণাৎ লাল্টু তার ঝকঝকে নতুন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো। একেই তো ঘোর দুপুরবেলা, তার ওপর বন্ধের দিন। লাল্টু তিড়িং-বিড়িং করে বহুক্ষণ ঘুরেও একটা রিক্‌শ পর্যন্ত জোগাড় করে আনতে পারল না। এদিকে ব্রজবাবু চোখ উল্টে, প্রায় শিবনেত্র হয়ে বিছানায় শুয়ে গোঙাচ্ছেন, আর মাঝে-মাঝে বলছেন, আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

রায়বাবু বললেন, তাহলে মেনরোডে গিয়ে খাসনবীশবাবুকে গিয়ে ধরো। ওঁর গাড়িতে করেও যদি একবার হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

বিশে তৎক্ষণাৎ ঘুরে এসে বলল, খাসনবীশবাবু বললেন, ওঁর গাড়িতে তেল ভরা নেই। আজ বন্ধ, তা ওঁর একদম মনে ছিল না।

পকাই বলল, আসলে লোকটা রামভীতু। আজ বন্ধের দিন গাড়ি বের করলে যদি রাস্তায় কেউ ধরে, সেই ভয়েই—

ঘোষবাবু বললেন, তাহলে কোনো একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেই তো হয়। ডাঃ হাজরা, কিংবা ডাঃ ঘোষাল—

লাল্টু বলল, সে চেষ্টাও আমি করেছিলাম। ওঁরা দুজনের কেউই তো এখানে থাকেন না। কেউই আজ চেম্বার খোলেননি।

রঙ্গিনী একটু আগেই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মধ্যে। ব্রজবাবু অমন কাতরাচ্ছেন দেখে বলল, আমাদের ডাক্তারবাবুকে একবার বলে দেখব?

—আমাদের ডাক্তার! তিনি আবার কে?

রঙ্গিনী আমতা-আমতা করে বলল, ওই যে গো, আমি যাদের বাড়ি কাজ করি—

গলিতে যে একজন ডাক্তার আছে তা অবশ্য কারও স্মরণে নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ এর আগে যা দু-একবার তাঁকে রাত-বিরেতে কল দেওয়া হয়েছিল। তিনি একবারও আসেননি, বলেছেন, সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য আসি। যাতে কেউ ডিস্টার্ব না করে সেইজন্যেই তো মহেশতলার বাড়ি ছেড়ে এতদূরে এসে ঘরভাড়া নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁর নাম

উঠতেই রায়বাবু বললেন, না, না, ওনাকে ডাকার দরকার নেই। ওনার খুব ডাঁট।

ব্রজবাবু কাতরাতে কাতরাতেও বললেন, না, না, মুসলমান ডাক্তার আমি দেখাব না।

ঘোষবাবু বললেন, ডাকলেও উনি আসবেন না।

বিচিত্রামাসিমা তখন মুখ কাঁদো-কাঁদো করে বললেন, কী হবে তাহলে? মানুষটা এরকম বেঘোরে কষ্ট পাবে নাকি? দেখুন না, ফুলে জয়ঢাক হয়ে গেছে। ওরে বাবা, কী ফোলা—

রঙ্গিনী চোপা করে বলল, আর আপনারা মুসলমান-মুসলমান করে গ্যালেন। কেন, ওনার নার্সিং হোমে যারা ভর্তি হয়, সব মুসলমান নাকি?

ইতিমধ্যে ব্রজবাবুর গোঙানি আরো বাড়তে লাগল। যত সময় যাচ্ছে, ততই হাত ফুলছে ক্রমশ। সবাই হাঁ করে দেখছে, আর হা-হুতাশ করছে। কিন্তু বন্ধের দিন বলে কীভাবে সুরাহা হবে ভেবে দিশে করতে পারছে না।

মনীশ বলল, মেসোমশাই, আমি শুনেছি, ইনি অর্থোপেডিক্সেরই ডাক্তার। অসুখের সময় জাতপাত নিয়ে ভাবলে কি চলে! এরপর যন্ত্রণা ক্রমশ আরো বাড়বে কিন্তু। রঙ্গিনী, তুমি ছাখো তো, উনি আসেন কি না। না এলে আমরা সবাই যাব ওকে রিকোয়েস্ট করতে। আজ বন্ধের দিন বলেই—

লম্বা, সুদর্শন ডাক্তারটি এমনিতে গম্ভীর। কিন্তু ব্যবহারটি যে খুবই ভালো তা সবাই স্বীকার করেন এ পাড়ায়। অবশ্য সারাদিন বাইরে-বাইরেই থাকেন। একমাত্র রবিবারেই যা থাকেন বাড়িতে। তাতে সবার সঙ্গে আলাপ গড়েও ওঠেনি তেমন।

আজ কিন্তু রঙ্গিনী খবর দিতেই চলে এলেন ব্রজবাবুর বাড়িতে। সঙ্গে তাঁর অ্যাটাচি। ব্রজবাবুকে দেখে-টেকে বললেন, মাল্টিপল ফ্রাকচার, একটা এক্স-রে করানোর দরকার এক্ষুনি। আমার বাড়িতে তো সব ব্যবস্থা নেই। চলুন, আমার গাড়িতে করে আপনাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাই।

ব্রজবাবু তখনও আঁতকে উঠে বলছেন, আপনার নার্সিং হোমে!

রঙ্গিনী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলল, চলুন না মেসোমশাই, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। মাসিমা, আপনিও চলুন।

পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ইউসুফ আলির গাড়ি ব্রজমেসো, বিচিত্রামাসিমা আর রঙ্গিনীকে নিয়ে রওনা দিতেই মনীশ হেসে বলল, যাক, রঙ্গিনীকে আর ডিসচার্জ-লেটার পেতে হবে না। কী বলো?

চেনা স্বর অচেনা মুখ

কল্যাণ মজুমদার

রবিবারের সকাল রোড রোলারের মতন মন্থর। বা গ্রীষ্ম দুপুরের হাওয়ার মতন বইতে ভুলে গিয়ে স্তব্ধ। স্তব্ধ কল্পদ্রুম বলা যায় কি? সময় যখন কাটতে চায় না আপনা থেকেই নানা অর্থহীন ভাবনা মাথার উর্বরতায় চরে। কি-করা-যায়, কি-করা-যায় ভাবতে ভাবতেও কিছুটা সময় কাটে।

অন্য রবিবারের মতন আজো বাজারে গেছে। ফিরে এসে চা বানিয়ে খবরের কাগজসহ গিলেছে। কাজের মেয়ে সন্ধ্যা আসবে দশটার পর। ও এসে রান্না করা, ঘর মোছা, জামাকাপড় ধোয়া শেষ না-করা পর্যন্ত বেরুবার উপায় নেই। সন্ধ্যা চলে গেলে উপল ক্লাবে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে অলস আড্ডা দেবে কিছুক্ষণ। বিয়ার বা ভদকা পান করবে। তারপর বাড়ি ফিরে ভাত খাওয়া ও পরিপাটি দিবানিদ্রা। উপল দেখেছে সন্ধ্যা কাজ সেরে চলে গেলেই সময়ের গায়ে যেন জেট-গতি লাগে। তার আগে পর্যন্ত সময় যেন পাহাড়ি পথের অনিচ্ছুক গাধা।

টি ভি চালিয়ে গার্ডেনচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল উপল। কি একটা সিরিয়াল চলছে। কিছুই বুঝতে পারল না। মেয়েগুলো দেখতে ভালো বলে ও দেখতে থাকে। একটি স্বল্পবাস মেয়ে ওকে আকৃষ্ট করে। উপল মেয়েটির স্ট্যাটিসটিকস আন্দাজ করার চেষ্টা করে।

এই সময় টেলিফোন বাজল। চতুর্থ রিংয়ের পর উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে —হ্যালো—

কোনো উত্তর নেই।

—হ্যালো—হ্যালো—

কোনো উত্তর নেই।

রিসিভার রেখে দিতে গিয়েও আরেক বার বলল—হ্যালো—এবার নারীকণ্ঠ বাজল—রেখে দিচ্ছিলেন বুঝি?

—কে বলছেন?

—আমি বলছি। মেয়েটির গলার স্বর ঈষৎ আদুরে। একটুখানি দুষ্টুমি মেশানো।

উপল মনে করার চেষ্টা করে এই কণ্ঠস্বর কখনো শুনেছে কিনা। মাথার কমপিউটার স্মৃতির শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খুঁজে ব্যর্থ হয়। কোনো রেকর্ড নেই।

—কাকে চাইছেন?

—কাউকে না।

—তবে ফোন করলেন কেন?

—এমনি ইচ্ছে হলো।

উপল কৌতূহলী বোধ করে। গলার স্বর শুনে বয়েস আন্দাজ করায় ওর কোনো বুৎপত্তি না-থাকলেও মনে হল ২২/২৩-এর বেশি হবে না। কমও হতে পারে। কেননা কণ্ঠস্বরে এখনো যেন কিশোরীর লঘুচাপল্য জড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে টিভি অফ করে।

—কি হলো, চুপ করে আছেন কেন!—উপলের মনে হলো, ঠিক যেন ঠোঁট ফোলানো উচ্চারণ!

—কি বলব বলুন তো—

—যা খুশি। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

—আপনি একলা আছেন?

—এ ঘরে আমি একা। নিচের ঘরে অন্যরা আছে। আপনি? আপনিও কি একলা?

—আকাশ জেনেছে, মাটিও শুনেছে, আমি তো করিনি আত্মগোপন! জানেন তো আমবেলিক্যাল কর্ড কেটে সন্তানকে মার কাছ থেকে আলাদা করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ একলা হয়ে যায়। একলাই থাকে। একলাই অন্তিম-যাত্রার পথিক হয়। হ্যাঁ, মাঝখানের অনেকটা সময় শুধু বেঁচে থাকার জন্য মানুষে মানুষে গলাগলি, মেলামেশা, প্রণয়, বিদ্বেষ, খুনোখুনি ইত্যাকার সবকিছুই করে থাকে। আমিও এই পৃথিবীর কোলহল, দূষণ, ভূষণ, সংশয়, বিশ্বাস, অবিশ্বাস নিয়ে যে কোনো নাগরিক মানুষেরই মতন থাকি। কিন্তু ঘরে যখন ফিরি তখন স্বরাজ্যে স্বরাট। 'নিঃসঙ্গতা! জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বৎসর।'

—আপনি তো দারুণ সুন্দর কথা বলেন। কি করে শিখলেন?

—সুন্দর বলি কিনা জানি না। তবে শিখেছি আমার ফার্স্ট গার্ল ফ্রেণ্ডের কাছ থেকে।

—কে তিনি? কোথায় আছেন?

—আছেন আমাদের দেশের বাড়িতে। ঝাড়গ্রামে। তিনি আমার মা—'আজো যার অপার ক্ষমায় পৃথিবীকে বুকে টানি।'

ওপারে আলি আকবরের ঝালার শব্দের মতন হাসি বাজে—ওঃ আপনি না—আমি তো কত কি ভাবছিলাম—বাড়িতে আর কে আছে?

—দু ভাই আছে, একটা পারুল বোনও আছে।

—আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এখন রাখতে হচ্ছে, পরে আবার ফোন করব। আপনার আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি করব কেন! আমার কথা বলতে ভালো লাগছে। ফোন করবেন

আপনি।

—আপনার নাম কি?

—এ জন্মে উপল চৌধুরি—'আর-জন্মে আনন্দ ছিলাম'।

—বাঃ! আপনার ফোন নম্বর কত?

—সে কি? আপনিই তো ফোন করেছিলেন।

—আমি কি নম্বর জেনে করেছি! আন্দাজে ঘুরিয়েছি ডায়াল—দু'তিনটে বাজে লোকের পর আপনার নম্বরটা লাগল।

—আমি বাজে লোক নই বলছেন?

—তাহলে এতক্ষণ কথা বলতাম নাকি! নম্বরটা বলুন।

নম্বরটা বলে উপল জানতে চায়—আপনার নম্বর—

—উঁহু। সেটা বলব না, কখনো বলব না। আপনি ফোন করতে পারবেন না। শুধু আমি করব ইচ্ছে হলে।

—নামটা বলবেন নাকি তাও গোপন রাখবেন।

—শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধেবেলায় বাড়ি থাকবেন?

—ফোন তুললেই বুঝবেন বাড়িতে আছি। না-থাকলে টেলিফোন কেউ তুলবে না।

—কেন?

—আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না বলে।

—ও! আমি কিন্তু এখন রাখছি।

উপল কিছু বলার আগেই ওপারে টেলিফোন রাখার শব্দ হলো। ওর মনে হলো মেয়েটি ভারি অদ্ভুত তো! অদ্ভুত এবং মজার। নিশ্চয় নিঃসঙ্গ। দুঃখীও কি!

খুব মন দিয়ে চাকরি করা ছাড়া উপল আর যা করে তা হলো অজস্র কবিতা পড়া। গল্প-উপন্যাসও পড়ে। তবে কবিতাই তার বেশি প্রিয়। বহু কবির নানা লাইন মুখস্থ থাকায় কথা বলার সময় সেসব লাইনগুলো নিজের মতন করে ব্যবহার করে। এতে কপিরাইটের আইন ভঙ্গ হয় কিনা ও জানে না। তবে শব্দ ছন্দের খেলাটা ওর ভালো লাগে। কোন কোন সময় একই সঙ্গে একাধিক কবির লাইনও মিলিয়ে মিলিয়ে প্রায় মৌলিক সংলাপ বলে। বন্ধুমহলে এজন্য ওর খ্যাতি ছিল।

এখন কাজের চাপের ফলে এবং প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয় বলে কবিতা পড়া কিছুটা কমেছে। তার চেয়েও কমেছে সমঝদার কথা বলার লোক। আজ বহুকাল পরে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নিজের স্টাইলে কথা বলতে পেরে নিজের অনুভবে এক অমল আনন্দের ঝলমলানি টের পায়। উপল তিন-চারটে কবিতার বই নিয়ে বসে।

সন্ধে আটটা পর্যন্তও শর্মিষ্ঠার ফোন না আসায় ভাবছিল খেয়ালি মেয়েটির

খেয়াল মিটেছে। বা অন্য কোনো খেয়ালে মেতেছে। ও যে ঠিক শর্মিষ্ঠার ফোনের প্রতীক্ষায় ছিল, তা নয়। তবু মনের নিভৃতে সামান্য হলেও কুঁড়ি-প্রত্যাশা যে ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

প্রাত্যহিক রুটিনের মতন আটটা বেজে গেছে দেখে হুইস্কির বোতল বের করে উপল। পাশের রান্নাঘর থেকে গ্লাস ও জল আনতে যাবে, এই সময় ফোন বাজল।

—হ্যালো—

—আপনি ভেবেছিলেন আমি ফোন করব না—

—আমার ভাবার তো কোনো সুযোগ নেই। আপনার ইচ্ছে হলে ফোন করবেন বলেছিলেন। আপনার ইচ্ছের গাছে জল ঢালা তো আমার সাধ্যের বাইরে।

—তাই বুঝি! —ওর গলায় চাপা হাসি মুড়মুড় করে। আচ্ছা, আপনি মার কাছে যান না?

—যাই মাঝে মাঝে—যখনই মসৃণ মমতার সমতলে আঁজলা জলের গভীরতার স্বাদ পেতে ইচ্ছে হয়।

—খুব সুন্দর! আপনি লেখেন?

—হ্যাঁ, লিখি বইকি। সেলস রিপোর্ট, মেমো, বিজনেস লেটার—প্রচুর লিখি।

—ধ্যাৎ আমি তা বলিনি। লেখা মানে কবিতা-গল্প—

—ওগুলো পড়ি। খুবই পড়ি। নিজে লিখতে পারি না। পারি না বলেই অন্যদের থেকে ধার করি। সুবিধে হচ্ছে এই ধারগুলো শোধ দিতে হয় না।

—সে তো বুঝতেই পারছি। আর কি করেন?

—শহরে মানুষে অন্তরঙ্গ পরিক্রমা। জীবনের গদ্যপাঠ করি প্রসন্ন নির্ভয়ে। মানে, একটা চাকরি করি।

—পরিক্রমার কথা বললেন—ট্যুরে যেতে হয় বুঝি?

—কখনো কখনো। যেমন কালই যাব মন্দির-শহর ভুবনেশ্বর।

—কবে ফিরবেন?

—সম্ভবত বুধবার। নইলে বিষুৎবার অবশ্যই।

—আপনার বাড়িটা কোথায়?

—বাড়ি! যেখানে শুধু দেয়াল আছে ঝরে মুছে গেছে সব বর্ণালী—যা শুধু এক বৃদ্ধ কাকের আশ্রয়—তাকে বাড়ি বলা নেহাৎ অন্যায়। আমার এটা আস্তানা মাত্র। যোধপুর পার্কে।

—ও! আমরাও খুব কাছেই থাকি। উঁহু, ঠিকানা জানতে চাইবেন না। বলব না। তবে কাছাকাছি থাকি যখন এমন তো হতেই পারে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই দোকান থেকে জিনিস নিচ্ছি, কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না। কি

মজা হবে বলুন তো! আরো মজা যদি বাড়ি ফিরে আমরা ফোনে কথা বলি। দারুণ মজা! —সশব্দ হাসির ঝর্না ভাঙে।

উপলও আপনমনে হাসে। মেয়েটা কিঞ্চিৎ পাগল আছে!

শর্মিষ্ঠা বললো, আপনি বিয়ে করেননি কেন?

—কে বললো করিনি?

—করলে কি আর একলা থাকতেন! তারপর যেমন করুণ গলায় বললেন ঘরের দেয়ালের সব রং মুছে গেছে, তাতেই বুঝলাম। কেন করেননি?

—...

—কি হলো, বলুন।

—কি বলব ভাবছি। কোনো কৃষ্ণচূড়া বা করবীর শোক নেই। বিধুরগন্ধ স্মৃতির গোধূলি উজাড় করা কোনো গল্পও নেই।

—ঠিক আছে। বলবেন না তো বলবেন না। আপনার রান্নাবান্না কে করে?

—কাজের লোক আছে। নিজেও করি।

—আপনি রান্না জানেন?

—কিছু কিছু। কাজ চালাবার মতন আর কি!

—ইস্, কোনোদিন আপনার রান্না খাওয়া হবে না আমার। এখন রাখছি। এবার আমাকে রান্না করতে হবে। আপনি ফিরে এলে আবার ফোন করব। আপনি কি করবেন এখন?

লঘুস্বরে উপল জবাব দেয়—মদ খাবো।

তৎক্ষণাৎ ওপারে টেলিফোন রাখার শব্দ হয়।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে উপল ভাবছিল মেয়েটি—নাকি মহিলা—ভারি অদ্ভুত। নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেনি অথচ ওর সম্পর্কে সব জেনে নিল। ও ভেবেছিল মিথ্যে বলে। কিন্তু অকারণে মিথ্যে বলবে কেন? ও অবশ্য সাহস করে শর্মিষ্ঠাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। তাড়াহুড়ো করা ওর স্বভাব নয়। ও যদি আবার ফোন করে ক্রমশ জেনে নেবে। অন্যের বিষয়ে বেশি কৌতূহল দেখানো রুচিতেও বাধে।

ভুবনেশ্বর থেকে বুধবারে ফেরা হয়নি। বিষুৎবার বাড়ি পৌঁছায় রাত ১১টা নাগাদ। শুক্রবার সকাল সাতটায় ফোন এলো—।

—হ্যালো—

—কাল কত রাতে ফিরেছেন?

—মধ্যরাতের একটু আগে—তখনো আকাশে ছিল বাউল জ্যোৎস্না আর হীরেফুলের চাষ।

—বুধবার আসেননি দেখে কাল সন্ধেবেলায় আবার ফোন করি। ফোন বেজে গেল। তারপর এয়ারপোর্টে ফোন করলাম। ভুবনেশ্বরের ফ্লাইট লেট ছিল।

—আমি তো প্লেনে আসব বলিনি। আপনার কেন মনে হলো?

—কি জানি। বুধবার আসেননি দেখে মনে হয়েছিল হয়ত। এখন রাখছি। পরে ফোন করব।

পরে মানে রবিবার সকাল নটায়। সেদিন জানা গেল শর্মিষ্ঠা ঠাকুর্দার কাছে থাকে এখানে। ঠাকুর্দা সম্ভবত ডাক্তার বা আইনজীবী। নাম-ঠিকানা কিছু বলতে রাজি হয়নি। মা-বাবা নেই। দাদা-বৌদি থাকে রামপুরহাট। মাঝে-মাঝে ওরা কলকাতায় আসে। সেও যায় রামপুরহাট। রামপুরহাট শুনেই উপল বলেছিল—রামপুরহাট না হয়ে যদি মল্লারপুর হতো তবে আরো ভালো লাগত।

—কেন?

—মল্লারপুর শুনলেই কেমন যেন মিউজিক্যাল ঝঙ্কার লাগে। সবুজে সবুজ, নীলিমায় নীল। দীর্ঘ তালগাছের নিচে বাঁশি বাজাচ্ছে একাকী রাখাল। দিগন্ত জুড়ে প্রণত গোধূলি।

—দারুণ! হাউ রোম্যান্টিক! রামপুরহাটেও তালগাছ আছে। দিগন্তে গোধূলিও আসে। কেবল আমার আপনার মতন শব্দ ভাষা নেই।

উপল জেনে যায় ইংরেজিতে এম. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হয়েও পড়া ছেড়ে দিয়েছে শর্মিষ্ঠা।

—পড়া ছাড়লেন কেন?

—ভালো লাগল না। মনে হলো আমার আর কিছু হবার নয়। বীতব্রত মানুষের কোনো আরাধনা থাকে না।

—মানতে পারলাম না। আপনার ভাবনা ঠিক নয়।

—হবে হয়ত। তবু আমার ভাবনাটা আমারই।

রবিবার সকালে নটায় ফোন করা শর্মিষ্ঠার রুটিনে দাঁড়িয়ে যায়। উপলও নিশ্চিত ঘরে থেকে ফোনের অপেক্ষা করে। যদিও কোনোদিন দেখা হয়নি, উপল ওর ঠিকানা ফোন নম্বর কিছুই জানে না, তবু মনে হয় যেন ছোট নকশায় মগ্নব্রতী এক ভূগোলছেঁড়া সাঁকো গড়ে তুলেছে। তিনমাসে দুজনে তো কম কথা বলেনি! অজস্র পদাবলী ঝরিয়ে গেছে দিনে দিনে।

একদিন জিজ্ঞেস করে উপল, বিয়ে করছেন না কেন?

—আমাদের দেশে মেয়েরা বিয়ে করে না, বিয়ে হয়।

—আপনার হলো না কেন?

—সকলের কি সব হয়! —গলার মেদুর বিষণ্ণতা বুঝতে ভুল হয় না উপলের।

—ওটা আমার কথার জবাব হলো না।

—হয়ত। আমি যা বলব সেটা আপনি মানবেন না। শুধু কথা বলার আনন্দটুকু নষ্ট হবে।

—তবু বলুন।

—যদি বলি আমি আজন্ম বিধবা, মানবেন?

—আমার মানা না-মানায় কিছু আসে যায় না। জীবনটা আপনার, জীবনের সত্যানুভবও আপনার নিজস্ব। আমি শুধু জানি এই পৃথিবীর আলো হাওয়ায় আপনার দীর্ঘ বসতি আছে। যদি আপত্তি না থাকে তবে আজন্ম বিধবা-বিষয়টা একটু বিশদ করবেন?

অজস্র টুকরো কথা জুড়ে উপল যে কোলাজটি তৈরি করে তার নাম দেওয়া যায়—'জাতক কথা'। তথাগত ছিল যেন কোনো উপন্যাস থেকে উঠে-আসা ঝলমলে যুবক। কৃতী ছাত্র, টেবিল টেনিসে তিনবার কলেজ চ্যাম্পিয়ন। হৈ-চৈ করে বাঁচতে ভালোবাসত—চঞ্চল উদ্দাম যুবকের মতন। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে চেনা জানা সময়ের মাপে এক দশকের, জীবনের মাপে আজন্মের, বিশ্বাসের অঙ্গীকারে জন্মান্তের। তথাগত ও শর্মিষ্ঠা জীবনবাসরে যুগলবন্দী বাজাবে সেতো নির্ধারিত ছিলই। দিনও প্রায় ঠিক ছিল শর্মিষ্ঠার সীমন্তিনী হবার। তথাগতর পিলানি থেকে ফেরার অপেক্ষা শুধু। কিন্তু প্রাণোচ্ছল মানুষের পরমায়ু দীর্ঘ হয় না। পিলানি থেকে বম্বে থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত পরিক্রমা করেও আকাঙ্ক্ষিত বিশল্যকরণী না পাওয়া বীতপ্রাণ তথাগত নিউইয়র্কেই লীন হয়ে গেল। তিন বছর আগে। শর্মিষ্ঠা পড়া ছাড়ে তখনই।

উপল বলে, আপনার দুঃখ আমি বুঝি। এই শোকের সান্ত্বনা সহজলভ্য নয়। তবে আমার একটু নিবেদন আছে। বেদনারও নানা রং হয়—একটা হয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির মতন, আরেকটা চন্দনচর্চিত লাল চেলির মতন। প্রতি সকালে যখন রাজর্ষি সূর্য ওঠে তখন কি রাতের অন্ধকারের কথা মনে রাখে কেউ?

—ওসব কাব্যে হয়। জীবন কবিতা নয় মশাই।

—জানি। আবার এও জানি যে-বেহালায় বেহাগ বাজে তাতে ভৈরবীও বাজে। বাজে জয়জয়ন্তী, ইমনকল্যাণ।

—আপনার সঙ্গে কথায় পারি না আমি।

—পারার দরকার নেই। যা পারেন তাই করুন।

—কি?

—পড়াশোনা শুরু করেনি। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে জাস্ট শুরু করুন। স্মৃতির সংগ্রামে অবিজিত হোন।

—ভয় করে। এতদিন পর পারব কি?

—পারবেন। আপনার প্রাণের প্রতিভাই দেখবেন প্রসন্ন পূর্ণিমার হিরণ্ময় বিভায় ভরে দেবে আপনারই মেদুর প্রাঙ্গণ।

সপ্তাহ দুয়েক পরে হঠাৎ এক শনিবারে বিকেল তিনটে নাগাদ ফোন করে শর্মিষ্ঠা। ওকে পেয়েই বললো—কবে ফিরেছেন?

উপল দিন দশেকের জন্য বাইরে গিয়েছিল।

বললো—দু'দিন আগে।

—শুনুন এখন বেশি কথা বলতে পারব না। আমি এসপ্লানেড পোস্টঅফিস থেকে বলছি।

—ওখানে কি করছেন?—উপল নানা মানুষের স্বরধ্বনি শুনতে পায়।

—আপনাকে ফোন করছি মশাই। শুনুন আমি এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য ফরম জমা দিয়েছি। এবছরই পরীক্ষা দেব।

—খুব ভালো। আগাম কনগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছি। এবছরই পরীক্ষা দেবেন জেনে আরো ভালো লাগছে।

—আপনার জন্যই করতে হলো। ফেল করলে আপনি দায়ী থাকবেন এখন রাখছি।

শর্মিষ্ঠা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, ফরম জমা দিয়েছে এটাই যথেষ্ট বড় খবর। তার উপর এ বছরেই পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত—ওর আত্মবিশ্বাস নিশ্চয় এখন আকাশের দিকে হাত বাড়াতে পারে। সঙ্গত কোনো কারণ নেই, তবু উপলের অনুভব এক শ্রীময় খুশির পার্বণ লাগে যেন।

পরদিন সকাল নটায় ফোন এলো শর্মিষ্ঠার—আজ না একটা দারুণ মজা হয়েছে। দোকানে গিয়েছিলাম কিছু জিনিস কিনতে। আমার পাশে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁর গলার স্বর, কথা বলার স্টাইল ঠিক আপনার মতন। আমার খালি মনে হচ্ছিল আপনিই, সেজন্য মুখ তুলে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই পারলাম না। যদি চেনামুখ হয়! সত্যি বলুন তো আপনি গিয়েছিলেন দোকানে?

—না। আমি ঘর থেকেই বেরুইনি। বাট, আই সী য়ু স্মাইল অ্যাক্রস দ্য ফোন!

—ধ্যুৎ! পুরো মুডটা অফ করে দিলেন! মিথ্যে করেও তো বলতে পারতেন আপনিই ছিলেন দোকানে। তাহলে সারাজীবন ভাবতে পারতাম আপনার সঙ্গে অন্তত একবার দেখা হয়েছিল, কিন্তু চেনা হয়নি।

—আপনার কি এখনো মনে হয় আমাদের চেনা হয়নি? আপনি হয়ত আমাকে চেনেননি। আমি আপনাকে চিনেছি।

—কিভাবে চিনলেন?

—এতদিন তাহলে কি কথা বললাম! কেন বললাম! আই ক্যান ফীল দ্য ময়শ্চার অব য়েয়র হেয়ার। অ্যাণ্ড স্মেল দ্য মাস্ক অব য়েয়র কোলন!

—বাঃ! এগুলো তো আগে শুনিনি। কার লাইন?

—জানতে চাইছেন কোত্থেকে ধার করেছি?—একজন বিখ্যাত শেঠের কাছ থেকে—বিক্রম শেঠ। বলুন, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

—ঝোঁকের মাথায় ওসব করে ফেললাম। এখন মনে হচ্ছে ঝুঁকি না-নিলেই ভালো হতো।

—সেতার বাজাতে শুরু করেছেন?

—মাঝেমধ্যে একটু-আধটু।

—আপনি কথা রাখছেন না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নিয়মিত দুবেলা বাজাবেন। মাস্টার ঠিক করেছেন?

—মাস্টারমশাই আসেন। আমার বাজাতে ভালো লাগে না।

—আপনাকে একদিন বলেছিলাম অতীত নোঙরহীন। বর্তমানই এনে দেবে ভবিষ্যতের রক্তজবা—যা আপনার কপালের টিপ হবে।

—আমি আপনার মতন অত আশাবাদী নই।

—বাদী না হয়ে বিবাদীই থাকুন। কিন্তু রোজ সেতার বাজান। আর পরীক্ষার জন্য তৈরি হোন। এ-পরীক্ষায় জোট বাঁধার কোন উপায় নেই। একলাই তৈরি হতে হবে।

—আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

—কোনো সন্দেহ আছে। এনিটাইম। এনিথিং।

—আমরা বেশ কিছুদিনের জন্য রামপুরহাট চলে যাচ্ছি। না-ফেরা পর্যন্ত আর ফোন করা হবে না।

—ভালো থাকবেন। সেতারটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এরপর দীর্ঘকাল শর্মিষ্ঠা ফোন করেনি। উপলের নিজে থেকে ফোন করার খোঁজ করার উপায় নেই। অফিসের কাজে ওর ঘোরাঘুরি ছিলই। সেটা আরো বেড়ে গেল পোর্টব্লেয়ারে নতুন ব্রাঞ্চ খোলার জন্য। মাস-তিনেক সেখানে ওকে থাকতে হলো। রবিবারে ঘরে থাকলে নটা বাজলেই শর্মিষ্ঠার ফোনের জন্য নিজের ভেতরে একটা প্রত্যাশা তৈরি হতো। ভাবত ঐ খেয়ালি মেয়েটি স্মৃতির হিমঘর থেকে বেরিয়ে রৌদ্রের উষ্ণতা খুঁটে নিচ্ছে কিনা। সেতারের সুর মগজে জমা হলে গগনবিহারী মনে ইন্দ্রধনু উদ্ভাসিত হবেই।

ঠিক কতকাল, হিসেব কষতে পারবে না উপল, শর্মিষ্ঠা ফোন করেনি। ও ভেবে নিয়েছে, খেয়ালি মেয়ের উপল-খেলা শেষ। শোকের কারণ ছিল না। অতিরিক্ত দীর্ঘশ্বাসও হৃদয়ে নিঙড়ে নির্গত হয়নি। তবু অনুভবের অনেক গভীরে হারিয়ে-যাওয়া সুরের মতন এক অনির্বচনীয় শূন্যতাবোধ ছিলই। এই স্বীকারোক্তি উপল করতে বাধ্য।

উপল ক্রমশ নিশ্চিত হয়ে যায় শর্মিষ্ঠা-অধ্যায় জীবনের এক রমণীয় কৌতুক, যা শিল্পমহিমা দাবী করতে পারে। এই পাওয়াটাও তো কিছু কম নয়। স্মৃতির নীহারিকায় সপ্তর্ষি যেন। দিনানুদৈনিকতার টানাপোড়েনে এখন আর মনেও পড়ে না জীবনে কখনো শর্মিষ্ঠা-নামক অদেখা অজানা নক্ষত্রচ্যুতি ঘটেছে।

তারপর হঠাৎ—একেবারেই হঠাৎ এক শনিবার সন্ধেবেলা উপলের টেলিফোন বেজে ওঠে। —হ্যালো।

—আমি বলছি।

গলা চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু অবিশ্বাস্য লাগে। যেন জন্মান্তরের ওপার থেকে কারুর স্বর শুনছে। সদা-প্রগলভ উপলও শব্দ হাতড়ায়।

—আমি বলছি—আমি শর্মিষ্ঠা—

—বুঝেছি। এতদিন কোথায় ছিলেন?

—অনেক জায়গায়। আপনাকে অনেক কথা বলার আছে। প্রথমেই বলি আমি পাশ করে গেছি।

—বাঃ! কনগ্রাচুলেশনস্!

—সব আপনার জন্য। আপনি জোর না করলে—

—আমি কিছুই করিনি। পড়েছেন আপনি, পরীক্ষা দিয়েছেন আপনি। আপনার ভেতরে যে অগ্নিপ্রভা ছিল তার উপর আপনি ছাই চাপা দিয়ে রেখে-ছিলেন। আমি শুধু আপনাকে ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলতে বলেছিলাম।

—জানেন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। ওরা আমাকে দেখা করতে দিল না।

—দেখা করতে চেয়েছিলেন! এমন কথা তো কখনো হয়নি। কিন্তু ওরা কারা—কারা বাধা দিল?

—আমার দাদু, আমার দাদা, বৌদি—

—ওঁরা কখনো বাধা দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আপনি নিজেই নিষেধের প্রাচীর গড়ে রেখেছিলেন।

—ঠিকই। কিন্তু আমার রেজাল্ট বেরুবার পর আমি সত্যিই আপনার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। চেয়েওছিলাম। তখন ওরা এমন একটা কাণ্ড করল আমার আর আপনার সঙ্গে দেখা করা হলো না।

—কি কাণ্ড করলেন ওঁরা?

—আমার বিয়ে দিয়ে দিল।

—ওঃ এতো দারুণ সুখবর। কনগ্রাচুলেশনস্ ওয়ান্স এগেন। আমি তো আপনাকে নানাভাবে এ কথাই বলেছি। আপনি নেমন্তন্ন করলেন না সে-দুঃখটা থেকে যাবে, তবু আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

—আপনি কিছু বোঝেন না—কিছু বোঝেন না। —গলাটা যেন চেরা শোনাল—আমার কত দুঃখ থেকে গেল জানেন? আপনার সঙ্গে দেখা হলো না, আপনার মাকে দেখলাম না, আপনার রান্না খাওয়া হলো না। বিশ্বাস করুন, সত্যিসত্যি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আপনাকে কত ধন্যবাদ কিভাবে জানাব ভেবে পাইনি। আপনার জন্যই সেতারে নতুন করে হাত

দিয়েছি। সেতার বাজাতে বাজাতে আবারও পড়ার আগ্রহ হলো! স্বেচ্ছাবন্দীত্ব থেকে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাশের নিচে। আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেই আমি বেঁচে থাকার ভিটামিন পেতাম।

—থামুন, থামুন, ধন্যবাদের বাহানায় আপনি যে মানপত্র পড়া শুরু করলেন। এসবের কোনো দরকার নেই।

—একটা সত্যি কথা বলবেন?

—কি কথা?

—এতদিনেও আপনার মনে আমার জন্য কি কোনোরকম সুরধুনী তৈরি হয়নি।

হো হো শব্দে হেসে ওঠে উপল। —আপনি সত্যি ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন! এখন কি এসব কথা বলতে হয়! ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন।

—আমি আপনাকে আবার ফোন করব।

—নিশ্চয় করবেন। আমার কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি জানি, আপনি করবেন না।

—কি করে জানলেন?

—অনেক আগেই বলেছি, আপনার চেয়ে আমার বয়েস অনেক বেশি। আপনার চাইতে জীবনকে আমি অনেকটা বেশি দেখেছি, চিনেছি, বুঝেছি।

—আপনি কিছু বোঝেননি। আমি ঠিক ফোন করব। আপনি কথা বলবেন তো?

—হ্যাঁ। আপনি ফোন করলে আমি কথা বলব—এতকাল যেমন বলেছি।

—আচ্ছা, দেখব।

তারপর কত চন্দ্রভৃক অমাবস্যা শুধু নয়, চন্দ্রকিরণোজ্জল পূর্ণিমাও কেটে গেছে। শর্মিষ্ঠা আর ফোন করেনি।

অফিসে দায়িত্ব বাড়ায় যখন তখন অজস্র টেলিফোন আসে। তবু রবিবার সকাল নটা নাগাদ টেলিফোন এলেই উপলের মনে হয়, প্রতিশ্রুত ফোনটা এলো বুঝি!

শর্মিষ্ঠা সব কথাই রেখেছিল, এটা রাখবে না!

উপলের স্মৃতির টেপে শেক্সপীয়রের একটা লাইন ঘোরে—'লাভস ফায়ার হিটস ওয়াটার, ওয়াটার কুলস নট লাভ।'

'ডাভ কটেজ'

বন্দনা সান্যাল

এখানে, এই শালমহুয়ায় আচ্ছন্ন আধাপাহাড়ি উপত্যকায় আমার আসার অবতরণিকা ছিল একটা উইল। উইলটা আমার প্রপিতামহ শশাঙ্কশেখরের। তিনি পাটের ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আমাদের পরিবারকে ধনী পরিবার বলা চলে। যদিও এখন পাটের ব্যবসায়ের সেই রমরমা নেই, তবু সঞ্চিত অর্থে অন্তত কয়েক পুরুষের অন্তত স্বাচ্ছন্দ্যের গদীতে গড়িয়ে কেটে যাবে। শশাঙ্কশেখরের উইলটি পারিবারিক লোহার সিন্দুকে এতদিন বন্ধ ছিল। এখন আমাদের কলকাতার সাবেকী বাড়ি ভেঙে প্রোমোটারকে দেওয়ার জল্পনা চলেছে। তাই শরিকীভাগের প্রশ্ন উঠেছে। কেউ বাড়ি ভেঙে ফেলার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। যাঁরা বিপক্ষে তাঁদের মনে এই সাবেকী বাড়ির কিছু সাবেকী স্মৃতি কাজ করছে বুঝতে পারি। এর সরু সরু ইটের গাঁথনী, বিশাল গোল থামের সারি, দেয়ালে বিলীয়মান পঙ্খের কারুকার্য, অনেক অন্ধকার ঘর যেখানে কোনোদিনই তেমন কিছু থাকতে দেখিনি খালি প্রচুর কাগজপত্র, আর বাল্যে রোমাঞ্চকারী কিছু ভূতের কল্পনা ছাড়া—এসবই দু'হাজার সালের আবর্জনা বাড়াবে বই নয়। তবু কিছু মানুষ আছে যারা সন্দিহান স্বভাবের এবং দু'হাজারের দিকে পেছন ফিরে বসে nostalgia-র নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। বলতে সঙ্কোচ হয়, আমিও সেই দলে। শশাঙ্কশেখরের উইলটা তাই মা যখন ঝেড়েঝুড়ে দীর্ঘকাল পরে বার করলেন, আমি ওটা মন দিয়ে পড়ে ফেললাম। অবাক লাগল অতীতের এক অর্থবানের কাছে টাকার যা মানে ছিল আজকের থেকে তা কত আলাদা। আমাদের পরিবারকে এখনও ধনী বলা চলে, কিন্তু আমাদেরও কেমন 'নিজের বেলায় আঁটিস্ঁটি' ভাব। এ বাড়ির কাউকে কোনোদিন পরার্থে কিছু দান করতে দেখিনি। আমার বাবা কোম্পানির শেয়ার কিনে কিনে কাঁড়ি করেছেন। আমার মা নিত্যনতুন ফ্যাশনের গয়না গড়িয়েই চলেছেন—নিজের জন্যে, দিদি বৌদিদিদের জন্যে। বিলাসের আধুনিক উপকরণ বাজারে যত বাড়ছে, আমাদের বাড়িও তত সেসব দিয়ে বোঝাই করা হচ্ছে, তা সে যতই বেখাপ্পা লাগুক এই বটের শেকড়জড়ান হাড়গোড় বেরোন বাড়িটাতে। আমার তো মনে হয় এই সব শেকড়বাকড় জড়িয়ে ত্রিকালজ্ঞ বাড়িটা যেন সময়ের জটা ধারণ করে সন্ন্যাস নিয়েছে। সে যেন দূর থেকে এ বাড়ির বাসিন্দাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে। অমন হাসি অনেক দেখলে, অনেক বুঝলে তবেই হাসা যায়,

প্রাজ্ঞ অতীত যেমন হাসে চঞ্চল বর্তমানের দিকে তাকিয়ে। সেই অতীতের অংশীদার ছিলেন শশাঙ্কশেখর। তাঁর আত্মাও এ বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথাও লুকিয়ে এমনি হাসে হয়তো। শশাঙ্কশেখরের অয়েলপেন্টিং আছে আমাদের বিশাল ড্রইংরুমের দেয়ালে। পাশেই টাঙান আছে তাঁর স্ত্রী হরিভামিনী দাসীর ছবি। শশাঙ্কশেখরের যত সুপুরুষ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা তাঁর স্ত্রীর ততই সাধারণ, স্থূল, কিছুটা নিরেট চেহারা। উইলে আছে শশাঙ্কশেখরের মৃত্যুর পর তিনি পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই বিশাল বাড়ির অর্ধাংশ। বাকি অর্ধাংশ শশাঙ্কশেখর ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর দুই সহোদরের অবর্তমানে চার ভাইপোর মধ্যে। হরিভামিনী, আমার পিতামহ যাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন এবং আমার বাবা একমাত্র পৌত্র—যাঁর ছবি দেখলে মনে হয় এতবড় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ছিল—দিব্যি দক্ষতার সঙ্গে স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন সংসারের হাল ধরেছিলেন। মার কাছে গল্প শুনেছি ছোট করে চুল ছাঁটা, খাটো থানপরা এই বৃদ্ধার অঙ্গুলিহেলনে অতবড় সংসার, যেখানে আশ্রিতের সংখ্যাই ছিল একশোর মতন, অতি মসৃণ গতিতে চলত। এ বাড়ির দোতলায় পুব দিকের একটি ঘরে রঙিন কাঁচের জানালার ধারে পাতা তাঁর চৌকিটি যেন benevolent dictatorship-এর প্রতীক ছিল। শশাঙ্কশেখরের উইলে ভাগ্নেভাগ্নী, বাড়িতে আশ্রিতদের প্রত্যেকের জন্যে ভাগ করা টাকার উল্লেখ আছে। আছে দেবত্র সম্পত্তি সম্বন্ধে নির্দেশ। পুরোহিতদের মাসোহারা, জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের জন্য দান। এসব পড়তে পড়তে হঠাৎ আমাদের নজরে এল অ্যান ক্যারল—এই একটি নাম। এত গ্রহীতার মধ্যে এক মেমসাহেবের নাম দেখে আমি খুবই উৎসুক হয়ে পড়লাম। এঁর পরিচয় কিছু দেওয়া নেই, কিন্তু এঁর নামে একটা মোটা টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়াও এঁকে 'ডাভ কটেজ' নামে একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছে সাঁওতাল পরগনার ম্যাকফারলেনগঞ্জে। ম্যাকফারলেনগঞ্জের নাম শুনেছিলাম, খুব সুন্দর ছবির মত জায়গা নাকি। এক সময় অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজের বড় বসতি ছিল এইখানে। শশাঙ্কশেখর ম্যাকফারলেনগঞ্জের বাড়িটি অ্যানকে দান করেছিলেন সে কথা তাঁর উইলে আছে। যা নেই সেটা হচ্ছে তাঁর কলকাতার কর্মস্থল ছেড়ে সাঁওতাল পরগনার এই প্রত্যন্তের একটি গ্রামে তিনি কেন গিয়েছিলেন এবং কিসের বাধকতায় অ্যানকে তাঁর মৃত্যুর পরেও সুখে রাখবার চেষ্টায় বিরত হননি। হরিভামিনী দাসী কি জানতেন তাঁর উইলের এই খুঁটিনাটিগুলি? যতদূর জানি তিনি চলিতার্থে শিক্ষিতা ছিলেন না। তাই কি শশাঙ্কশেখর আকৃষ্ট হয়েছিলেন অ্যান নামে কোনো শিক্ষিতা শ্বেতাঙ্গনার প্রতি? আমার এই কৌতূহল অমার্জিত নিঃসন্দেহে, কিন্তু ম্যাকফারলেনগঞ্জ এবং অ্যান ক্যারল এই নাম দুটি আমাকে অমোঘভাবে টানতে লাগল। এতই টানল যে পুজোর ছুটিতে নেশাগ্রস্তের মত ট্রেনে চেপে বসলাম।

ভোর ভোর পৌঁছে গেলাম ম্যাকফারলেনগঞ্জে। রাতের ট্রেন কোথা দিয়ে এসেছিল খোঁজ রাখিনি। আজ ভোরবেলা যেখানে পৌঁছলাম সে জায়গা নিঃসন্দেহে কারো কাব্যিক ও রোমান্টিক প্রেরণার উৎস হতে পারে। দূরের নাতিউচ্চ পাহাড়ের সারি ঠিক কুয়াশায় নয়, কিন্তু নীলাভ mist-এ এখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম বাড়িঘর যা আছে সবই যেন সবুজের সমুদ্রে তলিয়ে রয়েছে। একটা বুনো গন্ধ পেলাম। এক ধরনের ভেষজ গন্ধের শান্তি মনে যেন প্রলেপ বুলিয়ে দিল। ভারি নির্জন জায়গাটি, সভ্যতার হাত এড়িয়ে যেন নিজের সুখে আছে। একটু দূরেই দেখলাম চায়ের স্টলে উনুনে আঁচ পড়েছে। শীত এখনও ঠিক পড়েনি, কিন্তু তার শিরশিরানি টের পাওয়া যাচ্ছে। চা চাই। এগিয়ে গেলাম দোকানটার দিকে। চমকে দিয়ে শার্ট পাজামা পরা দোকানদারটি হেসে বলল, 'Goodmorning Sir !' আমি বোকার মত হেসে উত্তর দিলাম, 'morning ! চা পাওয়া যাবে ?'

'জরুর মিলেগা সার ! লেকিন থোড়া দের হোগা ! পাঁচ মিনিট ! আপ বৈঠিয়ে না !'

হাতের ব্যাগটি পাশে নামিয়ে বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে দেখি শিশিরে ভেজা। শিশির ! কতদিন পরে শিশির ছুঁলাম ! আমাকে আঙুল দিয়ে শিশিরে দাগ কাটতে দেখে দোকানী তাড়াতাড়ি একটা কাপড় এনে বেঞ্চিটা মুছে দিল। এই সকালেই তার সিঙ্গাড়া, আলুর চপের পুর তৈরি হয়ে গেছে, মাখা ময়দার তালও তৈরি। অবাক লাগল তার কাচের শো কেসে সাজিয়ে রাখা কেক আর পাঁউরুটি দেখে। জিনিসগুলি দর্শনধারী। দেখে মনে হচ্ছে না বাসি, মিয়োন বা শুকনো খটখটে।—যেমন মফঃস্বলে সাধারণত দেখা যায়।

'এসব রুটি কেক কোথাকার তৈরি ? এখানে কি বেকারী আছে না কি ?'

'আছে সাব্। মেরিনা মেমসাব্‌কা বহুৎ বড়িয়া বেকারী।' মেরিনা ! সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে মনে পড়ে গেল অ্যান ক্যারলের নাম। এই লোকটি কিছু জানলেও জানতে পারে। "আচ্ছা, এখানে 'ডাভ কটেজ' নামে কোনো বাড়ি আছে ? অনেকদিন আগে সেখানে অ্যান ক্যারল নামে এক মেমসাহেব থাকতেন।"

'মেরা তো মালুম নেহি, সাব। লেকিন, ন্যান্সি মেমসাবকা জরুর মালুম হোগা। উন্‌কী বহোৎ কুছ্ মালুম হ্যায়। ইহা তো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লোগোঁকো বহুৎ ভারী বস্তি কি না ! আভি তো জলুস সব খতম্ হো গিয়া। উও লোগ, সেরা মালুম, সব চলা গিয়া আস্ট্রেলিয়া না কওন মুলুক। লেকিন দো চার আদমি তো হ্যায়ই ইধার। ঔও ভী সায়দ্ আপ্‌কো বাতানে সকেঙ্গে।'

এবার দোকানী চা বানানোয় মন দিল। গরম চায়ের সঙ্গে বেশ উপাদেয় বিস্কিট মিলল। ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের ঘুম ভাঙছে। আরও দু'চারজন পশারি টুকটাক জিনিস নিয়ে এসে পড়েছে। শুকনো আপেল, টাটকা বড় বড় আতা, ছোলা সেদ্ধ, রামদানার লাড্ডু। চায়ের দাম মিটিয়ে দোকানীকে আর একটু বিরক্ত করলাম, থাকার জায়গা কোথায় মিলবে ? সে হাত দিয়ে দিক নির্দেশ করল যেদিকে না কি টমসন সাহেবের বাংলো আছে। সেখানে ঘর-ভাড়া পাওয়া যায়। খাবার জন্যে আসতে হবে বাইরের ঝোপড়িতে —সেখানে ভাত-ডাল-সবজি-ডিমের ডালনা পাওয়া যাবে পনেরো টাকায়। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ি-ঘোড়া, ঠ্যালা, রিক্সা কিছুরই বালাই নেই। হাঁটতে শুরু করলাম। বুক ভরে শ্বাস নিলাম খোলা হাওয়ায়। টমসন সাহেবের বাড়ি খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। দোকানী নাম বলে দিয়েছিল—'সিলভানো'। সুন্দর নাম। শিশুসেগুন আর শালের বেড়াজালে ঘেরা, Sylvan তো বটেই। কিন্তু একটু সকালে এসে পড়েছি। সাহেবের ঘুম এখনও ভাঙেনি মনে হচ্ছে। ব্যাগ কাঁধে দিয়ে সামনের উঁচু-নীচু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। চারদিকে মেলাই পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়ি দেখা গেল। সবই ঝোপঝাড়ে ঢাকা। বেশিরভাগই ইংলিশ কটেজ টাইপের। ঢালু চাল, ওপরে চিমনি। এককালের পিচ বাঁধান রাস্তা এখন মেলাই খানাখন্দে ভরা। অন্যমনস্ক হলেই পা মচ্‌কানর সম্ভাবনা। রাস্তার সমান্তরাল মিটার গেজের রেললাইন। একটা মালগাড়ি বেরিয়ে গেল ঘটারং ঘটারং করে। তার ছায়া পড়ল রেলব্রিজের তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট পাহাড়ি ঝোরায়। আবার গভীর নিস্তব্ধতা। বাড়ি-গুলো দেখতে দেখতে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে কোনটা হয়তো 'ডাভ কটেজ' হবে। এখানেই হয়তো কাজের ফাঁকে এসে পড়তেন শশাঙ্কশেখর, দু' দণ্ড জিরোনর জন্য। পায়ের শব্দ পেয়ে ছুটে আসতেন অ্যান। পিঠে লেসের চাদর, পায়ে মখমলের চটি। নীলাভ চোখে শশাঙ্কশেখরের জন্যে অপরিসীম ভালোবাসা। দু'জনে চায়ের কাপ নিয়ে বসতেন শাল গাছের তলায় বাঁধান বেঞ্চিতে। শশাঙ্কশেখরের দৃষ্টি ছুঁয়ে যেত কোলের উপরে অলসভাবে রাখা অ্যানের হাতের শ্বেত মসৃণ ত্বককে, ছুঁয়ে যেত সামনের কুলকুল করে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি ঝোরাকে, দূরের বন ছড়ান, ঢেউ খেলান প্রান্তরকে। তখন বোধ-হয় তাঁর মনে পড়ত না আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িটার কথা, অসংখ্য দায়িত্বসংকলন জীবনের কথা, পাটের আড়তের কথা, বা ভারী ভারী গহনা পরা ভারী চেহারার হরিভামিনী কথা। তখন তিনি অ্যানের দিকে গম্ভীর চোখে তাকিয়ে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে হেসে বলতেন, 'One more, darling !'

'Yes sir, how can I help you ?'

চমকে তাকিয়ে দেখলাম লতানো গোলাপ জড়ানো গেটের দরজা খুলে বোধহয় টমসন সাহেবই এগিয়ে আসছেন। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আবার 'সিলভানো'র সামনে ফিরে এসেছি জানি না। মোটাসোটা চেহারার সাহেব একটা হলুদ রঙের স্পোর্টস শার্ট আর গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট পরে মৃদু মৃদু

হাসছেন। রোদে পোড়া ফর্সা রঙে মালুম হয় রক্তের মিশ্রণ। নিজের প্রয়োজনের কথা বললাম। সাহেব জানালেন অসুবিধে হবে না, এখনও season শুরু হয়নি, প্রায় সব ঘরই খালি পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গেলাম বাগানের রাস্তা ধরে বাংলোর দিকে। এককালে বাগান নিশ্চয়ই সুন্দর ছিল, এখন অবহেলিত। ঘরগুলোতেও কেমন ভ্যাপসা গন্ধ, যদিও টমসনের লোক এসে বিছানায় যে পরিষ্কার চাদর পেতে দিল তাতে সুন্দর এমব্রয়ডারি করা। ঘরের সামনের টানা বারান্দায় কটা পালিশ ওঠা কাঠের চেয়ারের একটায় বসা গেল। চারদিকে মেলাই গাছপালা, খুব লম্বা লম্বা পুরোনো সব গাছ, দৃষ্টি চলে না। আমার কৌতূহলী চোখ ম্যাকফারলেনগঞ্জকে খুঁজছিল, এখানে বসে সুবিধে হল না। টমসন দেখি নিজেই দু'হাতে দুটো চায়ের কাপ নিয়ে আসছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বসতে বললাম। এবং, পুরোনো মদের বোতলের ছিপি খোলার মত টমসনের মুখ থেকে বগ্‌বগ্‌ করে বেরোতে লাগল পুরোনো কথা। আমি নড়েচড়ে বসলাম, এবার নিশ্চয়ই কাজের কথায় আসা যাবে। কিন্তু কোথায়! আমাকে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ না দিয়েই সাহেব চোদ্দপুরুষের গল্প ফেঁদে বসল। কেমন করে বিলেত থেকে তার ঠাকুর্দা নাবিকের কাজ নিয়ে চলে আসে, ইণ্ডিয়ান মুসলিম মেয়ে বিয়ে করে সে কেমন করে এই দেশটাকেই নিজের দেশ ধরে নিয়ে ম্যাকফারলেনগঞ্জের কাছে জায়ুয়াতে settle করে। সেখানে তাদের একটা ঘোড়ার ফার্ম না কি এখনও আছে। এরপর তাদের আত্মীয়-স্বজনরা জামুয়া, সীতাপুর, গইরান—এসব জায়গায় আস্তে আস্তে শক্তপোক্ত আস্তানা গাড়ে। স্কুল হয়, চার্চ হয়, পাদ্‌রীরা নেটিভদের শিক্ষার আলো দেখায়। তারপর এ দেশটা স্বাধীন হয়ে গেলে তারা একটু একঘরে হয়ে পড়ে, ঘর কা নেহি পার কা ভি নেহি। তখন তারা অনেকেই আবার নতুন মাটির খোঁজে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেয়। এসব মোটামুটি জানা কথা। আমি বিশেষ কৌতূহল বোধ করছিলাম না, তাই কথার তোড় অন্যদিকে বইয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'সাহেব, মনে হচ্ছে এখানে একলা যাক? কেন?'

এবার তার চোখে ব্যথার ছায়া পড়ল। বলল তার বৌ আর ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। সে যেতে পারেনি ম্যাকফারলেনগঞ্জের টান কাটিয়ে, তার প্রিয় 'সিলভানো' ছেড়ে।

'আচ্ছা, তুমি কি এখানে 'ডাভ কটেজ' বলে কোনো বাড়ির কথা জান?'

'Dove Collage! Not that I know of—but wait, I think I've heard of one Dove Cottage, but perhaps that was in England and belonged to the famous poet Wordsworth—

আমি বাধা দিয়ে বললাম অতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আপাতত নেই। আমি একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে জানতে চাইছি, তাঁর নাম অ্যান ক্যারল। তাঁর বাড়ির নাম ছিল 'ডাভ কটেজ'।

সাহেব কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'দেখ, আমি এখানে অনেকদিন আছি ঠিকই, কিন্তু মাঝে একটা break পড়ে গিয়েছিল। আমি কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম একটা মিশনারী স্কুলে কাজ নিয়ে। সে সময় আরও কিছু লোক এসেছে, আরও কিছু ঘরবসতি হয়েছে।

'না, না—আমি অনেকদিন আগের কথা বলছি। ধর তোমার ঠাকুর্দার আমলের। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। Thanks anyway. Now, Mr. Thomson, I need some rest.

রাতে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি।

'Oh, certainly, certainly! Have a good nap, and then have your lunch at the 'jhopri' outside. I'm sorry I couldn't provide you food, Mr. Chaudry, একলা মানুষ দেখতেই পাচ্ছ!' সাহেবকে আর কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে আমি এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কিন্তু এল না। শশাঙ্কশেখরের উইলের কপিটা বের করে বিশেষ অংশটা আবার পড়লাম। ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছি। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে যা চাইছি তা হয়তো অতীতের আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ডাভ কটেজের হয়তো কোনো অস্তিত্বই নেই!

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে আবার স্টেশনে গিয়ে চায়ের জন্যে সেই দোকানটিতে গিয়ে বসলাম। দোকানী পিটার মোলায়েম হেসে চা বানাতে লাগল। চা হয়ে গেলে আমার হাতে গেলাস ধরিয়ে দিয়ে সে বেঞ্চিতে জমিয়ে বসল। এরকম একটা চায়ের দোকানে শান্তিনিকেতনে একবার একটি বাংলাদেশী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল, এখানে সবাই ভালো তবে জীবন বড় মন্থর। প্ল্যাটফর্মে বসে চারদিকে তাকিয়ে ম্যাকফারলেনগঞ্জ সম্বন্ধেও আমার সেই কথাটা মনে হল। কোনো কোনো জায়গায় সময় কি গতিহীন হয়ে যায়? সেই অ্যান ক্যারলের সময় থেকে এ জায়গাটার বোধহয় কোনো পরিবর্তনই হয়নি! সেই একই সবুজে নীলে, ভোরের শিশিরে, শীতের হাওয়ায় যেন একটা সময় হীনতার মধ্যে সমাহিত হয়ে রয়েছে জায়গাটা। কেন জানি না, আমার হঠাৎ মনে হলো অ্যান ক্যারলের বাড়িটা হয়তো পাওয়া যাবে। আর, কি আশ্চর্য, ঠিক তখনই পিটার বলে উঠল,

'সাব, মালুম হোতা আপকা ডাভ কটিজকা পাতা মিল যায়েগা।'

'কেমন করে?' আমি উৎসুক হয়ে পড়লাম।

পিটার বলল সে নাকি স্ন্যান্সি মেমসাবকে জিজ্ঞেস করেছিল। মেমসাব নাকি তাঁর বুড়ো ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করে কিছু খোঁজ পেয়েছেন।

'আমাকে একবার স্ন্যান্সির কাছে নিয়ে যাবে, পিটার?'

পিটার রাজি হয়ে গেল। তবে এখন নয়, কাল ভোর ভোর সে টমসনের

বাংলোয় পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে ন্যান্সির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে সে দোকান খুলবে।

এই ব্যবস্থাতেই কাজ হল। ন্যান্সির বাড়ি টমসনের বাড়ির কাছেই। ঐ একরকমই কটেজ, তবে খুবই ভাঙাচোরা। ন্যান্সিকে দেখে একটু ধাক্কা খেলাম। সে একটা নীল রংএর ফ্রক পরে, হাতে লাঠি নিয়ে গোরু চরাতে যাচ্ছিল। তার গায়ের রং বেশ কালো, কুঁজো শরীর, মুখে বয়সের বলিরেখা। সে এত সকালে আমাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। তবে পিটারের পরিচয় দিতেই খুব খাতির করে আমাকে বারান্দায় নিয়ে বসাল। আমি আড়চোখে দেখে নিলাম একটা শ্রীহীন বাড়ির অভ্যন্তর। দেখলাম শুধু গোরু নয়—শুয়োর, মুর্গী সবই পালা হয়। তাই হাওয়ায় এক ধরনের বোঁটকা গন্ধ। একটা কুকুরের 'কেনেল'ও আছে, তবে তাতে বোধহয় এখন মুর্গী রাখা হয়। শুনলাম, ভেতরে কেউ একটানা কেসে চলেছে। বোধহয় ন্যান্সির ঠাকুর্দা। এসবই আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম ও শুনলাম। ন্যান্সি আমাকে বসিয়ে রেখে একটু ভেতরে গিয়েছিল, এবার সে বাইরে এসে বলল পিটারের কাছে সে আমার আসার কারণটা জেনেছে। তার ঠাকুর্দা অ্যান ক্যারলকে place করতে পেরেছেন। তাঁর বয়স এই নিরানব্বই চলছে, বাইরে আসতে পারবেন না। আমি যদি একটু ভেতরে যাই। এ সবই সে বেশ ভালো উচ্চারণে ইংরেজিতেই বলল। আমি সব শুনে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালাম। এ তো স্বপ্নটাকে মুঠোয় ধরে ফেললাম বলে! ঘরে ঢুকে দেখলাম এখনও ভালো করে আলো ঢোকেনি। জানলায় ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে, কিন্তু সেগুলো লেসের। এক কোণে একটা পুরোনো খাটে একজন অতি পুরোনো মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। ঘরে স্বভাবতঃই একটা অসুখ-অসুখ গন্ধ চেপে বসে আছে। ন্যান্সির ঠাকুর্দা অনেক চাদরবালিশ সম্বলিত হয়ে আধশোয়া অবস্থায় কেশেই চলেছেন। একেই বোধহয় graveyard cough বা কবরখানার কাশি বলে। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আসল কথায় আসা গেল। আমার কল্পনা ক্রমশ বৃদ্ধের শ্লেষ্মাজড়িত স্বর এবং কাশীর দমকে ঠেকে ঠেকে রূপ পরিগ্রহ করল। হ্যাঁ, অ্যান ক্যারল নামে এক অতীব সুন্দরী মহিলার কথা তাঁর মনে আছে। ম্যাকফারলেন-গঞ্জের শেষ সীমায় নীল ঝরনা আছে। সেখানে তাঁরা ছোটবেলায় প্রায়ই পিক্‌নিক্ করতে যেতেন। একবার সেখানে তাঁদের এক বন্ধুর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। সে স্নান করতে গিয়ে পাথরের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আশেপাশে কোনো বাড়ি ছিল না এক 'ডাভ কটেজ' ছাড়া। সেখানেই ওকে প্রাথমিক চিকিৎসা করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। অ্যান ক্যারল সেই বাড়িতেই থাকতেন এবং সেদিন তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে একলা বাড়িতে থাকতে দেখে ছেলেরা একটু অবাক হয়েছিল। ভয় করে কিনা জানতে চাইলে মহিলা তাদের বসিয়ে, কুকি খাইয়ে একেবারে আবিষ্ট করে দিয়ে হেসে বলেছিলেন, No, why

should I be afraid ? I love nature and nature loves me. When there is love there is no fear. Don't you feel so, boys ? Besides, I have friends to visit me. I'm not alone !'

ছেলেরা কথাগুলো বুঝুক, না বুঝুক, মহিলার এই 'বন্ধু' কারা তা জানবার জন্যে পরে যখনই নীল ঝরনায় যেত, 'ডাভ কটেজ' একটু উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করত। 'And once I saw a very handsom Indian gentleman sitting with her under a tree. They were enjoining their afternoon tea in the amber light of the setting sun.'

কথাগুলো হাঁফাতে হাঁফাতে বলেই বৃদ্ধ কাত্ হয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। আমার আর তর সইছিল না। সব কিছুই আমার কল্পনার সঙ্গে কেমন চমৎকার মিলে যাচ্ছে। বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে এসে আমি নীল ঝরণার রাস্তাটা ন্যান্সির কাছে জেনে নিলাম। এবং তখনই রওনা হলাম। ঘরবাড়ি শেষ হয়ে পথ প্রান্তরে নামল। আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই। রোদ ক্রমশ তেতে উঠছিল। আমি ঘামতে ঘামতে, এবং নিজের পাগলামিকে মনে মনে বিশ্লেষণ করতে করতে এগোলাম। দূরে একটা দু'টো টিলা। বেশ জঙ্গলে ঢাকা। কিন্তু রাস্তার ধারে কোনো গাছও নেই, ছায়াও নেই। প্রায় মাইল তিনেক পথ হাঁটবার পরে একটা ছোট্ট গ্রাম পড়ল। কিন্তু সেখানেও কেউ ডাভ কটেজ সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করতে পারল না। আমি অগত্যা ন্যান্সির কথা মত নাক বরাবর হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ একটা ভাঙা বাড়ি নজরে এল, গেটের দু'টো ভাঙা পিলারও। তাতে কিছু লেখা ছিল, যা এখন পড়া যায় না। জংলী গাছে চারিদিক প্রায় ঢেকে গেছে, বেশিরভাগই 'ল্যাণ্টানা' বা পুটুশের ঝোপ। সাপখোপ থাকতে পারে, তবে শীত আসছে তাই রক্ষে। গেট পেরিয়ে ঘাস আর আগাছায় ভরা পথ ধরলাম। এখন গাছের ছায়া বেশ ঠাণ্ডা। কি বিশাল সব গাছ, কতদিনের পুরোনো কে জানে। দেখতে দেখতে আসল বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। একতলা বাংলো, যেন মাটি থেকেই উঠে এসেছে, ভিত্‌টিত নেই। নাকি ভিত্‌টা এতদিনে মাটির তলায় বসে গেছে কে জানে! সামনে কাচঢাকা টানা বারান্দার কাচ প্রায় সবই ভেঙে গেছে। তবু দরজায় একটা মরচে ধরা তালা ঝুলছে দেখলাম। বারান্দার পরে সারি সারি তিনটে ঘরের দরজা, তালা দেওয়া। বারান্দার আনাচে-কানাচে মেলাই মাকড়শা জাল বুনেছে। কোথায় একটা ক্লান্ত ঘুঘু ডাকছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। একটু কান পাতলে একটা নদীর জলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে, বোধহয় নীল ঝরনার। একটা কবিতা পড়েছিলাম ডে লা জেয়ারের—The Listeners. নিজেকে সেই নিঃসঙ্গ পথিকের মত মনে হল যে এমনি একটা পোড়ো বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে বারবার বলেছিল,

'Tell them I came, but no one answered'. আমি হঠাৎ নিজের মনে বলে উঠলাম,

'শশাঙ্কশেখর, আমি এসেছিলাম। তোমার অ্যান ক্যারলের খোঁজে আমি এসেছিলাম।'

তখনই আমাকে অসম্ভব চমকে দিয়ে পাশের একটা কম ভাঙাচোরা ছোট্ট বাড়ি থেকে, সম্ভবত সেটা outhouse, একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আমি ভূত দেখার মত চমকে সরে যাবার চেষ্টা করতে সে পরিষ্কার দেহাতীতে জিজ্ঞেস করল আমি কে, কেন এসেছি। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশেক হবে। লম্বা, রোগাটে চেহারায় অযত্নের ছাপ। রং এককালে হয়তো খুব ফর্সা ছিল, কিন্তু এখন মুখে মেচেতার ছোপ। পরনে একটা লম্বা ফ্রক, ছেঁড়াফাটা। পা খালি। মেয়েটির নাক খুব টিকোল এবং ঠোঁট পাৎলা। তবে তার মুখের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দু'টি চোখ—নীল চোখ। সে জানাল সে ঐ outhouseটায় তার স্বামীর সঙ্গে থাকে। তার স্বামী স্টেশানে গেছে আতা বিক্রি করতে। তার কব্জিতে একটা ঘড়ি নজরে পড়ল যখন সে শিরাওঠা হাতটি তুলে সময় দেখল। এরপর সে ভদ্রভাবে জানাল আমার যদি তার ঘরওয়ালার সঙ্গে কোনো কাজ থাকে তাহলে ভেতরে এসে বসতে পারি। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার সঙ্গে গিয়ে দাওয়ায় বসলাম। ভারি ঠাণ্ডা জায়গাটা। শরীর মন জুড়িয়ে গেল।

'এখানে আপনি কতদিন আছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'জন্ম থেকেই। এ কোঠি ছিল অ্যান মেমসাহেবের। আমার ঠাকুর্দা ছিল তার বাস্টার্ড সান্। শুনেছি ভারি জলুষ ছিল এ কোঠির। মেমসাহেবের মনপসন্দ্ বাংলো বানিয়ে দিয়েছিল কলকাতার এক বাঙালি সাহেব। তারা সবাই মরে গেল। আমার ঠাকুর্দা দেখাভাল করত এ কোঠির। কিন্তু আমার বাবা সব ছেড়ে একদিন অস্ট্রেলিয়া না কোথায় চলে গেল। থাকলাম আমি আর আমার মা। তারপর একদিন মাও মরে গেল। এ বাড়িও আস্তে আস্তে ভেঙে গেল। এতবড় বাড়ি, কে দেখ্ভাল করে? এমনি তালা দেওয়া পড়ে থাকে, একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।'

আমার চোখের সামনে আর একটা ছবি ভেসে উঠল। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। সেখানে বহুতল বাড়ি উঠবে। শশাঙ্কশেখরের আত্মা এবার ঘরছাড়া হবে। ভেঙে যাবে 'ডাভ কটেজ'ও। কিন্তু এখানে, এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় আর নতুন বাড়ি উঠবে না। গাছপালায় ক্রমশ ঢেকে যাবে তাঁর আর অ্যানের ভালোবাসার এই স্মৃতিটুকুও। অ্যান বলেছিলেন, 'আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি, প্রকৃতি আমাকে ভালোবাসে। আমার ভয় কি?'

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই ভয় নেই। ম্যাকফারলেনগঞ্জের প্রগাঢ় প্রকৃতি যেন সবাইকে আশ্রয় দেয়। সবুজ চাদরে ঢেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। এখানে কোনো প্রোমোটার শশাঙ্কশেখরের নাগাল পাবে না। 'ডাভ কটেজে' কখনও হাতুড়ি-ছেনির বাড়ি পড়বে না। নিজের নিয়মেই সে ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, যেমন মানুষ মিশে যায়—মৃত্যুর পরে।

মুহাম্মদ সামাদের কবিতা

কাজল চক্রবর্তী

বাংলাদেশের কবিতার পটভূমি এক হলেও আবহাওয়া আলাদা। আমরা যারা এ বাংলায় বসে বাংলাদেশের কবিতা পড়ি, তারা প্রায়শই দু-বাংলার কবিতাকে পাশাপাশি রেখে উন্নাসিক ভাবে কবিতার বিচার করে থাকি।

মুহাম্মদ সামাদের কবিতা দুটি আমি ওভাবে পড়িনি, খুবই মনস্ক ধ্যেয়ানে পড়েছি। একজন সমমর্মী পাঠক হিসেবে, তার স্বাদ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি।

বাংলা কবিতায় রোমান্টিকতা বর্তমানে ভেঙে পড়া হাইরাইজের মতন। বহু গবেষণা বহু আলোচনা চলছে এই অচলাবস্থাকে নিয়ে—সে সময় সামাদের কবিতা দুটো পড়ে চমকে উঠতে হয়। কেননা যে শহরে কথায় কথায় গুলি চলে—সেখানে যদি কেউ বলেন—'সোনালী শস্যের মতো জীবনের কথা ছিলো' তাহলে অবশ্যই সেই কবির রচনার প্রতি ধ্যানমগ্ন মন নিয়ে একাগ্র হবার বাসনা জন্মায়। ধ্যান শব্দ ব্যবহারে কিছুটা ধর্মের গন্ধ থাকতেই পারে, কিন্তু আমি সেই অর্থে ধ্যান শব্দটি ব্যবহার করিনি। এই শব্দের ব্যবহারের কিছু সহজ সারল্য সামাদ প্রায়ই ব্যবহার করেছেন, অহেতুক বোঝা বাড়াননি কবিতার নির্মাণ কৌশলে। পাঠককে চিন্তিত হতে হয়নি শব্দের পিতৃত্ব নিয়ে। সহজ সাধারণ শোভন জীবনযাপনের মত পরিচ্ছন্ন কবিতায় তিনি তার চারপাশের অচলাবস্থাকে তুলে ধরেছেন—'চতুর্দিক ঘিরে করতালি দিয়ে নেচে উঠতো দ্যুতিময় অন্ধকার'। হঠাৎ অন্ধকার দ্যুতিময় হতে যাবে কেন! যাবে, কেননা আলোচ্য কবিতাটি (প্রেমিকের প্রতি) আপাতদৃষ্টিতে প্রেমের কবিতা মনে হলেও সহজ চিত্রকল্পের আড়ালে মুখ বাড়াচ্ছে তার প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক অবস্থান; এবং সেটা কবিতার ভাষায় এইরকম শোনায়—'আমি কল্পনায় তোমাদের হাতের আঙুল দেখি না / তেপোবনে অপেক্ষমান ঋজুঋদ্ধ সারিসারি প্রেমিক পুরুষদের দেখি'। পুরোনো প্রসঙ্গে ফেরৎ আসি—অর্থাৎ পাঠক 'তপোবন' শব্দটির পাশাপাশি 'প্রেমিক পুরুষদের' শব্দটি লক্ষ্য করুন। আরো পরে এসে কবিতাটি সরাসরি সামাদের অবস্থান বুঝিয়ে দ্যায়—'তুমি আমার চোখের গভীরে দীর্ঘ সাঁতার কেটেছো—' (শব্দটা 'দৃষ্টির গভীরে' হলে হয়তো আরো ভালো হতো)। সামাদের বর্তমানের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে,—'এবং বিশ্বাস করি—একাকিত্বই উৎকৃষ্ট নরক'। কিন্তু সামাদ মানবতাবাদকে সর্বোপরি তুলে ধরে জানান—'আমি এখন রাস্তায়, মাতাল ভাঁড়, বৃদ্ধ বেশ্যা আর / নড়বড়ে সাঁকো দেখি / এবং অভিভূত হই—হেঁটে হেঁটে বহুদূর এগোবে মানুষ'।

আমি আমার আলোচনার শুরুতে ফেরৎ যাচ্ছি—অর্থাৎ যারা দু-বাংলার পৃথক আবহাওয়াকে সামনে না রেখে কবিতা পড়েন, তারা—হয়তো সামাদের এই কবিতাটিকে এইভাবে পেলে আনন্দ পেতেন—'কোথায় যেন কবে তাহার একখানা চুল / উড়তেছিল মেঘের কাছে জলের কাছে / নিজেই যাবার কথা ছিল। গাছ এসে / আজ প্রশ্ন করে কোথায় গেল সেই কবিটি, / পদের কাছে! না নদের কাছে! নাকি / আজ সে বেহুঁস আছে—মাটির / কাছে ভালোবাসার স্বরে।'

মুহাম্মদ সামাদের দুটি কবিতা

শ্যামলা সরলা মেয়ে

নতুন কুঁড়ির মতো প্রতিদিন মেলে দিচ্ছো
তোমার হৃদয়। যেনো শীতের বরফ উষ্ণ অনুভবে
প্রবেশিছে আমার ভিতরে।

শ্যামলা সরলা মেয়ে
পদ্মার তীরের মতো আমি ভেঙে পড়ছি তোমার গহনে
আনন্দিত ইলিশের ঝাঁক তোমাকে পরাচ্ছে রঙধনু শাড়ি, চেলি
কপালে চন্দন;
আর
সখিগণ
সাজাচ্ছে বাসর ফুলে ফুলে
কৃষ্ণের নৌকোয়।

তোমার নামানো চোখে ঘাস ফড়িঙের
কম্পমান পাখা টলমল
মেঘভাঙা রোদের সৌরভ ঠোঁটে
আর
শ্যামল শরীর ছুঁড়ে ঘাই হরিণীর ডাক!

শ্যামলা সরলা মেয়ে
এসো করি তৃষ্ণিত হৃদয় ভরে বৃষ্টির বন্দনা
পান করি সোমরস, খুঁটে খাই শস্যদানা
সবুজ অরণ্য চাই আমাদের বুকে॥

প্রেমিকের প্রতি

তোমার মন্ত্রিত ঠোঁটে সোনালী শস্যের মতো জীবনের
কথা ছিলো
তোমার পৌরুষ থেকে বিচ্ছুরিত হতো কস্তুরীর তীব্র ঘ্রাণ
দীর্ঘজীবী বটবৃক্ষের শরীর ভেদ করে ফণা তুলতো
ঘুমন্ত নীল শঙ্খচূড়
তুমি আমার কনিষ্ঠ আঙুলে আদর করে
বসাতে সবুজ ঘাসে
আমাদের চতুর্দিক ঘিরে করতালি দিয়ে নেচে উঠতো
দ্যুতিময় অন্ধকার।
আর তোমার প্রফুল্ল কণ্ঠ থেকে মৃদুমন্দ ঝরে পড়তো
ভোরের শিউলিরা
এই শ্যামল নারীর সর্ব-দেহে-মনে (এখনো শিউলির
শুভ্রতায় আমি চোখ বুজি কবি, কী-যে ভালো লাগে!)

আমি কল্পনায় তোমার মুখচ্ছবি দেখি না
রোদেপোড়া এক গোলাপচারাকে বৃষ্টি ও নারীর
প্রার্থনায় নতজানু হতে দেখি।

আমি কল্পনায় তোমার চোখকে দেখি না
পাহাড়ের পাঁজর ভেঙে ঘননীল অশ্রুপাত দেখি।

আমি কল্পনায় তোমার কণ্ঠস্বর শুনি না
ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পবিত্র আত্মার রক্তাক্ত আর্তনাদ শুনি।

আমি কল্পনায় তোমার হাতের আঙুল দেখি না
তপোবনে অপেক্ষমান ঋজুঋদ্ধ সারি সারি
প্রেমিক পুরুষদের দেখি।

(আমার নাকের ওপর চাঁদের মতো লাল তিলটিতে
তুমি কখনো ঠোঁট ছোঁয়াওনি, যক্ষের ধনের মতো
বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা যেমন ঈদ কিংবা পুজোর জন্যে

নতুন জামা-কাপড় তুলে রাখে, ঠিক তেমনি তুমিও
মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলে। এখনো কি আছো?)

তুমি আমার চোখের গভীরে দীর্ঘ সাঁতার কেটেছো
(তুমি কি এখনো সেই অনন্তকাল সাঁতারে বিশ্বাস করো?)

প্রেমিক কবি আমার!
আমি যখন প্রবল প্লাবনে পোড়া বৃক্ষের মতো
শীর্ণকায় নারী দেখি
নিজেকে আজন্ম প্রবঞ্চক মনে হয়।

আমি যখন থলথলে মাংসল শুয়োর দেখি
অনাসৃষ্টির বাহুল্য আমাকে বিব্রত করে।

আমি যখন আকাশে ক্রমাগত নক্ষত্রের স্খলন দেখি
আমার ভয় হয়—বুঝিবা প্রভাত বিলম্বিত হবে।

প্রিয়তম কবি
আমি এখন ধর্মের উপাখ্যান পড়ে চতুর্দিকে তাকাই
এবং হেসে উঠি—ঈশ্বর সর্বত্রই উন্মোচিত।

আমি এখন প্রচুর বন্ধুকে সঙ্গ দিই
এবং বিশ্বাস করি—একাকিত্বই উৎকৃষ্ট নরক।

আমি এখন অজস্র মর্মরিত মৃত্যু দেখি
এবং আনন্দে জীবন্ত হই—তোমার কবিতারা আয়ুষ্মতী হবে।

আমি এখন রাস্তায় মাতাল ভাঁড়, বৃদ্ধ বেশ্যা আর
নড়বড়ে সাঁকো দেখি
এবং অভিভূত হই—হেঁটে হেঁটে বহুদূর এগোবে মানুষ॥

তুষার চৌধুরীর কবিতা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

একজন মনীষী, জঁ-পল সার্ত্র স্বদেশীয় সাম্যবাদী কবি লুই আরাগঁর একদা প্রশস্তি করেন এই ভেবে যে তিনি নুড়িপাথর নিয়েও কবিতা লিখতে পারেন। তুষার চৌধুরীর প্রসঙ্গেও আমি বলতে চাই তার অন্যতম জয়চিহ্ন এখানে যে তিনি মনিয়া নামের তুচ্ছ পাখি, জলজ কুসুম, নক্ষত্রমাধবী ও রোমাবৃত ফাটল, আমরা লাল পতাকার অশ্রু বিষয়ে মুগ্ধ হতে পারেন। আর সেই মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিতে পারেন পাঠকের মধ্যে। কবির কাজ যদি আমাদের বিস্মিত করা হয় তবে তুষার আশ্চর্যজনকভাবে সফল।

কুসংস্কারবশত যে সময়টাকে আজকাল সত্তর হিসেবে নির্দেশ করা হয় তুষার চৌধুরী সে সময়কার কবি। তখন খুব সহজ ছিল এবং তা প্রচলিতও ছিল কিছু মৌন অভিমানময় শিথিল অক্ষয়বৃত্ত; সমাজ-হিতৈষণার টুংটাং, আখ্যানধর্মী এবং বাস্তববাদী রচনার অবিরত প্রজনন। তুষার সে পথ পরিহার করেছেন। তার প্রথমদিকের রচনা পরীক্ষা করলে দেখতে পাব স্নায়ু বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের থেকেও যা অধিক তা হচ্ছে ধ্রুপদী আয়োজন। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে সালভাদর দালি যেমন, এলিয়ট যেমন শিল্পের দুঃস্বপ্ন ও নিশিযাপনের মধ্যে নব্য-ক্লাসিকতার সংযোজন ঘটান; তুষারের মনো-প্রবণতা সেরকম। তিনি কোন 'না-কবিতা' লিখতে চাননি, কোন অ্যান্টি-পোয়েট্রির কটাক্ষে সম্মতি জানান নি বরং কবিতাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন শব্দের পরতে পরতে রহস্যময়তার মৌল অধিকার।

নন্দনতাত্ত্বিক অর্থে এইজন্যেই তুষার চলতি শতকের আধুনিকতার সহবাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন যে তার বয়ান বিষয় বা বিবরণ থেকে দূরে সরে গিয়ে পরা-বাস্তবতার একটি ডিসকোর্স রচনা করে। এবং এই ডিসকোর্সের গহন অবয়ব ও মতাদর্শ কবিতার ত্বকের সঙ্গে, চেতনার উপরিতলের সঙ্গে কোন অপরিহার্য সমীকরণে বাঁধা নয়।

এই-ই তবে বিমূর্তায়ন ও বহুস্তর সমন্বিত পরিপ্রেক্ষিত। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত ছ'টি বইতে মুদ্রিত অক্ষরের সূত্রে আমরা যা উৎকীর্ণ দেখেছি তা, প্রকৃত প্রস্তাবে, অস্বীকার ও অন্তর্গমন। অনেকদিন আগে এই কবি একবার বলেছিলেন—নুড়িপাথরের চেয়ে শব্দেরা কিছু বেশী বিমর্ষ। কে আদর করলে এই বিমর্ষ শব্দেরা রাগমোচন করে? হীরকে রাখে ওষ্ঠ? আমরা তাকে চিনি সে কবি। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এরকম কবিদের একজন আমাদের এই বাঙালী সহজীবী

শ্রীযুক্ত তুষার চৌধুরী। ছোট এই চরিত্রলিপির সূত্রেই তাকে আমি পাঠকসমীপে নিবেদন করলাম।

তুষার চৌধুরীর কবিতাগুচ্ছ

কালো গোলাপ

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমি একটা সুড়ঙ্গের
ভেতর দিয়ে চলেছি
এ নিয়ে কোনো দ্বিরুক্তি নেই যে আমি একটা রাত্রির
ভেতর দিয়ে চলেছি
একটা অন্তহীন সুড়ঙ্গ যার বাইরে রোদ্দুর
এমন একটা সীমা মুড়োহীন রাত্রি যার এদিকে বিকেল
ওদিকে ভোর এক কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়
আমার চারপাশে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম ব'লে
আলাদা কিছু নেই
শুধু গোলাপ শুধু ঘন কালো গোলাপ প্রতীত হয়
গোলাপের গালিচার সুগন্ধ অন্ধকারে আমার চোখ
হারিয়ে গেছে
আমার সঙ্গে বদঅভ্যাসের মত চ'লে এসেছে কিছু কিছু
স্মৃতি আর প্রতীক
পৃথিবীর বিচিত্র সব মেয়েদের থেকে দূরে চলে এসেছি আমি
ওরাও এতদিন ভুলে গিয়ে থাকবে আমার হাবা মুগ্ধতার
বোবা বলিদান
মৃত নারীদের মাংসের মত হিম বাতাসের হাসি
উড়ে বেড়ায় এখানে
পিপে পিপে আঁধার-নীল মদের ভাঁড়ারঘরে হারিয়ে গেছে
মেধা আমার
আমার হৃদয় নেই হৃদয় ছিল না কোনোদিন
কল্কে-ফুর্তি আমার কপালে লেপে দিয়েছিল যে-শ্মশানসৌরভ
মিলিয়ে গেছে তাও

আমার নতুন চোখ দ্যাখে উলঙ্গ অন্ধকার
আমার নতুন কান অন্ধকারের গান শুনতে পায়
অন্ধকার আমাকে উর্বশীর মত সঙ্গ দেয়

আমার নবীন নখে আমি অন্ধকারের শরীর আঁচড়াই
অন্ধকারের সব মোরগ আমি শেয়ালের মত গিলে খাই
আমি চাই না ওদের কেউ আগামী ভোরের দেখা পাক
অন্ধকার প্রান্তরের গোলাপ পাপড়ি খেতে এত মিষ্টি যে
আমি তাতে সামান্য অন্ধকার সমুদ্রের
লবণ মিশিয়ে দিই

খুব বেঁচে গেছি যে এখানে আমাকে গুচ্ছের কবিতা লিখে
প্রতিভা প্রমাণ করতে হয় না
সুড়ঙ্গের রাত্রির লিবিডো-বিছানার কালো কৌমুদীতে
কবিতার কোনো মানে নেই
কোনো মানেরই কোনো মানে নেই
ক্লান্তিহর গাঢ় দ্রাক্ষাসবের হিম প্রস্রবণময় কালো তেপান্তরে
মানুষ ব'লে আলাদা কিছু নেই
মানুষ হ'য়ে ওঠার তাগাদা নেই
মানুষ বানানোর কারিগরও নেই এখানে
সৌরবিশ্বের শাশ্বত ভঙ্গুরতার উজ্জ্বল মেগাপোলিস থেকে
অন্ধকারের নমনীয় লতাবিতানে পালিয়ে এসেছি আমি

এক অন্ধকার প্রজন্মের জন্মদিতে দায়বদ্ধ আমি শুনতে পাচ্ছি
অযুত রেশমি ইঁদুরের শৃঙ্গারশিস
বিলম্বিত রমণকল্লোল
এই অন্তহীন আঁধারসুড়ঙ্গে আমার নগ্ন অন্ধকার বধূ
নিরাপদ কালো ডিম পাড়ে
আমার এখানকার বধূ ফেলে আসা পৃথিবীর নারীদের মত
আত্মপ্রেমী আহ্লাদী গোছের সোনালী কাকড়া নয়
স্বর্ণমানও অচল এখানে
এখানে পাখি আছে অনেক কিন্তু একটাও দাঁড়কাক নেই
সব দাঁড়কাক আমি আমার আগেকার নারীদের মত
অতীত সৌরবিশ্বেই রেখে এসেছি
এখানে ত্রিকোণ প্রেমের ছেলেমানুষি নেই, সুপারমডেল লগ্নি পুঁজি নেই
এখানে অশ্রুবরফ নেই
এখানে শ্রম জমাট বাঁধতে পারে না
এই অন্ধকার বিশ্বে স্বর্গমর্ত্য আলাদা কিছু নয়

এখানে ভ্যান অ্যালেন বেল্ট নেই, তার ফুটো হওয়ার সমস্যাও নেই
এখানে পুঁথির সাথে লণ্ঠনের, আরামকেদারার সাথে আলস্যের,
নাবিকের সাথে নৌকোর যোগসূত্র নেই
এখানে প্রতি মুহূর্তে স্বর্গসম্ভাবনা
প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু সরে যায়
এখানে কুকুরকোরাস নেই
প্রতিটি আঁধারদুর্গে লুকিয়ে রয়েছে এক একটি
অনুড্ডাবিত সিম্ফনি
অন্ধকারের করতলে ময়ূরপঙ্খী রাতের শামুক হেঁটে বেড়ায়
আমাদের তালাচাবিহীন ইতিহাসহীন আঁধারসিন্দুকে প'ড়ে আছে
অচল পয়সার মত অন্তহীন বাতিল নক্ষত্র
নক্ষত্রের অবক্ষয় জেনে, বিকিরণবিকার ও মহাজ্যোতিষ্কের বিস্ফোরণ জেনে
আমরা এসেছি এক চোরাটানে গাঢ়
কালো চুলে ঢাকা চিররতিমুখর রসাতলে
এই অতিকায় গর্ভপ্রদোষে শুনি অশ্রুত ঢেউয়ের গান
তিমির কোরক ফাটে অবিরাম এইখানে
পুঁচকে সিন্ধুঘোড়াদের সাথে খেলা করে আমার আঁধারশিশুরা

আফ্রিকার কাঠের পুতুলের মত দেখতে আমার আঁধার পিতেমোর মুখ
প্রপিতামহ, প্রমাতামহ, ওগো ভারভারিক্কি আলোর ছেলেরা,
বিষমন্থনে যে-অমৃত উঠে এসেছিল তার দু'এক ফোঁটা জিভে ছুঁইয়ে
তোমরা হ'য়ে উঠলে অন্ধকারের দেবতা
তোমাদের প্রতি আমার চিরভঙ্গুর প্রণাম ও ঝুরঝুরে আলিঙ্গন-প্রয়াস
প্রপিতামহী, প্রমাতামহী, ওগো মৌকলসি ওগো সেবাদাসী
যে-আগুন তোমাদের জ্যান্ত ঝলসেছে
যা, মানুষ ভাবে, তারা পাথরে পাথর ঠুকে বানিয়েছিল
আমি অতল কুয়োয় নিক্ষেপ করেছি
সব আগুন ও আলোর অত্যাচার অতীত বিশ্বে ফেলে এসেছি আমি

এখন
সব আলো বাসি শিশিরের মত ঝেড়ে ফেলে
কালো গোলাপ
আগামী কোনো প্রভাত গোধূলির জননফুল হ'য়ে
অন্ধকারকে গাঢ়তম অন্ধকারের দিকে ডেকে নিচ্ছে

অশনাক্ত নাভি

তোমাকে জড়িয়ে কিছু পাতিহংস-উপখ্যান আছে হে সুন্দরী
হাজার আকাঙ্ক্ষা ওড়ে অরণ্যের
তোমার শরীর ছুঁয়ে পাতাঝরা অরণ্যের হাজার আকাঙ্ক্ষা উড়ে যায়

শান্ত ও বিস্তৃত এক কুমারীত্ব নিয়ে তুমি স্থির শুয়ে আছ
ইতস্তত ঘাই দেয় মূঢ় মাছ, অপেক্ষায় থাকে মাছরাঙা
গেড়িগুল্মে জারি থাকে হাঁসেদের নিরুদ্ধ সাঁতার
পানকৌড়ি পাতাল চুঁড়ে যতবার উঠে আসে ঠোঁটে তার সুকুমার চাবি
অস্নাত সারসগুলো মিছিমিছি খুঁজে মরে সায়রের অশনাক্ত নাভি

ওপড়াই পদ্মের মূল যতই চিবোই মধু ঝরে
আমার পায়ের নিচে শামুকের খোল ভাঙে রক্ত মেশে জলে
যতই জড়াতে চাই রূপসী জলের মাংস সরে, যায় স'রে
সুন্দরী সায়র তুমি রোদ বোনো জ্যোৎস্না তোলো ঘরে

আদিগন্ত পা ছড়িয়ে বাস্তকার পদ্মকার নষ্ট নর আপামর বাংলোর মাতাল
শাপলার টলটলে অশ্রু পান করে হুল্লোড়সমেত
গড়চুমুকের গলদাচিংড়ির মালাইকারি হ'তে চায় গুটিকয় নারী
সুন্দরী, কণ্টকগ্রীবা, চুম্বনে যন্ত্রণা বড় আলিঙ্গনে ভয়
শাপলাই তোমার চক্ষু, শতচক্ষু, ওদের শেকড়গুলো পান করে তোমার হৃদয়
বাতাস বুভুক্ষু, ওরা তোমার অলীক পাপড়ি গর্ভরেণু ছুঁয়ে উড়ে যায়

ভোর

ভোরের আগেই তুমি মূর্ছা গিয়েছিলে
সুড়ঙ্গের আঠাজলে ডুবেছিল নিয়তি তোমার
বেগুনি জঙ্গল থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে
তাড়াতাড়া নক্ষত্রের হাসি
নিদ্রার নির্জন ছাউনি ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়
প'ড়ে থাকে ছিন্ন জানু দগ্ধানো দু'হাত
হৃদয়ের মৃদুবল ম'রে যায় অস্থায়ী কণার মত

ভালোবাসা—আলো ফেটে যায়
পত্রহরিতের দিকে যাত্রা হ'ল শুরু
ক্লোরোফিল, জ্যাম্ফোফিল, স্পর্শ করো শৈবাল ও মাছের হৃদয়
সাঁতারু ও নগ্ন জল—কে কাকে জড়ায়
ভোরের হাওয়ায় জাগে জলোমি
বাদললাঠি গাছে
কারা লেখে নাম ?
উদ্ভিদের কোনো নাম আছে ?
স্খলিত পা ফেলে তুমি পাখিমলে ছোপানো বেঞ্চটির দিকে
হেঁটে যেতে পারো বড় জোর

সুন্দর

লিণ্ডা ইভাঞ্জেলিষ্টার মোহে কে জড়ায়
কাঠবাদামের গন্ধ সিণ্ডির শরীরে
ওরা হামাগুড়ি দিতে পারদর্শী, ওরা
বক্ষ মেলে দ্যায় কিন্তু বৃন্ত ঢেকে রাখে
মৃত নক্ষত্রের নিচে নাভিবিন্দু, তার নিচে যোজন যোজন মসৃনতা
রুডিয়ার হাতে ধরা অনায়াস রূপোলি দর্পণ
তার নেত্রকোণ থেকে সে ছাখে নিজেকে
আঙুলে সরায় চুল, প্রতিবিম্বে আঁক কষে কত না কামিনী
ক্রিষ্টি প্রতারণাময়ী, দীর্ঘউরুনীবিভঙ্গে
দুই বুক বাহুতে আড়াল ক'রে আছে
লিণ্ডা নর্মসখী, ওকে রচনা ক'রেছে কোনো
রেনেসাঁ-ভাস্কর নয় নন্দনবণিক ধূর্ত নরমমর্মরে
ধরো এল ম্যাকফার্সন, মায়া না, জলপরী নয়
বড়জোর সৈকতকুহুরী
নাওমি নিদয়া তার নয় দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে
সুন্দর ওদের দেহে ব্যাকরণ-জ্যোৎস্না হ'য়ে ফোটে
সুন্দর, কবন্ধ তুমি মুণ্ডু গড়াগড়ি যায় মুণ্ডিত জাঙালে
শকুন্তলে ! অয়ি শকুন্তলে !
সুন্দর গোঁজিয়ে গেছে গভীর কর্দমে, দুষ্ট ফাজিল শামুক
সুন্দর আমার স্বপ্নে শিকলিপরা বাঘিনীর সোনালি কৌতুক

কোথাও ইমন নেই

ক্লান্ত আমি তোমার উরুতে মাথা রাখতে যাব, দেখি তুমি
অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছ
আমাকে জাগিয়ে রাখে উজ্জ্বল করাত তার সশস্ত্র দাঁত, তুলোবীজ ওড়ে
মৃত্যুর নরম ফুল হাড়ে মাংসে ফিকে নীল বিষের পরাগ
কোথাও ইমন নেই, স্থিরতার গাঢ় জল, মুক্তোহ্রদে মুক্তি নেই আর
আমার আঙুলগুলো শিকড়সন্ধানী, আজ ইতস্তত ঘাসে প'ড়ে আছে
আমি অন্ধকারে খুঁজি বাগানের গাঢ় রঙ, জন্মগন্ধ, মৃত্যুযোনি
অধরা ও আধোধরা ওরা ঠিক থেকে যায় ওদের মতন
আমার ইন্দ্রিয় কাঁদে, রক্তরসে ছিঁচকাঁদুনে পুরুষ আমার
বেকুব মূর্ছায় আমি দেখেছি নরম দ্বার
মিটমিটে প্রদোষে
থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড়, মূঢ় দেশে বহুদিন
কোনো ভোর নেই উদ্ভিন্নতা নেই
হরেক পূরবী আছে, সন্ধে আছে, ইতর ইশারা, রতিস্থখ
খোলস পাখনা পা আর গন্ধে ম'ম ঘুম অন্ধকার
কিন্তু কোনো গাইয়ে পাখি নেই

নীতিকথা

মানুষ অবুঝ, তার স্বপ্নে জাগে ফাল্গুনের লক্ষণসরণি
রক্তের আগুন তাকে নিয়ে যায় হেমন্তের হিম বেগুনিতে
ফুলের বাজারে ওই মেয়েটিকে ছাখো, ওর এক হাতে গোথরো
অন্য হাতে ভায়োলেট
পুরাণের সিন্ধুপ্রাণী উঠে আসছে দেখছ না কি ছাপোষা মৈথুনে
নীতিকথা ডিম হ'য়ে রেণু হ'য়ে ফুটে উঠছে ফলে ফুলে
পোকায় অর্বুদে

পারদ-পুকুরে এক রাজহংস আর্তনাদ করে
গোধূলির মেঘে রক্তছোপানো দস্তানা দেখেছে সে
মেলো রোমান্টিক পদ্য হাই তোলে, তন্দ্রিলার দিকে
এগিয়ে চলেছে এক বুড়ো ভাম চুপি চুপি মাত্রা গুনে গুনে

আর আমি, শব্দের লাম্পট্য জানি, ছন্দলীলা, ধূর্ত বিমূর্তন
ননী অঙ্গে উল্কি আঁকি, মারীর ইঁদুর ছাড়ি বুষ্‌দবিবরে
শিশুরা কানিশ থেকে উঁকি মারে, খাঁচার ভেতরে
অ্যানিমার স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠা বাঘ এক, ক্ষুধার্ত, গজরায়
আর তন্দ্রিলার দিকে এগোচ্ছে যে বুড়ো ভাম চোরিছুপি মাত্রা গুনে গুনে
সে জানে না, যদু জানে, নরমাংস খেতে ভালো হেমন্তে ফাল্গুনে

হে মহাজীবন

নিঃসঙ্গতা কাঠগোঁয়ার ; বলি, যাও ! কিছুতে যাবে না
ফুর্তি বেয়াদব, তাকে তাড়াবো কি ! সে বান্দা নাছোড়
মুঠো মুঠো পরিহাস, রঙ্গব্যঙ্গ, কৌতুকের ফেনা
রিরংসা, বর্জ্জাত রাত, অশ্রুপাত, ভোর

রুদ্র, নাও রুরুমাংস, শঙ্খ চক্র ছুঁড়ে ফ্যালো জঞ্জালের ভ্যাটে
প্রসাধনাগারে একলা প'ড়ে আছে অনুতপ্ত ম্লান ইন্দ্রধনু
সুদর্শন যুবকেরা পায় রসাতল-স্বর্গ, বিষাক্ত চ্যাটচ্যাটে
শান্তি স্বস্ত্যয়ন সেরে মনুষ্য মর্গেই ঘোরে ভালো জানে মনু

মাছি মাছি শবযাত্রী ভিড়েভিড়াক্কার নাকে রুমাল জড়িয়ে খোঁজে
আত্মীয়ের শব
ডোমের মতলব মন্দ, অপেক্ষা, আতরগন্ধ, কাপড় সরালে ধন্ধ :
আমার আমার
একটি কিশোরীর মুখ কী স্নিগ্ধ শীতল, ওকে আরেকটু নম্বর দিলে
অশুদ্ধ তেমন
হ'ত কি মহাভারত, বলো ডোম, বলো ম্যাজিষ্ট্রেট, বলো
কান্নাচাপা স্বজনবান্ধব
শ্মশানবন্ধুর হাতে ফুলমালা, ধুনো জ্বালো, গাময় আতর ঢালো
বলো হরি, এবার সৎকার
শকটের কাচে বন্দী, যাত্রা করো, এখনো তোমার লাশ, অশনাক্ত
প'ড়ে আছে হে মহাজীবন !

রসায়ন

কবিতার রসায়নে ধুন্ধুমার ধোঁয়া ওঠে
এই যজ্ঞে আমি আজ আমিই জল্লাদ
পেয়েছি চরম দণ্ড, মৃত্যুমঞ্চে হাসিখুশি আমিই ফাঁসুড়ে
রক্তে প্রেম মাংসে গর্ত নষ্টামির পাপড়ি ঝরে আপাদমস্তক
পদ্যের পাঠক যারা আর যারা আঁজলাভ'রে পেতে চায়
পরমান্ন কাব্যের প্রসাদ

আমার বিরুদ্ধে যাবে, যায় যাক, কেননা কাব্যের মধ্যে
আমি গুঁজে দিই ভয়, অন্ধকার, জিঘাংসার পদশব্দ,
বিষমাখা ফলক

যত বলি, 'শব্দের ভেতরে নাচো নটরাজ। চুল্লি জ্বালো,
আলোর হাঙ্গামা দাও জুড়ে'
কল্পশূন্যারের শেষে পুতুলে কান্নায় তবু ডেরা খোঁজে
সারে সারে জখম স্তবক

নৌকো

এখানে নৌকোর বড় অনটন
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হ'লে মাঝিরা উধাও
প্রেমিকাও ছোঁবে না তোমাকে
যেন তুমি কেউ নও, রোঁয়া ওঠা চাটুকার তুমি
থুৎনিতে দংশন চিহ্ন হৃদয়ে বাবলার ফুলও নেই
যেন সে মেয়েটি শুধু পরাগরেণুর মত কিছু জলবিন্দু ছুঁতে চায়

জেনেছে সে পুরুষশরীর
উপড়ে নেয়া মাংসের পালক
উঠে যায় নেমে আসে সিঁড়ি
বিছানায় গ্রন্থাগারে
বিনিদ্র পুরুষ তার রাত্রিভর নারীনির্ভরতা
অস্বীকার ক'রে দুই ছত্র লেখে হলদে তারাদের ইতিহাস

স্বর্গোদ্যানে প্রাতরাশ সাজানো রয়েছে
প্রবাদের যোগ্য তুমি হ'তে চাও ?
মানুষ, তোমাকে
খেয়ে যেতে হবে নষ্ট ফল।

জীবনদায়ী অন্ধকার

জীবনদায়ী অন্ধকারে গল্প করে তিন মেয়েলি তরুণ
নিরাশ্রয় প্রেমিক খোঁজে চটকদার রাতের জলধারা
জন্তু সে নয় হেমন্ত শীত বুধ বিষ্ণুদ স্বপ্ন দেখার তাড়ায়
প্রেমকটি তার তিন পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়ায়, দৃশ্যটি বেশ করুণ।

নদীর ধারে ফোঁপরা বট মাংসপোড়া গন্ধ বলিহারি
গাড়ি আমার টানছে ফিঙে দোয়েল রাজহংস ঘুঘু চড়াই
পরান আমার নিরানন্দ হস্তিনীর স্তনের মত ভারি
কালিনী নই কূলে কে গো বাঁশি বাজায় বড়াই

অধিকার হরণ

কল্যাণী দত্ত

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জগতে নিঃসন্দেহে এক-জন দিক্‌পাল। ঢাকা থেকে বৃহত্তর ভারতের দু'খণ্ডে স্বর্ণদ্বীপ দিয়ে তাঁর যাত্রা সুরু। হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ্ দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল এগারো খণ্ডে সম্পাদনা বোধহয় তাঁর বৃহত্তম কাজ। পুত্র অশোককুমার পিতার গ্রন্থাদির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। অশোককুমার গুর্জর প্রতীহার যুগ নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় বিদ্যাভবনের কানাইয়া লাল মুন্সীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আমাদের বাড়ীতে দাদা বিনয়কৃষ্ণের কাছে তাঁর যাতায়াত ও পত্র ব্যবহার দুই নিয়মিত ছিল। রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনে বিদ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং ধনাগম সবই বর্ধিত অঙ্কে শীর্ষে স্থান পায়। রমেশচন্দ্রের একাধিক কন্যা থাকলেও তাঁর পুত্র একটিই, তাতে জননী প্রিয়বালা দেবী হঠাৎ বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে সন্তানহীন পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অনুরোধ করলেন। পুত্র এই সামান্য কারণে বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ করতে কোন-রূপে সম্মত হলেন না। তখন তাঁর জননী অর্থলোভ দেখালেন অর্থাৎ বিবাহ না করলে পিতার সম্পত্তির অধিকারচ্যুত হতে হবে, ত্যাজ্যপুত্র করবেন এমন কথা পিতাকে দিয়েই বলালেন। অশোক তাতেও সংকল্পচ্যুত হলেন না, বিপিন পাল রোডের মস্ত বড় বাড়ীর মায়া ছেড়ে শান্তিনিকেতনে অতি ক্ষুদ্র বাড়ীতে (কর্ণিকার ?) রইলেন দীর্ঘকাল। সেখানে তাঁর একাগ্র বিদ্যাচর্চা আর স্ত্রীর অনুক্ষণ সেবা নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রমেশ মজুম-দারের মৃত্যুসংবাদ দৈনিক কাগজ এভাবে বেরোয় যে দেশমান্য পিতার শেষকৃত্য করতেও পুত্র আসেন নি, তিনি নিভৃত অবসর জীবনযাপন করছেন। অশোক পিতার মৃত্যুর পরে বিনয়দাকে বলেন—বাবা তাঁর বাড়ী বা মা তাঁর অলঙ্কার মেয়েদের দেবেন এ তো জানাই ছিল কিন্তু বাবা বইগুলো আমাকেই দিয়ে যেতে পারতেন —তাও দিলেন না। একজন বিদগ্ধপণ্ডিত এবং দেশমান্য ঐতিহাসিক স্ত্রীর বশ হয়ে নিজের জেদ এবং অকারণে ছেলের অধিকার হরণের যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে রাজা দশরথের বৃত্তান্ত আবার মনে পড়ে।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর জীবিতকালেই দেশের সর্বত্র শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করেন। তাঁর আত্মচরিতের মত সুখপাঠ্য বই সে যুগে অল্পই ছিল। বালক বয়েসেই তাঁর বিবাহ হয়, স্ত্রীর নাম প্রসন্নময়ী। শিবনাথের পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর

প্রসন্নময়ীর পিতৃকুলের দোষ আবিষ্কার করে পুত্রের আবার বিবাহ দেন, এই স্ত্রীর নাম বিরাজমোহিনী। দুই স্ত্রীকে নিয়ে একগৃহে বাস করার সঙ্কটের কথা আত্মচরিতে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে। নিজে সংসারী হ'বার পর শিবনাথ প্রসন্নময়ীকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রসন্নময়ীর সমাজসেবা, ঔদার্য, সন্তানবাৎসল্য, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি নানা গুণের কথা আত্মচরিতের অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। শিবনাথ বিরাজমোহিনীর খুনরায় বিবাহ দেবার প্রস্তাব করলে, বিরাজমোহিনী দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন কিন্তু তাঁর পিতৃগৃহের আশ্রয় দৃঢ় ছিল না অগত্যা শিবনাথের গৃহে প্রসন্নময়ীর সঙ্গিনী হয়েই তাঁকে থাকতে হয়। যদিচ বিরাজমোহিনীর নিজের বিবাহে কোন দায়িত্ব বা অধিকার ছিল না, তবু তাঁর একাকিত্ব নিয়ে শিবনাথ কোনও দিন চিন্তিত ছিলেন না। প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পরে শিবনাথ যখন তাঁকে পুরোপুরি পত্নীভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি যথেষ্ট শক্তি ও মনোবলের পরিচয় দেন। শিবনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

এখন যে উপেক্ষিতা-মহিলার কথা বলতে যাচ্ছি তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশে। ত্রিপিটকাচার্য-সমাজবাদী দার্শনিক রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিনি প্রথম পত্নী। এগারো বৎসর বয়েসে আজমগড় জেলার পন্দহাগ্রামে রীতিমত মিছিল করে রাহুল বিয়ে করতে যান। এই বিয়েকে রাহুল সারাজীবন উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করে নিজের বিবেককে সুস্থ এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন কিন্তু কার সঙ্গে লড়াই? রামমোহন বিদ্যাসাগর এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের কারণে কলকাতা এবং বঙ্গভূমির শহর অঞ্চলে শিক্ষিত হিন্দু পরিবারে দশ এগারো বছরে ছেলেদের বিয়ের কথা তেমন শোনা যেত না কিন্তু সরযূনদী পেরিয়ে আজমগড় অঞ্চলে বাল্যবিবাহ খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষত ঐসব ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার বা দায়িত্ব বলতে বিন্দুবিসর্গ কখনই ছিল না। এই অবস্থায় বিয়ের ৩০ বছর পরে কৃতী ও সুপণ্ডিত হয়ে নিজের গ্রামে ফেরার পরে একটি আপাদমস্তক কাপড়ে মোড়া স্ত্রীমূর্তি যখন তাঁর পায়ের ওপর পড়ে তখন রাহুল তাকে বিশ্বসংসারের অচ্ছুৎ জ্ঞান করলেন কেন? কোন অধিকারে? নিরুপায় মেয়েটিকে সর্বসমক্ষে তিনি স্ত্রীবলে স্বীকার না করে বল্লেন—এই ছেলেখেলার বিয়ের কোন দায়িত্ব তিনি নেবেন না। দায়িত্ব কি তবে ঐ মেয়েটিরই ছিল? মেয়েটি কিছু টাকা চায়—তীর্থযাত্রার কড়ি। রাহুল তাও দিলেন না। মাসোহারা দেওয়া দূরের কথা একবার মাত্র থোক টাকা দিলে তাঁর মহাভারত অশুদ্ধ হতো কি? রাহুল রাশিয়ায় গিয়ে লোলাকে আর প্রায় শেষ জীবনে প্রাইভেট সেক্রেটারী (কমলা দোরজি) নেপালী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন সেসব কথা সকলেরই জানা। সরল গ্রাম্য পিতৃকুল শ্বশুরকুলে আশ্রয়হীনা নাম গোত্রহীন এই মেয়েটিকে দয়া করতে তাঁর ভাঁড়ার শুকিয়ে গেল! এই কি এঁদের সাম্যবাদ আর সমাজবাদ! সংসারে শত শত অনাদৃতা বা

উপেক্ষিতা মহিলা ছিলেন, আছেন বা থাকবেন। সাধুসান্তরা যখনই গৃহত্যাগ করেন তখনই তাঁদের পত্নীরা সঙ্গীহীন অনাদৃত জীবনযাপনে বাধ্য হন। তবে আধুনিককালে চিন্তাশীল বিবেকী মানুষদের দায়িত্বহীন হতে দেখলে মানুষ দুঃখ পায়। স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা একই কথা, পিতৃগৃহে মর্যাদাহীন হয়ে বিনা মাইনের সেবিকা ছিলেন তাঁরা।

শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ী দেবীর মুখের কথা একটু বলি। একবার তাঁর কোন ভগ্নীপতির ক্ষয়রোগ হয়। ছোঁয়াচের ভয়ে কচি ছেলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সরে এলেন। তখন দূর পাহাড়ে বাঙালী মেয়েরা সেবা করতে যেতে চাইতেন না। লেখিকার মা ব্যবস্থা দিলেন—'জ্যোতু থাক, ওর যদি কিছু হয় ওর ছেলেমেয়েদের তখন আমরাই দেখব।'

আমাদের নিজেদের ঘরেও তাই দেখেছি—স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে আমাদের ঘরে মুরলা এলেন কিন্তু তাঁর ডাইনে বাঁয়ে দুই বিত্তবতী এবং সন্তানবতী ভগ্নী। তাদের অসুখে বিসুখে সেবা পরিচর্যায় আর সন্তানপালনে মুরলার জীবনের বারো আনাই ক্ষয়ে যায়। দুঃখী মেয়ে তো দুঃখ পাবেই ভগবান যার কপালে যা লিখেছেন। মায়ের ওপর কর্তব্য থাকে ছেলেদের, যে মাসী মানুষ করে খাওয়া দাওয়া ভুলে রাতের পর রাত জাগে সে তখন তখন ধাইমার মত অপরিহার্য, তারপর? সেকালে কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়ত এর চেয়ে ভাল ছিল। কোন প্রত্যাশা ছিল না মাসকাবারের। ঘুরে ফিরে, পরের বাড়ী রেঁধে বেড়ে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে যেতেন সেই মহিলারা।

এযুগে অধিকার কতটুকু আর কি পর্যন্ত, তার বিচারের মাপকাঠি হয়ত আলাদা।

জাহাজ ডুবি

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

চুড়িদারের হাতায় চোখের জল মুছে সোমা বলে—এখন কী হবে ?

অর্ক সোফার দিকে তাকায়। রিনি গুম হয়ে বসে আছে। চোখ দুটো বন্ধ। শরীর দোলে এদিক ওদিক।

অর্ক নিচু গলায় বলে—ঘুম এসে গেছে। আর ভয় নেই।

ঝাঁকিয়ে ওঠে রিনি। দুলে যায় শরীর। সোফায় পা দোলাতে দোলাতে ছড়া কাটে—

বড়কির বোন ছোটকি
গাবদা গাবুস মোটকি
কাঁধে আঙুল মোটকে
ভাত খায় না চোটকে

সোফায় গড়িয়ে প'ড়ে রিনি বিড়বিড় করে—লাল পিঁপড়ে দেখলে পরে / অমনি পালায় ছুটে।

সোমা আগুন-চোখে অর্ককে বলে—চার বছর আগে বলেছিলুম ফ্ল্যাটে আর ড্রিংক কোরো না। মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

—চার বছরে তো কিছু হয়নি, লাস্ট ফোর ইয়ার্সে অন্তত একশ' বার ড্রিংক করেছি বাড়িতে। আজ···

অর্ক কথাটা শেষ না করে থেমে যায়। সোমা কান চেপে বসে আছে। লোকশিল্পীরা চটকা পরিবেশন করে—

নওদারীটা মরিয়া আবো মোর সে হইছে হানি
বিছিনা পাড়িতে ও মোর আবো হে পড়ে চোখের পানি
কি ট্যাপ্পাস কি টুপ্পুস করিয়া হাঁ।

—টেপটা বন্ধ করবে ?

সোমার গলায় ঝাঁঝ।

—তোমার গলাটা তাহলে পুরো কমপ্লেক্সে পৌঁছে যাবে। ছুটে আসবে সবাই নাটক দেখতে।

অর্কের গলাতেও উত্তেজনা। কথা শেষ করে ওঠে অর্ক। স্টপ সুইচটা মাথা তোলে।

উঠে বসে রিনি—গান চলুক। ফোক সং। আহা কি মাদকতা। আহা।

সোমা ফেরে অর্কের দিকে। গলা নামিয়ে বলে—তোমার লাস্ট উইকের কথাগুলো রিপিট করছে।

অর্ক চেয়ার ছেড়ে রিনির পাশে এসে বসে। মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলে—ঘুমো। রাত হয়েছে, ঘুমো।

রিনি বাবার গোঁফে টান দিয়ে বলে—তুমি যে পাড়ায় থাকো তার নাম কী ?

অর্ক অবাক চোখে সোমার দিকে তাকায়। সোমা চাপা গলায় বলে—

আটটা বছর মিটিং, কনফারেন্স, বক্তৃতা করে কাটালে। খবর রাখো মেয়ের ? ভূগোলের প্রশ্ন বলছে।

—বাবা কিছু জানো না তুমি। আমি যে পাড়ায় থাকি তার নাম ইডেন পার্ক পাড়া।

দু' ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে সোফায় হেলে যায় রিনি।

টেপ রেকর্ডারে লোকসঙ্গীত বাজে—

আগে তো না জানিলাম ক্যান পীরিতি করিলাম
মরিলাম বন্ধুয়ার পীরিতে

অর্ক সোমাকে বলে—তুমি কী করছিলে ?

—মাছের চপগুলো তেলে ছেড়েছি। না তুলে আসি কি করে ! আমি জানবই বা কেমন করে তুমি ব্যবস্থা না করে চলে গেছ !

—বেল বাজতেই আমি উঠে পড়েছি। ভাবলুম ভেতরে ঢুকলে ঝামেলা। বাইরের দরজা থেকে মিটিয়ে দিই।

—তা অতক্ষণ ধরে কী বোঝাচ্ছিলে ?

—আরে নৃপেনবাবু ছাড়ার পাত্র নাকি ? কাল ভোরের ফ্লাইট ধরবে। ফরেনশিপে থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাচ্ছে। সেই কথা।

—কথা বলতে এতক্ষণ ?

—তুমি তো চেনো নৃপেনবাবুকে। বোম্বেতে জয়েন করবে বলে শুরু করল। তারপর কোন কোন দেশে যাবে তার ইটনারি। দুমাসের বেশি থাকতে পারে না, তার এত কথা !

—তুমি বললেই পারতে পরে কথা বলে আসবে।

—কখন আর যাব ? খেয়ে যাওয়া যায় নাকি ! বড় এক্সিকিউটিভ বলে পাড়াতে একটা পরিচিতি আছে আমার।

রিনি নড়ে। পাশ ফিরে বিড়বিড় করে বলে—বাবা, তুমি কাল অফিস যেয়ো না। আমাকে সকালে এক টাকা দিও। বাদাম খাবো। বিকেলের টাকায় ফুচকা।

—খাবে, কাল সকালে খাবে। আজ ঘুমোও।

সোমা রিনির বব্-কাট চুলে হাত বোলায়। রিনি মায়ের কথায় আশ্বস্ত হয়ে চোখ বোজে।

টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে অর্ক সোফায় এসে বসে। সোমাকে বলে—রিনি কি বুঝতে পেরেছিল আমার কোল্ড ড্রিংসে হুইস্কি মেশানো আছে?

—তা কি করে জানবো! টিভি দেখে শিখতেও পারে।

—না, মানে, নিজেরটা খায়নি। তোমারটাও না। আমারটাই খেলো। আমার গ্লাসে পরিমাণ বেশি ছিল বলে বদল করল নাকি!

—কিন্তু দু-আড়াই বছর তো এরকমই করে আসছো তুমি। কোনোদিন তোমার গ্লাসে চুমুক দেয়নি।

—কিন্তু খেল কি করে? গন্ধ লাগার কথা। তাছাড়া ঝাঁঝ!

—ইলিশমাছের চপ দিয়ে খেয়ে ফেলেছে। আমরা এসে পড়ব ভেবে চোঁ চোঁ করে শেষ করেছে।

—মা, আহ্! হিরো নামছে। আহ্! আঁখিয়া মিলাও কভি আঁখিয়া মিলাও।

সোমার দু-চোখে আতঙ্ক। রিনি ওঠে। ধরে ফেলে অর্ক। রিনি চেষ্টা করে যায় মাধুরী দীক্ষিতের শরীরের সঙ্গে তাল মেলাতে। পারে না। দুচোখে টান। চোখের কাজ ছাড়া গানের তাল কেটে যায়।

সোমা অর্কের কানের কাছে মুখ এনে বলে—ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? অর্ক কপালে হাত বোলায়।

সোমা উত্তর না পেয়ে ক্ষুণ্ণ—কি, শুনলে আমার কথা?

—ভাবছি।

—কী?

—ডাক্তারকে কী বলা যাবে! শোনা মাত্র রিঅ্যাক্ট করবে।

—তা বলে বসে থাকবে? কী হবে মেয়েটার, চিন্তা নেই তোমার?

—অর্কবাবু...

অর্ক আর সোমা রিনির অস্পষ্ট উচ্চারণে কান পাতে।

—অর্কবাবু, চলে এলুম। তিন মাস হয়ে গেল। বাড়িতে ছেলে আর বৌ। দুর্গাপুজোর সময় বাইরে থেকে যাব! চলে এলুম।

অর্ক সোমার দিকে ফেরে। গলা নামিয়ে বলে—সব কথা কানে ধরে রাখে! নৃপেনবাবুকে কোট করছে।

—অর্কবাবু, আমরা মিস্ত্রি। আপনারা এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কের মানুষ। আমার মায়ের ইচ্ছে ছিল সরকারী বড় অফিসার হই। ইংরেজিটার জন্যে মার খেলুম। জলে পড়ে গেলুম অর্কবাবু। অথৈ সমুদ্রের জলে।

সোমা অর্কের দিকে ফেরে। বলে—ঘুমনোর কোনো ইচ্ছেই নেই। বড় বড়

সেন্টেস বলছে। একি গো?

অর্ক তর্জমা দিয়ে কপাল ঘসতে ঘসতে বলে—হুইস্কিতে এই মুস্কিল। আস্তে আস্তে পিক-আপ নেয়। তবে কাটতে সময় লাগে অনেকক্ষণ।

—কী হবে?

মুখের ওপর দুলন্ত লক সরাতে সরাতে সোমা জিজ্ঞেস করে।

কীচ্ছু হবে না। বর্ষার সমুদ্রে জাহাজ অমন দোলে। নীল ঢেউ এক সময় শীতের বাতাসের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রিনি নৃপেণবাবুর জাহাজে ফিরে গেছে। জাহাজের ডেক থেকে শূন্যে হাত তুলে বলে—কী পাখি ওগুলো জেঠু? পেঙ্গুইন? অ, পেঙ্গুইন তো উড়তে পারে না। সী গাল?

সোমা ধমকায়—কী সব বলছিস রিনি! তুই সোফায় বসে আছিস। আমাদের ফ্ল্যাটে। চোখ বন্ধ করে ঘুমো। কথা বলিস না।

—মা, খাবো।

—কী? কী খাবি?

—মাছ।

—মাছের চপ আছে। ভেজে আনছি।

সোমা ওঠে।

—মা বস।

—কেন?

সোমা রিনির পাশে এসে বসে। বিলি কাটে রিনির চুলে।

—মা, মসীরের মুড়ো খাবো।

রিনির মাথা থেকে হাত সরিয়ে সোমা নিজের মাথায় রাখে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অর্ককে বলে—তুমি কিছু একটা করবে তো। এতক্ষণ শুধু কথা বলেছে। এবার ঝোঁক ধরছে। কান্না জুড়বে।

অর্ক সোমার পাশে এসে বসে। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—ডোন্ট গেট নার্ভাস। ঠিক হয়ে যাবে। বড় জোর আর এক ঘণ্টা।

—তুমি কি করে জানলে? এইটুকু বাচ্চাদের ড্রিঙ্ক করতে দেখেছো কোনদিন?

—ট্রাইবেলদের বাচ্চারা কত খায়। প্রত্যেকটা লোক-উৎসবে। তুমিও দেখেছো সিনেমাতে। কী ফিল্মটা যেন, অমিতাভ, আ হা, কী যেন?

বাঁহাতের পাঁচ আঙুল মেরে তালুর মধ্যে ছবির নামটা ধরে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় অর্ক। এক সময় দুটো হাত মুঠো করে ক্যাচটা লুফে ফেলে—শরাবী।

অর্ক 'শরাবী' শব্দটা একটু উঁচু স্বরে উচ্চারণ করে ফেলে। পাশ ফিরে

রিনি বলে—জেঠিমা, আমি দুধ খাবো।

কপাল চাপড়ায় সোমা। রিনির মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বলে—আমি মা, জেঠিমা না, আর ঐ যে তোমার বাবা।

'বাবা' উচ্চারণে সোমার ঠোঁটে যতখানি মিষ্টতা, চোখের চাউনিতে তত-খানিই আগুন।

চোখ নামিয়ে নেয় অর্ক।

—জেঠিমা, রেড সী-এর হারামীল দ্বীপে সী-কাউ আছে। জেঠু নিজের চোখে দেখেছে। আমাদের থেকেও লম্বা। না গো জেঠিমা, দুধ দেয় না ওরা। ওদের শরীরে তেল থাকে। দশ-বারো গ্যালন! এক গ্যালন কতখানি গো?

অর্ক 'ডিসগাসটিং' বলে চেয়ারে গিয়ে বসে।

—কী ডিসগাসটিং? তোমার জন্যে মেয়েটা মদ খেল। এখন বলছো ডিস-গাসটিং।

—আহা, আমি ওকে বলব কেন? নৃপেনবাবু ঐ সব গল্প বানায়। স্কুল থেকে এসে ঐ যে ওদের বাড়ি যায়···

—সে তো তোমার জন্যে।

—আমার? নৃপেনবাবুকে আমি ভয় করি। দেখলে পালাই।

—তবু তোমাকে যেতেও হয়। বিদেশী মদ, বিলেতী সিগারেট, জাপানী টেপ রেকর্ডার আর ক্যামেরা···

—সে তো তুমিও কর। বিদেশী কসমেটিকস আনাও। মাসে অন্ততঃ বার চারেক চা-কফি খাওয়াও। এমনকি যে বার বার্মা...

—বাবা, সিতাং...

—আবার!

সোমা রিনির মাথাটা সোফায় নামিয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে।

—মা, সিতাং...

সোমা অর্ককে জিজ্ঞেস করে—সিতাং কী?

—কে জানে কি!

সোমা রিনিকে বলে—সিতাং কী রে?

—নদী। নদীর চরে বেহালা বাজায় পেলিকানরা। ডানা ঝাপটালে সুর ওঠে।

সোমা রিনির চুলে হাত বোলায়—আন্টি বলেছে? তাই? তুমি চোখ বন্ধ করে সুর শোন মা, ঘুম এসে যাবে।

—ঘুম আসছে না মা। আমি বসে বসে বেহালা শুনি। মা, প্লিজ।

উঠে বসতে চেষ্টা করে রিনি।

অর্ক চেপে ধরে। রিনির হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলে—প্রমিস, কাল

তোমার জন্যে একটা বেহালা কিনে আনব। আজ ঘুমিয়ে পড়।

—তুমি ফিরবে অনেক রাত্রে। তখন তো আমি ঘুমিয়ে যাব।

—না, চলে আসব আমি। আটটার ভেতর চলে আসব।

—কেমন সুর সেটা শুনে কিনতে হবে। আমাকে নিয়ে যাবে বাবা?

—আমি জানি। বেদনার সুর তো ··

—পেলিক্যানের ডানার সুর। আকাশে পাখি উড়ছে, নিচে শব্দগুলো পড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির মতো। তুমি জেঠু···

—ওহ্।

হতাশ হয়ে চুপ করে যায় অর্ক। হোমসিক নৃপেনবাবু বছরে ন মাস বাড়িতে থাকে। বাকি তিন মাসের এক মাস খায়, এক মাস ঘুমোয় আর এক মাস নাট-বলটু টাইট করে। ফেরার সময় এক জাহাজ গপ্প ভরে পোর্টে নামে। সে সবই বাকি ন মাস পাড়ার বাচ্চাগুলোকে বিলি করে বেড়ায়। লোকে সহ্য করে নেয় বিলিতি মালের সুবাদে।

সত্যিই উঠে বসে রিনি। গলা চড়িয়ে বলে—আলো নেভাও।

আলো নেভে।

সোমা দাঁতে দাঁত ঘষে। অর্ককে বলে—এবার থেকে বাড়িতে মদ ঢোকালে আমিও খাব।

—একটা এ্যাকসিডেন্টকে তুমি জেনারালাইজ করছো। মেয়ার এ্যাকসিডেন্ট।

—এস. ও. এস.। বাবা, জ্যা-কেট পরো বাবা ঝাঁ-পিয়ে পড়ো।

অন্ধকারের ভেতর অর্ক চুপ করে বসে থাকে। রিনি চেঁচায়—বা—বা।

সোমা গলা চেপে বলে—বাবা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা।

রিনির গলা জড়িয়ে গেছে অনেকখানি। স্বর টেনে বলে—কো-থা-য়?

—সমুদ্রে মা।

—তুমি কো-থা-য়?

—এই তো।

—আলো জ্বালা-ও।

সুইচ টেপে সোমা।

—না না···

ঝাঁকিয়ে ওঠে রিনি। চোখ দুটো দুহাতে চেপে বলে—নী-ল।

টিউব নিভিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বালে সোমা।

—মা, স-মু-দ্র, নী-ল স-মু-দ্র।

—হ্যাঁ রিনি, সমুদ্র।

অর্ক বলে।

—বা-বা সো-ফা-য় কে-ন। বা-বা সাঁ-তা-র দা-ও।

অর্কের হাত ধরে টানে রিনি। অর্ক নেমে বসে কার্পেটে।

—মা, মা-ছ দা-ও।

শো-কেসে আঙুল দেখায় রিনি।

—মা, পা-খি।

কৃষ্ণনগরের মাটির মাছ সেন্টার টেবিলের নিচে। পুরীর কাঠের পাখি ডাইনিং টেবিলের ওপরে। রিনির ইচ্ছেয় প্লাস্টার অব প্যারিসের ভেনাস সমুদ্রে ভাসে। দেওয়ালে ঝোলানো পেতলের থালি দোল খায় জলে। বেতের চেয়ার ওল্টাতে হয়। সে চেয়ারের মাস্তুলে হরিদ্বারের কাঠের ময়ূর পেখম মেলে সাত রঙ দেখায়। জাপানী পুতুল দোল খায় ঢেউয়ের মাথায়। সরস্বতীর মূর্তি ভেঙে ঝিনুক ভাসে জলে। দেওয়ালের বেহালা আকৃতির ঘড়ি নিচে নামে।

—বা-বা সাঁ-তা-র দা-ও। মা সাঁ-তা-র···

গলা চড়ে রিনির।

অর্ক আর সোমা কার্পেটের ওপর শুয়ে হাত-পা নাড়ে। রিনি ঘড়িটা তুলে ডুবন্ত জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়ায়। গায়ে নাগা ওয়াল-ম্যাটের লাইফ জ্যাকেট। ঘড়ির বেহালা হাতে নিয়ে বাজায় রিনি। সে সুরে গলা মেলায় প্রেম-পীরিতির ক্যাসেট—

বাও জানি না ও আমি বাঁক চিনি না
বাইতে দিছ নাও
ও আমার দয়াল রে ও বুঝি ডুইব্যা মরাম রে ॥
তিন মোহনায় পইরাছে নাও
(দয়াল) কোন বা দিগে যাইরে ॥

ভূমেন্দ্র গুহর কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

মাস দুয়েক আগে 'যম' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ হাতে এল। লেখক ভূমেন্দ্র গুহ। প্রাক্-পঞ্চাশ দশকে যারা কবিতার মনস্ক পাঠক ছিলেন, তাদের কাছে কবির নামটি অপরিচিত না হলেও, অতি সাম্প্রতিক পাঠকদের কাছে নামটি হয়তো কোন তাৎক্ষণিক অনুষঙ্গ জাগাবে না।

ভূমেন্দ্র একসময় পূর্বাশার প্রায় নিয়মিত কবি ছিলেন। যে বিরল কয়েকজন প্রখ্যাত কবি ও পূর্বাশা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশেষ মনযোগের কেন্দ্রে ছিলেন, ভূমেন্দ্র তাদের অন্যতম। 'কবিতা' পত্রিকার পরে এবং কৃত্তিবাসপূর্ব সময়ে যে শ্রেষ্ঠ কবিতার কাগজ 'ময়ূখ' তরুণ কবিদের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল ভূমেন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম সম্পাদক। ছিলেন আরেক উল্লেখযোগ্য কাগজ 'অনুক্তে'র সহযোগী সম্পাদক এবং বাংলা ভাষায় সাফোর প্রথম ও অনবদ্য অনুবাদক। যারা আজ উত্তরপঞ্চাশ, তাদের এসব স্মরণে না থাকার কথা নয়। জীবনানন্দ আকস্মিক ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হলে মৃত্যুপথযাত্রী কবির শিয়রে কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনি অতন্দ্র সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁর শেষনিশ্বাস পর্যন্ত। ভূমেন্দ্র সব অর্থেই জীবনানন্দের শুধু পুত্রপ্রতিমই ছিলেন না, সম্ভবত ছিলেন তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠ অনুধাবকও। ব্যক্তিমানুষ জীবনানন্দ এবং হয়তো কবি জীবনানন্দর ওপরও তিনিই লিখলে লিখতে পারতেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাটি।

'যম' কাব্যগ্রন্থটি হাতে নিয়ে অনিবার্যভাবে এইসব স্মৃতি অধিকার করল এবং এখানে তার উল্লেখ একারণেই যে গত তিন দশকে কবিতার ক্ষেত্র থেকে তিনি হারিয়ে গেলেও তিনি যে ফুরিয়ে যাননি, প্রস্তুতির গার্হস্থ্যে এক নতুন আরম্ভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, 'যমে'র কবিতাগুলি পড়লে তা অলক্ষ্য থাকে না। আমি যখন কিছুদিন 'কৃত্তিবাস' সম্পাদনা করেছি, পরে 'বিভাব' তখন বহুবার তাকে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছি, কিন্তু এক পংক্তি কবিতা লেখাতেও সমর্থ হইনি। মাঝের তিরিশ বছর তিনি কলকাতার অন্যতম গণ্য হৃৎযন্ত্রের শল্যবিদ হয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। যে হাতে কলম ধরে একদা মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছুতে চাইতেন, সার্জারিসিজার হাতে অনেক মৃত্যুপথযাত্রী হার্টের রোগীর আয়ুকে বাড়িয়েছেন, শেষে সমে ফেরবার মতন আবার ফিরে এসেছেন কবিতার কাছে অর্থাৎ নিজের কাছে।

এটি 'যম' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা নয়। বইটি আমার পুত্র কিনে নিজে মুগ্ধ হয়ে পড়ে আমাকে উপহার দিলে আমি পড়ি বা বলা বাহুল্য গ্রন্থের প্রথম পংক্তি থেকে শেষ অক্ষর অবধি কবিই আমাকে ঘাড় ধরে পড়িয়ে নেন। তথাকথিত কবিতার মতো কিছু গ্রন্থাকারে পড়ে যখন কোনো কাব্যগ্রন্থ হাতে নিতেই আজকাল ভয় হয়, তখন 'যম' পড়ে বা অমোঘ ভাবে পড়তে বাধ্য হয়ে আমি আপ্লুত হই। বস্তুত এমন গভীর ব্যাপক সঞ্চারী, মননসিক্ত কাব্য-গ্রন্থ আমি সাম্প্রতিক স্মরণ সময়ে খুব বেশি পড়িনি। আজ যখন পৃথিবীতে প্রবাসী হয়ে আসার সময়, তখন এমন একটি অভিজ্ঞতার জন্য কবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেই হয়।

না, ভূমেন্দ্রের কবিতা পড়া মাত্র বোঝা যাবে, তেমন সহজ নয়। সঠিক পয়ারে লিখেও 'যম'-এ তিনি কবিতাগুলি চওড়া লাইনে ইচ্ছে করেই গদ্যাকারে সাজিয়েছেন। 'বিভাবে' মুদ্রিত এই কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতাটিতে তার সাক্ষ্য মিলবে। এই গুচ্ছের বাকি কবিতাগুলি অবশ্য প্রায় গদ্যাকারেই লিখেছেন এবং সে সূত্রে 'যমের' কবিতা থেকে বেশ খানিকটা সরেও এসেছেন। একই সঙ্গে খানিকটা দুরারোহও হয়েছেন। একবার পাঠেই এর গুণ, উপাদান, সারাৎসার বোঝা যাবে না। একাধিক পাঠের পরই কবিতাগুলি উত্তরণযোগ্য। যে কোনো সার্থক কবিতাই কবির আয়ুর বকেয়া দিনের মুহূর্ত হরণ করে। কবি তার অস্তিত্ব ও আয়ু নষ্ট করে যে প্রণিপাতভরা অক্ষর জাগাবেন, পাঠক পড়ামাত্র তা বুঝে ফেলতে চাইবেন, তিনিও তার আয়ুর অংশ খরচ করতে বিমুখ হবেন—এরকম আশা করা অন্যায়। জল পড়লেও অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে সব সময় পাতা নড়ে না, রবীন্দ্রনাথ লিখলেও না। কবিতায় আপ্তবাক্য রচনার দিন শেষ হয়ে এসেছে। নদী, সমুদ্র, পাহাড় আর কতকাল প্রবহমান পয়ার হবে। আর্চিবল্ড ম্যাক্‌লীশের মতো "কবিতা কিছুই জানাবে না / তাকে হয়ে উঠতে হবে" সে রকম নয়, ভূমেন্দ্রর কবিতার দার্শনিকতা আমাদের অনেক কিছুই জানায়; একই সঙ্গে হয়েও ওঠে। এইখানেই ভূমেন্দ্রর সাফল্য। ভূমেন্দ্রর মধ্যে আমরা কবিতার পরি-পূরক একজন দার্শনিককেও আবিষ্কার করি।

ঋতুচক্র

১.

আমরা ত্রিভুজ নিয়ে একদিন খেলেছি, রমণী। ত্রিভুজ ভিজিয়েছিলে জলের উপরে কিংবা প্রবাসের জলের ভিতরে। রেখেছিলে এক কোণে আমাদের আরাধ্য দেবীকে। আমি দূর থেকে দেখি, আঙুল চাঁদের দিকে প্রসারিত করি।

জ'লে যাবে ভাবি, নেমে আসবে শিশিরে ত্রিভুজে। দেবীমূর্তি আপ্যায়ন করো ব'লে শাড়ির আঁচল খুলে রাখো। তুমি খেল আরেক প্রভাবে। তোমার আঙুল রাখো দেবাসক্ত ত্রিভুজ ও অনুষঙ্গ গোলার্ধে বিন্দুতে। জল ভেসে যায়, জল ঝুঁকে পড়ে, গড়িয়ে নেমেছে মাঠে তোমার সজলে। অথবা ত্রিভুজে। সে-সব ভোলো না ব'লে প্রবাসে যখন থাকো, জল ডাকো কণ্ঠস্বরে, দূরাহত পদসম্মিলনে। কণ্ঠ-লগ্ন হতে চেয়ে দেবীকে জড়িয়ে এনে একাধারে সন্নিহিত কোণে রেখেছিলে। তখন জলের মোহে নিজের শরীরে দেবী রাখো। কৃপাভরে আমাকেও ডাকো।

এখন যাহারা ত্যাগে কনিষ্ঠা তনয়া। তুমি স্মৃতি খোঁজো ব'লে সজলে লবণে দেহে বিভক্ত করেছে। চাঁদের আঙুলগুলি সোনালি আগুনে মুড়ে ছুঁয়ে দেবে, তোমার ক্ষুধায় তারা দগ্ধ হয়ে যাবে। মাঠ জুড়ে ফুলগুলি ফুটে উঠবে বিমর্ষ স্বাধীন। জল কেঁপে উঠবে ব'লে জ্যোৎস্নায় কোটালে সব ধ্বংসমুখী হবে। নিজের শরীরে দেবী রাখো। আমি দূর থেকে দেখি, স্তন ভারি হয়েছে কলসে পত্রে পুষ্পে দুধের সম্ভারে; ঝুঁকে আছে, শস্যশীর্ষে মোচন করেছে। নিকটে আঙুলগুলি কুহকিনী মিথ্যা গ'ড়ে তোলে। গ'ড়ে তোলে, যেহেতু আমার জন্য মাধুকরী রাখো। প্রচ্ছদে ত্রিভুজে তোমরা পরস্পর সন্নিহিত হলে, নিষ্ঠাবান সুশাসন উচ্ছিষ্টের মতো থাকে অপ্রধান কোণে। সেখানে আমাকে ডেকে মূঢ়তায় রাখো।

রাত্রি বেজে ওঠে কানে-কানে। শরীরের পরাহত কোষে। যেটুকু সুস্বাদ তা তো প্রসারিত আঙুল ও উন্মোচিত কলসের হতে-পারত-এ-রকম নাবালক বিস্ময় ও ছুঁয়ে-যাওয়া তাপে। সে সব হল না, জানি কখনো হবে না। ও-আঙুল ও-কলস আর আমি ঠোঁটে দাঁতে আলজিভে আলাপে রাখব না। রাখব ত্রিভুজে, তুমি যে-রকম রাখো।

২.

আমাদের পাড়াগাঁর পুরোনো কোঠাবাড়ির চারদিক সেদিন সকালবেলার বাষ্প-সিক্ত দুর্বল আলোয় ভিজে যাচ্ছিল। বাড়িটির মুখের উপর যে একটি ছোট্টো মাঠ ছিল, সেখানে তখন সদ্য স্বাধীন হ'য়ে ওঠা বড়ো-বড়ো ঘাসের গুচ্ছ: কেঁচো ফড়িং শাদা ছোটো প্রজাপতি: সেই সব সমাচ্ছন্নতায় নুয়ে-পড়া হাতের তালুর মতো আকাশ: ঘনকৃষ্ণ ছায়া; সব ক্রমাগত গভীর হয়ে উঠছিল। জীর্ণ ফোয়ারাটির অকৃত্রিম অযৌক্তিকতার চারপাশে এতগুলি আহ্লাদিত কচি পাতার ঝাঁক সম-কোণে বিপ্রতীপ কোণে ধাক্কা খেতে-খেতে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, জল ও আগুনের পারম্পর্য প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছিল। শ্বেত পাথরে শ্যাওলায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল;

জলে নেতিয়ে যাচ্ছিল অর্বাচীনতার মায়ায় যারা ফুটে উঠেছিল, সেই সব বিন্দু-পরিমাণ হলুদ ফুলগুলি। সিঁড়ির ধাপের নিঃসীম পেরিয়ে যে বিলীয়মান বারান্দা, সেখানে কদমফুলের রেণুসংরাগের ভিতর খিন্ন মহিলাটির স্মৃতি-বিস্মৃতি রূপকথার আদলে এক নাগাড়ে ঝিমিয়ে পড়ছিল, পাড়াগাঁর অবিসংবাদী সমাবর্তনে যে-রকম হয়।

আমি আমার রোগনিষিক্ত শরীরটিকে প্রায়ান্ধকার ঘরটির ভিতর গলিয়ে দিলুম, এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সেই বোবা ও কালা রাজপুত্র-প্রতিম বালকটি চোখ তুলে তাকাল; রঙ-চটে-যাওয়া প্রাচীন চোঙওয়ালা গ্রামোফোনটির পিছনে ব'সে থেকে সে রেকর্ডগুলি গুছিয়ে তুলছিল, আমি তার অভিনিবেশ ক্ষুণ্ণ করলুম। সে আঙুল তুলে ঘুণে-ধরা কাঁঠাল-কাঠের ধূসর বইয়ের-আলমারিটি আমাকে দেখাল। আমি দেখতে পেলুম, আলমারিটির পায়ের কাছে মহিলাটি নির্মোহ বিশ্রামে শুয়ে আছে, অধঃপাতিত কোনো মৃত্যুজারিত সুদূর বৃক্ষশিশুর মতো; তার নির্বাপিত দুঃখী শরীরটির উপর হালকা প'ড়ে আছে সেই অনির্বচনীয় মায়াচিন্ময় নকশীকাঁথাখানি, যা আমার মায়ের হাতের নির্বাসিত কারুকাজে প্রবীণ ও শুভ্র। তার পাথর ঘসা মুখের যে-আধখানা দেখা যাচ্ছিল, তার কোণগুলি ঘেঁসে অগ্রিম-এসে-পড়া শীতের ঘূর্ণির অনির্দেশ্য হলুদ পাতাগুলির ছায়া মুষড়ে পড়ল, এবং জলের ক্ষীণাঙ্গ আশ্লেষে তা মিইয়ে গেল। আমার বয়সনিবন্ধন ঘোলাটে চোখের একাগ্রতা সুচারু হয়ে উঠল।

তার ঠোঁটে শুকিয়ে-ওঠা রক্তের গড়নে রঙ, বিন্যস্ত কপালে একই রঙের বিন্দি, গালে ক্ষীণ লাল বা গোলাপি, গলায় ছোটো কালো পুঁতির মালা, চুলে কান-ঢাকা কালচে-সবুজ রেশমি রুমালের ওড়না। কিন্তু সে তো এইটুকু, এক ফোঁটা, অথচ সমূহ কল্লোলিনী; রাজেন্দ্রাণীর শয্যার পুষ্পসমারোহের নিষ্করুণ দৈন্য নিরবচ্ছিন্নতার প্রগাঢ় নিরপেক্ষতার আঘাতে আমাকে অবশ ক'রে ফেলল।

কিন্তু রাজপুত্রটি তার হাতের কাজ মুলতুবি রেখে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। তাকিয়েই রইল। একপ্রকার খর অহঙ্কার তার অমলিন চোখের ভিতর গ'ড়ে উঠতে লাগল। আমাকে এবার ভাবতে হল, আমি কী করব। আমি আবাল্য দুঃখী বালিকার মতো আমার মায়ের কথা মনে আনলুম, তাঁর নিজের হাতে বোনা কাঁথাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অহসা উজ্জীবিত হয়ে উঠলুম; মহিলার কপালে হাত রাখলুম: ঠাণ্ডা—সজল—প্রাচীন পরাক্রান্ত পাথরের মতো—উৎপাটিত—এবং তারপর শীতল বরফকুচি! এর পর আমাকে আর কী কী অনুষ্ঠানের ভিতর সমর্পিত হতে হবে!

পুরোনো দরদালানের পুরোনো বিপুল জানালাটির দিকে এবার আমার চোখ গেল। জানালাটির চারদিক অবসাদে ছায়ায় অনেকটাই বুঝে এসেছে। বাইরে তার নির্জীব নম্র আলো। এবং একটি সবুজ ঝলমলে মাছি, ভিতরে, কাচে। কাচে ঠোক্কর খেতে-খেতে মাছিটি আগুনের একটি নতুন বিন্দুর মতো প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, ঘুরছে, উড়ছে, আলোর বিপ্রতীপে হেঁটে গিয়ে আলোর থেকে পুনরায় স্বতন্ত্র হয়ে পড়ছে। গুঞ্জনের বিমূর্ততায় ক্রমান্বয়ে প্রবীণ হয়ে উঠছে। আমি আঘ্রাত জিজীবিষায় আক্রান্ত হয়ে পড়লুম।

আমি মাছিটির চোখের দিকে তাকালুম, চার-কোণ দু'-কোণ বাসনার রোদে তাদের জ্ব'লে উঠতে দেখলুম। মুখের দিকে তাকালুম, সংরুদ্ধ আক্রোশী লালায় ভিজে যেতে দেখলুম তার ছোটো জিভের মাংসল আনাচ-কানাচ, সূঁচের মতো সরু ঠোঁট। বুকের দিকে তাকালুম, হাওয়ায় উঠছে, পড়ছে, পাখায় ঘ'সে-ঘ'সে রক্তবিন্দু সমাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। মাথার দিকে তাকালুম, দেখতে পেলুম চুলের ভিতরে তার তখনো-অব্যবহৃত নানা রকম মাটি পাথর পশম আলগা লেগে রয়েছে। এবং তার পেট—কোটালের সমুদ্রের মতো, ভরাট গম্ভীর বিশাল এবং আগ্রাসী, অগণন তাড়নাগভীর ডিমের সঙ্ঘাতে মূর্ছিত।

আমি বইয়ের আলমারির দিক থেকে স'রে এলুম। মৃত্তিকাঅধিগৃহীত কাঁথা-সম্বৃত মহিলাটির দিক থেকেও। আমি বোবা ও কালা রাজপুত্র-প্রতিম বালকটির উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালুম শুধু, তার প্রায় নিষ্পলক দু'চোখের কাচের উপরে প্রতিফলিত প্রজ্ঞাপারমিতার দিকে। ভিতরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসতে লাগল, আর তার প্রতি সব চেয়ে প্রাথমিক ও সনির্বন্ধ কৃতজ্ঞতায় আমি আপ্লুত হয়ে গেলুম।

৩.

ক.

তারপর এক সময় আমি আমার সেই প্রাচীন প্রাচীরের থেকে স'রে এলুম। প্রাচীরের শৈবালসমাসিক্ত কালচে-সবুজ স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়িয়ে তখন ছোটো-ছোটো হরিদ্রাপ্রধান কুসুমসকল ফুটে উঠেছিল, অথবা তারা কোন দূর সর্বংসহা দেবীগ্রাম থেকে নেমে এসে শৈবাল-সর্বজনীনতায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ছিল। ফলত এক প্রকার ক্লান্তি শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছিল, আমি যে-রকম সব অকৃত্রিম অবনমনের ও বিক্ষোভের শেষে নির্দ্বিধ ঘুমিয়ে পড়ি, সেই রকম। চোখের সামনে দেখতে-

দেখতে আমার শরীরে প্রবীণ মহীরুহ জেগে উঠল। আমি নিরুপায় কষ্টসাধ্যে ভাবতে লাগলুম যে, আমার শ্বাশুলাসমাকীর্ণ কাণ্ডের কী যে দশা হবে এবং যা হবে, তা দিয়ে আমি কী করব ; আমার মাধ্যাকর্ষণ পীড়িত শাখাপ্রশাখা নিয়ে, অথবা তদুপরি শুষ্ক তৃণজর্জরিত পাখির বাসাগুলি নিয়েই-বা আমার কী করণীয়। যে আভাসিত রক্তরঙ্ ফলগুলি আমি ফলিয়ে তুলতে চাইছিলুম, তারাই-বা কোন রমণীর বিপরীত কলসে মুক্তি পাবে !

ফলগুলি পাখির-বাসাগুলি কী-নয় আমি সেই বালিকাটির ক্ষুদ্র কোঁচড়ের ভিতর ঢেলে দিতে গেলুম তো দেখলুম যে তারা তার আগেই মাটির উপর গিয়ে থুবড়ে পড়েছে ; ফুলগুলিকে আমি তার অন্ধকার থেকে সদ্যোজাত প্রধান খোঁপাটির ভিতর বিন্যস্ত করতে গেলুম তো ভয়ে-ভয়ে জানতে পারলুম যে, তাদের আমি ইতোমধ্যেই সর্বাঙ্গীণ বিস্মৃত হয়েছি ; এবং, আশ্চর্য, যারা আমার চেতন-অচেতনের সোনায় মাখামাখি হয়ে আছে, সেই কাণ্ডপ্রস্থত প্রথম প্রভাতের সহজ সবুজ পাতাগুলি,—তারা রোদের মুখে চেয়ে আছে, ক্রমাগত গহন কালো হয়ে উঠছে, শিরাগুলি তাদের প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে। এবং এই নির্মল পরাজয়ের স্ফূর্তিতে আমার মনে পড়ল যে, বৈশাখের প্রথম দিবসে আমাদের ছেলেবেলার গ্রামে কালবৈশাখী উঠত, দারুণ ধুন্ধুমার কাণ্ড হত, এবং অনেক স্বাধীন সাবলীল বনবিটপী ঈশানীতলার কৃষ্ণ মৃত্তিকা ঘেঁষে বিঘূর্ণিত নেমে আসত—মৃত। সেই অধঃপাতিত পর্ণপল্লবসমাকুলতার ভিতর, ভেবে দেখলুম, আমি বালিকাটিকেও জীবনমরণ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলুম।

খ.

তারপর যা প'ড়ে থাকল তা মৃত্যুছায়ামূর্ছিত শৈবালসজল রাত্রি—এবং সুদূর বিস্ফারিত পিছনের-ডাকে-ফেরা রাত্রি। সেই পবিত্র মহান শোভাযাত্রার ভিতর সময়ের আদল ক্রমে রূপ পেতে লাগল। আমাকে ঘুমের প্রথাসিদ্ধ প্রস্তুতি থেকেও এবার স'রে আসতে হল, অথবা সেই সনাতন বিশ্রামের ভদ্দুর তন্তুশয্যা থেকে। এবং সেই ঘোর রাত্রির মায়ামরীচিকার ভিতর আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগলুম, অণু-পরমাণুগুলি আমার চতুর্দিক ঘিরে প্রাচীরের অবয়বে ধারালো বিদ্যুতের মতো বিঁধে রইল, ঠুকে যেতে-যেতে মাথার ঘিলুর মাংসাশী কালিমাও যে প্রাচীরে মুদ্রিত হয়ে যেতে লাগল, তাও আবছা টের পেলুম।

তারপর বপন ঋতু ঝাঁপিয়ে এল। ঘাস ফুল ফুটল। চার দিগন্ত সোল্লাসে মূর্তিমান হয়ে উঠল। ঢেউ দাপিয়ে এসে ছড়িয়ে গেল এবং প্রচ্ছন্নে চ'লে গেল। তার মহোৎসব যাবতীয় দৈনন্দিন ঘাট ও আঘাটার আশে-পাশে থলবল করতে লাগল।

অশ্বত্থ-বট অমিত বৎসরান্তিকতার ভারে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল। লাঙলের ফলকের সর্বকালীন পাপপঙ্কিলতা মুক্তোর মতো ঝকমকে ধুয়ে যেতে লাগল। বৃক্ষসকল ঘনকৃষ্ণ আভায় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। এবং আমি আমার নিজস্ব কাণ্ডের থেকে হালকা হাওয়ার উত্তরীয়ের মতো শৌখীন ঝুলতে লাগলুম। ফুলফলের বাস্তবতা আমি খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলুম : সেই ক্ষুদ্র বালিকাটির কোঁচড়ের সর্বস্বতা তার সরল ব্যর্থতার ভিতর এখনও ঘনিয়ে উঠতে পারে হয়তো, দুরে শাড়িটির ঠিক নিচে তার অপরিণত স্তনবৃন্ত দু'টিও হয়তো এইমাত্র প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। কেননা, এখন বপনকাল এসে পড়েছে, আমার নিরাভরণ কাণ্ডর শরীর ভেদ ক'রে একটি নিঃস্ব এবং ততোধিক দুর্বল প্রশাখার নবোদ্ভিন্ন কুণ্ঠা ও স্বঘোষণাও প্রকাশিত হয়েছে, এবং মৃত্তিকা আগুন ও জল আদ্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছে।

৪.

তুমি ও তোমার কায়কল্প সহচরীরা মিলে যে-শালপিয়ালের দুরধিগম্য অরণ্য গ'ড়ে তুলেছ, তার অন্তঃস্তলে তোমাদের গ্রামপ্রান্তবর্তী ক্ষ'য়ে-যাওয়া পাহাড়গুলি আছে। তাদের নির্জনতানিরুদ্ধ ঢালু উপত্যকা ভেদ ক'রে করুণ ঝর্ণারেখাটি পশ্চিম দিকের পরবর্তী সমুদ্রের দিকে চ'লে গেছে। ফলত অভ্রান-পৌষের বৎসরান্তিক উৎসবের উল্লাস তোমরা আবিষ্কার করেছ, এবং, যদিও কৃপণ, তবু সইসব অর্জন প্রখর আত্মাভিমানের মায়ায় ধারণ করেছ। ধূম্রকালিমাবিমোহিত গুহাগুলি তোমাদের শরীরের অভ্যন্তরে অস্ফুট জ্ঞাতসারে তোমরা গ্রথিত ক'রে তুলতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছ, শুদ্ধ জলরাশি কলসে সঞ্চিত করেছ, পাথরের পুরোনো অস্ত্রশস্ত্রগুলি তরুণ শষ্পাচ্ছাদনে ঢেকে রাখতে পেরেছ। এবং নিরাময় ঘাতকের প্রকৃত অহঙ্কার তোমাদের হাতের লৌহবলয়িত নিশ্চিন্ত কবজির কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি আমার বাল্যে-কৈশোরে আমার পরিপার্শ্বের সেই পাহাড়গুলি সম্যক উপলব্ধি করেছি ব'লে মনে করতে পারি না। তবু সে-সব দেখেছি, এবং উৎসব-ঋতুর অনুবন্ধের গা গড়িয়ে দূরের পাহাড় চূড়ায় অঝোরে বৃষ্টি হতে শুনেছি।

তোমার দেবীর শরীর ছুঁয়ে আমি সেই সব পদ্ধতি উন্মোচিত করেছি, যাতে ক'রে আমি সিঁদুরমাখানো দেবী-আখ্যাত সেই মহিমান্বিত প্রস্তরখণ্ডটির খুব সন্নিকটে এক রকম ঘোরের ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এবং তাকে সাগ্রহে আত্মগত করতে চেয়েছি আরেক দিন। সে-দেবী তোমার নিজস্ব আদলে নিজের আঙুলের চাপে ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠেছিল, এবং তাতে কল্পান্তরের সময় লেগেছিল ; তার

আরাধনার জন্য সে-সময় তুমি আমায় দিয়েছিলে। তুমি অন্তর্লীন সরল গুহাটির সম্মুখবর্তিতায় প্রবীণ জলের কলস্বনের নিকটে আমাকে সম্মুঢ় বসিয়ে রেখেছিলে, শস্যবীজের নবাবিষ্কৃত উন্মাদনার মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে-উঠতে আমাকেও আষাঢ়ের পরিপূর্ণ বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গীণ ভিজিয়েছিলে। এবং তোমার নিরপেক্ষ ও বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতায় আমি স্বশরীরে রক্ত উৎসারিত হতে দেখেছি, সেই রক্ত জলস্রোতের রেখায়-রেখায় মাঠে গেছে, পাহাড়ে গেছে, তোমার দেবীপ্রস্তরে গেছে। তোমার উৎসবে-উত্তেজনায় বিলুপ্ত হতে-হতে আমি ভালোবাসার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে কথ্য ভাষার সন্ধান করেছি ও নিদারুণ কষ্ট পেয়েছি।

টিকটিকির চোখ

অজয় দাশগুপ্ত

তৃণা আলোর গায়ে ভর দিয়ে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে যারা আসছিল সকলেই দরজার কাছ থেকে চলে গেল। যাবার সময় তাদের একটা হাসির ধাক্কাই যেন তাকে ঘরের মাঝখানে ঠেলে দিল। কিন্তু এখানে এসে, দাঁড়িয়ে, মাত্র একবার চোখ তুলে তাকিয়ে তার মনে হল সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। এখন আর কিছুতেই স্বচেষ্টায় সে নড়তে পারবে না। একটা চোখের অভিশাপ যেন পলকেই তাকে পাথর করে ফেলল। অহল্যার মতো প্রহর গুনে তৃণা তাই দাঁড়িয়েই থাকল।

তৃণা আসবার আগে পর্যন্ত নির্বাণ ঘরে পায়চারি করে অপেক্ষা করছিল। সে ঘরে ঢুকতেই স্থির দৃষ্টি মেলে নির্বাণ স্ত্রীকে দেখতে চাইল আর তখনই চোখা-চোখি হয়ে গেল।

অদ্ভুত একটা অনুভব! তৃণার সেই দৃষ্টিকে মনে হল টিকটিকির চোখের মতো। সহজ অথচ অমোঘ চাহনি। এই বুঝি লাফ দেবে শিকারের ওপর; নিশ্চিত সফল পরিণতির জন্যে। তৃণা শুনল, নির্বাণ বোধহয় বলল, 'বোস।' সে আরো দু-পা এগিয়ে খাটের বাজু ধরে বসে পড়ল।

সোজাসুজি দৃষ্টির আওতা থেকে সরে আসতে পেরে আবার চোখ তুলল তৃণা। নির্বাণ নড়ল। বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পকেট থেকে দামি সিগারেট বের করে ধরাল। তৃণার মনে মাছ-ধরিয়েদের কথা হঠাৎ ভেসে উঠল। ভাল চার ফেলে কেমন নিলিপ্তের মতো তারা বসে থাকে।

জামা খুলছে নির্বাণ। গেঞ্জি খুলল। সিল্কের পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির ভেতর থেকে একটা পুরো পুরুষের চেহারা ফুটল। আলনায় জামা-গেঞ্জি রেখে নিজেকেই যেন বলল নির্বাণ 'দরজাটা বন্ধ করা যাক।'

তৃণা ভাবতে-ভাবতেই নির্বাণ দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল আর ওর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কোনোরকম ভাঁজ না খেয়েও নির্বাণের চোখদুটো হাসছে। নির্বাণ আবার কথা বলল এগিয়ে এসে, 'আলোটা এবার নিবিয়ে দি।'

মনগড়া টিকটিকিটা যেন লাফ দিল তৃণার বুকে। হঠাৎ কি হল তার! থরথর করে কেঁপে উঠল ভয়ে। সে বলতে চাইল অতি দ্রুত, 'না, না, তুমি এখন আলো নিবিও না। অন্তত আজকের মতো আলোটা জ্বলুক।' মুখ দিয়ে ওর কোনো শব্দ ফোটার আগেই নির্বাণ বোতাম টিপল। আর একরাশ অন্ধকার যেন একটা জন্তুর

মতো তৃণার শরীরে লাফ দিল। একটা ভীষণ বোবা চিৎকার সে করে উঠল। এতক্ষণের জড় করা সমস্ত শালীন পরিবেশটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

নির্বাণ বিশ্রীভাবে চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা জেলে খাটের কাছে গিয়ে দেখল, তৃণা বালিশে মুখ গুঁজে মৃতের মতো পড়ে আছে। তার জ্ঞান নেই।

বন্ধ দরজার বাইরে যে কজন মহিলা এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়েছিল তারা তৃণার চিৎকার শুনতে পেয়ে সাঙ্ঘাতিক স্তব্ধ হয়েই মুহূর্ত মধ্যে নিজেদের সামলে একটা অস্বাভাবিক কিছু ভেবে নিয়ে সকলে একসঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিল। কেউ একজন নির্বাণকে দরজা খুলে দিতে বলল। নির্বাণ কি করবে বুঝতে না পেরে দরজা খুলে দিল।

হুড়মুড়িয়ে সব কজন মহিলা ঘরে এল। ততক্ষণে বাড়ির অন্যান্যরাও এসে এসে পড়েছিল। 'কি হয়েছে?' 'দেখি-দেখি', 'জল আছে ঘরে, তাড়াতাড়ি'। একটা কথার হুড়োহুড়ি সমস্ত বাড়িটার রাত্রির গায়ে মাখামাখি হয়ে আজকের এই শুভ-সূচনাকে নির্মম হাতে মুচড়ে ভেঙে দিল।

নির্বাণ আর ঘরে দাঁড়াতে পারল না। সমস্ত ঘটনার লজ্জার বোঝা তার কাঁধে চেপে তাকে লজ্জাতুর করে ফেলল। তাই সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে রাত্রির চেহারা নিয়ে নিমগ্ন হল।

একটু বাদেই তৃণা চোখ খুলল। চারপাশে একবার তাকাল। আর তারপর আবার চোখ বুজলেই ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। সবশুদ্ধ গোটা-তিনেক আলাদা করা ছবি। একটা বিরাট অন্ধকারের ভয়। নির্বাণের পাঞ্জাবি গেঞ্জি খুলে রাখার পর একটা পুরুষালী প্রকাশ। আর সেই শিকারী টিকটিকির চোখের ভাবনা। তৃণা ছবিগুলো মনে করবার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিটাও বুঝল। কী লজ্জা, কী লজ্জা! বুকের ভেতর একটা কিরকম শব্দ হচ্ছে যেন। চোখের পাতা কিছুতেই সরছে না। একটা বাজে ভয়ের তাড়নায় যে বিপদ তৃণা হঠাৎ ডেকে এনে হাজির করেছে এখন আর সে কিছুতেই তার মুখোমুখি হতে পারছে না। বিশ্রী লজ্জার অনুভূতি তার মনকে ধিক্কার দিয়ে বলছে, 'এখন মুখ দেখাবে কি করে?' 'এ তুমি কি করলে?'

তবু তৃণাকে চোখ খুলতে হল। তৃণা তার শাশুড়ির গলা শুনতে পেল। তিনি কাছে এসে বললেন, 'কি হয়েছে বউমা, আমাকে খুলে বলো। তোমার কোনো ভয় নেই।'

চোখ খুলে অকারণেই কেঁদে ফেলল তৃণা। এ ছাড়া তার কাছে আর যেন কোনো রাস্তা ছিল না। উঠে বসল সে। সকলে বারণ করল, তবুও। আবার শাশুড়ি প্রশ্ন করলেন, 'কই বললে না, বউমা?'

তৃণা একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিল। সাদা দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল আলো মিশে গিয়ে আরো উজ্জ্বল হয়েছে। এখন কোনো অন্ধকার নেই এখানে।

সেই সঙ্গে নেই নির্বাণও। শুধু তার সিল্কের পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি ফ্যানের অল্প হাওয়ায় দুলে-দুলে তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কুড়ি-বাইশ জোড়া মেয়েলি চোখ নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাদের মনের সমস্ত প্রশ্নগুলো যেন তৃণার উত্তর শোনার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

'কী যেন হয়ে গেল!' তৃণা মুখ নিচু করে খুব মৃদু গলায় বলল, 'হঠাৎ অন্ধকার দেখে ভয় পেলাম। ভীষণ ভয়···

আমার মনে হল—মনে হল, একটা জন্তু যেন আমাকে ধরবে বলে লাফ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে···'

'থাক, তোমাকে আর বলতে হবে না।' শাশুড়ি তৃণাকে থামিয়ে অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা একটু ভিড় ছাড় তো—সুধা, বউমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও। আমি আসছি।'

একটা মুখ টেপাটেপি হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে তৃণা ননদের হাত ধরে শাশুড়ির ঘরের দিকে চলল। ফাঁকা, বহু যত্নে সাজানো ঘরটায় শুধু এক শূন্যতা বিমূঢ় হয়ে পড়ে রইল।

রাত্রির দুর্ঘটনার ভয়কে শুষে নিয়ে সকাল হল। তৃণা ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসতেই শাশুড়ি প্রশ্ন করলেন, 'এখন কি রকম আছ বউমা?'

তৃণা একটু চুপ করে থাকল তারপর বলল, 'ভালই।'

'যাও, সুধা নিচেই আছে। ওর সঙ্গে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে এস, আমি ততক্ষণ পুজোটা শেষ করে আসছি।'

তৃণা সামান্য সময় শাশুড়িকে দেখল। তার মনে হল সে যেন কী বলতে চেয়েছিল অথচ কথাটা বলা হল না—অর্থাৎ সে বলতে পারল না। চিন্তাটার রেশ কাটতে না কাটতেই তৃণা মনে-মনে ভাবল, এখানে বড় একা সে। ভীষণ ক্লান্ত আর একা লাগছে। কথাটা জড়াতে-জড়াতে সে নিচে চলল।

বাথরুম থেকে ফিরেছে তাও অনেকক্ষণ। সুধার সঙ্গে জলখাবার খেয়ে আবার উপরে তৃণা তার নিজের ঘরে এসেছে। যে-ঘর কাল মাঝ-রাতে সে পরিত্যাগ করেছিল। কখন যেন এ-ঘরেই একটু স্বস্তি পেল সুধার সঙ্গে বসে। শাশুড়ির ঘরটা কেমন একটা প্রশ্নের চোখ বলে বোধ হল তার কাছে।

সকালেও ভিড় কাটেনি পুরোপুরি। ধারে-কাছের বাড়ির অনেকেই বউ দেখতে এসেছে, যারা কাল আসেনি। নতুন বউ দেখবার লোভে কিছু ছোট ছেলেমেয়েও তৃণাকে ঘিরে রয়েছে। তৃণা ভয়ে-ভয়ে সকলকে দেখছে আর ভাবছে, কাল রাতের ঘটনার কথা এরাও জানে নাকি? কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন না করায় সে পরম স্বস্তি পেয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর তৃণা কিছুটা সহজ হয়ে সুধাকে বলল, 'ঠাকুরঝি, একবার মাকে একটু ডেকে দাও।'

সুধা বলল, 'তাহলে তুমি এদের সঙ্গে একটু বোস—দেখি মা কোথায় ?'

একটু পরেই সুধা মাকে নিয়ে ফিরে এল। শাশুড়ি এসে তৃণার কাছে বসলেন। বললেন, 'কিছু বলবে আমাকে ?'

'হ্যাঁ।' একটু ইতস্তত করল সে। মনে-মনে যেন কথা সাজাতে চাইল। একবার সোজাসুজি দেখল শাশুড়ির মুখ। পরেই মাথা নামিয়ে নিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, 'বাবাকে যদি একটা খবর দেন···', শাশুড়িকে কেমন অন্যমনস্ক লাগল। তাঁর চোখ দুটোও তৃণার কাছে কি রকম কঠিন মনে হল। তৃণা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ওঁর মনোভাব। ভাবল, তার কথায় কি অসন্তুষ্ট হলেন উনি !

শাশুড়ি মৌনতা ভেঙে কথা বললেন, 'তোমার বাবাকে খবর পাঠিয়েছি, ভয় নেই ; তিনি নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।'

তৃণা বাবার সঙ্গেই ফিরে এল। তৃণার শাশুড়ি স্পষ্ট তাঁর বেয়াইকে বললেন, 'আপনার অসুস্থ মেয়েকে আমার ঘরের বউ করে সাজিয়ে রেখে লাভ নেই। ওকে নিয়ে যান। যদি ও সুস্থ হয় তবেই যেন আবার এখানে আসে। বার-বার আর আমাদের ঠকাবার চেষ্টা করবেন না। কোনো ভদ্রলোকই এরকম জেনে-শুনে রোগের বোঝা কারো ঘাড়ে চাপায় না। আপনার শাস্তি হওয়া উচিত।'

'আপনি বিশ্বাস করুন, বিয়ের আগে তৃণার এরকম কোনো···' 'থামুন আপনি !' তৃণার শাশুড়ি এক ধমকে তার বাবাকে চুপ করিয়ে বলেছেন, 'ওসব মিথ্যা কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

ট্যাক্সিতে ফিরতে-ফিরতে বাবা বলেছিলেন, 'আমি তোর সুখের জন্যেই জোর করে বিয়েটা দিয়েছিলাম, অথচ···'

'যাক বাবা, যা হবার হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে তুমি আর ভেব না। বরং ভালই হল, আমি তোমার কাছেই থাকব। কেউ আর আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।' তৃণা যেন বাবার সান্নিধ্যে তার শরীরের উত্তাপ ফিরে পেয়েছিল। সহজ হয়ে উঠেছিল শিশুর মতো।

তৃণা বাবা দেওয়া সত্ত্বেও ওর বাবা ডাক্তার ডেকে সব কথা খুলে বললেন। সাইকিয়াট্রিস্ট তৃণাকে দেখল। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করল। শেষ পর্যন্ত বলে গেল, কিছুই না। সিম্পলি নার্ভাসনেস। আপনিই সেরে যাবে।

দেখতে-দেখতে সাত দিন কেটে গেল। তৃণার কাছে তার বিয়েটা কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয়। সিনেমায় দেখা নায়কের মতো স্বামী নির্বাণের মুখটা ছবি হয়ে ভেসে ওঠে। একটা ভাললাগা, আপন বোধও ঘিরে ধরে। কিন্তু যখনই সে নির্বাণের চোখের কথা ভাবে—সেই টিকটিকির শিকারী চোখ মনে করিয়ে দেয়। আশ্চর্য ! স্বামীর কথা ভাবতে গেলেই এই চিন্তা আসে কেন ? অন্ধকারই বা জন্ত হয়ে যায় কি করে ?

তৃণা চোখ বুজে গভীর মনোযোগী হয়েও এর অর্থ খুঁজে পায় না। এর কোনো মানে নেই—কোনো মানে হয় না। কিন্তু তৃণা যখনই কথাটা ভাবে তখনই ভয় পায়। ভীষণভাবে ভয় পায়। ভয়টাকে তাড়াবার জন্য তৃণা ছুটে বাবার কাছে চলে যায়।

বাবার কাছেও আজকাল তেমন আশ্রয় পায় না সে। একদিন, মাত্র একটি দিন স্বামীর ঘর করে এসে তৃণার ধারণা বাবা বদলে গেছেন। তাঁর সরলতা কোথায় যেন বাধা পেয়ে হারিয়ে গেছে। কোন অতীতে সে যেন বাবাকে একা রেখে অনেক দূর চলে এসেছে। মাঝে-মাঝে অনুযোগ করে বাবাকে তাই বলে ও, তুমি আজকাল আমায় আগের মতো ভালবাস না বাবা। আদর করো না। কেমন যেন হয়ে গেছ।

'দূর পাগলি, তাই কী হয় নাকি !' কথা বলে আদর করতে-করতে বাবা আবার অন্যমনস্ক হন। বাধ্য হয়ে তৃণা উঠে চলে যায়।

রাত্রে বাবার পাশের ঘরে আলো জালিয়ে শোয় তৃণা। ঘুমোয় না। ঘুম আসে না। বিছানায় শুলেই বিয়ের কথা, নির্বাণের মুখ, অন্ধকারের ছবি এক-এক করে মিছিল করে আসে।

অন্ধকারকে এখনো ওর ভয়—তাই সবসময় সতর্ক হয়ে এড়িয়ে চলে। কখনো-কখনো তাও মুখোমুখি হয়ে পড়ে হঠাৎ। যেমন শেষ বিকেলে ছাদে ঘনায়মান আসন্ন সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারের সামনে বা সিঁড়ির নিচে গুদাম-ঘরে। তৃণা প্রতিবারই ভাবে, এ আমার মনের ভয় ; এবার কিছু হবে না। কিন্তু সময়ে সে ঠিক দ্রুত পাশ কাটিয়ে সরে যায়। আর ভয়ে তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে থাকে।

অন্ধকারটা ওর মনে যেন বাবার ছবি এনে হাজির করে। সময়-সময় বাবা আর নির্বাণ যেন এক হয়ে মিশে যায়। বহু ভেবেও তৃণা তার মনের সত্যকে আলোয় টেনে বের করতে পারে না। আপ্রাণ চেষ্টা করে ঘটনাটা ভুলে যেতে, চরম বিস্মৃতির মধ্যে আবর্জনার মতো মনের কালো ময়লাগুলো ফেলে দিতে, কিন্তু সে পারে না, কিছুতেই পারে না। বাবার দুঃখকে ভেবে, এই যে সে এভাবে একটা কাণ্ড বাধিয়ে চলে এল তার দরুন বাবার অসুখকে মনে করে সহজ হতে চায়—তবু তার শত মালিন্য ঘষে-ঘষেও আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।

কদিন থেকে তৃণাকে একটা স্বপ্ন পেয়ে বসল। তার চিন্তার কাছে এও এক অদ্ভুত ঘটনা ! চোখ বুজে কোনোরকমে সামান্য ঘুমের আয়োজনেই স্বপ্নটা বাদুড়ের মতো পাখা মেলে। তৃণা দেখতে পায়, সে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় তাদের বাড়িতে আগুন লাগে। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ওর কানে বাবার ব্যাকুল চিৎকার ভেসে আসে···আগুনের বেড়াজালে বাবা আটকা পড়েছেন। তৃণা বাবাকে উদ্ধার করতে যেতে পা বাড়ায় আর তখুনি শূন্য থেকে একটা লোক এসে তার সামনে দাঁড়ায়। তার হাত ধরে বাধা দেয়। তৃণা কান্নায় ছটফট করে···'ছেড়ে দাও,

আমাকে ছেড়ে দাও।' লোকটা তাকে কিছুতেই ছাড়ে না। প্রাণপণ জড়িয়ে ধরে বীভৎসের মতো হাসতে থাকে···হাসির শব্দগুলো বুকের ভেতর পাহাড়ের গা-বেয়ে পাথর গড়ানোর শব্দের মতো বেজে চলে। তৃণা কেমন হঠাৎ অভিভূতের মতো তাকিয়ে দেখতে পায় ওই দুরন্ত আগুনের মধ্যে তার ছোট মাসি বাইরের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে নিষ্ঠুরের মতো হাসছে। হাসিতে একাকার হয়ে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর চুল, কাপড়ে, দেহে সর্বত্র আগুন নেচে বেড়াচ্ছে।

একটু বাদেই সমস্ত দৃশ্যটা মুছে যায়।

সব সরে গিয়ে ওর চোখের সামনে সীমাহীন অন্ধকারের আকাশ নতুন করে পটভূমি গড়ে তোলে। অন্ধকার যেন শরীরী হয়ে তাকে ডাকতে থাকে, তৃণা—তৃণা···

সমস্ত ঘনীভূত অন্ধকারটাই আশ্চর্যভাবে বাবা হয়ে যায়। কিন্তু সামান্য সময় মাত্র···তারপর শূন্য ভোজবাজির মতো দৃশ্যগুলো পলকে বিদায় নেয়। তৃণার দৃষ্টির কাছে সিনেমার ফিল্ম কেটে গেলে যেরকম সাদা জমি দেখা যায়, সেরকম সাদা অস্তিত্ব ক'মুহূর্তের জন্যে থেমে থাকে।···তারপর···তারপর স্বপ্ন ভেঙে যায়।

স্বপ্নটা নিয়ে অলস দুপুরে খেলা করতে-করতে তৃণা কেমন স্মৃতিজীবী হয়ে পড়ে। অতীতের টুকরো-টাকরা কিছু ঘটনা, দৃশ্য, প্রবণতা তার স্বাভাবিক চিন্তার আশ্রয়ী হয়। ফাঁকা আকাশের গায়ে হঠাৎ উড়ে চলে যাওয়া একটা পাখির স্বাক্ষরকে ধরে রেখে অনেকক্ষণ বাদেও তার গতির কথা বেশ ভাবা যায়; তেমনি বহু আগের কিছু ছবি পুরোনো ফ্রেমের ভেতর থেকেও তৃণার সঙ্গে কথা বলে অনেকক্ষণ একাত্ম হতে পারে। ছোট মাসিকে স্মরণ করে তৃণা নিজেই ছবির মধ্যে ডুবে যায়।

তৃণা বিয়ের কথা কোনোদিনই ভাবত না। এখনো সে যেন পুরোপুরি সত্যে বিশ্বাসী নয়। অথচ টিকটিকির জলন্ত চোখ আর মাছ-ধরিয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য নির্লিপ্ততা তাকে বিভ্রান্ত করে।

শেষ বয়সে বাবা আর কিছুতেই শুনলেন না। বাধ্য হয়ে তৃণা যেন ডুব দিল অনিচ্ছার পক্ষে। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর ঠিক বিয়ের দুদিন আগে সে কেমন বিদ্রোহ করল। বাবাকে গিয়ে বলল, 'না-না বাবা আমি পারব না!'

বাবা অবাক। বললেন, 'কি পারবে না?'

'বিয়ে করতে! তুমি আমাকে রেহাই দাও, তোমার কাছে থাকতে দাও।'

'সে কি!' বাবা ভয় পেয়ে বললেন, 'ছিঃ তৃণা, তাহলে আমি অপদস্থ হব। তুমি কী তোমার বাবার সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আমার দুঃখ কী কোনোদিন বুঝবে না?'

'আপ্রাণ চেষ্টা করেও মনকে বোঝাতে পারছি না···'

'আমার অবস্থাটা একবার ভাব, মন তাহলেই স্থির হবে। তারপর দেখবে আমাকেই ভুলে যাবে।'

'তাই যদি হত!' তৃণা বাবার সামনে থেকে চলে এসেছিল।

সেদিনও তৃণা স্বপ্ন দেখেছিল।

একা সম্পূর্ণ একা সে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় একজন কে এসে তার হাত ধরল।

চমকে গিয়ে তৃণা বলল, 'কে আপনি?'

'আমি তোমার স্বামী।'

'স্বামী!' অবাক বিস্ময়ে তৃণা লোকটিকে দেখল।

'হ্যাঁ, তোমার সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী।'

'সমস্ত কিছুর—আমার দেহেরও?'

'দেহের নয় শুধু, মনেরও।'

'কক্ষনো না।' তৃণা হাত ছাড়াতে গিয়েই আবার লোকটির দিকে তাকিয়ে ভীষণ চমকে গেল।

'একি! বাবা তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

তৃণা রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। বাবাও নয়—স্বপ্নে সন্দীপের চেহারা দেখে। সন্দীপ আর স্বপ্ন দুই-ই হারিয়ে মিলিয়ে গেল।

সন্দীপকে অনেকদিন বাদে সেই স্বপ্নে তৃণা আবার দেখল।

সন্দীপকে এতদিনে আবার মনে পড়ল। কম করে দু-বছর তৃণা তার সান্নিধ্যে কাটিয়েছে। অথচ হঠাৎ একদিন ওকে তাড়িয়ে দিয়ে ওকে আর মনে রাখেনি। গাঢ় অন্ধকার যেন তাকে ঢেকে রেখেছিল। সেই স্বপ্নে সে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একবার সামনে এসেছিল। তারপর এখন আবার বেশ মনে পড়ছে।

অন্ধকারে একা ভীত হয়ে পালিয়ে এলেই ভাঙা-ভাঙা ছবিগুলো কোণগুলা কাচের ভেতরে বেঁকে যাওয়া দৃশ্যের মতো মনকে বিব্রত করে। অনেক দিনের সন্দীপ মূর্তি হয়ে নিষ্ঠুর হয়। দর্পণ হয়। যার গায়ে তৃণা নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অন্য কোনো মেয়ের গল্প বলে ভাবে।

সন্দীপ একদিন অন্ধকারের মতো ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। সে ছবি কাটা-কাটা মেঘের ভেতর দিয়ে আলোর ক্রম-প্রকাশের মতো তৃণার অতীতকে আলোকিত করে। সেদিন হঠাৎ সন্দীপ খুব কাছে থেকে তৃণাকে দেখছিল। আর তার চোখগুলো সুযোগ বুঝে অনায়াসেই মাতালের চোখের মতো ঘোলাটে হচ্ছিল। তৃণা ভয় পেয়ে বলেছিল, 'এ কি সন্দীপ, তুমি কি চাও—এমন করে তাকিয়ো না আমি ভয় পাব।'

সে বারণ শোনেনি। উত্তর দিয়েছিল, 'ভয় আছে বলেই তো সুখ আছে।'

'না, না, তুমি চলে যাও সন্দীপ।' তৃণা পেছিয়ে গেল।

'আমি তোমার ঠোঁটে চুমু খাব।' সন্দীপ হাসল।

তৃণার সেই হাসি দেখে কি জানি কেন ছোট মাসির কথা মনে এল। আর সেই সঙ্গে ছোট মাসির দিকে তাকিয়ে বাবার অকারণ হাসি···বাবাও কি তাহলে সন্দীপের মতোন ?···

তৃণা বীভৎস ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। আসবার সময় বলেছিল, 'তুমি আর আমার কাছে এসো না সন্দীপ, আমি তোমাকে ভয় পাই।'

এরপর সাপের ছোবলের মতো সন্দীপের চাহনি কিছুদিন তৃণাকে পীড়া দিত। ইচ্ছার তীব্রতায় সে সাপ হয়ে যেত। সাংঘাতিক বিষাক্ত সাপ।

তৃণা সে সময় ভীষণ ছোট মাসি হয়ে যেতে চাইতো। ইচ্ছে করত ছোট মাসির মতো বাবার কাছে থাকতে, বেড়াতে যেতে। কিন্তু কঠিন শাসনে বাঁধা বাবার দৃষ্টি তৃণার ইচ্ছাকে ঘুম পাড়িয়ে মমি করে দিত।

আজকাল তৃণার ঘুরে-ফিরে এই সব পুরোনো মন্দিরের গায়ে মুছে আসা শিল্পকর্মের মতো ছবির ভগ্নাংশ দলবাঁধা মৌমাছির গুনগুনানির রেশ নিয়ে অনবরত চারপাশে সাড়া তুলত। একা হয়ে যাওয়া ওর মন অন্ধকার থেকে রেহাই পাবার জন্য এর মাঝে ফুলের মতো নিজেকে মেলে ধরবার ইচ্ছা জাগত।

মার মৃত্যুর সামান্য ব্যবধানেই ছোট মাসি একদিন এসেছিল। মনে আছে সেই দিন—সেইদিনটা অকারণেই তৃণার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী লেগেছিল। কারণ হয়তো ছোট মাসির আসার খুশিতে বাবা সেদিন তৃণার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। তৃণা একা-একাই অভিমানে পুড়ছিল। এক সময় ছোট মাসি যেচে এসেই বলেছিল, 'তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ? কাল থেকে আমি দেখব। মন দিয়ে লেখাপড়া করো।' চলে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, 'আর শোন, আজ থেকে তুমি জামাইবাবুর পাশের ঘরে একাই শোবে।'

ছোট মাসি চলে যাবার পর তৃণা অকারণে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল।

অনেকদিন বাদে তৃণা আবার ভয় পেল। প্রচণ্ড ভয়। নিচ থেকে ওপরে উঠতে গিয়ে সিঁড়ির কোণের অন্ধকারটা হঠাৎ তার চোখের সামনে বাবার মতো হয়ে গেল। বাবা যেন অন্ধকারের বিরাট পাহাড় হয়ে তার পথ আটকাল। তার পরমুহূর্তেই পাহাড়টা একটা বিকট জন্তু হয়ে তৃণার শরীরে লাফ দিল। তৃণা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে সিঁড়ির নিচে লুটিয়ে অজ্ঞান হল।

স্বাভাবিক হয়ে যেতেই তৃণা কেমন আশ্চর্য হলো দুটো ব্যাপার লক্ষ্য করে। প্রথমত হঠাৎ সে যেন মনে কেমন জোর পেল। তার বোধের অনুভূতি যেন বলতে চাইল—আমি আর ভয় পাব না। অন্ধকারের অস্তিত্বে আর আমার ভয় নেই।

দ্বিতীয়ত সে একটা ছেলেবেলার দেখা দৃশ্যকে আবিষ্কার করল অনায়াসে। যে ঘটনার ছাপ মনে পড়ার কোনো কারণও নেই বুঝি। ঘটনাটা স্বল্প। ছোট মাসি আসবার পর একদিন সে স্কুল ফেরত বাড়ি ফিরে দেখেছিল, সিঁড়ির তলাকার ওই অস্পষ্ট জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বাবা আর ছোট মাসি।

তৃণা থমকে গিয়েছিল।

ওঁদের কিন্তু সাড় ভাঙেনি তাতে। বাবা ছোট মাসির একটা হাত ধরে কেমন যেন তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখদুটো অদ্ভুত হাসছিল। এ হাসিটার কথা পরে ভুলে গেলেও একদিন তৃণা ফের তা খুঁজে পেল সন্দীপের কাছে। অথচ সন্দীপ···

তৃণার কোনোদিনই ছোট মাসিকে ভাল লাগত না। কিন্তু ছোট মাসি বাবার সুখের জন্য আপ্রাণ করত এ কথা তৃণা বেশ বুঝত।

এর কিছুদিন বাদেই সন্দীপ এসেছিল।

সে সময়টা বাবার কাছ থেকে সরে এসে খুব একা হয়ে পড়েছিল তৃণা। ভীষণ একলা। পড়ার বই আর এলোমেলো বই নিয়ে কিছুতেই তার সময় কাটত না। তখনই সন্দীপ যেন গুমোট গরমের পর শূন্য পূরণ করবার জন্য ঝড়ের বাতাসের মতোই এসেছিল।

সন্দীপের কাছ থেকে পালিয়ে আসবার পরও সে তার খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছে। তৃণা এখন সে-সব চলে যাওয়া সময় নিয়ে খেলা করতে পারছে। আর সে এতদিন কেমন অহেতুক ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। সন্দীপকে উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলোয় উপেক্ষা করেছে। অন্ধকারের সুযোগও দেয়নি। এভাবে বাজি ধরে ধরে নিঃশেষ হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন সন্দীপের সমস্ত সামর্থ্য খরচ হয়ে গেছে। তাই সে আর আসেনি।

তৃণাও ভয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে খুশি। সন্দীপকে বাজিয়ে নিঃস্ব হয়নি।

আপন মনে ঘরে শুয়ে-শুয়ে তৃণা দাবার ঘুঁটি চালবার মতো মনে-মনে নিজের বিরুদ্ধে দান দিচ্ছিল। প্রতিপক্ষর সাবধানী দৃষ্টির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে।

এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকলেন। বসলেন এসে মেয়ের পাশে। হঠাৎ কী মনে করে তৃণা প্রশ্ন করল, 'বাবা ছোট মাসি এখন কোথায় ?'

কেমন যেন আনমনা লাগল বাবাকে ওর। বাবা উত্তর দিলেন, 'কাশীতে, একথা জানতে চাইলে কেন ?'

'এমনি।' তৃণা হাসল ঘনিষ্ঠ হয়ে।

বাবা তবু ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন অপলক চোখ মেলে। বাবার চোখ দুটো আয়না হয়ে গেল। তার ভেতর বহু পুরোনো দিনের বাবার শরীরই ফুটল। আবছা, ঘোলাটে।

তৃণার মনে পড়ল মার মৃত্যুর পর ঠিক এই চোখ নিয়েই বাবা তার কাছে অন্তরঙ্গ হতেন। সেই অন্তরঙ্গতার আভাষই যেন আয়নার কাচে। তৃণা শব্দ দিয়ে সময় ভাঙতে চাইল। বলল, 'এই একটু আগেও ছোট মাসির কথা ভাবছিলাম—কেমন মনে পড়ে গেল।'

'তাই বুঝি!' বাবাও এবার হাসলেন। তৃণার কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'আমার কথা বুঝি একটুও ভাব না?'

'বাঃ তোমাকে রোজ দেখছি, নতুন করে ভাবা কি?'

দুজনেই চুপ করে গেল। মনে হল যেন কথার মারপ্যাঁচে তারা কি রকম বিশ্রী জায়গায় এসে পড়েছে। যেখান থেকে আর পিছু হটা যায় না। তাই হয়তো একটু বাদেই তৃণার বাবা উঠলেন। বললেন, 'দেখি খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কতদূর।'

'এত ব্যস্ততার কি আছে।' হালকা হতে পেরে তৃণা বাবাকে বাধা দিতে গেল। বলল, 'তুমি বসো, আমিই বরং দেখছি।' কিন্তু বাবা ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বাবা চোখের আড়াল হতেই তৃণা ফের নতুন করে নিজেকে বিচার করতে প্রবৃত্ত হল। কবিতার পংক্তির মতো একটার পর একটা চিন্তার তারা গ্রথিত করে একটা হিজিবিজি নকশা আঁকল :

নির্বাণ আর সন্দীপ। ভয়
দুটো সময়ের পটভূমিতে অন্ধকার···
অন্ধকারের দুটো রূপ—
বাবা আর জানোয়ার।
একটা বিরাট গহ্বরের মতো ব্যবধান···
ছোট মাসি—স্বপ্ন—আগুন ;
বিভিন্ন সময়ের হাসি,
ছোট মাসি, বাবা, সন্দীপ আর নির্বাণ—
নির্বাণের চোখে ভাঁজ না খাওয়া হাসি।
টিকটিকির মতো চোখ :
আর সন্দীপের চুমু খেতে চাওয়ার ইচ্ছা।
কিন্তু সিঁড়ির তলায় মুছে যাওয়া স্মৃতি।
গর্ত···অনেক গর্তের গভীর দাগ বুকে :
এক দিনের ছবি।
ছোটমাসি পুড়ে গেল···বাড়িটা পুড়ে গেল, বাবাও।
শুধু আমি একা—আমার মনের অস্বাভাবিক অস্থিরতা।
অন্ধকারের ভেতর সিঁড়ির নিচে সাপ—

বিষাক্ত সাপ।

তৃণা চিন্তাগুলো ঝুড়ল, ছিঁড়ল, ছড়াল। বেছে-বেছে যাচাই করল বোধের দহনে। কিন্তু কিছু পেল না। তবু সে স্বস্তি নিয়ে, বুদ্ধির ভান নিয়ে নিজেকে বোঝাল, জানতাম কিছুই পাব না। কিন্তু ছোটমাসির বিদায়ের বিষণ্ণতা দ্বীপের মতো এতদিন পরে, এত কাল পরে জেগে উঠল। সেই স্মৃতিটুকু জমিয়ে রাখা টাকার মতো খরচ করে তৃণা নিজেও যেন আজ দুঃখ পেল।

একটা ঘোড়ার গাড়িতে মাল ওঠানোর পর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ছোট মাসি। বাবার হাত ধরে তৃণাও দাঁড়িয়েছিল।

'আসি জামাইবাবু।'

বাবা কোনো কথা বলেননি। শুধু ঘোড়াটা দুবার পা ঠুকেছিল।

'তৃণা যাই—' ছোট মাসি আদর করে ওকে চুমু খেয়েছিল। তারপর তৃণাকে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল।

বাবার স্থির শরীরটা একবার নড়ল। বললেন তিনি, 'চিঠি দিও।'

সেই শেষবার ছোট মাসির মুখে হাসি ফুটেছিল। সঙ্গে শেষ কথা, 'আর চিঠি দিয়ে কি হবে, কোনোরকমে শেষ দিন ক'টা এখন কেটে গেলেই বাঁচি। তুমি কিন্তু শরীরের যত্ন নিও। তৃণাকে দেখ।' কথার রেশটুকু ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চলে গেল।

তৃণা এর অনেক পরে জেনেছিল, ছোট মাসি বাল-বিধবা।

তৃণার ধারণা হল বাবার চেহারা নেওয়া অন্ধকারটা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। গলে-গলে তরল হয়ে আলোর ছোপ ধরছে। সেই সঙ্গে অন্ধকার থেকে তার মনসিজ জন্তুটার জন্ম নেবার প্রবৃত্তিও বুঝি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বাবাকে অসুখী রাখলে তার ভালবাসায় আঘাত দেওয়া হবে। মনের নিরিখে হিসেবের খাতা খুলে দেখল সে ; বাবার ভালবাসার সুখ, নির্বাণ। নির্বাণকে এড়িয়ে আমি বাবাকেই দুঃখ দিচ্ছি।

তৃণা নিজেকে শুনিয়ে বলল, 'সন্দীপ একদা আমাকে ভালবাসতে চেয়েছিল। আমি এতকাল আমার মনের পোষা জন্তুটাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। অথচ নির্বাণ আমার শরীরের অধিকার পেয়ে আমাকে সুখ দেবে, স্বাচ্ছন্দ্য। নির্বাণের চোখে আগামী দিনের স্বপ্ন—এখন দেওয়ালের টিকটিকি খুবই স্বাভাবিক, কারণ কাল সিঁড়ির তলায় জন্তুটা শেষবারের মতো আছড়ে পড়েছে।

তৃণা রাত্রের খাওয়া শেষ করে বহুদিন বাদে বেশ আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভেঙে বাবার কাছে বসে বাবার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে সে বলল, 'বাবা, তুমি কী আর ওদের খোঁজ নিয়েছ?'

বাবা অবাক হয়ে তৃণার লজ্জার সুশ্রীটুকু দেখলেন।

'কেন ?'

'ভাবছি এবার আমি যাব।'

'তুমি যে এখনো···'

'না বাবা, আমি সুস্থ, স্বাভাবিক—'

'বেশ, আমি আজকেই ফোন করে দেব।'

গরবিনী এক রাজহাঁসের মতো ঘর ছেড়ে তৃণা চলে গেল।

ওর মনটা সত্যিই এখন এক রাজহাঁসের মতো অন্ধকার জল কেটে আনন্দে সাঁতরাচ্ছে।

সতী, বিনোদিনী ও আমি

এষা দে

সায়ান্স ব্লকের স্টাফ কমনরুমে বসে আছি। ছ'খানা পাখার মধ্যে যে দুটো কোনক্রমে চলে তারই একটার তলায়। এটা নতুন বিল্ডিং, বিশাল ঘর, এই উঁচু সিলিং হলে হবে কি ছিরি ছাঁদ নেই। মেঝেজোড়া জুটের কার্পেটে ছড়িয়ে আছে দলা পাকানো কাগজ, ভাঙা চকের টুকরো—মাঝে মধ্যে ঝাঁট পড়ে আর কি। বড় বড় দরজায় ঝুলছে প্রমাণ সাইজের পর্দা। এই মাপের পক্ষে অনেক ছোট। আমরা যাকে কটকি বলি সেই টাই অ্যাণ্ড ডাই ডিজাইনের, গাঢ় সবুজ রঙ। ঘন নীল আর চড়া বেগুনীর মত এই রঙটিও এখানে ট্র্যাডিশনাল। সব ক'টিই আমার চোখে ক্যাটকেটে। ভাল করে হেলান দিয়ে সামনের টেবিলে পা তুলে দিই। সারি সারি নীচু চেয়ার, কাঠের ফ্রেমে নাইলন কেন্-এ বোনা সিট ও ব্যাক। সর্বদা কয়েকটা ছেঁড়া। খুব সুবিধে, প্রায় ফি বছর মেরামতির মোটা বরাদ্দ সরকার থেকে লেখালেখি করে আদায় হয়। সে সব কোথায় যায় কে জানে।

ঘড়ি দেখি। ঘণ্টা পড়ার এখনো বেশ বাকি। প্লাস টু সায়ান্স অর্থাৎ এগারো বারো ক্লাসের টিউটোরিয়েল। বিজ্ঞানের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ খুব সিরিয়াস এবং হার্ডওয়ার্কিং। ফাঁকি দেয় না, প্রায় নিয়মিত আসে। ক্লাসরুমে জায়গা কুলোয় না। হরদমই তো বেঞ্চিফেঞ্চি উধাও হয়ে যায়। ওরাই আবার পাশের ঘর থেকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে আসে। সে রুমে যাদের ক্লাস তাদের কপাল পোড়ে।

ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বের করে খুলে দেখি আগের সপ্তাহে ক্লাসে কী করিয়েছি। গ্রামারের কতগুলো অধ্যায় ছাড়া ওদের সিলেবাসে আছে প্রেসি, কমপ্রিহেনশান, লেটাররাইটিং। হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে করানো হয়েছে গ্রামার। আজ তাহলে প্রেসি করালে হয়। ব্যাগ হাতড়াই, প্রেসি ও কমপ্রিহেনশানের বইটা আছে তো। একটা প্যাসেজ বেছে ঠিক করে রাখি। এত লম্বা দেওয়া যাবে না, পেনসিলে দাগ দিয়ে দিয়ে ছোট করতে থাকি। ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড অ্যাণ্ড ফিফটি ওয়ার্ডস। প্রথম দিন তো।

'নমস্কার, ম্যাডাম'।

'নমস্কার'।

তাকিয়ে দেখি আমাদেরই ডিপার্টমেণ্টের সতী পাণ্ডা। বয়সে আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হলেও হতে পারে। সাদাসিধে পাতলা একহারা চেহারা, পুরু চশমা। অ্যাবাভ অ্যাভারেজ ছাত্রী, আমার মত ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া। কাজে কর্মে সিন্সিয়ার, নিয়মিত ক্লাস নেয়, ডিপার্টমেণ্টে ট্যাবুলেশানের ভার

ওরই ওপর। কারো কিছু অসুবিধা হয় না। সতী এসে পাশের চেয়ারটায় বসে।

সত্যি কথা বলতে কি ওড়িশাতে প্রথম প্রথম চাকরিতে 'ম্যাডাম' সম্বোধন কানে লাগত। বয়সে বড়রা নাম ধরবে আর ছোটরা নামের সঙ্গে 'দিদি' যোগ করবে—এটাতেই অভ্যস্ত ছিলাম। এখানে কিন্তু ছোট বড় নির্বিশেষে যে-কোন নামী মহিলা থেকে শুরু করে ওপরওয়ালার স্ত্রী বা মহিলা সহকর্মিণীদের 'ম্যাডাম' সম্বোধন করেন পুরুষেরা। বয়সে বা সম্মানে বড় হলে 'ম্যাডাম' ও 'স্যার' সকলে। ছাত্রছাত্রীরাও স্যার ও ম্যাডামদের অনুকরণ করে আমাদের নামের সঙ্গে স্যার ও ম্যাডাম যোগ করে সম্মান জানায়। দীর্ঘ প্রবাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বইয়ের সূচিপত্রে চোখ বোলাতে বোলাতে অন্যমনস্কভাবে বলি,

'ক্লাস আছে বুঝি?'

'না। আজকের মত শেষ। টাইমটেব্‌লে দেখলাম আপনার এখানে ক্লাস, তাই এলাম।'

একটু অবাকই লাগল। ইংলিশের টাইমটেব্‌ল আর্টস্ ব্লকে স্টাফ কমনরুমের দেয়ালে টাঙানো। দুটো ব্লকের মাঝখানে বেশ খানিকটা রাস্তা। এজন্য আমাদের ক্লাস বন্টন অনেক মাথা ঘামিয়ে করতে হয় যাতে দুটো পরপর ক্লাস আলাদা আলাদা ব্লকে না পড়ে। স্যারেদের প্রায় প্রত্যেকেরই দু'চাকা বাহন আছে। তা সত্ত্বেও মিনিটদশেক লেগেই যায় আর ম্যাডামদের, যাদের ছুটি পা-ই ভরসা তাদের তো আসতে যেতে ঘণ্টা কাবার হয়ে যায়। তাদের বেলা এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াতটা যতটা সম্ভব এড়ানো হয়। আর সতী কিনা এই গরমে এতটা রাস্তা রোদে তেতে পুড়ে শুধু আমারই সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বইটা থেকে মুখ তুলে সতীকে চেয়ে দেখি। সে মাথা নিচু করে বসে, কাঁধের ঝোলানো ফোমের ব্যাগটাকে কোলের ওপর রেখে দু'হাতে সমানে তার স্ট্রাপটা পাকাচ্ছে।

'কী ব্যাপার? ক্লাস অ্যাডজাস্টমেন্ট? বাড়িতে ডিফিকাল্টি?'

সতী মাথা নাড়ে, না। তেমনি চুপ করে বসে থাকে। আরও অবাক হই।

'তাহলে?'

'একটু পারসোন্যাল কথা ছিল।'

সে আবার কি! এরকম পরিস্থিতি এখানে আগে আমার কখনো হয়নি। এত বছরের চাকরি, অলমোস্ট টু ডিকেড্‌স। সবার সঙ্গে ভাল রিলেশান, অসুখেবিসুখে সুবিধে অসুবিধেয় যথেষ্ট হেল্প পাই, নিজেও অন্যের দরকার বেদরকারে হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। ইট্‌স অ্যা কর্ডিয়েল রিলেশানশিপ বাট নেভার ইন্টিমেট। কারণ ফার্স্টলি আমি কলকাতার বাঙালি, এখানকার সেট্‌লড্ বাঙালি, যাদের তাচ্ছিল্য করে 'ক্যারা' বলা হয়, তাদের থেকে

ডেফিনিটলি ডিফারেন্ট। আমার রুটস ভিন্ন সোসাইটিতে, ভিন্ন কালচারে, ভিন্ন ল্যাংগুয়েজে—যদিও ল্যাংগুয়েজ আমার এমন কিছু জানা ছিল না বরং এখানে এসেই বাংলা বইটই পড়ছি কারণ সকলেই ভাবে বাঙালি মাত্রেই সব বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে দু'কথা বলতে পারবে। সেকেণ্ডলি, আমার স্বামী একজন হাই অফিসিয়েল, ওড়িশাতে তাঁর কর্মক্ষেত্র ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান পলিসির দৌলতে। ফিউডালিস্টিক ডেকাডেন্ট সমাজে বুরোক্র্যাটরাই নতুন রাজা। তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যে, অন্তত আমাদের আগের জেনারেশান পর্যন্ত চাকরি তো দূরের কথা সঙ্ঘের সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের মত কাজেরও চলন কম। আসলে আরবান্ মিড্‌লক্লাসের চিহ্নগুলো এখনো এখানে সেরকম জোরদার নয়। দু-চারজন একশেপশানকে বাদ দিলে এখনো নেহাৎ টাকার প্রয়োজন ছাড়া মেয়েরা চাকরি করে চেহারা খারাপ হলে। মানে যাদের বিয়ে হওয়া শক্ত কিংবা বিয়েটা কোন কারণে তেমন সুবিধের হয়নি। আমি যেহেতু কোন দলেই পড়ি না, সে জন্যেও হয়তো আমার সঙ্গে কলিগদের একটা ইনভিজিব্‌ল বাট প্যাল্‌পেব্‌ল ডিস্‌ট্যান্স রয়ে গেছে। তাই আজ হঠাৎ কারো পারসোন্যাল প্রবলেম আমার কাছে বলার আগ্রহে অবাক না হয়ে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় প্রবলেমটা নিশ্চয়ই আরজেন্ট আর স্পেশাল। নইলে এত লোক, নিজের সমাজের আত্মীয়-বন্ধু থাকতে আমার কাছেই বা আসবে কেন।

হোয়াট্‌স দ্য ম্যাটার? মিঃ পাণ্ডার সঙ্গে মান অভিমান?

ঠাট্টার সুরে সহজ হতে চেষ্টা করি। সতী কিন্তু একইভাবে মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ে। যেন ঢোক গিলল। পুরু কাচের আড়ালে চোখদুটো ছলছলে। বইটা বন্ধ করে অপেক্ষা করি। বেচারীর একটু সময় দরকার। হ্যাচারালি। হুট করে তো আর মন খোলা যায় না। বিশেষ করে যার সঙ্গে সেরকম ঘনিষ্টতা নেই তার কাছে। ব্যাগের স্ট্রাপটা পাকানো বন্ধ করে এক সময় মুখ তুলে বলল,

'আপনি কেন বিনোদিনীকে মানে হিস্ট্রির বিনোদিনী সেনাপতিকে আপনার গাড়িতে কটকে নিয়ে যান? এতে আমার যে কী সর্বনাশ হচ্ছে। ডু ইউ নো সি গোজ টু কাটাক ট্যু মিট মাই হাজব্যাণ্ড? দে আর হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার।

আমি তো একেবারে হতভম্ব। প্রথমে কথাই বলতে পারিনি। সামলে নিয়ে বলি,

'এসব ব্যাপার তো ভাই আমি কিছুই জানতাম না। ইউ নো, আমরা এখনো ভুবনেশ্বরে বাড়ি পাইনি, স্বামী-স্ত্রী দুজনে কটক-ভুবনেশ্বর রোজ যাতায়াত করি। ওঁর সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে তাল রেখে আমাকেও সেই সকাল ৯টায় বেরিয়ে রাত ৮টা ৯টায় ফিরতে হয়। বাই চান্স যদি অন্য কোন গাড়ি আগে কটক যায় তো কলেজ ছুটির পর আমি একলা তাতে ফিরি। লেট মি টেল ইউ হাউ ইট অল

হ্যাপেন্‌ড। বিনোদিনীর মেয়ে কটকে মেডিকেল কলেজে পড়ে, ন্যাচারালি হোস্টেলে থাকে। আমাকে রিকোয়েস্ট করে রেখেছে যেদিনই আগে ফিরব ওকে যেন একটু লিফ্‌ট দিই, মেয়েকে দেখতে যাবে। ইট্‌ অল্‌ সিম্‌ড সো ভেরি নরম্যাল। তাছাড়া আমার ছেলেও হোস্টেলে থাকে, ছেলেমেয়ে দূরে থাকলে মায়ের কী কষ্ট তা যাদের এক্সপিরিয়েন্স নেই তারা বুঝতে পারবে না। সো আই ফেল্ট ফর হার। যখনই সুবিধা হয়, ওকে লিফ্‌ট দিই। এর মধ্যে যে অন্য কোন ব্যাপার আছে তা কী করে জানব বল। আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি ভেরি সরি।'

'আমি গেস্‌ করেছিলাম আপনি এসব ব্যাপার কিছুই জানেন না। সো আই কেম টু টেল্‌ ইউ। আপনি প্লিজ ওকে আর কোনদিন নিয়ে যাবেন না।'

'না-না, এখন তো সব জানলাম, এখন আর নিয়ে যাওয়ার কোয়েশ্চেনই ওঠে না।'

খুব জোর দিয়ে বলি। মনে মনে অবশ্য ভাবি বিনোদিনী যেতে চাইলে মুখের ওপর 'না' বলব কী করে।

'তা তুমি তোমার হাজব্যাণ্ডকে কিছু বল-টল না? হোয়াই ডু ইউ অ্যালাও দিস্‌ অ্যাফেয়ার টু কন্‌টিনিউ?'

হাঁ, যেন স্ত্রীরা অ্যালাও করে বলেই পুরুষের যত্রতত্র শয়নের লাইসেন্স। কে কার পারমিশনের ধার ধারে। সতীর জবাবে আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি। 'আমি পারমিট করি বা না করি কে গ্রাহ্য করছে বলে ভাবেন?'

কিছু একটা বলতে হয় তাই যোগ করি,

'আর বিনোদিনীরই বা কি আক্কেল। কিছু কচি খুকীটি তো আর নয়, প্রায় তো তোমারই কনটেমপোরারি, তাই না? স্বামী ছেলেমেয়ে সবই আছে। ব্যাপারটা আদৌ হ'ল কী করে?'

'আমারই কপালের দোষ ম্যাডাম, আর কী।'

চুপ করে যায় সতী। ভারি খারাপ লাগে। বেচারা। কী যে বলা যায়, সান্ত্বনা দেব না উপদেশ – বুঝতে পারি না।

বিনোদিনীকে প্রথম কটকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। সেদিন খুব ক্লান্ত লাগছিল। প্রতিদিন ক্লাসের পর স্ববীরের অফিস শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা। এই বসে থাকার একঘেয়েমি ক্লাস নেওয়ার পরিশ্রমের চেয়ে বেশি টায়ারিং। অথচ নিজেদের সময়মত যাতায়াতও খুব সহজ নয়। ভুবনেশ্বর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কটক বাসস্ট্যাণ্ড ৩৫ কিলোমিটার, এছাড়া কটকে বাড়ি থেকে বাসস্ট্যাণ্ড এবং ভুবনেশ্বর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কলেজ এত দূর যে দুবার রিক্সা করতে হবে। অতএব স্ববীরের গাড়ির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। সেদিন বিনোদিনী কী কাজে যেন লাস্ট পিরিয়ডে রয়ে গিয়েছিল। স্টাফরুমে আমরা খালি দুজন। আমার অবস্থা দেখে

বলল,

'ম্যাডাম, ইউ আর লুকিং ভেরি টায়ার্ড। এই কটক ভুবনেশ্বর করে করে আপনি শরীর খারাপ করে ফেলছেন।'

'কী করি বলুন।'

'কেন, বাড়ি পাচ্ছেন না? স্যারকে বলুন একটু চেঁচামেচি করতে। এমনি এমনি কি কিছু পাওয়া যায়। জানেন – আমাদের ওড়িয়াতে প্রবাদ আছে, বাচ্চা না কাঁদলে মা-ও দুধ দেয় না।'

'ওঁর দ্বারা ওসব হয় না আর কি। হি বিলংস টু দি ওল্ড স্কুল অফ ব্যুরো-ক্র্যাট্‌স। স্ট্রিক্ট নিয়ম মেনে চলেন, ধরাকরা আউট অফ কোয়েশ্চেন।'

'তাহলে আপনি করুন।'

'কী করব? আমি কি সেক্রেটারিয়েটে –'

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিনোদিনী হেসে বলে,

'আরে না-না, আপনি কি আর মিনিস্টার সেক্রেটারির কাছে যাবেন, আপনি তার চেয়েও ওপরে চলুন। আপনার ঐ কটকে ঢোকার আগে রাস্তায় একটা হনুমান মন্দির আছে। সত্যি একেবারে জাগ্রত দেবতা। চলুন পুজো দেবেন। গেছেন কখনো?'

বাড়ির আশায় মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা কখনো মনে হয়নি। ইন ফ্যাক্ট কোন-কিছুর আশাতেই জীবনে কখনো কোন মন্দিরে যাইনি। মন্দির-টন্দিরে যাওয়া তো আমাদের ক্লাসের বাঙালিদের প্র্যাকটিক্যালি উঠেই গেছে। হাঁ, বেড়াতে বেরুলে সাইট সিইঙের অঙ্গ হিসেবে পুরনো মন্দিরে পা পড়ে।

'যেদিন আগে ফিরবেন, গাড়ির সুবিধে থাকবে, বলবেন। আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব! দেখবেন, নির্ঘাৎ ফল পাবেন। আমি নিজে কতবার পরীক্ষা করে দেখেছি। একেবারে অব্যর্থ।'

পরদিনই গাড়ি পেলাম। সঙ্গে কেউ থাকলে লম্বা ড্রাইভ অত বোরিং লাগে না। যেন চট করেই পৌঁছে গেলাম। তখন বেলা চারটে, রোদের তেজ কমে এসেছে, শীতকালের বেলা। ছোট্ট ছিমছাম মন্দিরটি কত পুরোনো জানি না তবে আধুনিকের প্রলেপ স্পষ্ট। বিগ্রহ একাধিক। বেলা শেষে দর্শনার্থীর ভিড় নেই। বিনোদিনী গাড়ি থেকে নেমেই সোজা সেবায়েৎ-পুরোহিতকে ডেকে আনল। তাদের সচ্ছন্দ কথাবার্তায় অন্তরঙ্গ সুর, ক্রিয়ারলি পুরোনো আলাপ। ম্যাডামের জন্য ভাল করে পুজো দেওয়ার হুকুম দিয়ে অনায়াসে মাটিতে থপ করে বসে পড়ল। আমি একটু অপ্রস্তুত। তসরপ্রিন্ট শাড়িটা যথাসম্ভব বাঁচিয়ে হাঁটুগেড়ে বসার উপক্রম করছিলাম আর বিনোদিনী তার দামি পিওরসিল্ক শাড়িটা নিয়ে বদারই করল না। সত্যি এদের ভঙ্গি জেনুইন। আমি পাশে বসতে বড় চামড়ার-মত-আসলে-ফোমের ঝোলা ব্যাগ থেকে বের করল চটি বই।

'এটা কী জানেন ম্যাডাম ?'

'কী ?'

'হনুমান চালিশা'। এটাই তো আসল। আপনাকে একটা দেব। বাংলা তো এখানে পাওয়া যায় না, শুধু ওড়িয়া আর হিন্দি। হিন্দিই আপনাকে দেব, হিন্দি তো পড়তে পারবেন।'

আরও অপ্রস্তুত হই, 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলি না। আমাদের সময় হিন্দি থার্ড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে কম্পালসারি ছিল না। বাবার বদলির চাকরিতে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছি বটে তবে সবই বড় সহর, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, তখনও ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজের বদলে অল্টারনেটিভ ইংলিশ নেওয়া যেত। ওড়িয়া তো আমার আরো খারাপ। বাড়িতে বাংলাটাই শিখেছিলাম খানিকটা, এখানে এসে মাঝেমধ্যে তাই পালিশ করি।

বিনোদিনী আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে মাথায় বেশ ঘোমটা টেনে বই খুলে নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় পড়তে থাকে। আমাদের বিয়ে থাওয়ায় ষষ্ঠীর কথা বা কখনো লক্ষ্মী পুজোয় লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনতে হলে বয়স্কা মাসি পিসির খোঁজ করতে হয়। ইনফ্যাক্ট আমাদের বাড়িতে কোন দিন তাও হয়নি। তবে আমার পিসতুতো বোনের বিয়েতে, ক্বচিৎ কখনো কোন আত্মীয়ের বাড়ি পুজো-টুজোয় ডাকলে দেখেছি—অথচ বিনোদিনী তো আমার চেয়ে বয়সে ছোট। চুপ করে হনুমানের মাহাত্ম্য শুনি। পাঠ সেরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। বেশ ঘটা করে পুজো, এখানে মন্ত্র পড়া হয় স্বর করে, অন্য মন্দিরেও শুনেছি। পুজোর পর সাগ্রহে প্রসাদ নিয়ে আমাকে, গাড়ির ড্রাইভার কৈলাসকে, বাড়িতে স্ববীরের জন্য পাতায় মুড়ে—এককথায় যথাবিহিত প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে বেরোয় বিনোদিনী। পূজারী গাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে। মন্দিরের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিতে দিতে বিনোদিনী গাড়িতে ওঠে। আমি তার কর্মদক্ষতায় একেবারে ওভারহোয়েল্‌ড। আমার দ্বারা কস্মিনকালেও এসব হ'ত না! জিজ্ঞেস করি,

'আপনার সঙ্গে এদের জানাশোনা আছে ?'

বিনোদিনী 'ও কিছু নয়' ভঙ্গিতে অন্যপ্রসঙ্গে চলে যায়। কটক সহরে গাড়ি ঢোকার মুখে বলে ওঠে,

'এইখানে ম্যাডাম আমাকে নামিয়ে দিন।'

'সে কি, এই আধাটায় নেমে কী করবেন ?'

'মেয়েকে দেখতে যাব মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে।'

'সে তো এখানে নয়, বেশ দূর। চলুন হোস্টেল পর্যন্ত পৌঁছে দিই, আপনাকে নইলে এখান থেকে আবার রিক্সায় উঠতে হবে।'

না-না, কিছুই দরকার নেই। আসলে আমার এখানে একটু কাজ আছে।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে চট্ করে দরজা খুলে নেমে পড়ে।

'চলি ম্যাডাম, নমস্কার।'

'নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ।'

'না-না, ধন্যবাদের কী আছে। ফল হলে তারপর আপনি নিজেই আবার মন্দিরে আসবেন। আপনাকে দেবতার কাছে নিয়ে গেলাম, পুজা তো আমার।' এখনো পরিষ্কার মনে আছে। সেদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল, মানে ভুবনেশ্বরের শীত হিসেবে। বিনোদিনীর পরনে ভারি সিল্ক—ব্যাঙ্গালোরই হবে—জমকালো ছাপা। এখানে অধ্যাপিকারা অনেকেই কলেজে সিল্ক সিনথেটিক পরে আসেন, কাজেই আশ্চর্য কিছু লাগেনি। এখন ভাবলে সাজগোজের জন্য অর্থ পাওয়া যায়। কী পাখোয়াজ মেয়ে। হনুমানের মাহাত্ম্য প্রচার করে পরপুরুষের সঙ্গে অভিসার। কুড হ্যাভ টট্ আওয়ার ওল্ড শ্রীরাধা আ লেস্‌ন্ অর টু।

'সে এক মহাভারত কথা, ম্যাডাম।'

খেয়াল হয়, সতী তার কাহিনী শুরু করেছে। বছর-দুয়েক হতে চলল বিনোদিনী সতীর স্বামীকে পাকড়াও করেছে। আমি একটু মিন্‌মিন্ করে বলতে চেষ্টা করি,

'মানে ইউ মীন শি ইজ ইন লাভ—'

'লাভ না হাতী। আপনি তো ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড জানেন না। ওসব মেয়েরা লাভ-রোমান্সের ধার ধারে না, বদজাত তো। ওদের পরিবারও 'কণিকা' স্টেটের সঙ্গে লতায় পাতায় ক্যানেক্টেড্, ব্যাকডোর আর কি। চেহারায় তাই একটু চটক আছে দেখেন না ? ওই চেহারা ভাঙিয়েই তো—খণ্ডায়েৎ জাত আর ভাল কী হবে।

জাত তুলে কথা কানে লাগে। এত এডুকেটেড হয়েও কী করে যে এরা এত কনজারভেটিভ্। জাতের মহিমা কে না জানে। ওড়িশার বিখ্যাত মহিলারা তো অনেকেই খাঁটি ব্রাহ্মণ। তাঁদের চরিত্র, চাল-চলন সম্বন্ধে কেচ্ছায় তো কানে আঙুল দিতে হয়। একজন ফেমাস ডান্সারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—এখন অবশ্য বয়স হয়ে গেছে আর নাচেন না—ভদ্রমহিলা খুব হাইলি এডুকেটেড, বাইরে-টাইরে পড়েছেন, স্মার্ট। অথচ ভুবনেশ্বর ক্লাবে তাঁর সম্বন্ধে যে ধরনের মন্তব্য শুনলাম যেন শি ওয়াজ দি ওনলি অ্যাভেইলেবল ওম্যান ফর ওয়েলপ্লেস্‌ড মেলস লুকিং ফর সাচ্‌ফান। সবটাই গুজব, গায়ে জ্বালা, সেক্স রিপ্রেশানের চিহ্ন কি না কে জানে। হয়তো ইনডিভিজুয়েল রেবেলিয়ান সব সময়ই ওল্ড স্ট্রাকচার ফলো করে। এখানে মেয়েরা ঘরণী হতে না চাইলে শুধুমাত্র বৈরিণীই হতে পারে।

সতীর ইঙ্গিতটা খেয়াল না করার ভান করি।

'তা তোমার কপালে এ জুটল কী করে?

সতী নিজেই খাল কেটে কুমীরটি এনেছে, বিনোদিনীর মোহিনী প্রতিভার কথা জানা ছিল না তো, ওদের দুজনেরই সরকারি বাড়ি এক পাড়ায় ইউনিট নাইনে। বিনোদিনীর স্বামী সরকারি ইঞ্জিনীয়ার, অন্যান্যদের মত বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বদলি হন। তখন ভদ্রলোক সুন্দরগড়ে পোস্টেড। বিনোদিনীও ট্রান্সফার নিতে পারত, সুন্দরগড়ে আর কে যেতে চায় বলুন, ভেকেন্সি প্রায়ই থাকে। কিন্তু এ এমন চালু মেয়ে যে ভুবনেশ্বর কটকের বাইরে বড় একটা বদলি হয় না, বা স্বামীর সঙ্গে যায় না। আগে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার বাহানা দিত। তারপর ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা। অতএব স্বামী বেচারা আজ কোরাপুট কাল বালেশ্বর ঘোরেন। সতী ভাবল বেচারী ছেলেপুলে নিয়ে একলা আছে তাকে একটু দেখাশুনা করা দরকার, তাছাড়া কলিগ বলে কথা। অতএব মি. পাণ্ডা দুদিনেই বিনোদিনীর 'বিমল ভাইনা' অর্থাৎ 'বিমলদা' হয়ে উঠলেন। বিনোদিনীর নামে কোয়ার্টার ট্রান্সফার, বিনোদিনীর বাড়ি করার জন্য সরকারি লোন জোগাড়, বিনোদিনীর বাপের বাড়ির গাঁয়ের বেকার ছেলের চাকরি খোঁজায় সাহায্য ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধাপে ধাপ ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। অ্যাপারেন্টলি নাথিং আনইউজুয়েল, মিঃ পাণ্ডা ইজ কোয়াইট হাই আপ ইন দ্য স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, সত্যি সরকারি কাজে তিনি অনেক হেল্প করতে পারেন। হরদম এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াত ছেলে-মেয়েদের একত্র খাওয়া-দাওয়া আড্ডা। বিনোদিনীর মুখে 'বিমল ভাইনা'র সুখ্যাতি ধরে না। মিঃ পাণ্ডা একদিন কথাচ্ছলে সতীকে বলে ফেললেন,

'যাক বাবা, সব কলেজ লেকচারাই তোমার মত শুধা রুটি নয়।'

কথাটা খট্ করে সতীর কানে লাগে। তবে সত্যি কথা বলতে কি তেমন কিছু ভাবেনি। অস্বীকার তো করা যায় না বিনোদিনী চেহারাটি এখানকার অন্য পাঁচজন ওয়ার্কিং উইমেনের তুলনায় একটু সরেশ, বেশ বড় বড় চোখ, হালকা বাদামি তারা, লম্বা নাক, সামান্য গোঁফের আভাস থাকলেও হাসিটি সুন্দর, দিব্যি গায়ে পায়ে আছে, সাজপোশাকে তীক্ষ্ণ নজর। তবে আজকাল তো অনেকেই পোশাক-আশাক করে। চেহারার দিকে বিনোদিনী একটু চোখে পড়ার মত হলেও চাল চলনে নয়।

শুনতে শুনতে ভাবি পাশাপাশি সমাজ হলেও দৃষ্টিভঙ্গি কত আলাদা। আমরা ছাত্রী থাকার সময় অধ্যাপিকাদের লাউড কালারের সিল্ক বা সিনথেটিক শাড়ি পরে কলেজে আসা কল্পনাও করতে পারতাম না। হাতে একরাশ রঙিন চুড়ি—যা এখানে সোহাগ চিহ্ন—আর কানে লম্বা লম্বা দুলের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমার হাল্কা রঙের সুতির শাড়ি আর শুধু বালা পরা হাত আলোচনার বস্তু ছিল। এদিকে সতী কিন্তু বলেই চলেছে,

'সে লজ্জার কথা আর আপনাকে কী বলব। ধরা পড়বি তো পড় নিজের ছেলের কাছে।'

মনে হ'ল সবটাই যেন একটা বিশাল নাটক। আমরা প্রত্যেকে এক একটি চরিত্র, স্টেজে যে যার রোল করে যাচ্ছি। এখন আমার ও সতীর দিকটা অন্ধকার হয়ে গেল। আলো পড়ছে সতীর স্বামী বিমল ও বিনোদিনীর ওপর। অ্যাকশান স্টার্ট। আমি এখন দর্শক। বর্তমান থেকে অতীতে, নিজের থেকে অন্যে চলে যাই।

সতীর বড় ছেলে আমাদের কলেজেই পড়ে, ফিজিক্সে অনার্স, ঠিক বাপের মতনই দেখতে অর্থাৎ ছিপছিপে লম্বা, কাটা নাক মুখ চোখ, মাজা রঙ। ছেলে সতীর খুবই ভাল, যেমনি বা পড়াশুনায়—হায়ার সেকেণ্ডারিতে নাইন্থ হয়েছিল—তেমনি শান্ত ভদ্র ব্যবহার। অবশ্য ভাল তো ওর বাবাও ছিল, এখন দেখ অবস্থা। সে যাক গে, যে কথা হচ্ছিল।

তখন শীতকাল। কলেজে ক্রিসমাসের ছুটি। ছেলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পিকনিকে গেছে। আজকাল তো এদের ফ্যাশান স্কুটার মোটরবাইক রেসিং। সব যে যার বাহন নিয়ে গেছে। ফেরার সময় বিকেলের দিকে কী খেয়াল হয়েছে, ছেলে-ছোকরার ব্যাপার তো, দলবল নিয়ে 'ওবেরয় ভুবনেশ্বরে' হাজির। 'ওবেরয়' তখন নতুন খুলেছে, ওরকম হোটেল রাজ্যে আর কই। বোধহয় খেয়াল চেপেছে ফাইভস্টার হোটেলে একটা রাউণ্ড দিয়ে আসবে, পয়সা তো নেই, সকলের পকেট এক করলে কোল্ড ড্রিংকস একটা করে হতে পারে। মোটরবাইক স্কুটার সব পার্ক করতে গিয়ে দেখে, ওদের মারুতিটা সেখানে রাখা, লক করা। ছেলে তো অবাক। তারপর ভাবল বাবার বোধহয় অফিস-সংক্রান্ত কোন কনফারেন্স বা টি পার্টি আছে, তখন তো মিঃ পাণ্ডা একটা পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিং-এ, ওখানে কাজের ধাঁচ প্রায় প্রাইভেট কোম্পানির মত। এখানে ওখানে লাঞ্চ ডিনার নাকি মাঝেমাঝে চলে। ছেলে ভাবল হঠাৎ হাজির হয়ে বাবাকে একটা সারপ্রাইজ দেবে—যতসব ছেলেমানুষি আর কি। রেস্টুরেণ্ট হল সব উকি মেরে মেরে দেখে—আশ্চর্য, বাবা তো কোথাও নেই। তাহলে গাড়িটা এখানে এল কী করে। ওর কাছে ব্যাপারটা একটা বিরাট মিস্ট্রি। বন্ধুদের কিছু বলল না, টাউনে ফিরে যে যার বাড়ির দিকে চলে যেতে ছেলে ফিরে গেল 'ওবেরয়ে', একলা। জায়গাটা তো টাউন থেকে দূরে, বেশ নির্জন। গেটের বাইরে রাস্তার এক কোণে স্কুটারটা রেখে তার অপেক্ষা শুরু হ'ল। সন্ধ্যে হয় হয়, দেখে গাড়ি ফিরছে, চালাচ্ছে বাবা পাশে তাদের "বিনি মাউসী"। ছেলে তো আর কচি খোকা নয়, তার বুঝতে বাকি থাকে না।

তবে সে স্বভাবতই রিজার্ভড তার ওপরে কনসিডারেট। প্রথমে মাকে কিচ্ছুটি বলেনি। পাছে কষ্ট পায়। এদিকে সতী দেখছে ছেলে দিন দিন কেমন যেন

হয়ে যাচ্ছে, সব সময় মুখ গম্ভীর, চুপচাপ একলা বসে থাকে, পড়াশুনাতেও মন নেই। ফিজিক্সে আর. কে. ত্রিপাঠী তো একদিন সতীকে খবরই দিলেন, ম্যাডামের ছেলে প্র্যাকটিক্যালে ফাঁকি দিচ্ছে। মায়েরা নিজেরা মাস্টারি করলে ছেলেমেয়েদের বেয়াড়াপনা চট করে ধরা পড়ে যায়। বাড়িতে ছেলেকে যত জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রবলেমটা কী, কেন মন নেই কিছুতে, সদুত্তর পায় না। ছেলে জবাবই দেয় না। বেশি চাপাচাপি করলে মেজাজ করে—যা আগে কখনোই করত না, খুব নম্র ছিল—তারপর স্কুটার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উধাও হয়ে যায়। বাড়িতে কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না, বিশেষ করে বাপের সঙ্গে তো একেবারেই কথা নেই। রাতে খাওয়ার সময় চোখ নিচু করে কোন রকমে থালাটা খালি করে উঠে পড়ে। আগে বাবার সঙ্গে পড়াশুনা নিয়ে কত ডিস্‌কাশান হ'ত, দুজনের একই সাবজেক্ট। কোথায় গেল সেই সম্পর্ক। সতী ছেলে নিয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ে। দিনকাল খারাপ, সব সময় ভয় ড্রাগফাগ ধরে বসল নাতো।

শেষে একদিন এস্পার-ওস্পার। তিনদিনের জন্য মিঃ পাণ্ডা ট্যুরে গেছেন সম্বলপুর। এদিকে বিনোদিনীর ডিপার্টমেণ্টাল হেড সতীকে বললেন অ্যানুয়েল পরীক্ষার কোয়েশ্চেন সাবমিট করার তারিখ দুদিন বাদে, বিনোদিনী তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছে, জানেন ওর বাড়ি তো সতীরই পাড়ায়—খবরটা কি পৌঁছে দিতে পারবে। তা সতীর আর অসুবিধা কি, ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে স্লিপ দিয়ে। বিনোদিনীর অ্যাসাইনমেণ্ট টুকে নিল।

বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে যেই বলেছে, ও বাবা সে কী মেজাজ। সে পারবে না এসব চাকর-বাকরের কাজ করতে। মুখ গোঁজ করে বসে রইল। খুব রাগ হ'ল সতীর। ধাড়ি ছেলে, এইখান থেকে এইখান এতটুকু রাস্তা যেতে একেবারে পা খসে পড়ছে। এদিকে স্কুটারে চড়ে সমস্ত সহর চষে বেড়ানো হচ্ছে। আসলে বাইরে বাইরেই মন, ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক কী। মার এতটুকু কাজ করবে কেন, তার চেয়ে বরং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্যাজাবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রুঢ়াকড়া কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে গুম হয়ে সব শুনল। কিছু না বলে স্লিপটা ছোঁ মেরে সতীর হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে ফিরে এসে খবর দিল 'বিনি মাউদী'র শাশুড়ি বললেন কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিন দিনের জন্য সোস্যাল সার্ভিস ক্যাম্পে গেছে বিনোদিনী।

সতী তখন রান্নাঘরে নতুন চাকরটাকে বকাঝকা করছে। সকালে আলুর তরকারিতে নুন দেয়নি, পরটাগুলো আধকাঁচা আধপোড়া, মিঃ পাণ্ডার খেতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। যদিও মুখে কিছু বলেননি। ছেলের রিপোর্টে চাকরকে বকতে ভুলে গেল, একেবারে যাকে বলে হতভম্ব। ক্যাম্পে গেছে বিনোদিনী! সামনে পরীক্ষা, এখন তো কোন ক্যাম্প-ফ্যাম্প হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা

কলেজের কাজেই যদি গেছে তাহলে সি. এল নিয়েছে কেন, ডিউটি লিভই তো পাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য—হেড কিছুই জানেন না।

ছেলে তার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'বাবাও গেছে কি না।'

সতী একেবারে স্তম্ভিত। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি।

'মানে, তুই কী বলতে চাস?'

'কী আবার। তুমি তো চোখ থাকতেও অন্ধ। এত লেখাপড়া শিখে এই তো রেজাল্ট। খালি বিশ্বাস আর বিশ্বাস। সন্দেহ করতে পর্যন্ত জানো না। তোমার চেয়ে ঢেনকানলের গেঁয়ো ইল্‌লিটারেট স্ত্রীলোকও চালাক। নিজের জিনিস সামলে রাখতে পারে।'

গড়গড় করে সেই ওবেরয়ের ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাপের অভিসারের ইতিবৃত্ত বলে গেল। একসঙ্গে দেখার পর থেকেই ছেলে বাপের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। স্বামীর স্থলনের পুরো মানচিত্রটি এখন সতীর সামনে খুলে দিল। যেন সতীই দায়ী, সে কেন তার ছেলেকে একজন ভাল বাবা দিতে পারেনি। মা হিসেবে এখন তার কর্তব্য ছেলের ক্ষোভে দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া। কেন, সে দেখেনি তাদের বাবা আজকাল খালি নিজের জন্য হালফ্যাশানের জামাটামা কিনছে, ছেলেদের বাদ দিয়ে। দেখেনি তাদের টিউশানে এত টাকা খরচ হলে গজগজ করে নিজের জন্য ওল্ড স্পাইস আফটার শেভ, ক্রীম—এসব ঢালাও কিনছে। আর পাঁচটা ওড়িয়া ফ্যামিলিতে সতী দেখুক না বাবারা এরকম বিহেভ্ করে কি না।

বেচারা সতী তো যাকে বলে একেবারে ডিভাস্টেটেভ, কমপ্লিটলি। হ্যাঁ, সত্যি তার কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল বিমলের মেজাজ যেন বিনা কারণেই তিরিক্ষি, সিগারেটের সংখ্যা বেড়ে গেছে, রাতে শুতে আসে অনেক দেরিতে, কী যেন একটা মনের মধ্যে তার আছে।

'আপনিও তো স্ত্রী ম্যাডাম, বুঝতে পারবেন।'

ফিরে আসি বর্তমানে। হ্যাঁ, যে মানুষটার সঙ্গে বছরের পর বছর একত্র শোওয়াবসা হাসাকাঁদা—তার হঠাৎ পরিবর্তন আমাদের স্ত্রীদের নজর এড়াতে পারে না। তবে তার সেফ এক্সপ্লানেশান খুঁজি, বোধহয় অফিসে কাজের চাপ, কলিগদের ক্লিক, মন্ত্রী বা এম. এল. এ কিছু ঝামেলা করছে। আমাদের নিজেদের ভেতর ফাটল কি সহজে চোখে পড়ে? মাথা হেলাই। সতী বলে,

'এরকম সিচুয়েশান কোনদিন ইমাজিন করতে পারিনি। দ্যাট হি ওয়াজ অ্যাকচুয়েলি স্লিপিং উইথ অ্যানাদার ওম্যান···আই জাস্ট কুড নেভার বিলিভ ইট। সত্যি বলছি ম্যাডাম···কোনদিন···'

কথা শেষ হয় না, কান্নায় গলা বুজে এসেছে। এই রে, এ তো বড় বিপদ

হল, এটা স্টাফরুম, এখানে কান্নাকাটি করলে বিশ্রী ব্যাপার হবে। ওকে ডাইভার্ট করার জন্য অন্য প্রশ্নে চলে যাই।

'তা তোমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন? হাউ আর ইয়োর ইনল'জ?'

'বিয়ে ম্যাডাম প্রায় টুয়েন্টি ইয়ার্স হতে চলেছে। মাই ইনল'জ আর অল-রাইট। ফাদার-ইন-ল ছিলেন অর্থডক্স ব্রাহ্মিণ, অন্যান্য ছেলের বৌদের শুধু বংশ আর 'জাত' দেখেই ঘরে এনেছিলেন। আমার স্বামী সবচেয়ে ছোট, তাই একটু আদরের। আমার বিয়ের সময় শ্বশুর কোয়াইট ওল্ড হয়ে গিয়েছিলেন, বড় ভাসুর প্র্যাকটিক্যালি হেড অফ দ্য ফ্যামিলি। ওঁর নাম শুনেছেন বোধহয়? প্রফেসার অনিল পাণ্ডা, বানীবিহারে ফিলজফির হেড ছিলেন, পি. এইচ. ডি., এই তো সবে রিটায়ার করেছেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আই থিংক আই হ্যাভ হার্ড এবাউট হিম্। ওঁর তো ডি. সি. হওয়ার কথা?

'কথা তো কত কী থাকে। ওড়িশাতে এতদিন রইলেন, এখানকার অবস্থা তো জানেন। কারো সঙ্গে কারো বনিবনা নেই, ব্রাহ্মণ-করণ রাইভ্যালরি, আবার সম্বলপুর-কটক মারামারি, এছাড়া কে কংগ্রেস কে জনতা তো আছেই। মেরিটের ওপর কি কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়? ইদানীং আবার সিডিউলড্ কাস্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবকে মাথায় তোলার পলিটিক্স অ্যাডেড্ হয়েছে। সাধে কি আর এ স্টেট এত ব্যাকওয়ার্ড।'

ওড়িয়াদের কাছে আমি কখনো ওড়িশার বিরূপ সমালোচনা করি না। যা নিজেদের তারই খালি খুঁত ধরা সাজে। অন্যের মন্দটা মনে মনেই থাক। তাছাড়া সুধীর পইপই করে বারণ করেছে এসব আলোচনায় যেতে। কাজেই সতীকে তার নিজের পরিবারে ফেরৎ পাঠাই।

'তোমার বিয়ের কথা বলছিলে। তোমার ভাসুর ঠিক করলেন নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলছিলাম, উনিই ছোট ভাইয়ের বিয়ের কথা উঠলে শিক্ষিতা মেয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন। আমার কোয়ালিফিকেশান, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড —এসব দেখেই পছন্দ করেছিলেন। উনিই আমাদের বিয়ে দেন।'

'অর্থাৎ শ্বশুরবাড়িতে তুমি একলাই শিক্ষিতা বধূ। তাতে অসুবিধা হয়নি?'

'সেরকম কিছু হয়নি। কিছু কিছু কান্টমস্ আমার শকিং লেগেছিল।' জানেন আমার জায়েরা সবাই সকালে উঠে শাশুড়ির ময়লা পায়ের ধোয়া জল খেয়ে কাজকর্মে লাগত? ঐ পাদোদক আমার চলেনি। আমি প্রথম থেকেই করিনি, আমাকে কেউ কিছু বলেওনি। পরিবারের প্রচলিত পুজোআর্চনা ব্রতউপবাস সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ওয়ার্কিং ওম্যান হওয়া সত্ত্বেও। আবার লেখাপড়া জানা মেয়ের করণীয় কাজও করেছি। এই তো ম্যাডাম, উনি মারা গেলেন কিডনি ফেইলিওরে। তার আগে ওকে ভেলোর নিয়ে চিকিৎসার

সময় বৌদের মধ্যে আমাকেই বাছা হল সঙ্গে যেতে। অথচ কলেজের চাকরিতে ছুটি পাওয়া কি ঝকমারি তো জানেন।'

'তুমি তাহলে সেই দারুণ সিনথেসিসটি ঘটিয়েছ, ট্র্যাডিশানাল-মডার্ন, কী বল? আদর্শ হিন্দু রমণী। ভারতীয় পুরুষের স্বপ্ন'—একটু হেসে বললাম, হাওয়াটা হাল্কা হোক।

'আদর্শ-টাদর্শ কিছু নই ম্যাডাম। আমায় মা-ঠাকুমাকে যেসব রিচ্যুয়েলস করতে দেখতাম একদিন আমাকেও করতে হবে ধরেই নিয়েছিলাম। চাকরির অর্থ কী, আই মীন হোয়েদার আ ওম্যান'স আর্নিং শুড রিডিফাইন হার ফাংশান ইন দ্য ফ্যামিলি—এসব তেমন তলিয়ে ভাবিনি। মোটমুটি ভাল ছাত্রী ছিলাম পাশ করেই চাকরি পেয়েছিলাম, বিয়ের পর আই জাস্ট কনটিনিউড। তবে যতই ট্র্যাডিশান বাউণ্ড হই না কেন ঠাকুমা দিদিমারা যে অনাচার অপমান হয়তো মুখ বুজে সইতেন তা সহ্য করা সম্ভব নয়। দ্যাটস টু মাচ, আই জাস্ট···

এই রে আবার কান্না এসে গেল। অস্বস্তি লাগে। এখানে আমরা চাকরি করতে এসেছি, এটা বাইরের জগৎ। নারী পুরুষের জোড়-বেজোড়ের নাটক এখানে বেমানান। ঘণ্টা পড়ে গেছে বোধহয়, বাইরে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'এই যে, নিরিবিলিতে দুই ইংলিশ ম্যাডাম, বসে বসে খুব আড্ডা হচ্ছে! ক্লাসটেবলস নেই বুঝি। ঘেমে নেয়ে রেজিস্টার ডাস্টার হাতে হনহন করে ঢোকেন অঙ্কের ডঃ সত্যসুন্দর মহান্তি। কো-এড্ কলেজ। স্টাফেদের বেশিরভাগই পুরুষ। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দিয়ে সতীর নত মুখটা আড়াল করার চেষ্টা করি। হাসিমুখে পাল্টা বলি, 'হ্যাঁ, আছে বই কি। তবে কিনা আপনারা হলেন গিয়ে বিজ্ঞানের আসল লোক, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। আপনারা দয়া করে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিলে তবেই তো তারা ইংরিজির মত আনইম্পর্টেণ্ট সাবজেক্টের টিউটোরিয়েলে আসবে।

'সে কি ম্যাডাম, আপনারাই তো আসল, সবচেয়ে ওপরে। একেবারে ঈশ্বর, ওমনি প্রেজেণ্ট, সর্বত্র আছেন। আর্টস সায়ান্স কমার্স সমস্ত স্ট্রিমে আপনাদের পুজো না দিয়ে ছেলেমেয়েদের উদ্ধার নেই। নতুন এডুকেশান পলিসির ডিটেলস শুনেছেন তো? বি. এস-সিতেও ইংরিজি পড়তে হবে? তাকে বলা হবে ফাউণ্ডেশান। আর আপনি বলেন কি না ইংরিজি আনইম্পর্টেণ্ট। ফাউণ্ডেশান বলে কথা। হাতের জিনিসগুলো রেজিস্টারের টেবিলটায় রেখে কোণের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর দরজা দিয়ে বাথরুমের দিকে যান। হাত ধোয়ার জলও তো সেখানে পাওয়া যায় না।

পেছন থেকে ধাওয়া করি,

'আমরা যদি ফাউণ্ডেশান, আপনারা মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ্স কি সুপার স্ট্রাকচার?'

দুজনেই হেসে উঠি। বেয়ারা দয়ানিধিকে বলি প্লাস টু ফার্স্ট ইয়ার টিউটোরিয়েল গ্রুপ সিক্সটিনের রেজিস্টার আমাকে দিয়ে সতী ম্যাডামের জন্য একটু চা এনে দিতে। 'চা খাও এক কাপ, কেমন? পান খাবে না কি? খাও না, তুমি তো ও ব্লকে দিব্যি শ্রীমান বেণীর সাজা পান খাও দেখেছি? কী পান, 'সাদা' না 'কড়া'? অর্থাৎ জর্দাগুঁড়ি ছাড়া না সহ।

''সাদা', খালি এলাচ, পিপারমিন্ট আর সুপুরি। খয়ের দেবে না।'

'চুন?' দয়ানিধির প্রশ্ন।

ওড়িশাতে পান সাজা ও খাওয়া, জাপানের চা পানের মত একটা রীতিমত জটিল রিচ্যুয়েল। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রেসিপে। এতরকম মশলা যে অসংখ্য পারমিউটেশান-কম্‌বিনেশান সম্ভব। এনিয়ে গল্পগাছাও হয়। আমাদের পল্ সায়ান্সের রীডার ভূপতি নায়েক নামকরা নভেলিস্ট। খুব নাকি পপুলার। ওঁর বই সিনেমা-টিনেমা হয়। ভদ্রলোকের চেহারা অতি মামুলি, স্বভাব নিরীহ, দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ছাঁগোষা গেরস্তের। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের মত ড্রিংক-ফিংক করেন না, ফ্ল্যামবয়েন্ট সাজপোশাকের ধার ধারেন না। একদিন স্টাফরুমে তাকে নিয়ে ঠাট্টা শুনছি। আগের দিন সন্ধ্যায় ভূপতিবাবু কল্পনাছকএ অর্থাৎ 'কল্পনা' নামে সিনেমাহলের কাছে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পান কিনছেন। একটা সিকি পানওয়ালার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—

'গোটিএ সাদা পানঅ, অথয়েরিয়া শুধু গুয়া টিক্কে।

অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তার পান একটা, শুধু চুনসুপরি দিয়ে, খয়ের ছাড়া।

পানওয়ালা পান সেজে মুড়তে যাবে, ভূপতি বললেন,—

'তুমর পিপরমেন্ট অচি কি? টিক্কে দেল। পানওয়ালা পিপারমেন্ট যোগ করল।

ভূপতি, 'চমন বহার নাহি কি হো? অছি তো? টিক্কে দেল। এক চিমটি চমনবাহার পড়ল।

ভূপতিঃ আরে সেইঠি গুজরাতিটা খোলি কিরি রখিছ, দেল টিক্কে। ছোট এলাচ দুদানা দেওয়া হ'ল। এইভাবে 'টিক্কে' করে করে ধনের চাল, মৌরি ইত্যাদি সহ যখন সাত আটটা আইটেম এন্ট্রা যোগ হয়ে গেল, পানওয়ালা তেমনি নির্বিকার মুখে ভূপতির দেওয়া সিকিটা পানের ওপর তুলে ধরল—জিজ্ঞাসা করল,

'আইজ্ঞা, এবে এটা ভি দেই দউচি।'

স্টাফরুম শুদ্ধ আমরা সবাই হেসে উঠি। ভূপতিবাবুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনিও হাসিমুখে আনন্দ মিশ্রের মুখে নিজের কীর্তির কথা শুনে গেলেন। হ্যাঁ, ছেলেছোকরাদের কথায় সবাইকে চা খাওয়াতে রাজি হলেন। নেট লাভ হল ব্যাটা ধরির, অর্থাৎ স্টাফরুম পিয়ন ধরণী যে একটি আনঅফিসিয়েল চা-পান-সিগারেটের দোকান খুলে বসেছে।

ক্লাসে প্রেসি কাকে বলে, প্রেসি লেখার পদ্ধতি কী ইত্যাদি বুঝিয়ে একটা প্যাসেজ ডিকটেট করি। পয়েন্টস আলোচনার পর প্রেসির ফার্স্ট ড্রাফ্‌ট অর্থাৎ রাফ করানো সারতে না সারতে ঘণ্টা পড়ে গেল।

উঃ একটা টিউটোরিয়েল নিতেই ঘেমে নেয়ে গেছি। ব্লাউজটা পিঠে সেঁটে গেছে। চশমার কাচে টপটপ ঘাম পড়ছে। খুলে মুছতে মুছতে সিলিংএর দিকে বৃথা তাকাই। সেই পরিচিত দৃশ্য। চারিদিকে ঝুল। খোলা ইলেকট্রিক তার ও মাঝখানে হলদেটে হয়ে যাওয়া দোমড়ানো মোচড়ানো একটি পাখার ধ্বংসাবশেষ। এমনভাবে ব্লেডগুলো সামনের দিকে মুড়িয়ে এনে একসঙ্গে করা হয়েছে যে একটি জাইগ্যান্টিক সায়ান্স ফিকশনের যোগ্য কুঁড়ি। গত ছাত্র বিক্ষোভের চিহ্ন। এই একটা অদ্ভুত জিনিস ওড়িশাতে, ছেলেরা খেপে গেলেই ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস তার-ফার সব ভেঙেচুরে খারাপ করে রাখে। বলাবাহুল্য বছরের পর বছর পাখাগুলো তেমনই 'ফুলঅ' হয়ে রয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গরমে সেদ্ধ হই। এপ্রিল মে মাসে ফাইনাল পরীক্ষার সিজনে ফি বছর দু-চারজন মেয়ে ক্যানভিডেট ফেন্ট করে। তা করুক। হু বদার্স? এই কলেজে সিট পাওয়ার জন্য সব হেঁদিয়ে মরছে। সামনে আবার পরীক্ষা আসছে। ভাবলে গায়ে জ্বর আসে।

কমনরুমে ফিরে দেখি সতী চুপচাপ বসে। তার সামনে বড় জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল রোদেজ্বলা পামগাছটা। সতী একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণ ওর ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। নিজেরই একটু লজ্জা করল, যেন কাউকে হঠাৎ উলঙ্গ দেখে ফেলছি।

'চল যাওয়া যাক। অনেক দেরি হয়ে গেল, ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন বোরড্…

'না, না, ম্যাডাম। ও তো হ্যাবিট হয়ে গেছে।'

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নিচে নেমে আমি।

'তুমি কীসে যাবে?'

'রিক্সাতে, গাড়ি তো মিঃ পাণ্ডার কাছে। আর ছেলে স্কুটারে গেছে টিউশনে, নইলে ওর সঙ্গে ফিরি।'

'চল, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

'আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

'না-না অসুবিধা কি। তুমি তো ইউনিট নাইনে থাক? আমার রাস্তাতেই পড়বে।'

দুজনে গাড়িতে উঠি। গাড়ি খানিকটা চলতে শুরু করলে সতী আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই আরম্ভ করে,

'আই অ্যাম সো অ্যাশেইমড্ অফ ইট…সো অ্যাশেমড্। জানেন কাউকে বলি নি। শুধু আমি আর আমার ছেলে জানে। আপনি কিন্তু আর কোনদিন বিনোদিনীকে লিফ্‌ট দেবেন না, প্লিজ ম্যাডাম আমার রিকোয়েস্ট।

'পাগল হয়েছ। ওকে আর লিফট দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে দেখ একটা জিনিস কিন্তু আমার একটু অড্ লাগছে। আচ্ছা, কটকেই এদের দেখাসাক্ষাৎ কেন? মানে কিছু মনে কর না, জিনিসটার লজিক বুঝবার চেষ্টা করছি।'

'দ্যাটস ভেরি সিম্পল। ভুবনেশ্বর ইজ প্রিটি লোনলি, চট করে জানাজানি হয়ে যাবে। কটক কমপ্যারেটিভলি সেফ। ডেন্স্লি পপুলেটেড, পাঁচমিশেলি বাসিন্দা। ভুবনেশ্বরের মত শুধু সরকারি চাকুরে আর হাতে গোনা কোম্পানির লোক তো বাস করে না ওখানে। আসল কথা যেসব শেডি হোটেলে এসব ফিশি অ্যাফেয়ার চলতে পারে তার সংখ্যা তো কটকেই বেশি।

'দ্যাটস ট্রু। ইউ হ্যাড অ্যা পয়েন্ট। কিন্তু দেখ, কবে আমার গাড়ি থাকবে তার তো কোন ঠিক নেই। বিনোদিনী হঠাৎ করে কটকে গিয়ে কী করে দেখা-টেখা করে? তোমার স্বামীরও অফিস আছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কী করে?'

'আই থিংক কটকে একটা পার্টিকুলার হোটেলে ওরা একটা পার্মানেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখেছে। হোটেলওয়ালাদের কী আসে যায় বলুন? তাদের তো টাকা রোজগার নিয়ে কথা। তাছাড়া এখন তো হোটেলের ছড়াছড়ি। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাবার পর সরকারি লোনে ব্যাঙের ছাতার মত সব হোটেল গজিয়ে উঠেছে। সবসময় কি ট্যুরিস্ট আসে? আর কটকের কী এমন ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান বলুন? জেন্থইন কাস্টমার পায় কটা? এই সবেই মুনাফা আর কি।'

সেক্স আর টাকা হরপার্বতীর জোড়। একেবারে চিরন্তন, নো ডিভোর্স, নেভার। একদিক দিয়ে ইন্টারেস্টিং। এর ওপরে গুরুগম্ভীর আলোচনা হতে পারে, ইউ জি সি নাহলেও ন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল দ্বারা স্পনসরড্…'দি রোল অফ অ্যাডাল্ট্রি ইন দ্য ডেভেল্পমেন্ট অফ্ হোটেল ইনডাস্ট্রি' বা 'দি ইমপ্যাক্ট অফ হোটেল বুম অন মডার্ন ম্যারেজ' এটসেটেরা এটসেটেরা। হয়তো প্রস্তাব উঠবে হোটেল ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এক্সট্রাম্যারিটেল অ্যাফেয়ার্স সরকারের এনকারেজ করা উচিত। সরকারি চাকুরেদের ম্যরাল টারপিচিউডের গ্লানি নেহাৎই কলোনিয়েল রেসিডিউ প্রবলেম হবে কোন ডিপার্টমেন্ট প্রপোজ্যাল দেবে ট্যুরিজম্ না ইনড্যাস্ট্রি? আমলার মেয়ে, আমলার স্ত্রী, তাই বোধহয় আমলাতান্ত্রিক ধাঁচেই রিঅ্যাক্ট করি। সতীকে জিজ্ঞেস করি,

'তুমি বলছ বিনোদিনী কটকে পৌছে তাদের নির্দিষ্ট হোটেল থেকে তোমার হাজব্যাণ্ডকে কন্ট্যাক্ট করে?'

'অফ কোর্স। তাতে অসুবিধা কী?' মিঃ পাণ্ডা তো এখন কটকে পোস্টেড। ভুবনেশ্বর থেকে ডেলি যাতায়াত করছেন। সেই অজুহাতেই তো গাড়িখানা কব্জা করে রেখেছে। যত বলি নিজের গাড়িতে তেল পুড়িয়ে কেউ কটক ভুবনেশ্বর

যাতায়াত করে না, হয় অন্য আর জনের সঙ্গে পুল কর নয়তো কোন ভাবে ম্যানেজ কর। বলে কি না, সরকারি গাড়ি রোজ পাওয়া সম্ভব নয়, এত পেট্রোল খরচ দেখাব কী করে। অন্যদের সঙ্গে যাওয়াও হয়ে উঠে না। তারা বেশিরভাগ নাকি বোর্ড অফ রেভিনিউ অফিসে যায়, ওঁর অফিস সেই ক্যান্টনমেন্ট রোডে ইত্যাদি হাজার বাহানা। আমি ভাবছি স্বামী আমার কত অনেস্ট অ্যাণ্ড কনসেনশিয়াস। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে স্ত্রীপুত্রের অন্নসংস্থান করে ফিরলেন, এখন আমি স্ত্রী তাঁর সেবা করব। এদিকে তিনি টায়ার্ড ইমপ্রম্টু অভিসারে। যত্তসব জোচ্চর, ভণ্ড, চীট—

তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিই।

'থাক, থাক। ওসব যত ভাববে তত বিটারনেস বাড়বে।'

না ভাবলেই যেন বিটারনেস কমে যাবে। সতীর স্বামীর মত জোচ্চর ভণ্ড চীট তো ঘরে ঘরে। আমার স্বামীটি কোন ধর্ম্মপুত্তর যুধিষ্টির! অনেকবার প্রশ্ন জেগেছে হিন্দু বিয়েতে পুরুষের একনিষ্ঠতার অঙ্গীকার থাকে কিনা। কে জানে কী থাকে। স্যান্সক্রিট তো জন্মে পড়িনি। দিনক্ষণ দেখে শুভলগ্নে অগ্নিসাক্ষী করে শ্রীযুক্ত অমুকের পুত্র শ্রীমান তমুকের সঙ্গে শ্রীযুক্ত অমুকের কন্যা কল্যাণীয়া তমুকের বিবাহ যথাবিহিত শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হয়েছিল বটে কিন্তু তার ভিত্তি কী তাই ছাতামাথা জানি না। বয়স্ক গুরুজনদের কথায়বার্তায় কখনোসখনো স্যান্সক্রিট কোটেশান-টোটেশান, প্রভার্ব শুনেছি। দ্যাটস অল।

গাড়ির জানালা দিয়ে দেখি বাঁ দিকে সামনে বাগানওয়ালা ছোট ছোট সরকারি বাড়ি, সব রেসিডেন্স। ডানদিকে ঝকঝকে চকচকে মডার্ন দোকানের সারি। ঐ তো ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস, এটা অন্তত আমি জানি, অ্যা ওয়েলনোওন এনশিয়েন্ট কনসেন্ট—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। বিশাল অক্ষরে লেখা দোকানের নাম। দি ক্যাথিড্রেল সিটি অফ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড ইয়ারওল্ড ভুবনেশ্বরের লেটেস্ট শপিং প্যারাডাইস। যেমন দারুণ শাড়িজামাকাপড়ের কালেকশান তেমনি গলা কাটা দাম। সত্যি একটু ট্র্যাডিশান একটু ন্যাশনালিজমের গরম মশলা ছিটোলে তবে না ব্যবসায়ে রমরমা। সতীকে বলি,

'গত পাঁচ ছ'বছরে ভুবনেশ্বরে কী রকম ডেভেলপ করে গেছে দেখেছ? ক্যান উই বিলিভ আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম—সেই সিক্সটিজের কথা বলছি—তখন কটকে 'জয়নারায়ণ' ছাড়া গোটা ওড়িশায় আর কোন স্ট্যাণ্ডার্ড দোকান ছিল না। আর ভুবনেশ্বর তো ছিল জাস্ট অ্যা টাইনি ভিলেজ। সেভেন্টি ফোরেণ্ড পর্দার কাপড় কিনতে কটক যেতে হ'ত। তার পর তো আমরা দিল্লি চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি দিস গ্রেট ট্রান্সফরমেশান।'

'যা বলেছেন ম্যাডাম, দ্য সিটি হ্যাজ রিয়েলি পিকড আপ। এখানে জমির দাম কি হয়েছে জানেন? এই ক'বছর আগেও শহীদনগরে কেউ যেতে চাইত না,

আমাদের ইউনিট নাইন ছিল সহরের বাসযোগ্য এলাকার লাস্ট আউট পোস্ট। আর এখন শহীদনগর সবচেয়ে কনজেস্টেড এরিয়া। বাড়ি হয়ে যাচ্ছে সেই নন্দনকানন পর্যন্ত। জানেন চন্দ্রশেখরপুরে গভর্নমেণ্ট দোতলা বাড়ি করে বিক্রি করছে?

রমাদেবী উইমেনস কলেজ সামনে। ওড়িশ্বার এটি একটি সো পিস। এত বড় অর্থাৎ এরিয়ায়—মেয়েদের কলেজ এ স্টেটে আর নেই। বিশাল লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম, একজামিনেশান্ হল, স্টাফরুম ইত্যাদি। কনস্ট্রাকশানও আধুনিক। কলকাতার ব্র্যাবোর্ন কলেজও চেহারার দিক থেকে এত ইমপ্রেসিভ নয়। ড্রাইভারকে সতী বাঁদিকে টার্ন নিতে বলল। ইউনিট নাইন এসে গেছে। বাঃ বেশ ভাল কোয়ার্টার পেয়েছে তো। দোতলা পুরো বাড়ি, সামনে বাগান—কমবেশি খোলা জায়গা এখানে সব বাড়ির সামনেই থাকে। সরকারি বাড়ির প্রচুর রকমফের, মাসিক মাইনে, গ্রেড ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে কোন শ্রেণীর বাড়ি কে পাবে। সতী আমার মনের প্রশ্নটা বুঝল।

'এত ভাল বাড়ি অবশ্য তখন আমাদের পাওনা ছিল না। সেই বসন্তমঞ্জরীর কেসটা মনে আছে তো? রমাদেবীতে কেমিস্ট্রি পড়ায়? ওর স্বামী ইঞ্জিনীয়ার—অতি চালু, একেবারে পুরো পলিটিশিয়ান। স্বামী-স্ত্রীর মাইনে একসঙ্গে দেখিয়ে ওরা প্রথমে এই টাইপের বাড়ি পায়। তারপর তাদের দেখাদেখি আমরা। এই রো-এ একদম লাস্টে থাকে বিনোদিনীরা।'

'সেও কি একইভাবে বাড়ি পেয়েছে?'

মাথা নাড়ে সতী, হ্যাঁ।

মেটিরিয়েল সুবিধা নেবার বেলায় কোন প্রভেদ নেই সতীলক্ষ্মী ব্রাহ্মণী আর স্বৈরিণী খণ্ডায়েতে। নাঃ, টাকাই আমাদের মধ্যে সাম্য এনেছে। মুখে বলি,

'দোষ কি। আফটার অল স্বামীস্ত্রী দুজনেই তো সরকারের সেবা করছ।' যেমন আমরা করছি। কিন্তু আমাদের বেলা আলাদা স্ট্যাণ্ডার্ড। ধরে নেওয়া হয় আই. এ. এসরা একম্ অদ্বিতীয়ম। তাদের স্ত্রীদের চাকরির অধিকারই নেই। স্বামীদের গৌরবে তাঁরা গরবিণী। নিজস্ব কোয়ালিফিকেশান আবার কী। যদিই বা চাকরি করে, যথাসম্ভব কম সুবিধা পাবে। এই তো গতবছর যখন সুবীর কনসোলিডেশান কমিশনার হিসেবে কটকে পোস্টেড ছিল আর আমি ছিলাম র‍্যাভেনশ'তে তখন স্টেট গভর্নমেণ্টে কি যেন একটা পেরিভিশান হ'ল—আমি আবার এ সবের খবরও রাখি না, ওড়িয়া খবরের কাগজ পড়ি না তো, টি ভিতে ওড়িয়া প্রোগ্রামও দেখি না। যাই হোক অ্যাকাউণ্টেণ্টের কাছে শুনলাম নতুন রুলে নাকি যারা সরকারি বাড়ি পায় নি ও নিজেদের বাড়ি নেই তারা সবাই হাউসরেণ্ট অ্যালাওয়েন্স পাবে। আমিও তাদের মধ্যে। যেই না ক্লেইম করলাম

আমার সহকর্মীদের কী আক্রোশ, সরকারের কাছে ক্ল্যারিফিকেশান চাওয়া হ'ল এবং অফিসের একটি করিয়েকম্মে অ্যাকাউণ্টস ক্লার্ককে বাসভাড়া দিয়ে ভুবনেশ্বর পাঠিয়ে অর্ডার করিয়ে আনা হ'ল যারা স্বামীস্ত্রী সরকারি চাকুরে তাদের মধ্যে একজনকে বাড়ি দেওয়া হলে অন্যজন বাড়ি বা এ্যালাওয়েন্স কিছুই পাবে না। মজা এই যে আমার সহকর্মীদের মধ্যে যাদের স্ত্রী সরকারি চাকুরে তারা না কি অনেকে লিখে দিল তারা আলাদা থাকে, স্বামী স্ত্রী লিগ্যালি সেপারেটেড। যাতে টাকা কটা পায়। এটা অবশ্য আমার শোনা কথা। সত্যিমিথ্যে জানি না। তবে টাকাপয়সার ব্যাপারে যে এখানকার লোকে অত্যন্ত ডাউন টু আর্থ তা বহুবার দেখেছি। স্টাফক্লাবের মাসিক চাঁদা ৫্, তাতে অনেকে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ৩্ করার দাবি।

'এক কাপ চা কফি খেয়ে যান না ম্যাডাম, সেই তো একঘণ্টার রাস্তা যেতে হবে।'

'না-না আজ থাক ভাই, অন্যদিন হবে। আজ চলি।'

কথা বলতে বলতে বারান্দা দিয়ে খাটো পর্দার ফাঁকে চোখে পড়ে বসবার ঘরের সাজসজ্জা। রেডিমেড স্টিলফ্রেমের আর্টিফিসিয়েল লেদারের সোফাসেট, দেয়ালের ডিসটেম্পার দরজা-জানালার পর্দার রঙের কোন সামঞ্জস্য নেই। সামনেই বারান্দায় প্রায় রাস্তার মাঝখানে রাখা কয়েকটি গামছাজাতীয় কাপড় বিড়ে বাঁধা, একটা কুলোয় আরও কি সব, পুজোটুজো বা ব্রতর সরঞ্জাম হবে। এদের তো প্রতিদিনই কিছু না কিছু অবজার্ভ করার থাকে।

হঠাৎ সতীর জগৎটা দূরে সরে যায়। আমি নিতান্তই বহিরাগত, অচেনা। আমার কাছে এ জগৎ অর্থহীন।

'নমস্কার ম্যাডাম, মেনি থ্যাংকস।'

'না-না এত থ্যাংক্স দেবার কী আছে, ডোণ্ট বি সো ফরম্যান সতী। উই আর আফটার অল কলিগস।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলি।

কদিন বাদে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকে গেছি, অফিসে একটু কাজ ছিল। ডুপ্লিকেট সার্ভিস বইটা আপটুডেট এটি করার জন্য কনসার্নড অ্যাসিস্টাণ্ট বেহেরাকে তাড়া দিয়ে দিয়ে হয়রান। ব্যাটাকে সিটএ পাওয়াই ঝকমারি, স্টিলের শেলফ্ টেবিল তৈরির কারখানা খুলেছে, তাতেই ব্যস্ত। এছাড়া ফি বছরের মত এবারেও সেই চিত্রগুপ্তের খাতা, অর্থাৎ বায়োডাটা, পোস্টিং হিস্ট্রি ইত্যাদির রেকর্ড পাঠাতে হবে। এক ফর্ম প্রতি বছর ফিল্ ইন করে যাচ্ছি। আশ্চর্য। বড়বাবুকে ফর্ম দিয়ে বেহেরাকে চতুর্থবার তাড়া দিয়ে প্রচুর নমস্কার বিনয় ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখে লাইব্রেরিতে ঢুকি। ওপরে কমার্স ব্লকে ক্লাস, টেক্সট্ বইটা ফেলে এসেছি, একটা কপি দরকার।

স্টাফেদের জন্য যে নামেমাত্র রিডিংরুম আছে সেদিকে যাই। বইখানা হরিকে খুঁজতে বলেছি। লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ নাম্বার কিছুই কাজ করে না। কলেজ হওয়া থেকে হরি আছে, ওই জানে কোন বই কোথায়।

সেই অবধারিত নীচু চেয়ার। বসে কোন লেখালেখির কাজ করা যায় না। টিম টিম করে শেড ছাড়া বাল্ব জলছে, সব একশ' পাওয়ার কিন্তু এত উঁচু সিলিং ও লো ভোল্টেজ যে মনে হবে চল্লিশ। পাখাও একটা কোনক্রমে ঘুরছে। দেখি সতী একটা চেয়ারে, 'হিন্দু'র পাতা ওল্টাচ্ছে।

'এই যে সতী কী খবর?'

'নমস্কার, ম্যাডাম বসুন। ক্লাস আছে বুঝি?'

'ক্লাস তো সেই দুটো কুড়িতে। দেড় ঘণ্টা আগে আসতে হ'ল। ডুপ্লিকেট সার্ভিস বুকে এন্ট্রি করাতে।'

'বেহারার কাছে তো? ওকে দিয়ে ম্যাডাম কোন কাজ যদি হয়। আমাকে তো ছ'মাস ঘুরিয়েছে। আর এই বেটা নিত্যানন্দ কি কিছু কম ভাবছেন? বড়বাবু না আর কিছু। সব সময় গম্ভীর মুখে কী যেন ফাইল নিয়ে আছে। অথচ অ্যাকচুয়েলি কিচ্ছু করে না। আসল কাজ তো সব অন্য। সপ্তাহে ক'টা ফিনাইল কেনা হয় জানেন? এদিকে বাথরুমগুলোর তো এই অবস্থা।

'আমার মনে হয় মেয়ে কলেজগুলো অনেক ভাল। বাথরুমে অন্তত জলের বন্দোবস্ত থাকে, একটু ঝাঁটা বোলানো হয়। তাই না?'

'অফকোর্স। দিজ মেন আর ন্যাচারালি ডার্টি।'

'তারপর, হাড'জ লাইফ?'

'চলছে। আপনি আর লিফ্‌ট দিচ্ছেন না তো কোন বিশেষ মানুষকে?'

'ও বাবা, না। কাউকেই দিচ্ছি না। ও ঝামেলার মধ্যে আমি আর নেই। আচ্ছা সতী একটা প্রশ্ন আমার মনে হয়েছে! তুমি আদৌ জানলে কী করে যে বিনোদিনী মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কটকে যায়।

'কী করে আবার। দ্যাট হোর অফ অ্যা ওম্যান নিজের স্বামীর কাছে আপনার নামে শেল্‌টার নেয়। বলে কিনা আপনার সঙ্গে কটক যায় মেয়েকে দেখতে। কী টান মেয়ের ওপর। একবার দেরি দেখে মিঃ সেনাপতি মেয়েকে টেলিফোন করায় বেরিয়ে পড়ল সত্যি কথাটি, মাতৃদেবী কন্যাকে পাঁচমিনিটের জন্য দেখা দিয়ে ছু মারে, বলে কটকে নাকি তার অমুক মউসী তমুক পিউসীর সঙ্গে দেখা করার আছে, 'কিতাবমহলে' বই কেনার আছে, অর্থাৎ কাজের বাহানা। মিঃ সেনাপতি আমাকে টেলিফোন করে বললেন আপনাকে জিজ্ঞেস করে জানতে।'

এবারে আমি একেবারে চমৎকৃত।

'বিনোদিনীর স্বামীর সঙ্গে তোমার এ ব্যাপারে কথা হয় নাকি?'

'নিশ্চয়ই। যখন ভদ্রলোক আবার ভুবনেশ্বরে পোস্টেড হলেন, মানে লাস্ট ইয়ার জুলাইয়ে, তখনই তাকে টেলিফোন করে বলেছি, হ্যাঁ ম্যাডাম স্ট্রেইট বলেছি, বৌকে সামলাও। হি শুড গিভ হার অ্যা গুড থ্র্যাশিং। তা ওর দ্বারা কিছু হবেটবে না। ওই তো যত নষ্টের মূল। এক নম্বরের মাইচা। মাইচা মানে জানেন তো?'

'হিজড়ে?'

'ঠিক। এটা তো বিনোদিনীর প্রথম লীলাখেলা নয়। সে তো বহু বছর ধরে এ খেলা চালিয়ে এসেছে। উইথ ডিফেরেন্ট মেন।'

'তাই নাকি? তা অন্যান্য ভাগ্যবান কারা?'

'কে নয়? ওড়িয়া, মিডলক্লাস, সবরকম অকুপেশানের রিপ্রেজেন্টেটিভ, খালি নিজের মেল্ কলিগদের বাদ। কী রকম সেয়ানী দেখুন। মেয়ে কলিগের স্বামী চলবে। মাঝারি ব্যুরোক্র্যাট, ইঞ্জিনীয়র, পাবলিক সেক্টর বা ন্যাশনালাইড ব্যাংকের অফিসার, এমন কি ছোটখাট বিজনেসমেনও আছে। লম্বা লিস্ট ম্যাডাম, খুব লম্বা লিস্ট। শি ইজ জাস্ট অ্যা হোর।'

বার বার কথাটা কানে লাগছে। না বলে পারি না,

'অনেকটা গুজবও তো হতে পারে। আমাদের দেশে মেয়েরা কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বললেই লোকে অ্যাফেয়ার মনে করে।'

'মোটেই না, এখন আর সে দিন নেই। এই তো আপনি কাজ করছেন পুরুষদের সঙ্গে, কেউ কোন টু শব্দটি করেছে?'

'হু, তা বটে।'

আমার চেহারাটা বিনোদিনীর মত চটকদার নয় সেটা ভাবতে ইচ্ছে করল না। 'তবে হোরের তো একটা দেনাপাওনার ব্যাপার আছে, তাই না? শি মে হ্যাড লুজ মর‍্যালস বাট আই ডোন্ট থিংক শি টেক্‌স মানি।'

'দেনাপাওনার অনেক ডাইমেনশানস আছে। এই যে এত দামি দামি সিল্কের শাড়ি, ভুরভুরে সেন্ট, সেদিন একটা পিওর লেদারের ব্যাগ ঝুলিয়ে এসেছে দেখেছেন? এসব নিজের হার্ডআর্ন'ড মানি থেকে করছে বলে ভাবেন? তাছাড়া ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ফায়দা ওঠাচ্ছে। রমাদেবী কলেজের ওড়িয়া লেকচারার বিজয়া পানিগ্রাহীকে মনে আছে? আপনি তো ছিলেন কিছুদিন ওখানে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন তার আবার কী হ'ল?

'কী আর হবে। আমার মতই পোড়া কপাল আর কি। ওর স্বামীর সঙ্গে বিনোদিনীর এর আগে অ্যাফেয়ার ছিল। ওর মেয়ে যে মেডিকেল কলেজে সিট পেল সেটা কি মনে করেন টেস্ট দিয়ে, মেরিটে? মোটেই নয়। বিজয়ার স্বামী অতি ভুখোড় লোক, কোয়েশ্চেনটোয়েশ্চেন যোগাড়, খাতা দেখার ম্যানিপুলেশান—সব করেছে।'

কথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সব প্রফেশানাল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য পুরো ওড়িশা জুড়ে প্রচণ্ড কমপিটিশান, এখানে দুনম্বরি কারবার কি সম্ভব। জানাজানি হয় না? এটা সতীর বাড়াবাড়ি।

আবছা মনে পড়ল বিজয়ার কথা। বিনোদিনীর সঙ্গে কথা বলত না। একবার এক্সট্রা কারিকিউলার ডিউটি ডিস্ট্রিবিউশানে দুজনেরই পড়েছে ড্রামার চার্জ। অ্যানুয়েল ডে-তে ড্রামা হয় তার সব ব্যবস্থা করতে হবে। পরস্পরকে এড়ানোর জন্য সে কি কসরৎ, সকলেরই চোখে পড়ত। শেষে বিজয়া প্রিন্সিপ্যালকে বলে কি এক অজুহাতে কলেজ ম্যাগাজিনের চার্জে চলে গেল। সবাই নিজেদের মধ্যে কানাকানিও করত, তবে আমাকে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি।

তখন বিনোদিনীকে আমার বেশ আনইউজুয়েল ওড়িয়া ওম্যান বলে মনে হত। শাড়ির আঁচল পিছনে ঝুলিয়ে আমাদের মত পরত, অন্যদের মত গায়ে জড়িয়ে একটা পুঁটলি করে ফেলত না। নিজে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ি চালিয়ে কলেজে আসত। আমার দ্বারা তো স্টিয়ারিং ছোঁয়াই হয় না, তাছাড়া সুবীর খুব রাগ করে। তার সখের গাড়িতে এক্সপেরিমেণ্ট মোটেই পছন্দ নয়। তাই বিনোদিনীর গাড়ি চালানোটা আমি খুব অ্যাডমায়ার করতাম। ইন ফ্যাক্ট এখনো করি। আই থিংক আই হ্যাভ সিন বিজয়া'স হাজব্যাণ্ড অলসো। অ্যানুয়েল ফাংশানের পর অপেক্ষা করছিলেন মোটর বাইকে বিজয়াকে নিয়ে ফিরবেন। হ্যাঁ—ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ ভাল, সাজপোশাকও মডার্ন। বিজয়া আর সতীর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে, সাদামাঠা চেহারা, বেশভূষায় অমনোযোগী, শান্ত ধীর, কাজকর্ম নিয়ে থাকে। অর্থাৎ জাতে অধ্যাপিকা। স্বামীরা সুপুরুষ, হাবভাবে চৌখস, সাজে ফিটফাট। সিনেমা-টিভিতে যে ক্যারেক্টারকে এক্জিকিউটিভ টাইপ বলে দেখানো হয়। যতই জাতকুল মেনে এদের বিয়ে হয়ে থাক না কেন আসলে এ বিয়ে অসবর্ণ, বাস্তব অর্থে অসবর্ণ।

সতীর ক্লাসের সময় হয়ে আসে। ওকে আবার খানিকটা হাঁটতে হবে, জেনারেল ক্লাস নিউ সায়ান্স ব্লকে গ্যালারি ওয়ানে। ঘণ্টা পড়ার একটু আগেই চলে যায়। ওর সমস্যাটা কিন্তু রয়ে যায় আমার মনে।

কটকে ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডে আমাদের কোয়ার্টার। নামে বাংলো হলেও ছিরি-ছাদ কিছুই নেই, প্লেন সিমেণ্টের মেঝে। একেবারে রাফ দেওয়াল জুড়ে বেরিয়ে থাকা ইলেকট্রিক্যাল ওয়েরিং, রান্নাঘর গ্যাসপূর্ব যুগের, বাথরুমে একটা করে বেসিন আছে আর দুটি বাথরুমে ডব্লিউ সি। সবচেয়ে দোষ ডিজাইনে, আর্মি ব্যারাকের মত একটানা পর পর ঘর। একদিকে জানালা, হাওয়া খেলবার উপায় নেই—বৃটিশ আমলে ছাদ খড়ে ছাওয়া ছিল, বাড়িটাকে ঠাণ্ডা রাখত। ইদানীং দু একটা বাড়ির চালে আগুন লাগার ফলে আতঙ্কে সব খড় ফেলে অ্যাসবেসটাসে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। ফল্স সিলিং, প্রচণ্ড গরম। তবে বাড়ির সামনে পেছনে বিশাল

জায়গা, বাগান করা যায়। স্বল্পকাল বাস সত্ত্বেও বিভিন্ন বাসিন্দারা সাকসেসিভলি বাগান করার চেষ্টা করেছেন। বাউণ্ডারিতে বড় বড় গাছ—দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া। পেছনে কিছু ফলের গাছ আছে—আম, পেয়ারা, কাঁঠাল। তবে পাকা খাওয়া যায় না, কোয়ালিটি ভাল নয়। রান্নায় চলে। এক ঝাড় কলাগাছও আছে। ফুলের মধ্যে দু তিন রকমের জবা, রঙ্গন, টগর, কাঞ্চন। অবশ্য এগুলো বেশির ভাগ আমারই লাগানো। সিজনফ্লাওয়ারও করি। জিনি সূর্যমুখী শেষ হ'ল, এধারে পিটুনিয়া, তারপর জিনিয়া। মোটামুটি হিসেব একটা আছে। রজনীগন্ধা লাগিয়েছি কিন্তু কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। বাড়ির সামনে একটা গোল জায়গা লন তার চারিদিকে গাড়ির ড্রাইভওয়ে। প্রায় বাড়িতেই থাকে। গরমের সময় সন্ধ্যায় সেখানেই বেতের গার্ডেন চেয়ার পেতে বসা হয়। জায়গাটি সত্যি মনোরম। এত আরাম লাগে যে প্রায় ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। খাওয়ার পালাও প্রায়ই ওইখানে সারা হয়।

সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি অর্ডারলি পিয়ন রাজুকে যা যা করতে বলে গিয়েছিলাম একটাও ঠিক মত করে নি। বক্সিবাজার থেকে মাছ এনেছে, বলাবাহুল্য ভাল পায় নি। হাজারবার বলেছি বিনোদ বিহারীতে যেতে। না, সে অতটা সাইকেল করতে পারবে না। ওটাই একমাত্র বাজার যেখানে মাছটা ঠিকমত পাওয়ার সম্ভাবনা। কাছেই স্থায়ী বাঙালিদের বাস ছিল বলে হয়তো। মাছ এখানে একটা সমস্যা। ওড়িয়ারা মাছফাছ খায় বটে কিন্তু ওদের মাছ খাওয়ার কালচার নেই। অধিকাংশ দিনই কোন না কোন কারণে নিরামিষ—সোম বৃহস্পতি শনি সব সংক্রান্তি। গোটা কার্তিক মাস, এছাড়া বিভিন্ন 'ওমা' পুজোপার্বন। মাছ সম্বন্ধে ধারণাও নেই। একটা সাত আটশ গ্রামের পোনাকে বলে বড় মাছঅ। ভ্যারাইটি দেখা যায় না। বর্ষায় ইলিশ, তাও মহানদীর হলেই একমাত্র মুখে দেওয়া যায়। আর পাওয়া যায় 'পোহলা' বাটা জাতীয় খুব কাঁটাওয়ালা মাছ। গলদা চিংড়ি প্রায়ই আসে, এতটুকু গা এত বড় মাথা এবং সেই মাথা ভর্তি লাল ঘিলুর বদলে মাটি। আশ্চর্য। 'লুনি' অর্থাৎ সমুদ্রের মাছ প্রচুর চাঁদা, ভাঙ্গর আরও কতকি এর নাম জানি না। তবে আমরা তো এসব মাছ বড় একটা খাই না তাই হয়তো বাজারের এত সমস্যা। মাছটা রেঁধে, তরকারিটা বসিয়ে রাজুকে নামাতে বলে বাইরে আসি। ইস, গা ধুয়ে আবার ঘামলাম। কাফতানটা বদলাই। সুবীর স্নান সেরে ধোপদুরস্ত পাজামা ছোট হাতা পাঞ্জাবি পরে লনে বসে। রাজুর কীর্তি রিপোর্ট করি। শুধুতো বাজারের এই অবস্থা নয়, ডাস্টিং করে নি, রান্নার জায়গা যেমনকে তেমন রয়ে গেছে। আমিও বাড়ি থেকে বেরোই তারও ছুটি হয়।

'আসলে এরা তো নিজেদের দায়িত্বে কাজ করতে পারে না। তাছাড়া বাড়ির কাজ মানেই মেয়েদের থাকার কথা। তুমি নেই কাজেই সেও ঢিলে দিচ্ছে।'

'মেয়েদের করার কথা মানে কি। বাজার দোকান তো চিরকাল পুরুষমানুষরাই

করে এসেছে।' বলেই মনে হয় সুবীরের গায়ে লাগতে পারে কথাটা। সে তো কোনদিনই সংসারের কেনাকাটায় থাকে না। অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই, কী দরকার ঝামেলায়।

'জানো আমাদের স্টাফমেম্বারদের স্বামীটামি নিয়ে একটা জমাটি ড্রামা চলছে।'

'কী রকম?'

সতীর কাহিনী সামারাইজ করে শোনাই। সুবীর যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

'দেখ, এক পক্ষের কথা শুনে স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার বোঝা যায় না। সতীর স্বামীরও নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে। তার হয়তো একটা অভাববোধ ছিল। নইলে একজন মাঝবয়সী স্টেবল লোক বড় বড় ছেলেমেয়ের বাপ হঠাৎ এরকম উদ্দাম প্রেমে ভেসে যাবে—এটা হতে পারে না।'

'কী লেজিটিমেট রিজন থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'ওয়েল, তুমি তো বলছ তোমার কলিগের চেহারাটি তেমন সুবিধের নয়। সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে।'

কথাটা বেশ গায়ে লাগে। আমার নিজের চেহারাটি সতীর মত অত নিরেস না হলেও সুন্দরী মোটেই নই। পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনের সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। মার কাছে শুনেছি বড়ির ঘরে মেয়েদের নাকি তেমন রূপ হয় না। কে জানে সুচিত্রা সেন কি বড়ি নয়? তবে বড়ি বলেই হয়তো লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল ছিলাম। বাবা বড় চাকুরে, আমার চেহারা চাল চলনে নিশ্চয় তার ছাপ আছে। রূপের কথায় খোঁচা লাগে। একটু রেগেই বলি, 'চেহারাটা তো দেখেই বিয়ে করেছে, না দেখে তো আর করেনি। আর বিয়ের পর বিশ বছর তো ঐ চেহারা নিয়েই দিব্যি সংসার করে এসেছে, তিন তিনটে ছেলেমেয়ে। এখন হঠাৎ চেহারা ভাল নয় রিয়েলাইজ করল?'

'সংসার করলেই কি লোকে সুখী প্রমাণিত হয়? বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে দেওয়া বিয়ে। বাপ-দাদার পছন্দের ওপর কথাবলার সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই হয়তো ছিল না। আমরা সব সময় ভুলে যাই আমাদের সমাজে পরিবারের চাপ পুরুষের ওপরেও কিছু কম নয়। হয়তো ভেতরে ভেতরে অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল। কে বলতে পারে?'

কাঁটাটা আরও ভেতরে বেঁধে। সুবীরের ওপরেও কি তার বাবা-মা আমাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন? তারও কি মনের কোথাও অসন্তোষের বীজ লুকিয়ে ছিল যা পরে ওর দিল্লিতে পোস্টেড থাকার সময় বিশাল বটবৃক্ষ হয়ে ঘরের ছাদ ফাটিয়ে দিতে গিয়েছিল? পাঞ্জাবি সেই এয়ার হোস্টেসটির সঙ্গে—থাক, সেসব কথা আর মনে করব না। কতবার না প্রতিজ্ঞা করেছি ভুলে যাব, ভুলে যাব, ভুলে যাব।

রূপের প্রতি এতই যদি মোহ তাহলে কি বৌদি বা বোন জাতীয় কাউকে দিয়ে মায়ের মারফৎ কথাটা পিতৃদেবের কানে তোলা যেত না? আমাদের সমাজেও তো মতামত জানাবার একটা চ্যানেল ছিল। সুন্দরী চাওয়াটা তো খুবই ট্র্যাডিশনাল ব্যাপার।'

'শুধু সুন্দরী হলেই তো আজকাল চলে না। শিক্ষাদীক্ষা পরিবার—বিয়ের সময় সবই দেখতে হয়। এদের সমাজের বিশ-পঁচিশ বছর আগে একাধারে সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা ও সদ্বংশজাতা পাত্রী একজন স্টেট সার্ভিসের অফিসারের পাওয়া বোধহয় শক্ত ছিল। শুধু এখানে কেন অন্য কোথায়ই বা এরকম আইডিয়েল কমবিনেশান সুলভ?'

জ্বালাটা আর চাপতে পারি না।

'তোমাদের মানে হিন্দু পুরুষদের আইডিয়েল স্ত্রীর কনসেপ্ট ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে না কি? আগে চাহিদা ছিল সুশ্রী গৃহকর্মনিপুনা, তার পরে তার সঙ্গে যোগ হ'ল শিক্ষিতা, এখন আবার এতেও যথেষ্ট হচ্ছে না, চাকুরিরতা এবং প্রতিষ্ঠিত পিতা হলে ভাল। স্ত্রীর কোয়ালিফিকেশনের লিস্ট তো সমানেই লম্বা হচ্ছে। তার বদলে তোমরা বেশি কী দিচ্ছ শুনি?'

'আমাদের আর কী বা দেওয়ার আছে বল? আমরা পুরুষমানুষ তো শিব-ঠাকুরের চেলা, সন্ন্যাসী ভিখিরির জাত। তোমরাই অন্নপূর্ণা, আমাদের লালন পালন করছ অসীম কৃপায়।'

'বাঃ, এরকম একতরফা কৃপাবিতরণ আর কতকাল চলবে?

হাল্কা হয়ে যাই।

দিল্লিপর্বে সুবীরের কার্যকলাপে আমার যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তারপর থেকে আমার মেজাজ একটু চড়লেই সুবীর সামলে যায়। হাউ ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার। একেই বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্যাক্ট।

এরপর সতীর সঙ্গে দেখা হ'ল আর্টস ব্লকের স্টাফ কমনরুমে। একঘর লোক, আর্টসের সব সাবজেক্ট এখানে। কাজেই তেমন কোন কথা হয় না, দূর থেকে নমস্কার বিনিময়। তবে দূর থেকেও চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আরও যেন পাকিয়ে গেছে, গলার কণ্ঠাটা এতই উঁচু যে হারটা যেন ঢেউ খেলে পড়ে রয়েছে। শিরা ওঠা হাতে ঢল ঢল করছে কটকি জালি কাজের বালা—ফাঁকে ফাঁকে ময়লা, সঙ্গে মোটা মোটা ক'গাছা কাঁচের চুড়ি। শাড়িটা রঙজ্বলা, যত্নহীন তেলঘসা চুল টেনেটুনে একটা সরু বিনুনী বাঁধা—সব মিলিয়ে একটা বর্ণহীন নিরস অস্তিত্ব। মায়া হয়, আবার রাগও জাগে। এ যেন সবার কাছে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাদাসিধে থাকা, দেখ আমি কি শুদ্ধাচারিণী। এও বাড়াবাড়ি। আমিও তো চাকরিতে ওরই মত সময় দিই অর্থাৎ নিয়মিত ক্লাস নিই, নতুন টপিক পড়াতে হলে আগে

থেকে রীতিমত প্রিপেরেশান করি। টিউটোরিয়েল ক্লাসে এভ্রি অল্টারনেট ডে রিটনওয়ার্ক করাই—অধিকাংশ সহকর্মীদের মত অ্যানুয়েল স্টেটমেণ্ট অফ ওয়ার্কে ক্লাসের হিসেব দেওয়ার সময় গুল্ মারি না। হ্যাঁ রিসার্চ। কনফারেন্স সেমিনার অ্যাটেনডেন্স, পাবলিকেশান—এ সব কলমে আমার খালি থাকে। সময় কোথায়। চাকরি অর্থাৎ ক্লাস নেওয়া কর্তব্যটি সেরে সংসার ও চেহারা নিয়েই থাকি। বিশেষ করে সুবীরের সেই দিল্লি এপিসোডের পর। ফেমিনা'র সব বিউটি টিপ্স মন দিয়ে পড়ি, যথাসাধ্য ফলো করি। আমার একমাত্র হবি—মানানসই শাড়ি ব্লাউজ কেনা ও পরা। হ্যাঁ বাগানও করি। ঘরদোর তো সাজাতেই হয়, এখানে আই. এ. এসরা মোটামুটি ভাল স্টাইলে থাকে। ন্যাচারালি আমাকে তো কনফর্ম করতেই হয়। আমার বা বাড়ির সাজ সুবীরের চোখে পড়ে না সচরাচর যদিও অন্য কারো স্ত্রীর ফ্যাশান বা চেহারা, কার বাড়ি ওয়েলডান সর্বদাই খেয়াল করে এবং আমার কাছে প্রশংসাও করে। যেন কোথায় একটা না বলা খোঁচা থাকে। দেখ, অন্য স্ত্রীদের মহিমা। তাই আমি চুল কাটা, সেট্ করা থেকে সুরু করে আপাদমস্তক শরীরের যত্ন নিই। থ্যাংক গড্ এখন একটি পাঞ্জাবি মেয়ে কটকে বিউটি সেলুন খুলেছে, আগে তো সেই একটা চীনে মেয়েকে ধরে কোনক্রমে চুল টুল করাতে হ'ত। ইটারন্যাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য প্রাইস অফ ম্যারেজ। বিয়ে মানেই যাবজ্জীবন পাহারাদারি।

সপ্তাহ ঘুরে আবার সায়ান্সের স্টাফরুমে সতীর সঙ্গে দেখা। এই স্টাফরুমটা প্রায়ই খালি থাকে কারণ সায়ান্সের তো সব ডিপার্টমেণ্টাল রুম রয়েছে, যে যার রুমেই থাকে। শুধু চক-রেজিস্টার নিতে দিতে কমনরুমে আসে। এই দিনটা আমার একটা লম্বা অফ, বসে বসে সময় কাটে না। যেহেতু আমাকে কটকে ফেরার জন্য সুবীরের গাড়ির অপেক্ষা করতেই হবে কাজেই টাইমটেবিলের এই ইনকনভিনিয়েণ্ট ক্লাসটা নিয়ে অন্যদের ফ্রি করে দিতে আপত্তি করি নি। বিশেষ করে সহকর্মীদের অনেকেরই স্কুল থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব আছে। ভুবনেশ্বরে বাপের স্কুটার মোটরবাইক অনেক পরিবারে একমাত্র বাহন।

ক্লাস সেরে এসে দেখি সতী বসে। এই ক'সপ্তাহ অনেক ভেবেছি। ও নিজের সমাজের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনকে এড়িয়ে আমার কাছেই বা তার দুঃখের কাহিনী বলতে এল কেন। আমি ওর সমাজের প্রান্তে থাকি তাই বোধহয় আমার কাছে স্বস্তি বোধ করে। ভাবে আমি পক্ষপাতশূন্য, নিরাপদ, পাঁচজনকে বলে বেড়াব না। ওর কষ্ট, ওর লজ্জা আমার কাছে সুরক্ষিত। ব্যাংকের লকারে রাখা গয়নার মত।

'কী খবর সতী? কেমন আছ? ভারি শুকিয়ে যাচ্ছ।'

'কী করি বলুন তো? আই জাস্ট কাণ্ট টেক ইট এনি মোর। সহ্য হচ্ছে না।'

'হ্যাভ পেশেন্স। এত অস্থির হলে কী চলে? আফটার অল পৃথিবীতে এ সমস্যা তো নতুন নয় তোমার একলারও নয়।

'তা কি আমি জানি না মনে করেছেন? কিন্তু কষ্টটা তো শুধু আমার। আমার জীবনে তো এই প্রথম। ম্যাডাম, আপনি নিজেও তো একজন স্ত্রী, আচ্ছা আপনিই বলুন আমি কী করে ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুই? আমি যে বিনোদিনীর গায়ের গন্ধ পাই। স্ট্রেঞ্জ, হি ডাজ নট সিম টু মাইণ্ড।

মনে মনে ভাবি সে তো করবেই না। এদের কিছু এসে যায় না, অল ক্যাটস আর গ্রে ইন দা ডার্ক। বাংলায় একটা টপিক্যাল ভারশান শুনেছিলাম, খেঁদি পেঁচি নুরজাহান, লোড শেডিংএ সব সমান।

পুরুষের কাছে কি সর্বদাই লোড শেডিং?

হোয়াট অ্যা পীস অফ ওয়ার্ক ইজ ম্যান!

তার কামনা বাসনার কাছে কোন বন্ধন, কোন সম্পর্কই টেকে না, সেই প্রভারবিয়েল বানের জলে খড়কুটো।

'বাইরে যার তার সঙ্গে শুয়ে এসে বাড়ি ফিরে দিব্যি অগ্নিসাক্ষীকরা বৌয়ের সঙ্গে শোয়।' কী তিক্ততা সতীর গলায়।

সো মাচ ফর ইয়োর অগ্নিসাক্ষী। আগুনের কি একটা সিম্বল টিম্বল আছে না? তার থেকে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতও হয়েছে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূণ্য কর, এ জীবন…'

সতী আবার কথা বলে, নিজের মনেই প্রায় বলে যাচ্ছে,

'নিজেকে আমার এত নোংরা, এত অশুচি লাগে যেন আমিও একটা বেশ্যা হয়ে গেছি। আর আমাকে যে নামিয়ে এনেছে, প্রতি রাত ডিবেস করছে সেই পুরুষটাকেই সেবা করতে হবে। রেঁধে বেড়ে থালাটি সাজিয়ে মুখের সামনে ধর যাতে সে আমার মুখে গু মাখিয়ে—'

বাধা দিই। আর বাড়তে দেওয়া যায় না, ল্যাংগুয়েজ ইজ স্যানিটি। 'ছি সতী, ডোণ্ট বি হিস্টেরিকাল। এ কী করছ। তুমি না এডুকেটেড, ফিনানশিয়ালি ইনডিপেনডেণ্ট? তোমাকে কেউ ধরে বেঁধে রাখে নি, আফটার অল ইউ আর ফ্রি টু টেক দ্য হেল্প অফ ল।

'হুঁ। ফিনানশিয়াল ইনডিপেনডেন্স। আইন। ওগুলো তো সব অ্যাবস্ট্রাকশান আইডিয়া। বাস্তবে কী ফ্রিডম, কীসের স্বাধীনতা? হ্যাঁ রাস্তায় দাঁড়াবার স্বাধীনতা আছে। আপনি বোধহয় জানেন না মিড্লক্লাস ওড়িয়া সোসাইটিতে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসা স্ত্রীর কী পজিশান। মিথ্যে সেপারেশান দেখিয়ে হাউস রেণ্ট অ্যালাওয়েন্স নিলে নো ওয়ান রিয়েলি মাইণ্ডস, কিন্তু সত্যিকারের সেপারেশানে কপালে হাউস জুটবে না। আপনি কি ভাবেন ভুবনেশ্বরে আমি বাড়ি ভাড়া পাব? আর আইনের কথা বলছেন, কিসের আইন? অ্যাডাল্ট্রি প্রুভ করতে পারব? তাও ধরুন যদি বাই চান্স করাও যায়, ছেলেমেয়েদের কাস্টডি? আইন দেবে আমাকে ছেলেমেয়েদের সংগে বাসের অধিকার? স্বামী তো গেছেই এখন

এরাও যদি না থাকে তাহলে বাঁচব কাকে নিয়ে, আপনিই বলুন।' আবার উত্তেজিত হয়ে গেছে সতী। ভারি মুস্কিল হ'ল, কেউ যদি এসে পড়ে! আড় চোখে দেখি পিয়ন দয়ানিধি কী করছে। এদের তো চোখকান অত্যন্ত সজাগ—কাজের বেলা নয় কিন্তু সেক্স আর টাকা নিয়ে কোন কেচ্ছার গন্ধ পেলেই হ'ল, তখন সমস্ত অ্যান্টেনা চাগিয়ে ওঠে। নাঃ, ব্যাটা সত্যি ঘুমোচ্ছে, যা গরম পড়েছে। গরীব শ্রেণীর লোকেদের এও একটা অসামান্য গুণ একটু সময় বসলেই অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়ে। অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারের বোঝা টেবিলে সাজিয়ে একেবারে বোম ভোলানাথ হয়ে বসে আছে।

'মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা কর। ট্রাই টু বি কুল। এত যদি অসহ্য মনে হয় তাহলে নিশ্চয় কোন একটা উপায় বের করতে হবে। ম্যারেজ ইজ আ নেসেসারি ইন্‌স্টিটিউশান, নো ডাউট। কিন্তু তার জন্য কতটা মূল্য দেওয়া পোষায় সেটাও তো দেখতে হবে। সেল্‌ফ রেসপেক্ট বিসর্জন দিয়ে, একটা নার্ভাস ব্রেক্ হয়ে বিবাহিত থাকার কোন মানে নেই। এটা আমি বিশ্বাস করি। একটা সীমারেখা আছে তার ওপারে যাওয়া যায় না।

সতী ঢোক গিলে মাথা হেলায়। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখমুখ মোছে। দুজনে চুপচাপ বসে থাকি। আজ আমার লাকি ডে নয়। সেই একসঙ্গে ফেরা, মানে পাক্কা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা।

কোন কথা না বলে সতী একটা নমস্কার করে উঠে চলে যায়।

ভারি বিষন্ন লাগে।

কটকে ফেরার পথে যথারীতি সুবীরের সেক্রেটারিয়েট বৃত্তান্ত শুনি। এটি আরেকটি রণাঙ্গন। কাজ করলেই বিপদ, না করলেও ছাড় নেই। একেবারে ক্যাচ ট্যুয়েন্টি সিচুয়েশান। আমি অবশ্য কোনদিন কিছু মন্তব্য করি না, উপদেশ দেওয়ার কথা মনেও হয় না। আমার বাবাও বড় সরকারি চাকুরে ছিলেন অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টসে, মা সে আমলের শিক্ষিতা মহিলা, কিন্তু অফিসটা বাইরের জগৎ, মার এরিয়া নয়—এটাই বরাবর দেখে এসেছি। ট্রান্সফার বা প্রমোশনের মত বড় কিছু ছাড়া মাকে বাবা কখনো অফিসের কথা বলতেন না। আমাদের পড়াশুনা দৈনন্দিন সংসারের সমস্যা এ সবেই তাঁর মন থাকত। হয়তো সেইজন্যে আমি সুবীরের এই অভ্যাসের মাথামুণ্ডু পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় সুবীরের বোধহয় আমার কাছ থেকে উপদেশ বা পরামর্শ কোন কিছুরই প্রত্যাশা নেই। চাকরির কথা বলে কারণ আর কিছু আমার সঙ্গে বলার নেই। বিলেতে সম্পর্ক-না থাকা লোকেদের মধ্যে যেমন ওয়েদারের কথা হয়। ইট ডাজ নট মীন এনিথিং। কোন মানে নেই।

কোন কিছুরই কি মানে আছে! বিয়ে, চাকরি, সংসার, সম্পর্ক—খালি করার জন্যে করা, তার ভেতরে আর কিছু নেই।

বাড়ি ফিরে চা খেয়ে রান্না ঘরে হাজিরা দিই। আজ পরে স্নান করব। কালকে ঝোল করে রেখেছিলাম, আজ মাছ ভেজে দিয়ে দিলে হবে, ভাতও আছে। শুধু তরকারি রান্না। গিয়ে দেখি ইলেকট্রিক সারাদিন ছিল না—কোথায় লাইন রিপেয়ার হচ্ছিল—ফ্রিজে রাখা সব খাবারে জল। বলাবাহুল্য শ্রীমান রাজু ভাল করে ঢাকা ঢুকি দেওয়া বা মোছামুছি কিছুই করে নি। বকাবকি সেরে কাজে লাগলাম, সবই রান্না করতে হবে, ফ্রিজটাও মোছা বাকি। স্নান সেরে বাইরে আসি, দেখি সুবীর ইতিমধ্যে স্নান সেরে ধোপ দুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে বসে। ব্যাটা রাজু আমার শাড়ি ব্লাউজ ইস্তিরি করাতে নিয়ে যেতে রোজ ভুলে যায় কিন্তু সাহেবের জামাকাপড়ের বেলায় একটু নড়চড় নেই। সুবীরকে সংসারের আজকের বুলেটিন শোনাই। আমি যেগুলোতে উত্তেজিত হয়ে যাই ওর কিন্তু তাতে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। দায়সারা গোছের মন্তব্য করে, যেন সংসারটা ওর নয়, শুধু আমার। ও বাইরের লোক বা বড়জোর এক প্রান্তে আছে, শুধু যখন যা দরকার হাতের কাছে পাবার কথা। অ্যা সর্ট অফ পেয়িং গেস্ট। অথচ আমার বাবা সংসারের প্রতিটি ডিটেল জানতেন, খবর রাখতেন। সবেতেই তাঁর আগ্রহ ছিল।

'বাবার চিঠি এসেছে।' চেয়ারে বসতেই সুবীর খবর দেয়।

'কী লিখেছেন?'

'যেমন লেখেন। দাদা বৌদি টুম্পা রাজা সবার খবর, কৃষ্ণা মলয় মিলি আর তুলি কে কী করছে কেন করছে কী করা উচিত ইত্যাদি।'

আমার শ্বশুরমশাই অনেকটাই আমার বাবার মত। দুই ছেলে ছেলের বৌ মেয়ে জামাই নাতি নাতনী সবাই তাঁর, সবার জীবনে তিনি ছড়িয়ে থাকেন।

'ওঁর প্রেশারটা নেমেছে? মায়ের হাঁপানিটা বাড়ে নি তো? আর পায়ের ব্যথাটা?'

'কই সেসব কথা বিশেষ লেখেন নি। আমরা ভুবনেশ্বরে বাড়ি কবে পাব জিজ্ঞাসা করেছেন। তোমার যাতায়াতে কষ্ট হচ্ছে। এদিকে আমি হতভাগাও তো সেই একই রাস্তা যাচ্ছি আসছি। আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই।'

আমার শ্বশুর শাশুড়ি অত্যন্ত ভাল, ওঁরা জানেন ছেলে নিজেদের, তার সঙ্গে ভদ্রতার সম্পর্ক নয়, ছেলের বৌ হাজার হলেও পরের বাড়ির মেয়ে। তার সঙ্গে ভদ্রতার প্রয়োজন আছে। এদিক দিয়ে আমি সত্যি খুব লাকি।

'আসলে আমার তো বাইরে যাওয়াটাই একটা বাড়তি পরিশ্রম। তাই বোধ হয় এত খেয়াল করেন।'

'আই থিংক আই'ল হ্যাভ অব ড্রিংক।

উঠে গিয়ে ড্রিংকের সরঞ্জাম নিয়ে আমি। রাজুকে বলি বরফ যদি বসে থাকে তো বের করে আইস বাকেটে দিতে।

'সঙ্গে কিছু খাবে না কি? এনি স্ন্যাক্স?'

'না-না। এই তো এক্ষুনি ডিনার খাব।'

এতক্ষণে একটু হাওয়া দিচ্ছে। চৈত্রমাস পড়তে না পড়তে এত গরম।

আকাশে একটা মাঝারি গোছের চাঁদ, পুরো গোল নয়। তাতেই বেশ জ্যোৎস্না।

'বাই দি ওয়ে, তোমার সেই কলিগ দুজনের খবর কি? সেই যে দারুণ ট্রায়াংগেল।'

আজকের টাটকা খবর বলি। সতীর কাছে স্বামী শয্যা অসহ্য।

'যাই বল, তোমার এই সতীসাধ্বীটি কিন্তু নিওরটিক। খুব ওভার রিঅ্যাক্ট করছে। এমন একেবারে কি হয়েছে? পৃথিবীর সর্বত্র চিরকাল পুরুষ একাধিক নারীর সঙ্গে শুয়েছে, শুচ্ছে এবং শোবে। তাই বলে কখনো তো শোনা যায় না স্ত্রীর এরকম রিঅ্যাকশান হচ্ছে। নিজের স্বামীর সঙ্গে শুয়ে অশুচি লাগে! দিস ইজ টু মাচ।

সুবীরের গলায় বেশ উত্তেজনা। যেন তার গায়ে আঁচ লেগেছে।

'হয়তো বা কারো কারো লাগে। স্ত্রীদের মনের কথা কেই বা জেনেছে।'

আস্তে করে বলি। হুল ফোটাতে আমিও জানি। ছেড়ে দেব না।

'কেন, এই যে তোমাদের এত কাব্য নাটক নভেল, সবই তো প্রেমবিরহ মিলন নিয়ে। কোথাও তো দেখা যায় না এরকম স্ত্রী। সাহিত্য ইজ সাপোজড টু বি আ রিফ্লেকশান অফ লাইফ। এ তো আমাদের মত বেরসিক বিজ্ঞানের ছাত্ররাও জানে।'

'লেখকেরা তো বেশির ভাগই পুরুষ। মেইল মীথগুলো প্রজেক্ট করে এসেছেন। নইলে যদি লজিক্যালি দেখ সতী সাবিত্রী স্ত্রী আর সাতঘাটের জল খাওয়া বেশ্যার মধ্যে সত্যি কোন পার্থক্য আছে কি? কারোরই ঘেন্না থাকা চলে না। দু'জনেরই সিদ্ধিলাভ আত্মবিসর্জনে। তফাৎ শুধু খদ্দেরের সংখ্যায় আর সময়ে। সতীলক্ষ্মীর একটি স্থায়ী খদ্দের, বেশ্যার অনেক ও টেম্পোরারি।

'ইজন'ট দ্যাট রাদার সিনিক্যাল?' সতর্ক প্রশ্ন করে সুবীর।

'মে বি। তবে রিয়েলিটিকে ডিসটর্ট করে মহৎ সাহিত্য হয় না। দ্যাটস দ্য রিজন আমি ইণ্ডিয়ান লিটরেচারে ইন্টারেস্টেড নই। ইণ্ডিয়ান মেন প্রজেক্ট ওনলি মীথস অ্যাণ্ড স্টিরিও টাইপস্। এ সাহিত্য বেশি দূর যায় না।'

'হ্যাভ আ ড্রিংক। অন্যের ব্যাপারে এত ইনভল্‌ভড হচ্ছ কেন।'

সুবীরের সেন্স অফ বাউণ্ডারি সত্যি সুপার্ব। চিরকালই ফেন্সের ওপর বসে কাটিয়ে গেল। আমলা তো, সাবধানতা জীবনের একমাত্র প্রিন্সিপ্‌ল।

ভুবনেশ্বরে কি কি বাড়ি খালি হয়েছে এবং আমাদের পাওয়ার সম্ভাবনা কত এই সব নিরাপদ আলোচনায় চলে যাই। খাওয়া শেষে আমি আগে উঠি।

শোওয়ার আগে মুখ পরিষ্কার একটা বিশাল পর্ব। তারপর আছে চুলের পরিচর্যা। বয়স হচ্ছে তো।

কলেজে স্টাফরুমে ঢুকতেই দেখি একঝাঁক পুরুষের মধ্যে জমিয়ে বসে বিনোদিনী খুব হাত মুখ নেড়ে কী বলে যাচ্ছে। পরনে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি, চওড়া হলদে মেরুন হায়দ্রাবাদী পাড়। এই প্রচণ্ড গরমে কটকটে দিনের আলোয় যেন গা কী রকম করে ওঠে। চোখ ঝলসে যায়। কী ক্রুড। আমাকে দেখে সোৎসাহে বলে উঠল,

'এই যে ম্যাডাম, নমস্কার, নমস্কার। আজকাল তো আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই নেই। স্ল্যাক সিজন তো। বাঃ কী সুন্দর বেংগল হ্যাণ্ডলুমের শাড়ি পরেছেন। কী সফট্ কালার। এটাকে কী শাড়ি বলে? টাঙ্গাইল? আপনার চয়েস খুব ভাল, আমরা সবাই বলাবলি করি। একদিন আমার সঙ্গে একটু যাবেন শপিংএ?' 'তন্তুজে'র যে ব্রাঞ্চটা খুলেছে এখানে, কী যেন সেল্ দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এখন চৈত্র মাস তো। বাঙালি সব দোকানে এখন সেল্ হয়। ইয়ার ক্লোজিং হবে, তারপর পয়লা বৈশাখে নতুন হালখাতা।

'তাই নাকি? বাঃ বেশ ভাল কাস্টম তো। পুরনো স্টক সব বিদেয়, প্র্যাক-টিক্যালি স্টক ক্লিয়ারেন্স। নতুন বছরে নতুন স্টক দিয়ে সুরু। অর্থাৎ ফি বছর নতুন ডিজাইন, নতুন প্রোডাকশান। কলকাতার সব দোকানেই কি এই নিয়ম?'

'মোস্ট অফ দ্য বেংগলি শপ্‌স এই নিয়মেই চলে। অবশ্য নিয়ম ঠিক নয়, বলতে পারেন কাস্টম।'

বাঁপাশে কোণের দরজা দিয়ে সতী ঢোকে স্টাফরুমে। রেজিস্টার টেবিলে রেখে আমাদের দিকে একঝলক তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। একদম উল্টো দিকে দূরে এককোণে গিয়ে বসে। বিনোদিনীর সঙ্গে কথা বাড়াবার ইচ্ছে হ'ল না। যদিও এমনিতে ওকে আমার ভালই লাগে। বুদ্ধিমতী, খরখরে, খুব চালু, কোন রকম ন্যাকামি বা সংকোচের ধারধারে না। কাজেকর্মে কমপিটেন্ট।

'ভাল কথা, সেটা এই এঁদের মানে স্যারেদের বলছিলাম।' ছেলেদের দিকে হাতটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বলে,

'কুড়িটা টাকা দিন তো, সাবস্‌ক্রিপশান। সামার ভেকেশানের আগে ক্লোজিং ডে-তে ফিস্ট হবে। কী মেনু হবে তাই ডিসকাস করছিলাম।'

ফিলজফির হেড ডঃ সুধাংশু মিশ্র বয়স্ক লোক, তিনি সাজেস্ট করলেন,

'এই গরমে দুপুরবেলা আর মাংসটাংস কোর না, মাছই হোক।

'না, না,' সমস্বরে প্রতিবাদ ইয়াংদের, হিস্ট্রির কৃষ্ণপ্রসাদ দাস, ওড়িয়ার যজ্ঞেশ্বর মহান্তি, আমাদের সুরেন্দ্র ত্রিপাঠী।

'মাংস না হলে ফিস্ট কিসের। চিকেন করুন ম্যাডাম চিকেন।'

'চিকেনে প্রবলেম আছে জানেন তো? সবাই খাবে লেগ আর উইং, বাকি পিস কেউ চায় না।'

'স্পেশাল চিকেন অর্ডার দিন।'

'যার শুধু লেগ আর ইউং আছে?' বিনোদিনীর প্রশ্ন ও সকলের হাসি।

'ফিজিওলজির বরেন স্যারকে বলুন না, ওর ভাইয়ের নাকি পোল্ট্রি ফার্ম আছে।'

'ঠিক আছে বলে দেখব। তাহলে চিকেন ফাইনাল? ম্যাডাম আপনি কী সাজেস্ট করেন?'

তাড়াতাড়ি আলোচনা থেকে সরে পড়বার জন্য টাকাটা বের করতে করতে বলি,

'আপনারা সবাই মিলে একটা কিছু ঠিক করুন না, আমার কাছে সবই সমান।'

'আচ্ছা, ভেজ্ মেনু কী হবে? কবে কলেজ ক্লোজ করছে তো কেউ জানে না, অ্যাজ ইউজুয়েল লাস্ট মোমেন্টে গভর্নমেন্ট অর্ডার আসবে। যদি সোম গুরু বা শনিবার পড়ে বেশিরভাগ ভেজিটারিয়েন হবে।'

টাকাটা বিনোদিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে রেজিস্টার নিতে এগোই। বিনোদিনী আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ছানার ডালনা না স্পেশাল গাংগুরামের মিষ্টি, ভেজিটেবল পোলাও না ফ্রয়েড রাইস, বিলিতি স্যালাড না ওড়িয়া 'পাচরি' না কি 'আম্বগটা' অর্থাৎ আমের চাটনি।

স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখি সতী মাথা নীচু করে বসে। ভাবলেশহীন স্থির মুখ। একেবারে পাথর। চোখে দৃষ্টি নেই, সামনে শূন্য।

ভারি মায়া হয়।

বি. এ. ফার্স্ট ইয়ার জেনারেল ক্লাস। ইবসেনের ডল্স হাউস বা শেক্সপীয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট। আমরা উৎসাহে ডল্স হাউস বেছেছি। ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু কোন উৎসাহ নেই। গতবারে পরীক্ষার খাতায় যা সব লিখেছিল, নোরা ইজ অফ টিপিক্যাল ওয়েস্টার্ন ওম্যান। র‍্যাবিশ। কোন আণ্ডার স্ট্যান্ডিং নেই। সামনে বছর আবার শেক্সপীয়ারে ফিরে যাব। আসলে আমাদের দেশে ম্যান ওম্যান রিলেশানশিপ এখনো ইমম্যাচুয়র, রোমান্স মানে কোর্টশিপ, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, একজন ভিলেন, শেষমেষ সব ঠিকঠাক, বিবাহ। অ্যাণ্ড দে লিভ্ড হ্যাপিলি এভার আফটার। মীথ নিয়ে থাকতে ভালবাসে। তাই হিন্দি নাচগানের ছবি এত পপুলার।

কয়েকটি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে বাদে বাকি বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের মুখ নিষ্প্রাণ। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর নেই। টেক্সট বইও সামনে নেই। সন্দেহ

হয় আদৌ আছে কি না। নির্ঘাৎ কোন গাইড বেরিয়ে গেছে। দেশি লোকেদের উপার্জন চাই তো। ডল্স হাউস টাইটেলের মানে কি, নোরার বিবাহিত জীবনের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ইত্যাদি বোঝাবার প্রাণপণ এবং হয়তো বৃথা চেষ্টা করে লেকচার শেষ করলাম। অবশ্য লাস্ট সেন্টেন্স শেষ হতে না হতেই ঘণ্টা পড়ে গেছে এবং পেছনে বসা ছেলেমেয়েদের দল কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। নোরার নিয়তিতে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বই রেজিস্টার নিয়ে বেরিয়ে আসি। স্টাফরুমের সামনে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে নমস্কার করে ঘিরে ফেলে।

'কী ব্যাপার?'

'ম্যাডাম একটা রিকোয়েস্ট আছে। আমরা আপনার কাছে টিউটোরিয়েল ক্লাস করব।'

বিরক্ত হই। মামাবাড়ির আবদার। ইচ্ছেমত টিউটোরিয়েল করবে, তাও আবার এই ফ্যাগ এণ্ড অফ দ্য সেশানে। মুখে বলি,

'সে কী করে হবে। তোমাদের কার কী কমবিনেশান সে সব দেখেশুনে ফ্রি পিরিয়ড বেছে টিউটোরিয়েল গ্রুপিং করা হয়েছে। খেয়ালখুশি মত তো বদলানো যায় না।'

'উই নো, ম্যাডাম। আমরা কোন কিছু বদলাতে বলছি না। আপনার ফ্রাইডে সিক্সথ পিরিয়ডে গ্রুপ টেন-এর ক্লাস; আমরা গ্রুপ নাইন, আমাদেরও একই সময়ে টিউটোরিয়েল। আমরা খালি আপনার ক্লাসে গিয়ে বসব, রুম নম্বর টুয়েল্ভ-এর বদলে টুয়েল্ভ-বি। দ্যাটস অল।'

'তোমাদের অ্যাটেনডেন্সের কী হবে? অ্যাণ্ড ইউ নো দ্য সাইজ অফ দোজ রুমস। একটা রুম-এ দুটো ক্লাস আঁটবে?'

'উই'ল ম্যানেজ, ম্যাডাম। অ্যাটেন্ডেন্স চাই না। বাইরে করিডরে একটা এক্সট্রা বেঞ্চিতো পড়েই থাকে, ওটাকে রুমে নিয়ে যাব। ওতেই আমাদের এই ক'জনের হয়ে যাবে।'

এত গরজ টিউটোরিয়েল করার। দিস ইজ নট রিয়েলি নরম্যাল ফর দি আর্টস স্টুডেন্টস। একটু অবাক হই।

'ব্যাপারটা কী বলতো? টিউটোরিয়েলটা কার? ক্লাসে এতদিন কী হয়েছে?'

'আজ্ঞে সতী ম্যাডামের। আর ক্লাসে যে কী হয়, মানে···এর ওর মুখ চায়। আরও অবাক হই।

'সতী ইজ ভেরি রেগুলার। সব ক্লাস নেয়। তবে? হোয়াটস ইয়োর ডিফিকাল্টি?'

মেয়েরা চুপ। কেমন কেমন লাগে। তবু ভাবি ব্যাপারটা খোলসা হওয়া

দরকার। একজনের গ্রুপ অন্য আর একজনের ক্লাসে গিয়ে বসবে উইদাউট এনি রাইম আর রিজন সেটা তো ঠিক নয়। সতী আমাকে মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করতে পারে।

'ইউ মাস্ট টেল মি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেনড। ইয়েস, কাম অন। ডোণ্ট বি অ্যাফ্রেড। আই প্রমিজ কাউকে বলব না।'

ওরা মাথা নীচু করে থাকে। হঠাৎ একজন বলে ওঠে,

'সতী ম্যাডাম আমাদের খুব বকাবকি করেন।'

'বকাবকি করার মত তোমরা নিশ্চয়ই কিছু কর। টাস্ক ভুলে যাও।'

'না, না, ম্যাডাম লেখাপড়া নিয়ে বলেন না। সে কেসে তো আমরা কিছু মাইণ্ডই করতাম না। উনি আমাদের সাজপোশাক চুলকাটা এইসব নিয়ে খুব বাজে বাজে কথা বলেন। আর বলতে সুরু করলে এমন চটে যান যে কোন সেন্সই থাকে না। এই তো সেদিন পিংকিকে বলেছেন ও এত ফ্যাশান করে, ডিম্পল কাপাডিয়াকে কপি করে চুল কাটে। এসব ছেলেদের ট্র্যাপ করবার জন্য। ম্যাডাম আপনিই বলুন এরকম কথা বললে ছেলেরা মজা পাবে না? তারপর থেকে পিংকিকে দেখলেই ওরা কতরকম কমেণ্ট করছে। ও বেচারা ক্লাসে বসতে পারছে না।'

এ আবার কী যন্ত্রনা। কী যে করছে সতী। এখন সামাল তো দিতে হবে। ডায়েরি খুলে টাইমটেবিল দেখার ভান করে বলি,

'তোমরা এক কাজ কর। টুমরো অ্যাট ওয়ান টুয়েন্টি আমার সঙ্গে দেখা কর। এর মধ্যে আমি দেখি কীভাবে অ্যাডজাস্ট করা যায়। নাও পিংকি, লুক—তুমি ওসব কে কী বলছে ইগনোর কর, বুঝেছ? ক্লাসে রেগুলার যাবে, কিচ্ছু হবে না। কো-এড ইন্সটিটিউশানে ওরকম একটু আধটু টিজিং হয়েই থাকে। তোমরা বড় হচ্ছ এসবে ভয় পেলে চলবে কী করে। আচ্ছা, এখন এস তাহলে।'

নাঃ সতী বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। এত বড় কলেজ, হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রী, এরকম আলতুফালতু কথাবার্তা বললে ঝামেলায় পড়বে। কবে কোন গার্জিয়ান এসে প্রিন্সিপ্যালের কানে তুলবে তখন একটা কেলেংকারি হবে। ভুবনেশ্বরের নাম্বার ওয়ান কলেজ মানে প্র্যাকটিক্যালি ওড়িশায় এক নম্বর, র‍্যাডেনশ' তো এখন গুণ্ডার আড্ডা। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের বাবারা সব হোমরাচোমরা, হয় সিভিলিয়ান ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার, নয় পলিটিশিয়ান, নিদেন পক্ষে কনট্র্যাক্টর বিজনেসম্যান। হেঁজিপেঁজি এখানে কেউ নেই। এদের সঙ্গে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। ইনফ্যাক্ট দোষ ধরা তো দূরের কথা দোষের কিছু দেখলেও ইউজুয়েলি না দেখার ভান করা হয়। এই তো লাস্ট উইকে কবে যেন টুয়েন্টিতে রুম নম্বর টুয়েলভ বিতে একটা টিউটোরিয়েল ছিল। একটু দেরী হয়েছে যেতে, দেখি থারটিনের সামনে দিয়ে হনহন করে ফিরছেন

ইকনমিক্সের ডঃ সর্বেশ্বর পট্টনায়েক। নিজের দেরী হওয়াতে অপ্রস্তুত, তাই বলি,

'কী ডঃ পট্টনায়েক, কেউ ক্লাসে নেই? যা ইররেগুলার হয়েছে ছেলেমেয়েগুলো·· ডঃ পট্টনায়েক আমার সামনে এসে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে আস্তে আস্তে বললেন,

'ঐ রুম-এ কী হচ্ছে জানেন? একটি ছেলে দুটি মেয়ের মাঝখানে বসে আছে দু'জনের কাঁধে হাত রেখে।'

'সে কি। আপনাকে দেখে উঠল না?'

'উঠবে কি, আমিই উঁকি মেরে চলে এলাম।'

'কেন? কিছু বললেন না?'

'কী বলব? ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার।'

'বলেন কি। মেয়েরাও স্মোক করছে?'

'কে জানে। গন্ধটা মিষ্টিমিষ্টি। অর্ডিনারি সিগারেট নয়, গাঁজা।'

'বাট দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস। উই হ্যাভ গট টু ডু সামথিং।'

'উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ম্যাডাম। ছেলেটির বাবা অমুক বুঝলেন। আর একটি মেয়েটির তো বাবা তমুক। বাকিটিকে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম না। হোয়াট আ স্ক্যাণ্ডাল। আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে এগুতে হবে।'

'আমি যাব আপনার সঙ্গে? মেয়েরা যখন আছে—'

'নো, নো, ম্যাডাম, ইউ নিড্ নট বদার। আইল টেক কেয়ার অফ দ্য সিচুয়েশান।'

কিন্তু কিছুই ভদ্রলোক করলেন না, অন্তত শান্তি হ'ল না। হ্যাঁ, তারপর যেদিনই দেখা হয় ভদ্রলোক আমাকে এড়িয়ে চলেন। এই তো অবস্থা। আর সতী কি না যা প্রাণ চায় বলে বসছে। ফলাফলের চিন্তাই নেই।

পরদিন থার্ডইয়ার অনার্স ক্লাস। ওদের আমি প্র্যাকটিকাল ক্রিটিসিজম পড়াই। আগের দিন শেলীর একটি কবিতার অ্যাপ্রিসিয়েশান লিখতে দিয়েছিলাম। মোটামুটি অর্থটা ধরতে পেরেছে। কিন্তু বিশ্লেষণ যে প্রধানত কবিতার আর্টের অর্থাৎ কবিত্বর, বিষয়বস্তুর নয় সেটা এদের মাথায় ঢুকছে না। তবুও যা হোক শেলীর কবিতা তো, পড়তে ভাল লেগেছে, থিমটা ডিসট্যাণ্ট বা কালচারালি রিমোট নয়। কারেকশান করা হয়ে গিয়েছিল, আজ খাতা ফেরৎ দিলাম। শব্দ ও অর্থের যুগলবন্দী, চিত্রকল্প, ভাবপ্রকাশের সংযম ইত্যাদি নিয়ে তবেই না এক্সেলেন্স, সার্থকতা। আলোচনা হ'ল। একটি খুব ভাল মেয়ে আছে। সেকেণ্ড ইয়ারে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। সকলের আশা ফাইন্যালেও পাবে। অনার্সে আজ পর্যন্ত যত ভাল স্টুডেণ্ট পেয়েছি প্রায় বেশির ভাগই মেয়ে। এখানে ছেলেদের মধ্যে সংবেদনশীলতা বোধহয় কম। অথচ পরে দেখি তত-ভাল-নয় ছেলেরা কলেজে

অফিসে রাজত্ব করছে, এই সব ঝকঝকে মেয়েরা কোথায় হারিয়ে যায়। গত ডিসেম্বরে নিউইয়ার্স ইভ পার্টিতে ক্লাবে একটি কড়া প্রসাধনকরা প্রায় মাঝবয়সী চেহারার মেয়ে আমাকে উইশ করে জিজ্ঞাসা করল,

'আমাকে চিনতে পারছেন তো ম্যাডাম?'

মুখের ওপর 'না' বলা যায় না, বিশেষ করে এত আগ্রহ নিয়ে যখন চেয়ে আছে। মাথা হেলিয়ে একটু হেসে বলি 'হুঁ'।

'আপনার কথা, আর. ডি. উইমেনস কলেজের কথা এত মনে পড়ে। মনে আছে সেই অ্যানুয়েল ডে-তে ইংলিশ প্লে স্টেজ করেছিলেন? কত খাটতেন আমাদের নিয়ে।'

এইবার মনে পড়ল, এই কি সেই মেয়েটি যাকে গড়েপিটে অসকার ওয়াইল্ডের দি ইম্‌পর্টেন্স অফ বিং আরনেষ্ট থেকে একটা অংশ মঞ্চস্থ করা হয়েছিল? দিনরাত মেতে থাকতাম শখের নাটক নির্দেশনায়। কী টেনশান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। মেয়েরাও রাত্রিদিন কলেজে আমার পেছন পেছন, বাড়িতেও রিহার্সাল দিইয়েছি। শেষ পর্যন্ত উৎরে গেল ভালভাবেই; এখনো মনে পড়ে—আলো, সাজসজ্জা, মেডেল, হাততালি, উন্মাদনা। খুব ট্যালেন্টেড ছিল মেয়েটি। হ্যাঁ নামটা মনে পড়েছে, নীতু ওয়ালিয়া; ওরা বোধহয় পাঞ্জাবি সিন্ধি কিছু একটা। ওড়িশায় সেট্‌লড। এলোকিউশান, ডিবেটেও খুব ভাল ছিল। ভি. সি.র শীল্ড পেয়েছিল।

'এখন কী করছ?'

'কী আর করব ম্যাডাম, জাস্ট আ হাউসওয়াইফ। আই হ্যাভ টু চিলড্রেন বোথ সন্‌স…'

এরকম কত নীতু আমাদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে। আর তারপর? সংসারের চাপে মরে হেজে নষ্ট হয়ে গেছে কত সম্ভাবনা। অশিক্ষিত দরিদ্র অবহেলিত গ্রামবাসীদের আপোফোটা প্রতিভা নিয়ে কবির বিলাপ বিখ্যাত হয়ে আছে। এইসব শিক্ষিত, সচ্ছল, আদরিনী স্ত্রীদের অপূর্ণতা কারো খেদ জাগায় কি? গরীব এবং পুরুষ না হলে সহানুভূতি পাওয়া যায় না। টাকা না থাকাটা একমাত্র কষ্ট এবং পুরুষেরই শুধু আহার নিদ্রা মৈথুনের বাইরে কিছু করতে চাওয়ার অধিকার আছে। আমরা আবার নিজেদের স্পিরিচুয়েল ভাবি।

'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

সেকেণ্ড ইয়ার অনার্সের পুরো দলটি আমার গতিরোধ করে।

'মর্নিং। কী খবর? কেমন প্রিপেরেশান চলছে? ফার্স্ট ইয়ারে পোয়েট্রি পড়ানো হয়েছিল মনে আছে তো? না কি সব ভুলে বসে আছ, পরীক্ষা তো সামনে।'

'না, না ম্যাডাম, পোয়েট্রিতে কোন প্রবলেম নেই। একদম থরোলি করানো হয়েছিল। সব নোট্‌স আছে। আমরা একটা অন্য প্রবলেম নিয়ে এসেছি। একটু আমাদের 'ওথেলো' ডিসকাস করে দিতে হবে।

আহ্লাদের আর সীমা নেই! এই গরমে রেগুলার ক্লাস শেষ করে পরীক্ষার ডিউটি করতে হবে, তাছাড়া খাতা দেখার বিশাল পর্ব রয়েছে।

'আমি তো তোমাদের 'ওথেলো' পড়াই না, যিনি পড়ান তাঁকে বল গিয়ে।'

'দ্যাটস অফকোর্স রাইট ম্যাডাম। কিন্তু 'ওথেলো'র বিশেষ প্রগ্রেস হয়নি। এদিকে পুরো প্লে-টা আসবে পরীক্ষায়, সময়ও নেই।'

'যাই হোক, সেটা যিনি পড়ান তাঁকে বলছ না কেন? এটা তো তারই রেসপনসিবিলিটি। কে নেন 'ওথেলো'?'

'সতী ম্যাডাম।'

থমকে যাই। এখানেও ঝামেলা বাঁধিয়েছে! সাবধানে জিজ্ঞাসা করি, 'কটা অ্যাক্ট হয়েছে?'

'সেইটাই তো প্রবলেম, কী যে হয়েছে তাই আমরা কেউ জানি না। সতী ম্যাডাম ক্লাসে এসে টেক্সট্ খুলে অ্যাট র‍্যান্‌ডম্ একটা পেজ্ নেন, কয়েক লাইন পড়েন, তারপর এক্সপ্লেন করতে গিয়ে টেক্সট ছাড়িয়ে কী যে সব আবোলতাবোল বলতে শুরু করেন আমরা তার হেড অর টেইল করতে পারি না, বুঝতেই পারি না কী হচ্ছে; ইফ উই আস্ক এনি কোয়েশ্চেন, হঠাৎ চুপ করে যান, আনসার দেন না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। উই ফিল্ সো অড্।

তাড়াতাড়ি জোড়াতালি লাগাতে চেষ্টা করি,

'সেটা হয়তো কোন পার্টিকুলার ডে-তে কোন পার্টিকুলার কারণে হয়েছে। উনি তো খুব রেগুলার ক্লাস নেন, উই অল নো।'

'ইয়েস ম্যাডাম দ্যাট্‌স ট্রু। লাস্ট ইয়ারের ব্যাচকেই তো দ্য সেইম টেক্সট কত ডিটেলে লাইন বাই লাইন পড়িয়েছেন। আমাদের ব্যাড লাক্।'

'আসলে সতী ম্যাডামের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, প্রেসারের গণ্ডগোল হয়েছে।'

যা মুখে এল বলে দিলাম। অজুহাত তো দিতে হবে,

'শার্প ফ্রাকচুয়েশান হয়, তাই কনসেনট্রেশান হ্যাম্‌পার্ড হচ্ছে। তোমরা হেড্ বা প্রিন্সিপ্যালকে কিছু বলটল নি তো?'

'না, না ম্যাডাম সে কথনো করি। আমরা অত ইরেসপনসিবল নই। উই অল আণ্ডারস্ট্যাণ্ড যে ওঁর কোন জেন্যুইন ডিফিকাল্‌টি আছে। কিন্তু আমাদের যে সামনে এক্‌জাম, শেক্সপীয়ার গাইডেন্স ছাড়া প্রিপেয়ার করা—'

শেষ করতে না দিয়ে বলি,

'ইয়েস ইয়েস, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইয়োর প্রবলেম। লেট্‌স ডু ওয়ান থিং। দেখ রেগুলার ক্লাস নেওয়ার তো আর টাইম নেই। তোমরা টেক্সটটা নিজে নিজে এই উইকে পড়ে ফেল, সবারই তো অ্যানোটেড এডিশান, গ্লসারিও আছে। একেবারে অসম্ভব নয়। না হয় ডিফিকাল্‌ট জায়গাগুলো মার্ক করে রেখো। নেক্সট

উইকে আমি তোমাদের নিয়ে বসব, ইম্পর্টেন্ট টপিক বেছে সেই অনুযায়ী সব সিনস, লাইনস পয়েন্ট আউট করে সেগুলো ভাল করে করিয়ে দেব। উইল দ্যাট ডু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম, দ্যাট'ল বি এনাফ। মেনি থ্যাংকস ম্যাডাম, নমস্কার।'

গাড়িতে ফেরার পথে ব্রিফকেস খুলে স্বুবীর ইনভিটেশান কার্ডগুলো খাম থেকে খুলে খুলে দেখছিল। প্রতি সেক্রেটারির টেবিলেই গাদা হয় সরকারি আধা-সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ। অনেক সময় খোলাও হয় না, যাওয়া তো দূরের কথা। এখন সময় কাটাবার জন্য দেখা হচ্ছে।

'এই দেখ পয়লা এপ্রিল, ওড়িশা ডে সেলিব্রেশান। যাবে নাকি?'

'ছুটির দিন আবার ভুবনেশ্বরে আসব? না বাবা, অত ইন্‌টিগ্রেটেড হই নি।'

পয়লা এপ্রিল ওড়িয়া স্পিকিং এরিয়া সব এক করে ওড়িশা স্টেট গঠিত হয়েছিল। অ্যা গিফট ফ্রম দ্য কলোনিয়েল রুলার্স। তারা ইংরেজ, মডার্ন জাত। হিন্দু বা মুসলমান আমলে লিংগুইস্টিক বেসিসে স্টেটহুড সম্ভবই হত না। আর আমাদের দেখ, এক খাবলা বিহার, এক খাবলা আসাম, আর বাংলা দেশ তো সিংহভাগ নিয়ে গেছেই—ক্ষুদিরামের পাপ। বাকি যেটুকু অবশিষ্ট সেখানেও লাখ লাখ বাইরের লোক এসে একেবারে হেগেমুতে একসা করছে। আগে স্বুবীরকে এসব বললেই ঠাট্টা করত। ব্যুরোক্র্যাটের মেয়ে, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া। বঙ্গপ্রীতি আর যাকে হোক আমাকে মানায় না।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। আমাদের ফ্যামিলিতে বাংলাচর্চা বলতে গেলে নামে মাত্র। শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান। বঙ্কিমকে বলা হ'ত ইণ্ডিয়ান স্কট আর শরৎচন্দ্র মেলোড্রামাটিক, সেন্টিমেন্টাল অতএব নাকচ। তার পরের লেখকদের বিশেষ খবর কেউ রাখত না। হ্যাঁ চার ছ'টা নাম জানা ছিল। সত্যজিৎ রায়ের দৌলতে বিভূতিভূষণ পড়া হ'ল, তারাশঙ্করকে অবশ্য আগেই জানা ছিল, তবে স্বুনীল, শংকর এদেরকে আমরা আগে প্রায় পড়ি নি। ওড়িশাতে এসে ক্যারা বাঙালিদের অবস্থা দেখে আমার চোখ খুলল। বাংলা বলাই শক্ত। আরও শক্ত কোনরকম মিনিংফুল ইন্টারচেঞ্জ। কটকে শৈলবালা উইমেনস কলেজে যখন ছিলাম একবার ম্যাকসএর সরোজিনী দত্ত আমার মাছ খাওয়া নিয়ে শকড্। সে কি এখন সে কার্তিক মাস, মাছে পোকা পড়ে। ওড়িয়ারা এক বাক্যে তাকে সমর্থন আর আমি অপ্রস্তুত। এরা এখনো পাজি মেনে ওঠাবসা খাওয়াদাওয়া করে। বাংলা 'এসে' আর ডিবেট কমপিটিশানে জাজ্ হয়ে দেখি কী ভয়াবহ অবস্থা বাংলায়। কলকাতায় একটা ক্লাস ফাইভের বাচ্চা এখানকার বি. এ. পড়া ছাত্রছাত্রীর চেয়ে বোধহয় ভাল বাংলা জানে। এখানে বাঙালিরা যে ক্যারা হয়ে গেছে তার কারণ হ'ল এই বাংলা না জানা। ল্যাংগুয়েজ ইজ নট মিয়ারলি অ্যা মিনস অফ কম্যুনিকেশান, ল্যাংগুয়েজ ইজ ইয়োর আইডেন্‌টিটি। বহুকাল

আগে পড়া বিখ্যাত ফরাসী গল্প দি লাস্ট লেসনএর মর্ম এত দিনে বুঝতে পারলাম। যে জনগোষ্ঠী ভাষা রাখতে পারে তার স্বাধীনতা কখনো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ভাষাই স্বাধীনতার চাবিকাঠি।

তারপর থেকে আমি গোগ্রাসে বাংলা নভেল পড়তে শুরু করলাম। স্বুবীরের ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা ('তুমিই হচ্ছ ট্রু বেংগল পেট্রিয়ট', 'বেংগল্‌স কালচারাল অ্যামবাসাডার' ইত্যাদি) গায়ে মাখতাম না। দিল্লি ট্রান্সফারে সব ওলটপালট হয়ে গেল। আমার জীবনে দিল্লি থাকাটা হচ্ছে একটা ওয়াটারশেড। এর পরে সবই পাল্টে গেছে।

'কেন, তোমার তো কালচারে ইন্টারেস্ট, বেচারা ওড়িয়াদের কালচারাল অনুষ্ঠানের জন্য একটু তেল খরচ করবে না?' খোঁটা দেওয়া স্বামীদের প্রিভিলেজ।

'না, করব না। কারণ এটা কালচারাল ইভেন্ট নয়, পোলিটিক্যাল। দি গ্রেটেস্ট ওড়িয়া রাইটার ওয়াজ বর্ন অ্যাণ্ড ব্রট আপ ইন বেংগল প্রেসিডেন্সি।'

'তাই নাকি। নাম কি?'

'ফকিরমোহন সেনাপতি। কেন আউট সাইডার আই. এ. এসদেরও তো ওড়িয়া শিখতে হয়, যখন শিখছিলে 'ছ' মান অ আঠঅ গুণ্ঠ'র নাম শোননি?'

আমিও পাল্টা তীর চালাই, যদিও নিজে ফকিরমোহন পড়িনি, ওড়িয়া ঐ স্ট্যাণ্ডার্ডের জানিই না।

হাওয়াটা বেশ গরম।

হয়তো হাওয়াটা ঠাণ্ডা করতেই খেতে বসে স্বুবীরের প্রশ্ন,

'আচ্ছা তোমাদের সেই সতী সাধ্বীর খবর কি?'

আমিও সহজ হওয়ার স্বুযোগ পাই।

'আর বল কেন। সত্যি তুমি ঠিকই বলেছিলে, ও একটু বোধহয় মেন্টালি অ্যাফেক্টেড। যা তা করছে কলেজে, টিউটোরিয়েলে আলতুফালতু মেজাজ। অনার্সে কোর্সটোর্স লাটে উঠে গেছে। ছেলেমেয়েরা কমপ্লেইন করছে। আজকেই তো আমি দুটো ক্লাসে ঠেক্না দিয়ে এসেছি। অন্য কারো কানে উঠলে কী হবে কে জানে।'

'তোমরা মেয়েরা মেয়েলিই রয়ে যাও। যতই লেখাপড়া শেখ, চাকরিবাকরি কর, প্রফেশন্যাল হতে পার না। সংসারই তোমাদের কেন্দ্র, ওখানে একটু এদিক ওদিক হলেই ব্যস, ব্যালান্স নষ্ট। পতি পরম গুরুটিকে বাদ দিলে তোমরা একে বারে জিরো। শূন্য। দেখছ তো।'

কথাটা মোক্ষম জায়গায় ঘা দেয়। আমিও কি সংসারনির্ভর নই? আমার জীবনও কি সেই আদ্দিকালের পতি পরম গুরুটিকে কেন্দ্র করে টিঁকে নেই? আর কিছুই তো করতে পারলাম না। যাদবপুরের হাই-সেকেণ্ড ক্লাস, একটা চাকরি

করি, দ্যাটস অল। এটা কি একটা অ্যাচিভমেণ্ট? স্বুবীরের দিল্লি পোস্টিংএর ক'বছর আমি ইউ. জি. সি ফেলোশিপ পেয়েছিলাম। কত কাঠখড় পুড়িয়ে ধরা করা করে উৎকল ইউনিভার্সিটিতে গাইড যোগাড়—আমি তো এখানে বি.এ. এম. এ করিনি, কাউকে চিনতামই না। তারপর রিসার্চ টপিক বাছা, সিনপ্‌সিস তৈরি, পি এইচ. ডি রেজিস্ট্রেশান। কিন্তু কাজটাই হ'ল না। তিন তিন বছরে শুধু মেটিরিয়েল কালেকশানের স্টেজেই রয়ে গেলাম। একটি পেপারও লিখতে পারি নি। একটা পুরো সংসারের কাঁটাচামচ থেকে স্বুরু করে টাই পর্যন্ত প্যাক করা আবার দিল্লিতে সে সব আন প্যাক, সংসার পাতা, নিত্য প্রয়োজনীয়ের বন্দোবস্ত করা, ছেলের স্কুলে অ্যাডমিশন ইত্যাদি। কোন শেষ নেই। স্বুবীরের অফিস অতএব তাকে সংসারের কোন কাজ, কোন দায়িত্বে পাওয়া যাবে না। আমার কলেজ নেই, আমি ছুটিতে, তাছাড়া আমি বাড়ির গিন্নি, অতএব সংসারের দায়ের বোঝা আমার। আসলে স্বুবীর এমন পরিবারে মানুষ যেখানে ছেলের ভাল রেজাল্টের জন্য বাবা সর্বক্ষণের চাকর, মা ফুলটাইম ঝি। সমাজের মাথায় ওঠার সিঁড়ি পরীক্ষার পড়া। কিছু মেধা, অনেকটা মুখস্ত, বাকিটা সৌভাগ্য। ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস (খোদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, আমার মত যাদবপুরের সেকেণ্ডক্লাস নয়) স্বুবীর এখন শুধু অফিসের পয়সায় কেনা ম্যাগাজিন আর পিরিয়ডিক্যাল পড়ে। একমাত্র ইনটেলেকচুয়েল এক্সারসাইজ ক্রসওয়ার্ড পাজল। যাক সে কথা। আমি তো ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট নই, তাই বরাবরই কিছু না কিছু বই পড়ে আসছি। সংসার বসিয়ে দিল্লির সমস্ত লাইব্রেরির—মানে যেগুলো কাজে লাগতে পারে—মেম্বারশিপের চেষ্টা। চেনাশোনার খোঁজ—সব কিছুই কী সময় সাপেক্ষ। কলকাতা ঘিঞ্জি শহর, কটক ভুবনেশ্বর ছোট ছোট জায়গা, দিল্লি শহরে সবকিছুর যে দূরত্ব তার জন্য কোনরকম প্রস্তুতিই ছিল না। তাও এগোচ্ছিলাম এবারে মুখ থুবড়ে পড়লাম। থিসিসের বিশেষ কিছুই হ'ল না। উৎকলের গাইডটি বয়স্ক, মানুষ ভাল। বোধহয় ধরেই নিয়েছিলেন শুধু ফেলোশিপ পাবার জন্যই তাঁর আণ্ডারে রিসার্চে নাম লেখানো, কাজটাজ আমার মত সখের চাকুরে আই. এ. এস গৃহিণীদের দ্বারা হবে না। তাই কখনো তাড়াও দেননি। কী লজ্জা।

চুপ করে থাকি। হয়তো মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

স্বুবীর আর একটা বড়সড় মাছ তুলে নিতে নিতে আড়চোখে আমার দিকে দেখে।

'মাছটা আজ গ্র্যাণ্ড হয়েছে। তুমিই রাঁধলে না কি? বেরিয়েছ তো সেই সকালে, ফিরলে এই এখন। কখন রাঁধলে?'

'ওরই মধ্যে। ভগবান আমাদের মানে চাকরি ও সংসারের জোয়ালে বাঁধা মেয়েদের শুধু দশভুজাই করেননি আমাদের জন্য বাড়তি সময়েরও সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কাজেরও শেষ নেই, এনার্জিও অফুরন্ত।

'আমার মেজাজ খারাপ হ'ল? তোমার সঙ্গে তো দেখছি নরম্যাল কনভার-সেশানই শক্ত। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বাইরের লোকের, আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। তোমার এত গায়ে লাগে কেন? ডোণ্ট বি নিওরটিক।'

সত্যি, সতীর ব্যাপারে আমার মেজাজ খারাপের কোন যুক্তি নেই। কলেজে আরও কলিক আছে, আছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। একজনের জীবন আমার সমস্ত মনপ্রাণ দখল করে থাকবেই বা কেন। তাছাড়া ও তো ল্যাজেগোবরে হয়ে আছে, সব কিছুতেই গা ছেড়ে দিয়েছে। যেমন কাজকর্মে তেমনি সংসারে, ক্লাস যেমন সামলাতে পারছে না, তেমনই পারছে না স্বামীপুত্রকে বাগে আনতে। হোপলেস। ঠিক করি ফের যদি গায়ে পড়ে কাঁদুনি গাইতে আসে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেব। হিস্টিরিয়া হলে নাকি ঠাস করে চড় মারলে স্বাভাবিকত্ব ফিরে আসে। ওর সেরকম দাওয়াই চাই। সামনে অ্যানুয়েল পরীক্ষা। কোয়েশ্চেন তৈরী করতে হবে। ক্লাস টু ফার্স্ট ইয়ার আমার করার কথা। ঝামেলার তো, বিট্ কোয়েশ্চেনস, গ্রামার, কমপ্রিহেনশান বা প্রেসি যাই দাও প্যাসেজ যোগাড় করতে হবে। কপি করার মেহনত। বইপত্র কাগজ কলম নিয়ে বসি। র‍্যাভেনশ'-এ আমার প্রথম কো-এড্ কলেজে পড়ানো। রীতিমত হস্টাইল আবহাওয়া, সখের চাকুরে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, বাড়তি স্বুবিধা নিচ্ছে ইত্যাদি গুন্‌গুন্ ফুস্‌ফুস কানে আসত। এই প্লাস টু-এরই কোয়েশ্চেন করতে দেওয়া হলে গ্রামার, প্রেসির জন্য প্যাসেজ অন্যান্য কোয়েশ্চেনের সঙ্গে যত্ন করে টুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। হেড যেন একটু অবাক হলেন, অবশ্য খুশিও। সহকর্মী একজন বললেন, 'তা তো টুকবেনই, বাড়িতে তো কাজকর্ম নেই, সময় কাটাবেন কী করে।' বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার, মশলাবাটা ইত্যাদি সংসারের আটপৌরে কাজগুলোর সঙ্গে মেয়েদের সত্তা এদের কাছে একাত্ম। এগুলি না করতে হলেই ধরে নেওয়া হয় অনন্ত অবসর, মেয়েদের কাজ মানেই নিম্নবর্গের শ্রম। সভ্যতার বিবর্তনে শিকার চাষবাস কায়িক শ্রম থেকে পুরুষের কাজ দিব্যি হোয়াইট কালার জব-এ উঠে গেছে। কিন্তু মেয়েরা আদি ও অকৃত্রিম নীচুতলার মজুর রয়ে গেছে। অথচ সংসারের প্রচুর রকমফের আছে, শুধুমাত্র পর্দা লাগানোতেই শ্রেণীর তফাৎ হয়ে যায়, ছেলে মানুষ, পরিচ্ছন্নতা, ঘর সাজানো, পারিপাট্য, রোগের শুশ্রূষা, খাওয়ার মেনু সবকিছুতেই গৃহিণীর বুদ্ধি ও দক্ষতা লাগে। অথচ বেশির ভাগ পুরুষ এবং কিছু কিছু নারীর কাছে গৃহস্থালীর অর্থ আটবছর বয়সের বুদ্ধিতে করা যায় এমন মানের যান্ত্রিক কায়িক শ্রম ও তার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি মাত্র। আশ্চর্য। স্ত্রীরাও যে স্বামীদেরই মত মাল্টিক্লাস এনটিটি এটা স্বীকার করে নেওয়া কি এতই শক্ত!

কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের হেড শ্রীগণেশ্বর ত্রিপাঠী ধরলেন।

'এই যে ম্যাডাম, একটু কো-অপারেট করতে হবে।'

'কী ব্যাপার?'

'ইংলিশ 'এসে' কমপিটিশানের খাতাগুলো একটু দেখে নেবেন। আপনি জাজ্।'

'বেশ তো, ক'টা?'

'এই গোটা আস্টেক।'

'ঠিক আছে।'

তিন হাজার ছেলেমেয়ের প্রতিষ্ঠানে একটা রচনা প্রতিযোগিতায় দশজনের বেশি অংশ নেয় না। তাও বলে কয়ে। ডিবেটে একই হাল। শুধু বিদেশী ভাষা ইংরিজিতে নয়, মাতৃভাষা ওড়িয়াতেও এক অবস্থা, মেরে কেটে জনা বারো। অ্যান্নুয়েল স্পোর্টস-এ স্টাফ মেম্বার ছাড়া দর্শক থাকে না, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে ক'জন অংশগ্রহণ করে শুধু তারাই আসে, বড়জোর তাদের দুচারজন বন্ধু-বান্ধব ভল্যান্টিয়ার্স। আজকাল ছেলেমেয়েদের কোন কিছু করাতেই আগ্রহ নেই। সবাই শ্রোতা, দর্শক এবং পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে যায় না। কেরিয়ার ছাড়া আর কোন জিনিসে পরিশ্রম বা মনোযোগ অকল্পণীয়। গান, বাজনা, অভিনয় —কোন পারফরমিং আর্টসে যোগ দেবার ছেলে পাওয়া দুষ্কর। ফি বছর কালচারাল উইক মানে শুধু আমাদের মাথাব্যথা। আধুনিক ছেলেমেয়ের শ্রাদ্ধে স্টাফ কমনরুম গুলজার। আমি চুপ করে শুনি, যোগ দিই না। আজকাল প্রায়ই মনে প্রশ্ন জাগে এই 'আধুনিক' নাম দিয়ে যেসব অভাব বা দোষ নিয়ে আমরা দিনরাত বিলাপ করি সেগুলি কি সত্যি এতই আধুনিক? আমি তো আমার জানাশুনা কোন পুরুষকে—অর্থাৎ যাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্থায়ী ভাল চাকুরে —তাঁদের ছাত্রাবস্থায় পড়ার বই আর পরীক্ষা ছাড়া আর বিশেষ কিছুতে মন দিতে দেখিনি বা কোনকালে দিতেন বলে শুনিনি। যেমন সুবীর। যেমন আমার ভাই। এরা তো বাবাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। আর আমাদের আমলে মেয়েদের যে দু'চারদিন সারেগামা করানো হত সেও তো বিয়ের বাজারে দর তোলার উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি স্বামী যোগাড়। তার মারফৎ নিজেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তথাকথিত গৌরবোজ্জ্বল সুদূর অতীতে জাতিবর্ণলিঙ্গ নির্বিশেষে শিক্ষার বালাই ছিল? ছিল শিল্পকলাচর্চা? এমন কি কৈশোরের নির্দোষ আমোদ খেলাধুলা তারই বা ক'টা দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়? নাচ গান বাজনা ছিল পতিতাদের প্রায় একচেটিয়া, খেলার মধ্যে পাশা। এই ঐতিহ্য নিয়ে এখন আধুনিক ছেলেমেয়েদের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজ নেই, ভারত কেন অলিম্পিকে গোহারা হারে, এসব হাহুতাশ সাজে না। পরিপূর্ণ মানুষ শরীর মন সুকুমার প্রবৃত্তির সুষম বিকাশের ফল। আমরা যেন আধাখেঁচড়া হয়ে আছি। হয়তো এখানেই পিছিয়ে পড়ার আসল কারণ। তবে পিছিয়েই থাকব চিরকাল। কারণটাকে সবসময় পাপোষের তলায় ঝাট দিয়ে লুকিয়ে রাখছি। সব দোষ অন্যের—যে পশ্চিম পূর্ণ মানুষের সাধনা করেছে

তাকে জড়বাদসর্বস্ব বলে কি তৃপ্তি! তাই ছেলেমেয়েদের আমরা বুঝতে পারি না।

স্টাফরুমে ঢুকতে না ঢুকতে সতীর সঙ্গে দেখা। পুরু চশমার আড়ালে গর্তে বসা ছোট ছোট চোখ জ্বলছে। পরনে একটা বেমানান চড়া বেগুনি রঙের সম্বলপুরী মারসেরাইজড কটন শাড়ি, এদিকে হাতকাটা ঢলঢলে লাল রঙের ব্লাউজ, কায়দা করে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে, ছাত্রীদের মত একটা বিশাল রঙীন ক্লিপ তাতে সাঁটা। সামনে চুলে টান পড়েছে, কপালটা আরও গড়ের মাঠ। গরমে তেল গড়াচ্ছে নাকের দু'পাশ দিয়ে। মোটা একটা মালা জাতীয় লম্বা হার কণ্ঠার ওপর উঁচিয়ে আছে, কানে লম্বা দুল—হাতে ময়লা পালিশচটা কঙ্কন, কাঁচের চুড়ি আর জেন্টস সাইজের ঘড়ির সঙ্গে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। সাজ দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই না। এরকম সঙ্ সাজার চেয়ে বাবা না-সাজাই ভাল। মেয়েরা নির্ঘাৎ হাসাহাসি করে, করবেই তো।

'নমস্কার ম্যাডাম, ফ্রি পিরিয়ড নেই?'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ি, না।

'ক্লাস শেষ কখন? আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

'২-৩০শে। সায়ান্সের স্টাফরুমে থাকব।'

কথা বাড়াই না। যা বলার একসঙ্গে বলবখন।

দুটো পঁয়তিরিশ নাগাদ সায়ান্সের স্টাফরুমে পৌঁছে দেখি সতী বসে আছে। চারি দিকে চট করে নজর বুলিয়ে নিই। যাক বাবা, কেউ নেই। খালি এক কোণে ক্লাস রেজিস্টার বোঝাই টেবিলের সামনে টুলে বসে পিয়ন দয়ানিধি যথারীতি ঝিমোচ্ছে। মনে মনে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝাঁটা হাতে জঞ্জাল সাফ করতে প্রবৃত্ত হই। সতীর হিস্টিরিয়া-ন্যাকামি ঝেড়ে দূর করে ফেলে দিতে হবে।

'দেখ সতী, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আমারও স্বামী আছে। সংসার আছে। চাকরি আমিও করি। জীবনে আমারও সমস্যা এসেছে। সেই সব মনে রেখে তোমাকে আমি একটা সোজা প্রশ্ন করতে চাই। প্লিজ ডোন্ট টেইক ইট আদারওয়াইজ। তুমি কলেজের কাজে মন দিচ্ছ না কেন? তুমি শ্রীযুক্ত বিমলকুমার পাণ্ডার ধর্মপত্নী, এটাই কি পৃথিবীতে তোমার একমাত্র পরিচয়? তোমার স্বামী একজন অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম করছে, শুচ্ছে—ব্যাপারটা দুঃখের, অপমানের —সব সত্যি। কিন্তু তাই বলে তুমি যে অধ্যাপিকা, সেই ভূমিকাটা পুরো অস্বীকার করবে, ভুলে যাবে? হ্যাঁ, তোমার অভিজ্ঞতা নিদারুণ, ট্রমাটিক, একশো বার স্বীকার করছি। কিন্তু তার জন্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন খেসারৎ দেবে? ওদের তো কোন দোষ নেই। ওদের প্রতি তোমার কর্তব্য তো কারো স্ত্রী, কন্যা বা মা হিসেবে নয়। তোমার পরিবারের বাইরে তুমি যখন একটা দায়িত্ব নিয়েছ,

তখন ঘরে বাইরের আলাদা আলাদা বাউণ্ডারি বজায় রাখ। এরকম ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছ কেন?'

বেশ একটা জোর কামান দেগে দিয়ে নিজেকে হাল্কা লাগে। সতী মাথা হেঁট করে আমার বক্তৃতা শুনছিল, হঠাৎ মাথা তোলে, ঠোঁট দুটো শক্ত, কোলের ওপরে স্থির হাতে ধরা ব্যাগ।

'আপনি কি মনে করেন আমি সেটা জানি না? সেটা জানি বলেই তো আমার এত কষ্ট। আমি পড়াশুনা নিয়ে থাকতে এত ভালবাসতাম, ছেলেমেয়েদের ভাল করে পড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করতাম, ক্লাসে লেকচার দিতে দিতে টের পেতাম না কখন ঘণ্টা পড়ে যেত, ঘেমেনেয়ে যখন স্টাফরুমে ফিরতাম নিজেকে কত ঝরঝরে লাগত—আমি কিছু দিতে পেরেছি, সেটা কারো কাজে লাগছে, কারো কাছে আমার মূল্য আছে—এই ফিলিংটাইতো ছিল টিচিং কেরিয়ারের রিওয়ার্ড। নইলে ম্যাডাম আমাদের প্রফেশানে এই ইউজিসি স্কেলফেল হওয়ার আগে আর কীই বা ছিল বলুন? শুধু সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশান। আমি তো তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এই এক বছর ধরে যে কী হয়েছে, কোন কিছুতেই মন দিতে পারি না, আমার সমস্ত শরীর, মাথার মধ্যে যেন একটা তিক্ততা, এমন হতাশা, কী করে যে আপনাকে বোঝাব। যেন একটা কোন ভয়ঙ্কর ভাইরাস ঢুকেছে আমার রক্তে আর শিরাউপশিরায় সমস্ত শরীরে ছেয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত···'

হ্যাঁ, ভাইরাসই বটে। সমস্ত মনপ্রাণকে গ্রাস করে ফেলে তার শক্তি। কত-দিন দিল্লির বাড়িতে আমি চুপ করে কলম হাতে সাদা কাগজ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি? হাত চলত না, মাথার মধ্যে সব শূন্য।

জামাকাপড় ছাড়তে আলস্য লাগত, এক কাফতানের ওপর এক কার্ডিগান আর সেই নাগা শালটা জড়িয়ে দিল্লির প্রচণ্ড শীতের একটা সিজন প্রায় সবটা কেটে গেল। কোনদিন আয়নার সামনে দাঁড়াতাম কি? চুল কাটতে গিয়েছি! ফেসিয়েল, ম্যানিকিওর, আইব্রাও—কিছুই করাই নি। বিউটি সেলুনের দিকে পা বাড়াবার ইচ্ছেই হ'ত না। রান্না করতাম যা-হোক তা-হোক। কোন নতুন ডিশ এক্সপেরিমেণ্ট করার সখ ছিল না।

সতী আস্তে আস্তে বলে যাচ্ছে,

'সত্যি বলছি ম্যাডাম, আমি রেজিস্ট করার প্রাণপণ চেষ্টা করি লিটেরালি, ডে আফটার ডে নিজেকে বলি আমি পড়ব, আমি পড়াব, আমি পড়ব আমি পড়াব। আগের মত, একদম আগের মত। কিন্তু লেকচার দিতে গিয়ে পয়েণ্টস ভুলে যাই, টেক্সট পড়তে পড়তে দেখি শব্দগুলো অর্থহীন হয়ে গেছে, পাতা জুড়ে অক্ষরগুলো সারি বেঁধে চলেছে কালো কালো পিঁপড়ের মত। খাতা দেখতে গিয়ে মন কোথায় চলে যায় যে—'

বাধা দিয়ে কঠোরভাবে বলি,

'দ্যাট্স বিকজ ইউ ওয়ালোয়িং ইন সেল্ফ পিটি, ইয়েস দ্যাট্স ইট। সবসময়ে ভাবছ আমার ওপর অবিচার হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, বেচারি আমি। আহা, আমার কী কষ্ট!'

'না, না, আমার নিজের ওপর কোন করুণা নেই। সত্যি বলছি ম্যাডাম আই হেইট মাইসেল্ফ, আই অ্যাম অ্যাশেমড্ অফ মাই ইনএবিলিটি। আমি নিজেকে দুভাগ করে এই দিকটা ঘরের স্ত্রী, আর ঐ দিকটা বাইরের লেকচারার, দুজনের মধ্যে নিশ্ছিদ্র দেওয়াল—এরকম করতে পারছি না।'

আমি আরও কঠোর হই'

'কেন পারছ না? দুটো আলাদা ভূমিকা, সম্পূর্ণ আলাদা।'

'আচ্ছা, আপনিই বলুন এই যে আমি সতী পাণ্ডা, হাইট পাঁচ তিন, ওয়েট ৪৮ কেজি, এম. এ. উৎকল, লেকচারার ইন ইংলিশ, ও ই. এস. ক্লাস টু অফিসার, ওয়াইফ অফ মিঃ বিমলকুমার পাণ্ডা—আমার কোনখানটা অধ্যাপিকা, কোনখানটা স্ত্রী? আমি তো দুটো মিলিয়েই একটা পুরো মানুষ, না কি? আমার কি এই হাতটা, এই পাটা, এই বুকটা স্ত্রীর রোলের জন্য? আর অন্য হাত, অন্য পা, অন্য বুক অন্য রোলের? আমাকে কোথা দিয়ে দুভাগ করবেন বলুন, বলুন? লম্বালম্বি, না, আড়াআড়ি?'

'থাক্, থাক্ সতী, তুমি তো হিস্টেরিক্যাল হয়ে যাচ্ছ। স্টপ ইট, আই সে, স্টপ ইট।

সতী কথা বলতে বলতে আমার হাত দুটো জোরে চেপে ধরেছিল।

এখন আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়। আমি একটু পেছনে হেলান দিয়ে ওর থেকে দূরত্বটা বাড়াই। বলি,

'অত উত্তেজিত হয়ে পড়ো না। তাতে কোন লাভ নেই। এভাবে তো তুমি নিজেকেই ডেস্ট্রয় করছ। তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? একটু অন্যভাবে দেখবার চেষ্টা কর না অবস্থাটাকে।

'কী ভাবে, কী ভাবে? আপনিই বলুন।'

'এখন তুমি যে ভাবে কাজকর্ম করছ তাতে তোমার আত্মগ্লানি বেড়েই যাচ্ছে, তাই নয় কি? ফলে আত্মবিশ্বাসও কমছে, সেটা কি ভাল মনে কর? বরং উল্টোটা চেষ্টা কর। আরও পড়, আরও ভাল করে পড়াও, রিসার্চ সুরু কর, অন্তত এম. ফিলে তো নাম লেখতে পার, এদিকে এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাকটিভিটিতে মন দাও। হ্যাঁ, তবেই তো তোমার সর্বদা মনে হবে, ইন ফ্যাক্ট তুমি সত্যি রিয়েলাইজ করবে তোমার একটা নিজস্ব সত্তা আছে যা পরিবারের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। কাজেই স্বামী পুত্র কন্যার সঙ্গে সম্পর্কে যতই ফাঁকি থাক না কেন, অন্য জায়গা থেকে, পরিবারের বাইরে থেকে যা পাবে তাতে পুষিয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি

তোমার সঙ্গে এগ্রি করি যে তুমি একটা পুরো মানুষ, আলাদা আলাদা খোপে বিভক্ত নও। সেই কারণেই তো আমি বলি একটা ব্যালান্স একটা সামঞ্জস্য দরকার। একদিকে কমলে, অন্যদিকে বাড়াও।'

সতী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। আমি দয়ানিধিকে ডাকি, দু'কাপ চা এনে দিক।

ব্যাজার মুখ করে কেটলি হাতে বেরিয়ে যায় দয়ানিধি। এখন তো আর বিশেষ ক্লাসটাস নেই, তিনটে বেজে গেছে। বোধহয় কাটবার তাল করছিল! চা-ফা আনতে গিয়ে আবার আটকে গেল।

সতীকে এতক্ষণ লেকচার দিয়ে নিজেই টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। তবে বেশ হাল্কা লাগছে। যেন মনের মধ্যে অনেক দিনের জমানো কিছু বেরিয়ে গেল। আচ্ছা, সতীকে যে উপদেশগুলো দিলাম ওগুলো কি আমার ওপরেও প্রযোজ্য নয়? ভাবতে ইচ্ছে করে না। নিজের দোষত্রুটি ধরা এত শক্ত, অন্যের কাঁধে বাঁট রেখে বন্দুক দাগানো সোজা।

সতী আস্তে আস্তে নীচু গলায় সুরু করে,

'গতকাল ঠিক এই ধরনের কথাই উঠেছিল। সেইজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করে একটু ডিসকাশানের দরকার ভেবেছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে পড়ত চিত্তরঞ্জন মিশ্র, ও এখন উকিল হয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করে আমি সব বলেছিলাম, এরকম দিনের পর দিন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আইন যখন আছে তখন আলাদা হয়ে গেলে ভাল। আই উড লাইক টু স্টার্ট এগেন। নিউ লাইফ।'

'বল কি!' আমি উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসি, যেন আমার জীবনেরই একটা মোড়। 'এ তো তুমি একটা ভীষণ কাণ্ড করে বসে আছ। তার পর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমার এধরণের চেষ্টা ও তার পরিণতি। সবই ব্যর্থ।

'চিত্ত সব শুনে-টুনে গতকাল কাগজপত্র রেডি করে আমার বাড়িতে আসবে বলেছিল। আমি তো অপেক্ষা করে বসেই আছি বসেই আছি। চিত্তর দেখা নেই। এমন সময় দর্শন ছিলেন আমার ভাসুর। আপনি তো ওঁর কথা জানেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এই সেদিনই তো বলছিলে, ফেমাস স্কলার বটে?'

'শুধু তাই নয়, খুব কড়া, ভাইরা কেউ এখনো মুখের ওপর কথা বলতে পারে না।'

'শুনেছি। আমাদের ফিলজফির হেড গল্প করছিলেন, ওঁর আণ্ডারে রিসার্চ করতে সব হিমসিম খেয়ে যায়।'

'ঠিক। তবে পরিবারটাকে উনিই ধরে রেখেছেন, উনিই তো এখন কর্তা। যদিও খাওয়া থাকা সবই আমাদের আলাদা কিন্তু পুরনো আনডিভাইডেড ফ্যামিলির মতনই আমাদের মানসিকতা, অভ্যাস, চালচলন। উনি এসেই বললেন 'চিত্তর কাছে সব শুনলাম।'

আমি তো অবাক।

'সে কি কথা! তুমি তো তোমার এই চিত্তকে উকিল হিসাবে ডেকেছ, তুমি ওর ক্লায়েন্ট, তাছাড়া এটা একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার, কনফিডেনশিয়াল, আর চিত্ত কিনা সোজা ভাসুরকে গিয়ে সব বলে দিল! এতো খুব আশ্চর্য ব্যাপার।'

'কিছুই আশ্চর্য নয় ম্যাডাম। আমাদের সমাজ ওরকমই। আপনি ভাবেন কী? আমরা লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি করি বলেই কি আমাদের জীবনের কোন ডিসিশান, বিশেষ করে ইমপর্টেন্ট ডিসিশান আমাদের নিতে দেওয়া হয়? সে উপায়টি নেই। ডিসিশান সব পুরুষের।'

'কিন্তু চিত্ত যে তোমার ভাসুরের এতই পরিচিত, একেবারে ক্লায়েন্টের কনফিডেনসিয়াল কথাবার্তা বলার মত ঘনিষ্ট সেটা তুমি জানতে?'

'চেনাচেনি ঘনিষ্টতার কী আছে। আমাদের ওড়িয়া সমাজ ঐরকমই। বাবাদের আমলে সব ম্যাট্রিকুলেট পরস্পরকে চিনত। এখন সেটা গ্র্যাজুয়েট অব্দি উঠেছে। তাছাড়া চিত্তর গাঁয়ে আমার শাশুড়ির ভাইঝির বিয়ে হয়েছে। তাই ওতো আমার শ্বশুরবাড়ির সবাইকে চিনবেই।'

আমি তো একেবারে হাঁ। গ্রামভিত্তিক কুটুম্বিতা আত্মীয়তার এমন লতায় পাতায় টান আমরা সহুরে বাঙালিরা কবে ভুলে গেছি। যাইহোক ব্যাপারটা কী দেখা যাক। প্রশ্ন করি,

'তারপর কী হ'ল?'

'তারপর···' সতী বলতে সুরু করে।

জীবনমঞ্চে কলেজ ও আমরা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাই। এখন আলোর ফোকাস সতীর বাড়ি ও পরিবারে। অ্যাকশান স্টার্ট।

অনিলবাবু ছোটভাইয়ের বাড়িতে ঢুকেই সতীকে পাকড়াও করলেন, যদিও এতকাল ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্কে সামনাসামনি অন্যের অনুপস্থিতিতে কথাবার্তা বড় একটা হয় নি। ড্রয়িংরুমে দুজন বসে। সতী এককোণে জড়োসড়ো। বড় সোফাটায় অনিলবাবু।

'এত দিন ধরে হতভাগাটা পরিবারের নাককান কেটে এইসব কীর্তিকাণ্ড করে আসছে আর তুমি কাউকে কিছু বলনি? তোমার জা'দের তো বলতে পারতে। আমাকে বা মাকে না বলতে পার। তাহলে বহুদিন আগেই তোমার বড়জা'র কাছ থেকে আমি শুনতাম আর কেলেঙ্কারিটা এতদূর গড়াতো না।'

সতী এদিকে ত লজ্জায় সঙ্কোচে মাথা তুলতে পারে না। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত ভাসুরের সঙ্গে ক'দিন কথা বলেছে আঙুলে গোনা যায়। আর এধরনের বিষয়ে আলোচনা তো অকল্পনীয়। কোনক্রমে বহুকষ্টে মৃদুস্বরে বলে,

'আমি তো যথাসাধ্য নিজের কর্তব্য করে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই, একশো বার। আমি তো বলছি না তুমি তোমার কর্তব্য করনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমি তোমার অধিকার কেন দাবী করনি। তুমি তো শুধু ব্যক্তিবিশেষের স্ত্রী নও, তুমি এই পরিবারের বধূ, বংশধরের মা। তোমার ছেলেদের হাত থেকে আমাদের পিতৃপুরুষ অন্নজল গ্রহণ করবেন। এ পরিবার থেকে তোমার চলে যাওয়ার প্রশ্ন আদৌ ওঠে কী করে? ঐ হতভাগাটার অধঃপতন হয়েছে বলে?'

সতী কোন উত্তর দেয় না। চোখ নামিয়ে তেমনি বসে থাকে। অনিলবাবু একদৃষ্টে সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সুরু করেন। এবারে আস্তে আস্তে, গলার কয়েক পর্দা নামিয়ে,

'আমাদের বংশের ধারায় তুমি মিশে গেছ। তোমার বাবা শাস্ত্রমতে তোমাকে সম্প্রদান করেছেন, তুমি এখন আমাদের গোত্রের। তুমি তো আর পিতার গোত্রে ফিরে যেতে পার না। গোত্রত্যাগ তুমি কেন করবে? কিসের জন্য?'

সতী একবার ভাবল বলে এই কষ্ট থেকে অব্যাহতির জন্য। তার প্রতিদিনের জীবনে, হাসিকান্নায়, গোত্র থাকা না থাকার কি বিশেষ মূল্য আছে? কিন্তু প্রশ্নটা করতে পারে না, মুখ বুজেই থাকে। অনিলবাবু একমুহূর্ত থেমে আবার বলতে সুরু করেন,

'হ্যাঁ, তোমার কোন অপমান হলে, তোমার ওপর কোন অন্যায় হলে তুমি নিশ্চয়ই বিচার চাইবে, আর সেই বিচার পরিবারই করবে। এখানে আইন আদালত টেনে এনে কী লাভ? আমরা মাথার ওপর আছি কিসের জন্য? অপরাধীর শাস্তি দাবী কর, দেখ আমরা কিছু করি কিনা। এই যে বিমল না, এদিকে এস।'

ইতিমধ্যে অপরাধীটি অফিস থেকে ফিরে বড় ভাইয়ের উত্তেজিত গলার আওয়াজে প্রমাদ গুনে জামাকাপড় ছাড়বার বাহানায় গুটি গুটি করে দোতলায় শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, ডাক শুনে কাচুমাচু মুখে ড্রয়িংরুমে ঢোকে। এদিক ওদিক চায়, কোথায় বসবে। মাঝখানের বড় লম্বা সোফায় অনিলবাবু, উল্টোদিকে ডিভানের এককোণে সতী। সন্তর্পণে একটি ছোট সোফায় ধারে বসে, যেন এই উঠল বলে।

'এই যে, ব্যাপারখানা কী? এসব কী শুনছি?'

বেশ নার্ভাস হয়ে গেছে বিমল, বড় ভাই শুধু যে বয়সেই বছর পনেরো বড় নন তার ওপর প্রচণ্ড রাশভারি, বরাবর বাবার মত মান্য করে এসেছে। হঠাৎ সরাসরি প্রশ্নের লক্ষ্য বুঝতে পারে না, মাথা নীচু করে থাকে।

'কী, উত্তর নেই যে? এসব কী শুনছি?' অনিলবাবুর গলা আরো কঠোর।

আমতা আমতা করে বিমল বলে,

'আজ্ঞে···ঠিক কী জানতে চাইছেন বুঝতে পারছি না···'

'বুঝতে পারছ না! বটে! বলি বয়স কত হ'ল?' অনিলবাবুর রাগ আরো যেন বেড়ে গেল। এখন একেবারে কটমট করে তাকিয়ে। বিমলের তো গলা শুকিয়ে গেছে, আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

'আজ্ঞে···বয়স···তা···এই সাতচল্লিশ আটচল্লিশ হবে বোধ হয়···'

'বোধহয়! নিজের বয়সেরও কি সঠিক হিসেব নেই?'

'না···মানে হ্যাঁ আছে! এই জুলাইয়ে, মানে শ্রাবণে আটচল্লিশ পুরো হবে।'

'বিয়ে হয়েছে কত দিন?'

'আজ্ঞে বাইশ বছর।'

'ব্রাহ্মণ সন্তান অগ্নিসাক্ষী করে সহধর্মিণী গ্রহণ করেছ, দুটি পুত্র একটি কন্যা ঈশ্বরের আশীর্বাদে। জ্যেষ্ঠের বয়স কুড়ি পেরিয়েছে, আজ বাদে কাল সে সংসার-ধর্ম করবে। ঠিক কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা এই বয়সে, এই অবস্থায় গোমূর্খ ষণ্ড রাজাগজাদের মত পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছ কেন আমাকে বুঝিয়ে বলতে পার?'

খানিকক্ষণ সবাই চুপ। থমথমে আবহাওয়া। ঘরটা পড়ন্ত রোদে তেতে একেবারে ইটখোলা। পাখাটা ফুলস্পিডে থাকলে কী হবে কিছুই হাওয়া হচ্ছে না। যত সব বাজে কোম্পানীর পাখা, স্টেটের বাইরের বড় ফার্মের প্রোডাক্ট তো কেনা হবে না। লোকাল ইনডাস্ট্রিকে মদত দিতে হবে। আর মদত মানেই প্রোটেকশান, যাতে যোগ্যের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় না নামতে হয়। সতী পাখার ব্লেডের দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে বেচারা পাখাটার কী দোষ, সে তো প্রাণপণে ঘুরছে।

যেমন সতী, সেও তো প্রাণপণে সংসারের চাকা আঁকড়ে আছে। নিজেকে মনে হল একটা জড়পিণ্ড, পাখায় ব্যবহার করা পদার্থের মত প্রাণহীন। না, সে হচ্ছে অ-পদার্থ। একটি জীব অর্থাৎ অ-পদার্থ। শব্দের খেলায় হাসি পায়। সে একটু দূরে বসে। দেখে সামনে দুটি চরিত্র, সে যেন দর্শক, এদের থেকে আলাদা। একটু অপেক্ষা করে অনিলবাবু আবার মুখ খোলেন,

'কী হ'ল? চুপ কেন? জবাব দাও।'

এবারে আস্তে আস্তে খুব নীচু স্বরে উত্তর আসে।

'আজ্ঞে···ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়।'

'তা কী রকম একটু বিস্তারিত বোঝাও দেখি, আমি শুনি।'

একটা দারুণ কিছু ঘোষণার ভঙ্গিতে বিমল বলে,

'আজ্ঞে আমি আগে জীবনে কখনো কোন পরস্ত্রীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাই নি।'

'তাকানোর কি কথা? এমন ভঙ্গি করছ যেন পরস্ত্রীর দিকে না তাকানোটা ভীষ্মের সংযম। ব্যাভিচার কি স্বাভাবিক বলে মনে কর নাকি?'

'না···না···ঠিক তা নয়,—মানে আমি বলতে চাইছি যে আমি জেনেশুনে ভেবেচিন্তে কিছু করি নি। ঘটনাচক্রে এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছি।'

বিমল মুখটা যথাসাধ্য করুণ করে তোলে। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়।

'বটে! অর্থাৎ কিনা তুমি অসহায় অনিচ্ছুক শিকারমাত্র। তা ঘটনাটা কী আর চক্রটাই বা কেমন একটু ব্যাখ্যা করতে পার?'

এবারে বিমল খানিকটা উত্তেজিত। সতীর দিকে ইঙ্গিত করে বলে,

'সে ব্যাখ্যাটা আমার চেয়ে আপনাদের 'সানবউ'ই ভাল দিতে পারে। বিনোদিনীকে কে এনেছিল আমাদের সংসারে? দিনের পর দিন তার সঙ্গে খাওয়া বসা হাসি গল্পে কে আমাকে জড়াত? কে দিনের পর দিন কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করত, বিনোদিনীর কোয়ার্টারটা ওর নামে ট্রান্সফার করিয়ে দাও, বিনোদিনীর 'পিউসীপুঅ'র ই. পি. কলে চাকরির জন্য উমেদারিতে লাগো, বিনোদিনীর হাউস বিল্ডিং লোনটা স্যাংশান করানোর চেষ্টা কর। কে এসব করেছে, জিজ্ঞেস করুন ওকে।'

অনিলবাবু স্থির দৃষ্টিতে সতীর মুখের দিকে তাকালেন,

'এসব সত্যি?'

সতী মাথা নেড়ে সায় দেয়। না দিয়ে কী করবে। কী করেই বা ভাসুরকে বলবে, এই কাজগুলো বন্ধুভাবেও করা যায়। এর জন্য বিছানায় ওঠার দরকার হয় না। বিমল বেশ পার পেয়ে গেছে ভঙ্গিতে নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসে। অনিলবাবু কিন্তু তাকে নিয়ে আবার পড়েন।

'তা তুমি কখনো প্রশ্ন করনি পরের সংসারের দায় তোমাকে নিতে বলা হচ্ছে কেন?'

বিমল একটু বেকায়দায় পড়ে। ভেবেছিল সতীর ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে নিস্তার পাবে। কিন্তু বড়ভাই নাছোড়বান্দা। প্রশ্নটাও বেয়াড়া।

'আজ্ঞে···না···মানে বিনোদিনী তো ওর কলিগ, পাড়ায় থাকে, ওর স্বামী তখন সুন্দরগড়ে পোস্টেড, ছেলেপুলে নিয়ে একলা। সংসারে পুরুষমানুষের তো কতগুলো কাজ থাকে, সে সব ওর করে কে? তাই আমি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অনিলবাবু বললেন,

'তাই তুমি শূন্যস্থান পূরণ করছিলে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান আর কি।'

বড় ভাইয়ের তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষের খোঁচায় বিমল খানিকটা শক্ত হয়ে উঠেছে। না, আর আঘাত সহ্য করবে না, আত্মরক্ষায় একটা ঢাল সামনে ধরে,

'কেন, ও কি জানত না ওর সখীটির স্বভাবচরিত্র ভাল নয়? কটক ভুবনেশ্বরে কে না জানে বিনোদিনীর কীর্তিকথা? দিনের পর দিন আমাকে লোভ দেখিয়েছে। আফটার অল আই অ্যাম আ ম্যান, পুরুষমানুষ। একটা মোটামুটি অ্যাটাকটিভ স্ত্রীলোক যদি সবানে নিজেকে অফার করতে থাকে, কে লোভ সামলাতে পারে? আমারও জাস্ট সেটুকুই অপরাধ বলতে পারেন। প্রলোভন জয় করতে পারিনি।'

'বাঃ অতি চমৎকার। পুরুষমানুষ, অতএব প্রলোভন জয় করতে পারনি। বলি, তুমি একলাই কি পৃথিবীতে পুরুষ? তোমার একলারই জীবনে প্রলোভন এসেছে? আমরা পুরুষ নই? আমাদের জীবনে কোন দিন কোন প্রলোভন আসে নি? আমরা আত্মসংবরণ করেছি কী করে? প্রলোভন তো বাইরের জগতে সর্বদাই থাকে। রোগের জীবাণুর মত সর্বত্র কম বেশি ছড়িয়ে আছে। সবাই কেন প্রলুব্ধ হয় না? সবাইকে কেন রোগে ধরে না, তার ব্যাখ্যা দিতে পার? শরীরের নিজের শক্তি থাকে না যুঝবার? নীতিজ্ঞান, বিবেক এসব কি একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছ?'

বিমলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, সার্টটা ভিজে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। বসবার ঘরটা যে এত সাংঘাতিক প্যাচপেচে গরম তা আগে কোনদিন এত হাড়ে হাড়ে টের পায় নি। ওপরে পাখাটার দিকে চায়। না, পুরো স্পিডই দেওয়া আছে। সতীর দিকে আড়চোখে চায়। চা-টা করার নাম করে উঠে গেলেও তো পারে। পরিবারের বৌ বলে কথা, স্বামী ভাসুরের কথার মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে কেন। সতী যেন বুঝতে পেরেই উঠে দাঁড়ায়।

'একটু চা-টা করে আনি।'

'না, না ওসব পরে হবে', অনিলবাবু সোজা বারণ করেন।

'তুমি বস দিকি। বস। ওর যা যা বলার আছে তোমার সামনেই বলতে হবে। হ্যাঁ, বিমল, বল তোমার কী কী বলার আছে।'

'দেখুন স্বামী হিসেবে কখনো তো কোন কর্তব্যে অবহেলা করি না। সংসারে যখন যা দরকার হাসিমুখে যোগান দিই, ওর সব ব্রতটত পালাপার্বনে যা যা আমার করণীয় সব করি, এ নিয়ে কোন কথা কখনো তুলি না। ও সংসারের গৃহিণী, ওর কর্তৃত্ব সবদাই মেনে নিই। যখন যা করতে বলে মুখ বুজে করি, গ্যাসের দোকানে যাওয়া থেকে সুরু করে ছেলেমেয়েদের সায়ান্স ম্যাথামেটিকস দেখিয়ে দেওয়া পর্যন্ত। আমি ওর স্বামী, ছেলেমেয়েদের বাবা, তার বাইরে কি আমার একটু আলাদা লাইফ থাকতে পারে না? বাইরের জন্য তো আমি ঘরকে অবহেলা করছি না। এ দুটোকে আলাদা রাখতে চাওয়া কি অন্যায়?'

'হ্যাঁ, অন্যায়। একশোবার অন্যায়। ঘরের তুমি যে মানুষ বাইরের তুমিও ঠিক সেই মানুষ। চৌকাট পেরোলেই কি অন্যলোক হয়ে যাও না কি। এতো

দেখছি আমাদের যৌবনকালে পড়া সেই জেকিল-হাইডের কাহিনী। একই মানুষের মধ্যে কি দুজন লোক হয়, ওটা অস্বাভাবিক, অসুস্থতা। শোন, কর্মের দায়িত্বই পুরুষার্থ। সে দায় এড়াবার মিথ্যে চেষ্টা ক'র না। ব্যভিচার নৈতিক স্খলন, তার পক্ষে কী যুক্তি আছে তোমার? আসল প্রশ্নের উত্তর কই?'

বিমল চুপ করে থাকে। তারপর যেন হঠাৎ মরীয়া হয়েই বলে ফেলে,

'আপনি সেটাকে এত পাপ ভাবছেন আমাদের সমাজ কিন্তু সেরকম সাংঘাতিক কিছু মনে করে না। সবাই জানে পুরুষের···মানে···ফিজিক্যাল ডিমাণ্ড মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। দিস ইজ অ্যাকসেপ্‌টেড। এই তো সেদিন পর্যন্ত পলিগ্যামি লিগাল ছিল। ওয়ান ম্যান ওয়ান ওম্যান তো ওয়েস্টার্ণ কনসেপ্ট। ইভ্‌ন প্রষ্টিটিউশান ওয়াজ অলওয়েজ—'

'থাক, থাক আর সাফাই গাইতে হবে না। ছি ছি তোমার লজ্জা করে না। এই তোমাদের মডার্ণ এডুকেশানের ফল। তুমি না ইউনিভার্সিটির ভাল ছাত্র ছিলে, সায়ান্সের হায়েস্ট ডিগ্রি আছে। এই সায়েন্টিফিক অ্যাটিচ্যুডের নমুনা।'

সতী শুনে যায়। যেন কলেজে এলোকিউশান কমপিটিশানের জাজ্, তার প্রতিযোগীদের নম্বর দেওয়া ছাড়া আর কোন ভূমিকা নেই।

অনিলবাবু কিন্তু উত্তেজিত, উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত টহল দিয়ে এসে লম্বা দেয়ালের মাঝখানটিতে দাঁড়ান, বক্তৃতা দেবার পোজ। মুখের ভাবে শ্লেষ ও তাচ্ছিল্য,

'বলিহারি তোমাদের শিক্ষা! ফিজিওলজি সম্পর্কে এলিমেণ্টারি ধারণা পর্যন্ত নেই। মডার্ণ ফাইণ্ডিংস কী? আ ম্যান রিচেস হিজ পিক অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইয়ুথ অ্যাণ্ড আফটার ম্যাচিওরিটি, হিজ নিড গ্র্যাজুয়েলি ডিক্লাইনস। বিজ্ঞানের চোখে তোমার ছেলের প্রয়োজন তোমার চেয়ে বেশি, বুঝেছ? সেটা মানতে রাজী আছ? হাউ'জ ইট দ্যাট হি ইজ নট টেম্পটেড?'

এবারে বিমলের মুখে আর কথাটি নেই। ছেলের প্রসঙ্গে সতী যেন ফিরে আসে বাস্তবে, অর্থাৎ নিজেকে জড়ায়। অস্বস্তির সীমা থাকে না, পারলে মাটির সঙ্গে মিশে যেত। কী করে, পেছনে হেলান দেওয়ার কুশনগুলো নিয়ে তার ওয়াড়গুলো টেনেটুনে ঠিক করতে থাকে। ব্যস্ত থাকার চেষ্টায় নিষিদ্ধ বিষয় আলোচনাকে অস্বীকারের একটা ভঙ্গি বা ভান।

'তুমি নিজেকে কী ভাব? আর আমাকেই বা কী মনে কর? আধুনিক চিন্তাভাবনার খবর রাখি না? এক্ষেত্রে খুব রেলেভ্যাণ্ট নয় বলে মেয়েদের ফিজিওলজি আলোচনায় আসছি না। একটা জিনিস তো তোমাদের মত সোকল্ড ইণ্ডিয়ান হেরিটেজ মানা ন্যাশনালিস্টদের খেয়াল করার কথা, মেয়েদের ক্ষমতা বা চাহিদা যদি পুরুষের চেয়ে এতই কম তাহলে মেয়েরা প্রষ্টিটিউট হয় কী করে? হ্যাঁ টাকার জন্য হয়, ফাইন। পুরুষ টাকার জন্য প্রষ্টিটিউট হতে পারে

না কেন? অত দূরে যাবার দরকার নেই, লেট'স স্টিক টু আওয়ার সিচুয়েশান। তুমি ধরে নিচ্ছ যে তোমার স্ত্রী মেয়ে বলে তার চাহিদা তোমার চেয়ে কম, এই তো? তাহলে তোমার ঐ বিনোদিনী মেয়ে হয়ে নিজের স্বামীটিতে সন্তুষ্ট নয় কেন? সে তো স্বামী সামলে তোমার মত অনেক পুরুষসিংহকে বাগে রাখতে পারছে। সেটা কী করে সম্ভব এবং কেন? আই মীন তোমার ঐ মেয়েদের কম ছেলেদের বেশি থিয়োরি অনুযায়ী?'

বিমল এগনো চুপ। জবাব আর কী দেবে, সতী মনে মনে ভাবে। এইসব পুরুষের ধারণা দেয়ার আর টু কাইণ্ডস অফ উইমেন, এক হচ্ছে ওয়াইফ মেটিরিয়েল, বাড়ির ঝি ও ছেলেমেয়ের মা; অন্যটি হচ্ছে নায়িকা কাম্ ফ্লেশট্রেডার, যাকে এন্‌জয় করা যায়, যার সঙ্গে সম্পর্ক লীলাখেলার। দুজনেরই যে বেসিক ফিজিওলজি এক, চাহিদা এক, তৃপ্তি একই অভিজ্ঞতায় সেটা কেউ বুঝতেই চায় না। বুঝলেই নিজেদের মুরোদে ঘা পড়বে। যত্ত সব হিজড়ে পুরুষ। একটা মীথ তৈরি করেছে, পুরুষ অতএব চাহিদা বেশি, ক্ষমতা বেশি। ক্ষমতার দৌড় যেন সতীর আর জানতে বাকি নেই। হিন্দু স্ত্রী তাই এ ধরনের শর্টকামিং মেনে নিয়েছে বরাবর। স্বাভাবিক সক্ষমতা যত কম তত বেশি ক্ষমতার ভান। পেট-রোগা ছেলের কুপথ্যিতে আকর্ষণ।

অনিলবাবু এখন খানিকটা শান্ত হয়েছেন, একটানা গোলাবর্ষণে বোধহয় ক্লান্তও। সোফায় এসে বসে এবারে সুরু করলেন,

'মেয়েদের সব সমাজে বাধানিষেধের মধ্যে রাখা হয় নানা প্রয়োজনে, সামাজিক অর্থনৈতিক। স্ত্রীদের সতীত্বের সঙ্গে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। ইউ ক্যান সে সতীত্ব একটা সামাজিক সংস্কার, পরিবারের প্রয়োজনেই তার মূল্য। তবে হ্যাঁ, সমাজে বাস করতে হলে সংস্কার মেনে চলাতে পুণ্য। ভেবো না আমি অর্থডক্স বলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করছি। জাস্ট দি অপোজিট।'

'কিন্তু আমার ব্যাপারটা ঠিক'—বিমল খুব নীচু স্বরে আরম্ভ করতে যায়। অনিলবাবু বাধা দিয়ে নিজের বক্তৃতার খেই ধরে এগিয়ে যান।

'হ্যাঁ তোমার কীর্তিকলাপেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব বই কি? এটা তোমার মিডলাইফ ক্রাইসিস, মধ্য বয়সের সঙ্কট। এখন নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ভয় হওয়ার সময়, জীবনে কী পেয়েছ আর কী পাওনি তার হিসেবনিকেসের সময়। যা পাওয়ার ছিল বলে মনে হয়—তা সে ভুল করেই আর ঠিক করেই হোক—সেটা এখন যেনতেনপ্রকারেন পেতে চেষ্টার সময়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তোমাদের ঐ আজকাল যাকে বলে মেইল ইগো, পুরুষের অহংবোধ। মনে মনে ধরেই নিয়েছ হিন্দু স্ত্রী তার আর যাওয়ার জায়গা কোথায় অতএব ইউ ক্যান গেট আওয়ে উইথ এনি থিং। তারওপর বিদুষী চাকুরে, তাকে অপমান করায় যে তৃপ্তি, একটা অশিক্ষিতা সম্পূর্ণ অধীনাকে হ্যাটা করে তো ততটা সুখ নেই।'

মুখোশটি খুলল তবে, সতী মনে মনে ভাবে। এরপর বক্তৃতার স্রোতে আরও কী বলে ফেলবেন। সতী মাথায় কাপড়টা বেশি করে টেনে আস্তে আস্তে উঠতে উদ্যত হয়। অনিলবাবু বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলেন,

'না তুমি যেও না। লজ্জা নারীর ভূষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝড়ে যখন নৌকো ডুবতে বসে তখন মাথায় ঘোমটা টেনে লজ্জাবতী লতা হয়ে থাকলে চলে না। ঘোমটা ফেলে কোমরে আঁচল জড়িয়ে শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়।'

সতী মৃদু স্বরে বলতে চেষ্টা করে,

'সে তো ঠিক। এখন···মানে আপনি তো বোধহয় ক্লান্ত—একটু চা-টা করি আমি। তাছাড়া···ওরা···মানে ছেলেমেয়েরা হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছে কী এত কথা···'

'না, না, এখন সবচেয়ে জরুরি তোমার স্বামীটির চালচলন, অন্যসব ব্যাপার থাক। চা হবে'খন পরে।

'আর এই যে পুরুষসিংহ, এবারে আসল কথাটায় এসো দেখি। খুব যে বড় মুখ করে বলছ স্বামী হিসাবে সব কর্তব্য কর। তোমার রোজগার তো বাঁধা। মাস গেলে মাইনে আর বাড়িভাড়া। এত যে হোটেলটোটেলে অভিসার এসব এলাহি খরচ আসে কোথা থেকে? কি, কোন জবাব নেই, না? বাড়তি রোজগার হচ্ছে তাহলে। অসৎ পথের টাকা অসৎ কাজেই ব্যয় হয়। সব দিক দিয়েই গোল্লায় গেছ দেখছি। তা তো হবেই। সংসারের প্রথাসিদ্ধ পথে চলতে গেলে শুধুমাত্র মুণ্ডটাকে রাস্তা থেকে বের করে দিয়ে তো ফান অ্যাণ্ড গেমস হয় না, পুরোটাই বেরিয়ে আসতে হয়। ঘরের তুমি আর বাইরের তুমি মোটেই আলাদা নও, দু জায়গাতেই তুমি বিশ্বাসঘাতক, আন প্রিন্সিপিলড্ সুবিধাবাদী।'

একটানা বলে দম নিতেই যেন থামলেন। আর কারো মুখে কথা নেই, যেন কোন প্রতিক্রিয়াও নেই। বিমলের হাতে যে দুপয়সা আসছে সতীর বিলক্ষণ জানা। কোনদিন কিছু প্রশ্ন তোলেনি। ধরেই নিয়েছিল লাভটা তার সংসারেই কোন না কোন ভাবে আসবে। সৌখীন জামাকাপড়, ছেলেমেয়েদের সখের হাজার রকম ইলেকট্রনিক গুডস, সকলের বাড়ি আজ এক একটি প্রদর্শনী। সেই বা বাঁধা মাইনের সরু গলিতে হিসেবের আঁকাবাঁকা মোড় পেরিয়ে কষ্টেসৃষ্টে দমবন্ধ হয়ে চলবে কেন? একটু ঘাবড়ায়। ভাসুর তাকে আবার এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না তো?

অনিলবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। এবারে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু সুরু করেন,

'দেখ, তোমরা মানে তথাকথিত আধুনিক ভারতীয় পুরুষ, তোমরা হচ্ছ ধোবি কা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা। না আছে তোমাদের প্রাচীন বর্ণহিন্দুর চতুর্বর্গ চতুরাশ্রমে বাঁধা জীবনচর্যা, না আছে পশ্চিমের যুক্তি ও বিজ্ঞাননানা

মানবিক সততা। ইউ হ্যাভ নো ক্যারেক্টার অ্যাট অল। না, চরিত্র বলতে আমি শুধু নারীসংসর্গের কথা বলছি না, টোটাল পার্সোন্যালিটির কথা বলছি। কর্মক্ষেত্রে, বিশ্বাস সবকিছুর কথা বলছি। সব মেরুদণ্ডহীন জেলিফিশ।'

সতী এখন পালাতে পারলে বাঁচে। বক্তৃতাটা এখন যে মোড় নিয়েছে তাতে সমস্যাটা প্রায় চাপা পড়ে যেতে বসেছে। এরপর হয়তো আরও অ্যাবস্ট্রাক্ট আরও জেনেরালাইজড হয়ে জাতি, সমাজে পৌঁছবে। ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ কী করছে দেখলে হত। বড় ছেলে না হয় এখনো ফেরে নি, তার তো টো টো করে রাত আটটা-নটায় ফেরা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ছোট দুজন, ক্লাস টেনে পড়া মেয়ে সীমা আর সেভেনে পড়া ছোট ছেলে অমল, এরা এতক্ষণ কোথায়। সাধারণত বড়বাপা অর্থাৎ জ্যাঠামশাই এলে আগে ভিড় করে আসে ভাইপো ভাইঝি, এদের কাছে অনিলবাবু প্র্যাকটিক্যালি 'জেজাবাপা' বা ঠাকুর্দা এবং 'বড় বউ'ও 'জেজামা'র মত পিঠেপুলি করে পাঠান। খালি হাতে বোধহয় এই প্রথম আসা। প্রশ্রয়দাতা স্নেহশীল গুরুজন এঁরাই। আজ সব রুটিন বানচাল। সতীর প্রায় ইচ্ছে হয় আলোচনাটা এখানেই থেমে যাক।

এবারে অনিলবাবুর টারগেট সতী,

'কটকের জমিটাতো তোমার বাবা বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিলেন? বাড়ি তোমার নামে তো?'

সতী মাথা নাড়ে, না। বিমল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

'আজ্ঞে আমার নামে করতে হয়েছিল। অফিস থেকে হাউস বিল্ডিং লোন নিয়ে করা, তাই। ওর তো তখন মাইনে অনেক কম ছিল, বেশি এমাউন্টের লোন এনটাইটেল্ড্ ছিল না—'

'থাক থাক আর জাস্টিফাই করতে হবে না। একটা কোম্পানীকে তো ভাড়া দিয়েছ শুনেছি, তলায় অফিস, ওপরে রিজিওন্যাল ম্যানেজারের রেসিডেন্স। মোটা টাকা ভাড়া পাচ্ছ তাহলে।'

'আজ্ঞে···আজকাল যে রকম রেট···'

'হয়েছে হয়েছে। এবার থেকে বাড়িভাড়ার পুরো টাকা এবং মাসের মাইনে স্ত্রীর হাতে তুলে দেবে। আর তুমি', এবারে লক্ষ্য সতী, 'তুমি ওর হাতখরচ বাবদ যেটুকু ন্যায্য মনে কর সেটুকুই দেবে। তোমার নিজের উপার্জন তো নিশ্চয়ই আলাদা অ্যাকাউণ্টে রেখেছ?'

সতী মাথা হেলায়, 'আমার মাইনে আমিই রাখি।'

'যাক সেটুকু অন্তত সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। এখন থেকে এই সংসারের পুরো আয় তোমার হেফাজতে।'

সতী মনে মনে ভাবে, আর বাড়তি আয়টা, সেটার খরচ কিসে তার হিসেব?

'আর এই বিমল যখন এত সনাতন হিন্দু ট্র্যাডিশান, পলিগ্যামি এসব বড়বড় কথা বলছে তখন তার একটু সনাতন নিয়ম মানা ভাল। বয়স তো পঞ্চাশ হতে চলল, শাস্ত্রমতে পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবার কথা। কালাহাণ্ডির জঙ্গলে দু'চার বছর থাকলে সব দিক দিয়েই মঙ্গল। তা সেই কী যেন নাম বললে মোহিনী না বিনোদিনী, সে তো নিশ্চয়ই কালাহাণ্ডি ধাওয়া করে তোমাকে প্রলোভন দেখাতে পারবে না। তোমাদের ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের জয়েন্ট সেক্রেটারি দুজনেই আমার ছাত্র ছিল এককালে। এখনো দেখা হলে নমস্কার করে। আমার পরিবারের সম্মানের জন্য ওদের বললে তোমাকে বদলি করে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর কালাহাণ্ডি তো এখন ইণ্ডিয়ার ফোকাল পয়েন্ট, দেশের সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট। কালাহাণ্ডিতে ট্রান্সফার অর্ডার বেরুলে আর তারি নড়চড় নেই, পুরো তিনটি বছর ওখানে কাটাতেই হবে। তোমার পক্ষে কালাহাণ্ডি ইজ দ্য সলিউশান।'

'আজ্ঞে···না···না', বিমল ব্যাকুল, মুখচোখ দেখলে মনে হয় এই বুঝি পায়ে পড়বে, 'আজ্ঞে, আমাকে একটা সুযোগ দিন। ভুলতো মানুষ মাত্রেই করে। আমি·· আমি প্রতিজ্ঞা করছি···মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করছি আমি শোধরাব, বিনোদিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না···জাস্ট গিভ মি অ্যা চান্স।'

সতীও কালাহাণ্ডির কথায় চমকে গিয়েছিল। কোয়ার্টারের কী ব্যবস্থা হবে। গাড়ির ড্রাইভার পিয়ন কোথা থেকে আসবে, ছোট ছেলে, মেয়ের ম্যাথস সায়ান্স কে দেখবে, গ্যাস···। তার চিন্তায় বাধা পড়ে,

'শোধরালেই ভাল। তবে আমার কাছে দ্বিতীয়বার কিন্তু ক্ষমা প্রত্যাশা ক'র না।' সতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি সাক্ষী রইলে।'

এণ্ড অফ অ্যাকশান। জীবননাট্যে রঙ্গমঞ্চের একদিকটা এখন অন্ধকার হয়ে গেল। আরেক দিকে জ্বলে উঠল আলো। সতীর ড্রয়িংরুম থেকে ফিরে আসি কলেজে, সায়ান্স স্টাফরুমে। গতকাল থেকে আজকে। এবারে কুশীলব আমি এবং সতী। একে অন্যে, মানুষে মানুষে পরস্পর জড়িয়ে অতীত বর্তমানের শিকলে গাঁথা হয়ে জীবনকাহিনী এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে।

'বাঃ তোমার ভাসুর তো দারুণ লোক সতী', আমি উচ্ছ্বসিত, প্রায় মুগ্ধ, 'সত্যি তোমাদের সমাজে জয়েন্ট ফ্যামিলি একটা লিভিং ট্র্যাডিশান। উই বেংগলিজ আর সো ডেকাডেন্ট আমাদের ওখানে নো বডি কেয়ারস। কলকাতায় কোন শ্বশুর ভাসুর বাড়ির ছেলের এম্প্লয়্যা ম্যারিটেল অ্যাফেয়ার্সে মাথা ঘামাবে না। ওটা তার বৌয়ের এরিয়া। হ্যাঁ ডিভোর্সটিভোর্সের ঝামেলা হলে বৌয়ের হাজার দোষ বেরুবে। এইভাবেই তো আমাদের সমাজ ভেঙে যাচ্ছে। জয়েন্ট রাখতে হলে পরিবারের কর্তাকে এইরকম জাস্ট অ্যাণ্ড কনসিডারেট হতে হয়।

আমি আরও গড়গড় করে, পরিবারের কর্তার রোল সম্বন্ধে ছোটখাট বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সতী মাঝখান থেকে বলে উঠল,

'ভাববেন না আমাদের সমাজে সব ফ্যামিলিতেই এরকম কর্তা। ইনফ্যাক্ট আমাদের 'ভাইনা' হচ্ছেন একসেপশান। দ্যাটস হোয়াই আই রেসপেক্ট হিম।'

'করাই তো উচিত। এরকম ব্রাদার ইন-ল কে না রেসপেক্ট করবে বল, আমিও করতুম।'

'কেন, আপনার ইন-ল'জরা কি ইনকনসিডারেট—বঙ্গালিরা তো ইউজুয়েলি প্রগ্রেসিভ।'

'না, না সেরকম প্রবলেম কিছু নেই। ইনফ্যাক্ট ছোট ছোট স্ক্যাটারড্ ফ্যামিলি, সবই লাইভলিহুডে নেসেসিটি, আমার ভাসুর থাকেন বম্বেতে, শ্বশুর শাশুড়ি কলকাতায়, আমরা এখানে। আমাদের মধ্যে তো সেরকম বন্ধন মানে টাইজ আর নেই।'

'তাতে কি লাভ হয়েছে ভাবেন?'

'টু বি ফ্র্যাংক লাভক্ষতি দুটোই আছে। ইটস্ অ্যা ফ্যাক্ট আমি অনেক ফ্রিডম পাই, ডিউটিজও কম, তেমন কারো হেল্পও পাই না। লুক অ্যাট ইয়োর সিচুয়েশান। ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম, যেটা এঁরা শেয়ার করছেন; সবাই তোমার পেছনে আছেন। দ্যাটস অ্যান অ্যাডভানটেজ, অ্যা ডিস্টিংকট অ্যাডভানটেজ, আই টেল ইউ। তুমি একলা থাকলে নিজেকে শুধু স্ত্রী মনে করে কত ডিপ্রাইভ্ড ফিল করতে। কনজারভেটিভ্স ড হ্যাভ আ পয়েন্ট, বিয়েটা পরিবারের, দুজন ব্যক্তিবিশেষেরই শুধু নয়, পরিবারের বৌ হিসেবে, ছেলের মা হিসেবে তোমার অধিকার, পাওনা গণ্ডা ষোল আনা আদায় কর। ছাড়বে কেন ফাইট ইট আউট, সতী, ফাইট ইট আউট।'

সতী মাথা হেলায়, হ্যাঁ। আমি খানিকটা উত্তেজিত। অন্যের ব্যাপারে কেন যে এত ইনভলভ্ড হই। সুবীর ঠিকই বলে, আমার গায়ে এত লাগে কেন। কেন যে লাগে সেটা যেন জানা নেই। ন্যাকামি।

চুপ করে থাকি খানিকক্ষণ। ঘড়ি দেখি, চারটে বাজে। ব্যাটা দয়ানিধি ঘুম থেকে উঠে দুমদাম করে আলমারিতে রেজিস্টার চকের বাক্স, ডাস্টার সব ঢোকাচ্ছে। অর্থাৎ এবারে কমনরুমের দরজায় তালা দিয়ে সে কাটতে চায়। যদিও সে অফিসস্টাফ এবং ১০টা-৫টা ডিউটি করার কথা। এই ক্লাস ফোর এমপ্লয়িরা দিন দিন যা হচ্ছে। ওঠার উপক্রম করি।

চল, এবার যাওয়া যাক। আমি তো সারকিট হাউসে নেমে যাব, তোমাকে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসবে'খন। আমার তো ফিরতে ফিরতে সেই রাত আটটা।

'সে কি ম্যাডাম এখনো কোয়ার্টারের কিছু হ'ল না? কী আশ্চর্য। ডিপার্টমেন্টাল হেডদের যদি এই অবস্থা তাহলে তলার দিকে কি যে হাল···'

'অথচ আমরা প্রথম যখন ভুবনেশ্বরে পোস্টেড হই ছাট ওয়াজ সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান আই থিংক, উই স্টেট মুভড্ ইন আ কোয়ার্টার। সারকিট হাউসে ক'দিন ছিলাম, ছাটস অল। তখন মনে কর উনি মোটে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন, অ্যা জুনিয়র পোস্ট। এভরিডে থিংস আর বিকামিং ওয়ার্স…'

'হবে না, পলিটিশিয়ানদের দেখুন না। যত ভাল বাড়িগুলো নিয়ে কী অবস্থা করে রাখছে, এছাড়া জার্নালিস্ট জাজ সবাই এখন গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারে থাকছে।'

'দিস ইজ সামথিং ভেরি স্ট্রেঞ্জ, আই বিলিভ দিস ইজ পসিবল ওনলি ইন ওড়িশা। প্রেস অ্যাণ্ড জুডিশিয়ারি শুড বি ইন্ডিপেনডেণ্ট অফ দ্য গভমেণ্ট…'সিড়ি দিয়ে নীচে নামি। গাড়িতে উঠি। সেই জাজদের সরকারি বাড়ি পাওয়া নিয়েই কথা উঠল। লনে বসে সুবীর জানাল,

'শামল, মানে প্রাইভেট সেক্রেটারি বলছিল এবাড়ির যেসব কাজের কথা বলা হয়েছিল সেইসব রিপেয়ার এট্সেটেরা স্যাংশানও হতে চলেছে ; জি. এ. ডিপার্টমেণ্ট থেকে নাকি জিজ্ঞাসা করছিল স্যার তো নিশ্চয়ই ভুবনেশ্বরে শিফ্ট করবেন, এখন কি আর কটকের বাড়িতে কাজ করাবেন। আই থিংক দে হাভ অ্যা পয়েণ্ট। ভাবছি এ বাড়ির কাজের ফাইল আর পারসু করব না।'

কিন্তু কিন্তু করে বলি,

'কবে ভুবনেশ্বরে বাড়ি পাব, শিফট করব, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এদিকে এখানে তো অসুবিধাগুলো সবই ভোগ করতে হচ্ছে। বাউণ্ডারির তারের বেড়া প্রায় নেই বললেই হয়, যদচ্ছ গরু ঢুকছে, রাস্তার কুকুরের আড্ডা হয়ে যাচ্ছে। আউট হাউসে জানালাগুলোর পাল্লা ভেঙে গেছে, পেছনের দরজাটার অবস্থা শোচনীয়, ওটাতো রীতিমত সিকিউরিটির প্রশ্ন। যে পরিমাণ দেওয়াল ড্যামেজ হয়ে রয়েছে আর একটা বর্ষা কিন্তু আমি এখানে কাটাতে পারব না বলে দিলাম।'

'তাহলে আবার লাগব বলছ ?'

'দেখ বাড়ির কাজ করিয়ে নিলে ক্ষতি তো নেই। ফেলা তো আর যাবে না। আমরা না হয় ভোগ নাই করলাম, আমাদের পরে যারা থাকবে তারা করবে। তোমাদের ক্যাডারেরই তো কেউ আসবেন।'

'আরে সেইখানেই তো খোঁচ। শামল ডিপার্টমেণ্টে শুনে এসেছে এ বাড়ি সার্ভিসের কাউকে আর দেওয়া হবে না, কোন জাজকে নাকি অ্যালট করা হচ্ছে।'

'তাহলে আর ঝামেলায় কাজ নেই।'

খেতে বসে ভাতের চেহারা দেখে প্রতিদিনের মত আমাদের দুজনেরই মেজাজ খারাপ। সেই মোটা মোটা লালচে চাল। এখানে সরু ভাল সেদ্ধ চাল পাওয়া

যায় না। আমরা বাঙালিরা সাধারণত যে চাল খাই সরকারি পরিভাষায় তার নাম বেংগল রাইস। সেটি বাংলার বাইরে দুষ্প্রাপ্য। এখানে আতপ চাল নানা রকমের ও গুণের পাওয়া যায়। আমাদের ওড়িশাবাসের প্রথম বছর দশেক মনের সুখে ভাল আতপই খাওয়া হত। দেখা গেল সুবীর আমাকে 'বঙ্গপ্রেমিক' নামে খেপালেও তার পেটটি কম বঙ্গীয় নয়। ক্রনিক হজমের গণ্ডগোল, কনস্টিপেশান ও গ্যাসট্রিক প্রবলেম। অতএব রুটি ও / অথবা সেদ্ধচাল অবশ্য বরাদ্দ। দিনের বেলা ভাত খাওয়ার সুবিধা নেই, দুবেলা রুটি মুখে রোচে না। অতএব প্রতিরাতে অন্ন দেবীর মূর্তিখানা দেখে চামনমণির জন্য হাহুতাশ।

আজকের মেন্যু বাটি চচ্চড়ি ও সেই আদি অকৃত্রিম পোনা মাছের ঝোল। বাটি সাজিয়ে দিতে দিতে বলি,

'ভুবনেশ্বরে গিয়ে তো আবার বাড়ির কাজের জন্য লাগতে হবে। যে কোয়ার্টারই জুটুক না কেন নির্ঘাৎ একগুচ্ছের কাজ করাতে হবে। বছরের পর বছর বাড়িগুলো পড়ে থাকে, মেনটেনেন্স বলতে গেলে নিল। যে নতুন অকুপাই করবে তার ঘাড়ে মেরামতের বোঝা পড়বে। এটাই এখন রেগুলার সিসটেম।'

'তাও কি সহজ ?' সুবীর তার প্রিয় বাটি চচ্চড়ি দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলে,

'এই কটকের বাড়িসারাইয়ের জন্য কবে থেকে লেখালেখি করছি বলতো ? সেই আমাদের দিল্লি থেকে স্টেটে ফেরার পর। কতদিন হল ? বছর আড়াই ?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, বেশিই হবে।' আমি ডালটা মাখতে মাখতে উত্তর দিই।

'তুমি তো প্রথমে এলে সেটলমেণ্টে, তারপর কনসোলিডেশানএ। বাড়ি দুমাস পরে খালি হ'ল মনে নেই ? সারকিট হাউসে জিনিসপত্র নিয়ে কি হয়রান, কী করে যে ভুলে যাও।'

'এবারে বাড়ি পেলে তুমি বরং সব দেখেশুনে কী কী করতে হবে ব'ল। যদি সম্ভব হয় কাজগুলো করিয়ে তারপর শিফট করব।'

'সব কাজ তো সেরকম করা যাবে না। জানই তো বাস না করলে কোন বাড়ির সুবিধা অসুবিধা বুঝতে পারা যায় না।'

'ইন এনি কেস আবার সেই পর্ব', সুবীরের ক্লান্ত মন্তব্য।

সত্যি, ক্লান্ত হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়। প্রত্যেকটি বাড়ির পেছনে আমলা-তন্ত্রের নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন দপ্তর ইনভল্ভড্। রাজমিস্ত্রির কাজ ও জানালাদরজা পি ডবলিউ ডি (পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট), জলকলবাথরুম, পি এইচ ডি (পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট), বাড়ির ভেতরকার ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও ইনস্টলেশান জি ই ডি (জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট), মেইন সুইচ, মিটার ও কানেকশান সাপ্লাই (ইলেকট্রিক সাপ্লাই), বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ নার্সারি

সেকশান, জি এ ডি (জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ডিপার্টমেণ্ট)। ওভার অল চার্জ অর্থাৎ সবার ওপরে জি এ ডি। বড় বড় মন্দিরে প্রধান বিগ্রহটিকে সেরে দর্শনার্থীরা যেমন চৌহদ্দির ভেতরে চারিপাশে ছড়ানো মিনি মন্দিরের মাইনর দেবদেবীকে সভক্তি পুজো দিয়ে তবে পবিত্র কর্তব্য সমাপ্ত করেন, তেমনি আমরা সরকারি বাড়ির বাসিন্দারা জি এ ডি পার করে বিভিন্ন দপ্তরে অর্ঘ্য পাঠাই। সেই সনাতন ছাঁচটি চলে আসছে সর্বত্র—কি বাড়ি মেরামত, কি স্ত্রীপুরুষসন্তান সম্পর্কে।

'সব রকম কাজ করতে করতে আবার কত দিন লেগে যাবে কে জানে। ততদিনে হয়তো আবার কটকে বদলি হয়ে আসব। বদলির চাকরিতে তো স্থিতু হবার উপায় নেই।'

'দিব্যি আছে', শক্ত মুখে সুবীর মাছের কাঁটা ছাঁড়াতে ছাড়াতে বলে,

'ভুবনেশ্বরে দশপনের বছর একাদিক্রমে রয়েছে এমন অফিসার প্রচুর। তবে তারা সব ইনসাইডার। সব অসুবিধাজনক নীতিই শুধু আউট সাইডারদের প্রতি প্রযোজ্য।'

ওড়িয়া সামাজিক রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসে ভূমিপুত্রের স্থান সর্বোচ্চে। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সর্বাগ্রে। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে এটি অলিখিত সর্বজনীন কার্যক্রম। বেচারা সুবীরের অত্যন্ত সেনসিটিভ পয়েণ্ট। বড় বড় দপ্তর, ক্ষমতার পদ বেশির ভাগই ভূমিজদের কবলে।

'ও তো জানা কথা', মাছের কাঁটা আমার বিরক্ত লাগে, কেন যে বড় কাটা রুইকাৎলা পাওয়া যায় না। সাবধানে গাদার পিসটা থেকে কাঁটা ছাড়াই, একেবারে ল্যাজার দিকের, মাছ। সুবীর তো কাঁটা খেতে পারে না, কাজেই আমার ভাগেই রাখি।

'তোমরা হচ্ছ গিয়ে পরের ছেলে, আশ্রিত বললেই ভাল। তোমরা কি আর নিজের ছেলের মত দক্ষিণখোলা বড় ঘরটি পাবে? তোমাদের জন্য গোয়ালঘর, আস্তাবল। গরমের দিনে দাওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ কিনা কটকের রেভিনিউয়ের পোস্ট, পুঁয়েপড়া লোকসানের পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিং আর ট্রেনিং তো আছেই। খুব কপাল ভাল তোমার যে ছোটখাট ডিপার্টমেণ্ট একটা পেয়েছ। একেবারে সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশের অধিকার। কাউণ্ট ইয়োর ব্লেসিংস।'

'যা বলেছ। জাতীয় সংহতির জন্য শুধু আমরাই বলি প্রদত্ত। নেতারা যে যার রাজ্যে থাকবেন।'

'মেরা ভারত মহান।' দুহাত বিস্তৃত করে কত মহান দেখাই। দুজনেই হাসি। জাতীয়তাবাদের যে টক ফলটি আমাদের বাপঠাকুর্দা গলাধঃকরণ করেছিলেন তারজন্য আমাদের দাঁতটি একেবারে টকে গেল। বরাবরের জন্য।

পরদিন কলেজে স্টাফরুমে ইকো-র ডঃ সর্বেশ্বর পট্টনায়েক ও আমি মুখোমুখি।

তখন বেলা পড়ে এসেছে, কমনরুম ফাঁকা। গাঁজাটাজা খাওয়ার সেই ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক আমাকে এড়িয়ে চলেন। আমিও কিছুই হয়নি এমন ভান করি। আজ নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে আলাপ সুরু করলেন।

নমস্কার, ম্যাডাম, ভাল তো?'

'নমস্কার, এই চলছে আর কি।'

'কমনরুম কিরকম ফাঁকা দেখছেন। সেশান শেষ হতে চলল, কোর্সও প্রায় খতম। আপনাদের ইংলিশে ছেলেমেয়েরা আসছে?'

'জেনারেল রুমে কিছু কিছু আসছে। টিউটোরিয়েলগুলো ফাঁকা। অবশ্য আর্টসের ছেলেমেয়েরা তো এমনিতেই ফাঁকিবাজ, কোনদিনই টিউটোরিয়েলের মধ্যে বিশেষ নেই। আপনাদের সাবজেক্টে কী অবস্থা?'

'ঐ একই। ডিসকাশনের দিন আসে, লেখার দিন নেই। খাটুনির কথা বলেছেন কি ব্যস হয়ে গেল। খালি শুনবে। প্যাসিভ অ্যাক্টিভিটি।'

আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিই। ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে সুরু করেন, যেন এতক্ষণ নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। সেদিনের ঘটনায় কোন স্টেপ কেন নেন নি তার একটা অ্যাকসেপ্টেবল জাস্টিফিকেশান আমাকে দেবেন। আফটার অল, ও রুমটায় ওঁরই তো ক্লাস ছিল।

'আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা হয়েছে ম্যাডাম, একেবারে ইন্‌করিজিবল। কাউকে মানে না, রেসপেক্ট করে না, অবাধ্য অসভ্য হওয়াটাই যেন কৃতিত্ব। অ্যান্টিসোস্যাল আর নরম্যালএর মধ্যে তফাৎটা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সেদিনের ইনসিডেণ্টটা মনে আছে? ছাট বয় সুকান্ত, সুকান্ত মহান্তি? দুটি মেয়েকে পাকড়ে তাদের দুকাঁধে হাত রেখে মাঝখানে বসে কী না কী খাচ্ছিল? কী যে সাংঘাতিক স্পেসিমেন আপনি ভাবতে পারবেন না। ক্লাসের তো ধারে কাছে নেই, দিন রাত হিরো হণ্ডায় চড়ে হিরোর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ কলেজের ক্যাম্পাসে থাকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে নিয়ে হো হো করে। ড্রেস দেখেছেন? আর চুল কাটা? কে যেন সেই হিন্দি ফিল্মের হিরো, হ্যাঁ হ্যাঁ সঞ্জয় দাত্। এই সব হচ্ছে মডেল, আদর্শ। সেদিনের ঘটনাটা রিপোর্ট করি নি কেন জানেন? ওর বাবা আমাদেরই সিনিয়র কলিগ প্রফেসর সুরেশ মহান্তি, বালেশ্বরে এফ. এম. কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, এই তো রিটায়ার করেছেন। কী দুর্ভাগ্য বলুন তো বেচারা ভদ্রলোকের? আমি শুধু ওর বাবার কথা ভেবেই কিছু করি নি। এদিকে আমি ডিসিপ্লিনের চার্জে আমার কি অবস্থা বুঝুন। ওর লেটেস্ট কীর্তি শুনেছেন? শনিবার সন্ধ্যেবেলা দারোয়ান বাহাদুরকে কিছু টাকা আর একবোতল দিশি দিয়ে কলেজের গেট খুলিয়ে একটা মেয়ে নিয়ে ভেতরে কোন ঘরে নাকি ছিল দু ঘণ্টা। ভাবতে পারেন কোথায় নেমেছে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা? ছি ছি, একেবারে গোল্লায় গেছে।'

রীতিমত শকড্ হয়ে যাই। সত্যি ব্যাপারটা সিরিয়াস।

'ছেলেটার বাবা-মা এতদিন কী করছিল? রাতারাতি তো একটা মানুষ খারাপ হয়নি। তাছাড়া এ কলেজে যখন অ্যাডমিশান পেয়েছে রেজাল্ট নিশ্চয় ভাল ছিল।'

'সে তো ছিলই। স্কুল ফাইন্যালে হাই ফার্স্ট ডিভিশান। তারপর থেকে ডিক্লাইন। প্লাস টুতে সেকেণ্ড ডিভিশান, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বালেশ্বর থেকে ট্রান্সফার কেস করিয়ে এ কলেজে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি করা হয়েছিল। এখন তো দেখছেন অবস্থা, প্র্যাকটিক্যালি ডেলিংকোয়েন্ট। ভারি খারাপ লাগে। ছেলেমেয়েরা মানুষ না হলে সে কষ্টের কোন সান্ত্বনা নেই।'

'ওর বাবাকে খবরটবর দেন নি? তাঁর তো জানার কথা, এরকম চালচলন তো নজর এড়াতে পারে না।'

'ওর বাবা আসলে একটু অস্থবিধায় আছেন। সেপারেট এস্টাব্লিশমেণ্ট, সেকেণ্ডটাইম বিয়ে করেছেন তো, এ পক্ষে একটি মেয়েও হয়েছে, এ দুই সংসারে সমান মন দেওয়া সম্ভব হয় না।'

এবারে আমি উঠে বসি,

'সেকেণ্ড বিয়ে, দুই সংসার, এসব মানে? ভদ্রলোকের তো বেশ বয়স হয়েছে। ফার্স্ট ওয়াইফ কি ডেড্?'

'আপনি তাহলে কিছুই জানেন না দেখছি, না-না, শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ।'

'অ্যালাইভ? তাহলে ভদ্রলোক ফার্স্ট ওয়াইফকে ডিভোর্স করেছেন বলুন।'

ডঃ পট্টনায়েক জিভ কাটেন,

'না-না, ছি ছি, ডিভোর্স করবেন কেন, চার ছেলের মা, পঁচিশ তিরিশ বছরের বিয়ে। তিনি যেমন থাকবার তেমনি আছেন। আসলে হয়েছিল কি এই মেয়েটি মানে সেকেণ্ড ওয়াইফ, ওঁর বড় ছেলের ক্লাসমেট, পড়তে আসতো, পাকেচক্রে সম্পর্ক একটা হয়ে গেল আর কি, আফটার অল বয়স যাই হোক ঘি আর আগুন। তারপরে ন্যাচারালি হি হ্যাড টু ম্যারি হার।'

আমি একেবারে স্তম্ভিত। জানি বহুবিবাহ প্রথা সমূলে উৎপাটিত হয়নি। কিন্তু কলকাতায় আমাদের সামাজিক পরিধিতে এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ কখনো দেখিনি বা শুনিনি। আমাদের জেনারেশানে বরং দুচারটে ডিভোর্স করে সেকেণ্ড টাইম বিয়ে করছে, কিন্তু একই সঙ্গে দুটি স্ত্রী একেবারেই অসম্ভব। হ্যাঁ গাঁয়েটায়ে ছোটজাতের পুরুষ একাধিক বিয়ে করে বা বৌগুলোকে খাটায়, তাদের পরিশ্রমে পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে খায়। কিন্তু ভদ্রসমাজে বিশেষ করে এরকম হাইলি এডুকেটেড ক্লাসে একজন বয়স্ক বড় বড় ছেলেমেয়ের বাবা

যিনি নিজে অধ্যাপক এবং যাঁর সমাজে একটা লিডারশিপের ভূমিকা আছে তিনি নির্বিবাদে এক স্ত্রী বর্তমানে মেয়ের বয়সী কাউকে বিয়ে করে দিব্যি আর এক প্রস্থ সংসার পেতে বসেছেন উইদাউট এনি ভিজিব্‌ল সোস্যাল কনসিকোয়েন্সজ অর রিঅ্যাকশান, এ তো কল্পনার অতীত। জিজ্ঞেস করি,

'গভমেণ্ট কোন স্টেপ নেয় নি? সরকারি চাকুরে, আর বাইগ্যামি তো ইল্‌লিগ্যাল। ফার্স্ট ওয়াইফই বা কিছু করলেন না কেন?'

'কী আর করবেন। এখন অন্তত ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসারে কর্ত্রী হয়ে আছেন। ডিভোর্স করলে তো রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ত, বাপ-মা বহুদিন গত। কমপ্লেন যে করবেন তাতে তো নিজের আর ছেলেমেয়েরই ক্ষতি, চাকরি গেলে তো এদের স্বার্থেই বাজবে। আইন করে কি সমাজ পাল্টায়।'

'সত্যি, স্বার্থই আসল বন্ধন, আর সব ধাপ্পা। আর সমাজ পাল্টানো।' মুখটা তেতো লাগে। না বলে পারি না,

'আই নাও আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্যাট পুওর বয়। বেচারার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। না পারে বাপকে শ্রদ্ধা করতে, না পারে মাকে। ভেরি, ভেরি স্যাড।'

'কী বলছেন কী ম্যাডাম! ছেলেটির তো কোন অভাব, কোন অসুবিধে নেই। প্রফেসর মহান্তি ইজ আ ভেরি রেসপনসিবল ফাদার। তারপর এটি ছোট ছেলে বলে কত আদরের, যখন যা চায় যোগান দেন। ওঁদের অবস্থা ভাল, ঢেনকানলে প্রচুর জমি, পুকুর, বিরাট সম্পত্তি। ছেলে তো এক্সট্রা টিউশান থেকে স্থরু করে হালফ্যাশানের জামাকাপড়, ইলেকট্রনিক সৌখিন জিনিস, যা চায় তাই পায়। কোন কিছুতে 'না' বলেন না ওর মা। সি ইজ অ্যা জেম অফ আ লেডি, অ্যান আইডিয়েল হিন্দু ওম্যান। দেখুন না কী রকম অ্যাডজাস্ট করেছেন।'

'কিসের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করেছেন? অন্যায়ের সঙ্গে তো?'

আমার বাংলাজ্ঞানের দৌড় যদিও বেশিদূর নয় তবুও রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত লাইনটি জানা। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সয় দুজনেই সমান অপরাধী। কিন্তু ডঃ পট্টনায়কের মুখ দেখে মনে হল কাজটা যে আদৌ অন্যায় সেটা সম্বন্ধেই ধাঁধা আছে। তেড়েফুঁড়ে বলি,

'আদরের ছেলে! এই কি আদরের নমুনা? একটা গ্রোয়িং হিউম্যান লাইফের শুধু খাওয়া পরা হলেই চলে? টাকা খরচ করলেই ছেলে মানুষ হয় এ ধারণা আমাদেরও যদি থাকে তাহলে আর নুভোরিশ কনট্রাক্টর ব্যবসায়ীদের গালাগালি করি কেন? এই ছেলেটির মনের শিক্ষা তার বাপ-মা কী দিচ্ছেন? তার রোল মডেল কে? আদর্শ কে? এই বাপ, এই মা?'

ডঃ পট্টনায়েক কীরকম হতবাক হয়ে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন,

'আপনি খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছেন দেখছি। আপনারা কলকাতা-

টলকাতার লোক, আপনাদের অ্যাটিচ্যুড আলাদা কিন্তু হিন্দু পরিবার ম্যাডাম, হাজার হাজার বছরের সংস্কার, বাবা বলেই ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, স্বামী বলেই মান্য। দোষগুণ বিচারের অধিকার কী আছে। তাছাড়া এমন একেবারে কী পাপ করেছেন? বাপ তো আর চুরিডাকাতি খুন রাহাজানি করেন নি, শাস্ত্রমতে একটি কুমারী কন্যাকে বিবাহ করেছেন। আমাদের দেশে তো বরাবর হিন্দু বলুন মুসলমান বলুন বহু—'

'বিবাহ প্রথা চালু ছিল, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি। প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেছে। সতীর স্বামী বিমলও এই দোহাই দিয়েছিল না? সুবীরের অবচেতন মনেও কি জাতীয় অভ্যাসের প্রশ্রয় লুকিয়েছিল? পিছিয়ে থাকার অনেক সুবিধা। যদৃচ্ছাচারের লাইসেন্স মেলে, বিশেষ করে ন্যাশনালিজম একবার টেনে আনতে পারলে সব নীতিবোধ, সর্বজনীন মাপকাঠি, কোথায় চলে যায়। ভদ্রলোকের ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ি।

'এই যে সুকান্ত ছেলেটি আজ বাধ্য সুপুত্রের মত বাবার দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে পারছে না—অবভিয়াসলি পারছে না—তার কারণ আপনারা বলবেন তো সেই রুট অফ অল ইভিল, ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স? তাই তো? বাপ-মার আচরণের নৈতিকতাকে সে চ্যালেঞ্জ করছে এই তার দোষ? আচ্ছা, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? হিন্দু মানসে শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, লক্ষ্মণ ভরত আদর্শ ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ সখা, সীতা সাবিত্রী আদর্শ স্ত্রী। কিন্তু আদর্শ বাবা কে? এত কাব্যনাটক ইতিহাসে কোন নায়ক পিতা হিসেবে সন্তানের জন্য নিজের ভোগসুখের এককণাও ত্যাগ করেছেন? মুসলমানদের তবুও বাবর-হুমায়ুণের মত টাচিং এপিসোড আছে। আমাদের কী আছে?'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'এসব আপনি কী বলছেন ম্যাডাম! পিতার পক্ষে ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে কী করে? পিতা জন্মদাতা, সেটাই তো সবচেয়ে বড় দান। তাই সন্তানকে পিতৃঋণ শোধ করতে হয়। শুধু ভক্তিশ্রদ্ধা নয়, মানে যাকে বলে আনকোয়েশ্চেনিং ওবিডিয়েন্স তাই তো সন্তানের কর্তব্য।'

'দেখুন যে সমাজে শত শত বছর ধরে কর্তব্য শুধু একতরফা, ছেলেমেয়ে স্ত্রী সকলে নিজেদের স্বাভাবিক, ন্যায্য পাওনা একটিমাত্র পুরুষের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য বিসর্জন দিতে বাধ্য সেখানে সুকান্তরা লং ওভারডিউ। কথায় কথায় আমরা ছেলেমেয়েদের শ্রাদ্ধ করি, দুটো খেলনা কিনে দিয়ে তাদের সেন্স অফ ভ্যালুজ নেই বলে নাক শিঁটকোই। আমাদের কী ভ্যালুজ? ডোন্ট ইউ থিংক উই মেক দেম্ পে ফর আওয়ার সিন্স?' ঘণ্টা পড়ে গেল। ভদ্রলোক খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন।

'আমরা আর একদিন ডিসকাস করব'খন। এখন চলি। আপনি কি একলা

বসে থাকবেন ম্যাডাম?'

সামলে নিতে চেষ্টা করি। সত্যি আজকাল অল্পতেই সেলফ্ কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলছি। কী যে হয় আমার! প্রেসারটা দেখাতে হবে।

'হ্যাঁ, বসতে হবে। আমার তো বসে বসেই দিন কাটছে।' একটু হেসে সহজ হতে চেষ্টা করি। ডঃ পট্টনায়েক নমস্কার করে বেরিয়ে যান। ঘর ফাঁকা হয়ে যায়। একা বসে থাকি।

সেই 'বসে' থাকার মূল্য দিতে হয় ছুটির দিনে। ভুবনেশ্বর বদলির পর থেকে সংসারের যা হাল হয়েছে। কড়াইডেকচিফ্রাইপ্যান কালি ঝুল, গ্যাস বার্নারের ফুটোগুলো জ্যাম, প্রায় জলে না, ঘর দুয়ার ফার্নিচারের আনাচেকানাচে ময়লা, কার্পেটটায় পা দেওয়া যায় না, বাগানভর্তি আগাছা, অপরাজিতা লতা মরোমরো, ফুলগাছগুলো রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই তো লাল ও গোলাপি দুটো রঙের পয়েন্টসিটিয়া ছিল, লালটা দেখছি না, একটা সাদা মুমাণ্ডা নেই। শাকসব্জির কথা তুলছি না, ও তো এমনিতেই এদের দ্বারা হয় না। ওড়িশা ক্যাডারের আই. এ. এসের সঙ্গে আমার যখন বিয়ে ঠিক হ'ল, মাসিপিসিরা বলেছিল, 'ভালই হ'ল চিত্রা আরামে থাকবে, ব্যাকওয়ার্ড স্টেট, কাজের লোক ঢের, এই আমাদের কলকাতার মত ঠিকে ঝিদের যুথনাড়া সইতে হবে না।'

স্টেটে পা দিতে না দিতেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত। কাজ কেউ জানেও না, করতে চায়ও না। ঘর করনার সবচেয়ে মোটা দাগের কাজ যাতে নাকি মাথা-টাথা লাগেই না, সেগুলোও এদের দায়িত্বে দেওয়া যায় না। তেলমশলার ছাপ লাগা আধমাজা বাসন, হাড়ি কড়াইয়ের পেছনটা মাজার প্রশ্ন নেই। একবার আগুনে বসল তো ব্যস্, হিন্দু নারীর কলঙ্কের মত চিরকাল দাগী হয়ে রইল। অথচ কলকাতায় যুথনাড়া ঠিকে ঝিদের কৃপায় মা এবং শাশুড়ির রান্নাঘরে ঝকঝকে বাসন শোভা পায়। ওখানে মেঝেতে প্রায় মুখ দেখা যায়, প্রতিদিন মুছে চকচকে। এখানকার ম্যাটমেটে ছোপধরা সিমেন্ট সপ্তাহে গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছাড়া জলের ছোঁয়া পড়ে না। আমি অবশ্য প্রথম থেকেই বলে দিয়েছি আমার এই স্ট্যাণ্ডার্ড চলবে না, রোজ ঘর মোছাই, বাসন মাজাই। বকাবকি করি। কথা শুনি 'বঙগালি ঘরে কামঅ বেশি'। কাপড় দুবার দুমদাম পিটে জল ছিটিয়ে শুকোতে দেখলে তেড়ে যাই। এইটেতে খুব অবাক লাগে। কল খুলে দিলেই জল। বেশি ধুতে কার্পণ্য কেন। আসলে নিজেদের বাড়িতেও এরা এরকম নোংরা-মোংরাই থাকে। কোয়ালিটি অফ লাইফের কোন কনসেপ্ট তো দূরের কথা বেসিক হাইজিন, মামুলি স্বাস্থ্যবিধি জানা নেই। তাই এত অসুখবিসুখ, প্রতিদিনই শুনি হয় এর স্ত্রীর পেট খারাপ, নয়তো ওমুকের ছেলের গাডভি ঘা। আরশুলার জীবন এবং আরশুলার মতই প্রজাতি হিসেবে

টেঁকসই। বিদেশী আক্রমণ থেকে সুরু করে ভবিষ্যতে নিউক্লিয়ার ডিভাস্টেশানও এরা সারভাইভ করবে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এদের চাষবাস খেত খামারের অনভিজ্ঞতা। আমরা শহুরে লোক মাটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এরা গাঁ থেকে এসেছে এদের কৃষিপ্রধান জীবন-যাত্রা। মালি পিয়ন সবাইকে ডেকে বললাম, দ্যাখরে প্রচুর জমি আছে। বীজ চারা যা লাগে আমি কিনে দিচ্ছি, শাকসবজি যা ফলাবি নিজেরা খা, খালি আমাদের দুটি প্রাণীর যেটুকু লাগে সেটুকু দিলেই চলবে।

মহা উৎসাহে ডাঁটা শাক, কাঁচা লংকা, বেগুন, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ - অর্থাৎ অতি সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারি লাগানো হ'ল। শাক পচে গেল, কুমড়ো লতা আর ঢ্যাঁড়শ গাছে পোকা লাগল, ইটের মত শক্ত বেগুন যা ফলল তাও সাইজে এই টুকুটুকু আর বিচিভর্তি, আর কাঁচা লংকা কোন অজ্ঞাত কারণে সরু সুতোর মত গজিয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এসব বিপর্যয়ের কারণ বা প্রতিকার কারো জানা নেই যদিও গাঁয়ে কতবার নিজেদের, পাড়া পড়শীদের এধরণের দুর্ভাগ্য হয়েছে তার সাল তারিখ সহ অত্যন্ত সজীব বর্ণনা শোনা গেল। গাঁয়ে তাহলে তারা কী খায় – এই প্রশ্নের জবাবও মজুত – যা পাওয়া যায় তাই, নুন পেঁয়াজ ভাত। যাদের জমি নেই সেই আরও গরীব নিরক্ষর ছোটজাত এদের মত জমিওয়ালা সাক্ষর মাঝারি ও উঁচুজাতের চাষবাস করে, শাকসবজি ফলায়, গাই গরু দেখে। তারা কাদের কাছ থেকে শেখে? সাতজন্ম এই কাজ করছে, আপনি থেকেই জানে। তাহলে এরা কী কাজ জানে? কোন উত্তর নেই। ওড়িশাতে এত বছরে কত কর্মপ্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার ছকটি আদি, অকৃত্রিম এবং স্থায়ী। কুশীলব একটি বয়স্ক পুরুষ – সাধারণত সুবীরের অফিসের একটি বয়স্ক ঘাগু পিয়ন – সঙ্গে বিশ থেকে ছাব্বিশ বছরের একটি জোয়ান ছেলে এবং আমি।

বয়স্ক : মাকু নমস্কার কর। (প্রার্থীর কোমর থেকে ঝুঁকে আমাকে নমস্কার)

আমি : তমে কামঅ করিব? (প্রার্থীর চোখ আমার পায়ে, সম্মতিসূচক মাথা নাড়া)

আমি : কন কন কামঅ জানিচঅ? (প্রার্থী নিরুত্তর)

বয়স্ক : আইজ্ঞা, কামঅ তো কেরে করিনি, পাঠঅ পড়ুথিলা, সপ্তমরে উটিলা তার বাপা আউ পড়াই পারিলা নি। (সর্বৈব মিথ্যা, বয়স দেখলেই বোঝা যায় প্রতি ক্লাসে অন্তত বার তিনেক ফেল। মোস্ট প্রোবাবলি আ ড্রপ আউট)

গরিবঅ আইজ্ঞা পাঁচ সাতটা পিলা কন করিবঅ? মতে আমি কিরি ধরিলা, 'ভাইনা পিলাটিকু কোউঠি রখাই দিঅ। (ডাউটফুল, নিজেই সম্ভবত ডেকে এনেছে একমাসের মাইনের বদলে কাজ জুটিয়ে দেবে

শর্ত করে) আইজ্ঞা পিউসীপুঅ, নাহি কিমিতি করিবি? (নিজের পিসি কি গ্রাম সম্পর্কের পিসি ঈশ্বর জানেন) মু সাহেবঅকু কহিলি, আইজ্ঞা আপনঅ মালিকঅ, মাবাপ, আপনকু ছড়া মু আউ কাহাকু জানি নি (অর্থাৎ স্থানীয় অফিসারদের কাছে পাত্তা পায় নি তাই বঙ্গালির দ্বারস্থ হয়েছে) টিকে দয়া করন্তু।

আমি : গাঁরে জমি তো থব? (হুঁ, অছি) চাষঅ কাঁহিকি করুনঅ?' মুরুব্বির ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করি। ওড়িয়াজ্ঞান আমার সামান্য তবুও কোথায় যেন একটা প্রবাদ শুনেছিলাম কেন জানি না মনে আছে।

আপে চষিবু পুরা চাষ
ছতা জোতা অধা চাষ
মুলিয়া চাষ ফসরফাস।

বয়স্ক : আইজ্ঞা আমে তো কেবে হল ধরিনু, বহারে কামঅ ধামঅ কলু, জমি সবু মুলিয়া চষে।

আমি : এইঠি তো ঘর কামঅ ছড়া আউ কামঅ নাহি। পারিব?

বয়স্ক : হঁ আইজ্ঞা, সবু পারিব। আপন দিনে দুইদিন দেখাই দেবে সবু শিখি যিব। ভারি বুদ্ধিয়া পিলাটে…'

'দিনে দুইদিন' থেকে এক দেড় বছর কেটে যায়, ঘরের কাজ পেছনে লেগে লেগে কোনক্রমে আদায়, এদিকে অফিসে চাকরি করে দেওয়ার জন্য মাথা খেয়ে ফেলে। সকলের জীবনের লক্ষ্য – একটি চতুর্থ শ্রেণীর চাকরি, যেখানে শারীরিক পরিশ্রম নেই। পড়াশুনা মাথার কাজের প্রয়োজন নেই। নেই হাতের কাজের দক্ষতা। দেশ জুড়ে এধরণের পুরুষ যাদের কিছু জমি আছে চাষ করে না। সুস্থ স্বাভাবিক, কল কারখানার গেট মাড়ায় না। কাজের মধ্যে খাওয়া গুলতানি আর ফি বছর বংশবৃদ্ধি। কেরানী হলে অন্তত বংশবৃদ্ধিটা কম করত, হয়তো বা এক আধটা ছেলে বা মেয়ে ঠিকমত কিছু শিখে কাজ করার যোগ্য হলেও হতে পারত। কিন্তু এরা? হিউম্যান গারবেজ।

আমরা আগেরবার যখন ভুবনেশ্বরে পোস্টেড ছিলাম, সেই আলি সেভেনটিজ-এর কথা, আমার এক বন্ধুর বাড়ির পুরানো ওড়িয়া ঠাকুর তার ছেলেকে নিয়ে এসেছিল সুবীরের কাছে কাজের উমেদারিতে। কলেজ থেকে ফিরে দেখি বন্ধুর চিঠি নিয়ে একটি বছর বাইশের ছেলে অপেক্ষা করছে, তার বাপ তাকে আমাদের বাড়ির পোর্টিকোতে বসিয়ে গাঁতুতো কোন মামুনা দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। আমার তখন খুব তাড়া। স্পুর স্কুল থেকে ফেরার সময়। জল খাবার তৈরির পালা, কাজের লোক ছুটিতে। ব্যাগটা ভেতরে রেখে জুতো ছেড়ে হাত ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকি। ময়দার টিনটা বের করে নিয়ে আলু কাটতে কাটতে ছেলেটির অর্থাৎ শ্রী কৈলাস চন্দ্র দাসের দুঃখদারিদ্র্যের কাহিনী শুনছিলাম।

কড়াইটা বার্ণারে বসিয়ে দেশলাই ধরাতে ধরাতে বলি,

'মোর পিলাটা আসিব স্কুলরু। জলখিয়া লাগিব। তমে টিক্কে কামঅ করি দেল। সেই ডবারু দুই মুঠা মইদা কাড়অ, পরটা হব দুই তিনিটা।'

শ্রী কৈলাস চন্দ্র দাস মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তেলে ফোড়ন দিয়ে আলু ছাড়তে ছাড়তে শেষ কথাগুলো রিপিট করি।

শ্রী কৈলাস চন্দ্র দাস গম্ভীর মুখে বলে,

'মু ঘর কামঅ করিবি নি।'

'কাঁহিকি? জলের ছিটে দিয়ে এক চিমটে হলুদ দিই, নুন দিই।

'মু পাঠঅ পড়িছি।'

'কী পাঠঅ?' কাঁচালংকা চিরে ফেলে দিই কড়াইয়ে, এবারে ঢাকনা।

'আইজ্ঞা, মু ম্যাট্রিক ফেল্।'

মু এম. এ. পাশ। মু যদি ঘর কাম করি পারে তমে কাঁহিকি করিব নি?'

'আপন স্ত্রীলোকঅ, মু পুরুষঅ।'

বলা বাহুল্য আন্‌এমপ্লয়েড লিস্ট থেকে শ্রীকৈলাস চন্দ্র দাসের নাম কাটানোর জন্য সুবীরকে খোশামোদ করি নি। গরীবের জন্য আর প্রাণ কাঁদে না। এই হতদরিদ্র রাজ্যে দুই দশকের অভিজ্ঞতায় দেখেছি গরীব আর শোষিত সমার্থক নয়। ধনী দরিদ্র শোষক শোষিত শ্রেণীভেদ অতিরিক্ত সরল। যাদের দেয় বিশেষ কিছুই নেই, ঘাঁকতি প্রচুর। পোকামাকড়ের মত অগুনতি বংশবৃদ্ধি, তারাই পরগাছা।

অতঃপর নির্দ্বিধায় প্রাণখুলে গালাগালি করি গঞ্জামের মালি, কটকি অর্ডারলি ও তেলেগু ঝিকে। আমার বাংলা মেশানো ওড়িয়া নিশ্চয় ওরা বোঝে না। বোঝার দরকারও নেই। পেছনে লাথি মারতে বাংলাওড়িয়াতেলেগু কিছুই লাগে না। পিছিয়ে পড়া মানুষ ঐ একটি ভাষাই বোঝে। সেজন্যই পিছিয়ে থাকে। যেদিন নিজের দায়িত্বে কাজ করতে পারবে সেদিনই সত্যিকারের শ্রেণী বিপ্লব ঘটবে। মেজাজ গরম করে সারাদিন সংসারটি মাজাঘসা হয়। ছুটি বলে রান্নাও একটু স্পেশাল। একটা শর্টকাট হালকা বিরিয়ানির রেসিপে আমার আছে, 'কুচন্তর' অর্থাৎ দইয়ে পেঁয়াজলংকা কুচি দিয়ে রায়তার সঙ্গে খায়। সেটাই করলাম। সুবীর টিপিক্যাল বেংগলি মেইল। ডোমেস্টিক ম্যান ম্যানেজমেন্ট ঝামেলায় নেই। সারা সপ্তাহ ডাঁই করে রাখা খবরের কাগজ (প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসা ডাকের কাগজ পড়ার সময় নেই) আর উইকলি ম্যাগাজিন নিয়ে ছুটি ভোগ করে। কমপ্লিটলি রিল্যাক্সড্। ওর কাছে ছুটি মানে আ ডে অফ রেস্ট, পূর্ণ বিশ্রাম।

আর আমার বিশ্রাম কবে?

কিছুদিন বাদে আবার সায়ান্সের স্টাফরুমে সতীর সঙ্গে দেখা। সেই ম্লান

মুখ, বঞ্চনার তিক্ত ছাপ সমস্ত চেহারায়।

'কী খবর? ভাল তো সব?' জিজ্ঞেস করি।

'ভাল আর জীবনে হবে না।'

'সবতো মিটেটিটে গিয়েছিল, আবার কী হ'ল?

'কিছুই মেটে নি ম্যাডাম, জীবনে কোন কিছুই শেষ হয় না। সমস্যা চলতেই থাকে।'

'সে কি, এই না তোমার ভাসুর মিঃ পাণ্ডাকে একেবারে নাকে খৎ দেওয়ালেন, উনিও মায়ের নামে প্রমিজ্ করলেন—'

'ওসব প্রমিজটমিজ্ সব দাবার চাল। ক'দিন চুপচাপ থেকে আবার যেই কে সেই। আর এই এক স্ত্রীলোক। কী যে আনন্দ পায় অন্যের সংসার নষ্ট করে কে জানে। অ্যা পারভারটেড্ বিচ্। মনে করুন অফিসে টেলিফোন করে স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। নির্লজ্জ বেহায়া। আগ বাড়িয়ে নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে।'

'খরচ কে দেয়? টাকা তো সব তোমার হাতে।'

'আপনি যে কোন জগতে থাকেন ম্যাডাম। শুধু লেজিটিমেট আর্নিংটুকুতেই আমার এক্তিয়ার, আর উপরিটা? মাইনের টাকাটি যাদের একমাত্র উপার্জন শুধু তাদেরই তো স্ত্রীর বিছানা ছাড়া আর কোথাও গতি নেই।'

সুবীরেরও তাহলে মাইনে ছাড়া অন্য উপার্জনের ঢালাও বন্দোবস্ত ছিল দিল্লিতে।

সব টাকাই কি—না, ওসব ভাবব না।

'ইউ মীন করাপশান আর অ্যাডালট্রি ইনটারলিংকড?'

'খানিকটা তাই নয় কি? পুরোপুরি নয় বটে। ছোটলোকদের মধ্যে তো নাকি বৌছেলেমেয়েকে খেতে পরতে না দিয়ে পুরুষরা মদ মেয়েমানুষে টাকা উড়িয়ে দেয়। নইলে লেবারার ক্লাসের এই অবস্থা কেন বলুন? আজকাল তো কলকারখানায় রোজগার লোয়ার মিডল ক্লাস হোয়াইট কালার জব্‌এর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। অথচ এই দু ক্লাসে ছেলেমেয়ের ফারাক দেখুন। ইটস অল ডিউ টু দ্যাট মেইল হেড, যত সেল্‌ফিশ—'

বাধা দিই। এখন সতীর হিস্টেরিসের পায়ের শব্দ চিনতে পারি।

'তা তুমি এখন কিছু করবে টরবে ভাবছ না কি? বাপের বাড়ির কাউকে বলে দেখবে?'

'না, না, সে প্রশ্ন ওঠে না। মা তো নির্ঘাত বলবেন আমারই দোষ, আমি কেন কড়া নজর রাখি নি। মায়েদের তো জানেন তাঁদের চোখে পুরুষ মাত্রেই চিরকালের কচি খোকাটি, সব সময় একজন মাদার ফিগার দরকার তাকে সামলানোর জন্য, নিজের তো নীতিবোধ দায়িত্বজ্ঞান কোন দিনই গড়ে উঠবে

না। বুঝলেন ম্যাডাম দায়বোধের বেলায় নাবালক নিজের স্বত্বটির বেলায় সাবালক, দ্যাটস আওয়ার ইণ্ডিয়ান মেল, ভারতীয় পুরুষ।'

সব জিনিসেই জাতীয়তার স্ট্যাম্প মারা আমাদের একটা মুদ্রাদোষ। ভারতীয়ত্বের অ্যাবস্ট্রাক্ট আলোচনায় উঠে না গিয়ে সতীর বাপের বাড়ির কনক্রিট পয়েন্ট আঁকড়ে ধরে থাকি।

'আর তোমার বাবা? তুমি তো বলতে ভাইবোনদের মধ্যে তুমি বাবার ফেবারিট?'

'হ্যাঁ। বোনদের মধ্যে আমি পড়াশুনায় সবচেয়ে ভাল ছিলাম। এখনো দেখা হলেই পি এইচ. ডি. করার জন্য তাড়া লাগান। এমনকি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সম্বলপুরে ওঁর ওখানে থেকে রিসার্চ করতেও বলেন।'

'তা উনি যখন এত সাপোর্টিভ ওঁকেই সমস্যাটা একবার বলে দেখ না?'

'সে হয় না, ম্যাডাম। আমরা চার চারটে বোন, বাবা প্রায় ফতুর হয়ে গেছেন আমাদের পার করতে। তাছাড়া শুধু আমাকেই বিয়ের সময় দাদা-মশাইকে বলেটলে কটকে জমি যৌতুক দিয়েছেন। এ নিয়ে ভাইবোনেদের মধ্যে যথেষ্ট ফিলিং আছে, বাবার মুখের ওপর অবশ্য কেউ কিছু বলে না, কিন্তু আমাকে সুযোগ পেলেই কথা শোনায়। না, না, বাবা মা, বাপের বাড়ির কাউকে আমি আর দায়িত্বের মধ্যে জড়াতে চাই না।'

ঠিকই। আমিও তো বাবা মাকে সুবীরের অ্যাফেয়ারের কথা ঘুণাক্ষরেও জানাই নি। বরং সেবারের পুজোতে আরও দামি দামি উপহার দিয়েছি। বাপের বাড়িতে মেয়ের বিবাহিত জীবন সর্বক্ষণের পরীক্ষা, সেখানে পাশফেল ডিভিশান সব আছে। বিবাহিতা মেয়ের আদর, সম্মান নির্ভর করে তার স্বামীর অর্থ নৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার ওপর। দিদির চেহারা আমার চেয়ে নিরেস, রঙ আরও ময়লা, বিয়ে একটু বেশি বয়সেই হল—ইনফ্যাক্ট দিদির বিয়ের অপেক্ষাতেই আমার এম. এ. পড়া। জামাইবাবু অক্সের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে হিস্ট্রির প্রফেসর। যখনই দিদির সঙ্গে আমার বিয়ের পর দেখা হয়, আমার জীবনযাত্রা, সাজপোশাক, চাকরি—সবকিছু নিয়ে চিমটি কেটে কেটে কথা বলে। 'আমি তো আর আই. এ. এসের স্ত্রী নই যে বিউটি সেলুনে যাব, আমার দরকারই বা কি ডল পুতুল সাজবার, মাস্টারের বৌ আমাকে পার্টিফার্টি দিতেও হয় না, ডিনার ককটেলে যেতেও হয় না···(আই. এ. এসদের বৌ হলেই যেন এসব করতে হয়) ···আমাদের তো কাজের লোকের অত সুবিধা নেই যে ঘরদোর ম্যাগাজিনের মত সাজিয়ে রাখব···হাতে দেদার সময়ই বা কই•যে সখের চাকরি করব···' আমি চুপ করে সহ্য করি কারণ আমাকে নিয়ে বা বলা উচিত আমার বিবাহিত অবস্থা নিয়ে বাবা মা এত স্পষ্টভাবে গর্বিত যে দিদির জ্বালাধরাটার আসল কারণ বুঝতে পারি। পড়াশুনায় দিদি আমার চেয়ে ভাল ছিল, ক্যালকাটা

ইউনিভার্সিটির ফার্স্টক্লাস। কিন্তু সাবজেক্ট জিওগ্রাফি যা অধিকাংশ কলেজেই পড়ানো হয় না। অর্থাৎ চাকরির স্কোপ খুব কম। ইংরিজি সর্বত্র কম্পালসারি সাবজেক্ট, তাই যাদবপুরের হাইসেকেণ্ডক্লাস হলেও আমার চাকরি জোটাতে খুব অসুবিধা হয়নি। জামাইবাবু ভাল স্কলার কিন্তু টিচিং জবএ বাড়ি গাড়ি লোক-লস্করের সুবিধা নেই—অবশ্য বদলির ঝামেলাও কম। নতুন জায়গায় মা-শাশুড়ি গোছের কাছে কেউ না থাকায় পর পর দুই মেয়েকে মানুষ করতেই দিদির অনেকটা সময় চলে গেছে। তারা স্কুলে যেতে যেতে দিদির বয়স তিরিশের ওপারে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শুধু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে চাকরি পাবার পক্ষে দেরি হয়ে গেছে। অর্থাৎ সীমিত আয় অথচ যৌথ উপার্জনের সুবিধা নেওয়াও শক্ত। ইউনিভার্সিটিতে ছুটির মেয়াদ বেশি। দিদি জামাইবাবু প্রায়ই কলকাতায় আসেন, অনেক সময় বাবা মার বাড়ি বা বিষয় সংক্রান্ত কাজেও সাহায্য করেন। আমি অনেক কম যাই এবং যখনই যাই অতিথি হিসেবেই থাকি। সুপ্রাপ্ত হওয়ার সময়ই শুধু একটানা কয়েক মাস ছিলাম। তার প্রস্তুতি হিসেবে আমার জন্য ঘরের পর্দা, বেডকভার নতুন কেনা হয়েছিল। 'মেয়ে আমার মস্ত চাকুরের স্ত্রী, কত বড় বাংলো, কত ভালভাবে থাকে', ঝি কিরণকে ঘর ঠিক করতে করতে মা'র মন্তব্যটি বাবা পরে আমাকে হাসতে হাসতে শুনিয়েছিলেন। দিদির দুই মেয়েও আমাদের বাড়িতে থেকেই হয়েছে। বাবা মুখ দেখেছেন একটি করে আংটি দিয়ে। আমার ছেলে হ'ল, বাবা মা নার্সিং হোমে এলেন বালা নিয়ে। এ ছাড়া সাধ, পুজো সব উপলক্ষেই দেওয়াদেয়িতে পক্ষপাতিত্ব। লজ্জা করে, তাই দিদির ঝাঁঝ সহ্য করি। না, সতী ঠিকই বলেছে। বাপের বাড়ির সঙ্গে আমাদের জীবন আর জড়ানো যায় না। আমরা বাবা মার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি। সারাজীবন তাঁরাই শুধু দিয়ে যাবেন প্রত্যাশা করা যায় না। বরং বদলে তাঁদের কিছু প্রাপ্য হয়। আমরা স্বামী সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সুখী—এটা দেখতে চাওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

এসব ফাইন অ্যাণ্ড টেনডার সেন্টিমেন্ট ছাড়াও আমার ক্ষেত্রে একটি বিরাট অসুবিধা ছিল—চাকরি না থাকা, মানে দিল্লিতে উপযুক্ত চাকরি না থাকা। দিল্লির মত মেট্রোপলিটান সিটিতে এক যুগ বাসি সেকেণ্ডক্লাস এম. এ. ডিগ্রি আর ওড়িশার মত ব্যাকওয়ার্ড স্টেটের বিভিন্ন জেলায় পড়াবার অভিজ্ঞতা—এমন আহামরি কিছু কোয়ালিফিকেশন ছিল না। হ্যাঁ, বছরের পর বছর চেষ্টা করলে কোন এক জায়গায় কিছু একটা হয়তো পাওয়া যেত কিন্তু আমার সে সময় ছিল না। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা, পারলে পরদিনই এস্পার ওস্পার করে ফেলি। তখন মিডল ইস্টে ইংরিজি, আর সায়ান্স সাবজেক্টে অধ্যাপকের খুব ডিমাণ্ড। ওড়িশা ছাড়বার সময়ই আমাদের কলেজ থেকে অ্যানথ্রপলজির একজন, রাউরকেল্লা থেকে ইংরিজির একজন প্রচুর টাকা মাইনেতে তিন বছরের

কনট্র্যাক্টে আলজিরিয়া আর মস্থল না কোথায় যেন চলে গেল। আদাজল খেয়ে লেগে গেলাম। কত সন্তর্পণে খোঁজখবর করে লুকিয়ে লুকিয়ে ডিপার্টমেণ্ট অফ পারসোনেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস-এ গিয়ে পরিচয় এড়িয়ে বাইল্যাটেরাল অ্যাসাইমেণ্টের ফর্ম যোগাড় করা, সফদরজঙ এনক্লেভে একটা গভর্নমেণ্ট আণ্ডার টেকিং ছিল—কী যেন নাম, হ্যাঁ এডুকেশানাল কন্সালট্যাণ্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড—সেখান থেকে বাইরে কনসালট্যাণ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যও ফর্ম আনা। দিনের পর দিন বার বার মুসাবিদা, একরাশ টাকা খরচ করে সব টাইপ, জেরক্স, পাসপোর্ট ফটো, তার ওপর বিদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পাঠানোর ঝামেলা। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পর পর্বতের মুষিকপ্রসব। শুধুমাত্র জর্ডান ও ইরাকের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তর এসেছিল—পি. এইচ. ডি. ছাড়া তারা টিচিং পোস্টে অ্যাপ্লিকেশান কনসিডারও করবে না। টাকার শেষ ডকটরেটটিও বাগদাদ বা কুয়েতগামী প্লেনে উঠে পড়েছেন।

অথচ মজা হ'ল যেখানে স্থায়ী চাকরি ছিল, অর্থাৎ ওড়িশাতে, সেখানে ফিরে একলা চাকরি করে থাকার কথা কোনদিন কেন জানি না কল্পনাতেও আসে নি। কলকাতায় ফিরব না কারণ সেখানে বাপের বাড়ি। কিন্তু যেখানে কর্মক্ষেত্র সেখানে কেন নিজের জোরে থাকার কথা ভাবতে পারলাম না? চাকরির পরিচয়টুকু যথেষ্ট নয় বলে? ওড়িশাতে এতদিনের বসবাসে ক'জন ডিভোর্সির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে? একজনও না। তার ওপর আবার আউট সাইডার। কিন্তু সতীর তো শেষ অস্ত্রবিধাটুকু নেই। ও তো এখনকার মেয়ে। তাই যুক্তি দেখাই, 'কিন্তু তোমার বাবাকে তো তোমার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। থ্যাংকস টু ইউ. জি. সি, তোমার একটা ভাল চাকরি আছে, ইনফ্যাক্ট এখন তো তোমার স্বামীর চাকরির সমতুল্য। তাছাড়া ট্রান্সফারেবল, তার সুবিধাটা নিতে পার। সম্বলপুরে তোমার বাবা এখন সেটলড্, ওখানে একটা পোস্টিং পাওয়া কিছু শক্ত নয়, ওয়েস্টার্ন ওড়িশায় তো সব সময় ভেকেন্সি থাকে।'

সতী মৃদু হেসে মাথা নাড়ে আক্ষেপের ভঙ্গিতে,

'মেয়েদের চাকরি মানেই কি সাফিশিয়েন্সি? রোজগার করি বলে স্বামীর সংসার থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলে বাবার দায়িত্ব থাকবে না! কী যে বলেন ম্যাডাম। সোস্যাল আসপেক্টটা ভুলে যাচ্ছেন কী করে। কত শ' বছর ধরে আমাদের সকলের মগজে ঢুকে আছে মেয়েদের তো কারো না কারো হেফাজতে থাকতে হবে—বাবা, স্বামী বা ছেলে। ঐ কেরালার সোকলড্ ম্যাট্রিলিনিয়ার সোসাইটিও নো একসেপশান, সেখানে স্বামীর বদলে ভাই, ঘাটস অল। আমরাও তা অ্যাকসেপ্ট করি, স্বামী বয়সে বড়, ওয়েল এস্টাব্লিশড হবে। কেন, আ সর্ট অফ ফাদার সাবস্টিটিউট আর কি।'

'তাহলে তুমি বলছ ইকনমিক স্টেটাস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফ্রিডম?'

'নট মাচ। যতক্ষণ না তার সঙ্গে সম্মান আর অধিকার থাকছে। ইকনমিক ইণ্ডিপেন্ডেন্সটা জাস্ট কথার কথা! আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মেয়েদের উপার্জনে যে সোকলড্ লিবারেল মেইলরা উৎসাহ দেখান সেটা অনেকটাই বোধহয় নিজেদের ইণ্টারেস্টে। মেয়েরা যত বেশি দায়িত্ব নেবে পুরুষের তত দায়িত্ব কমবে। ভারি মজা।' তিক্ত হয়ে ওঠে সতীর মুখচোখ।

'কিন্তু সেদিন তোমার ভাসুর অত করে বললেন তার কি কোন মানে নেই?'

'আপনি বড় সহজে ভুলে যান ম্যাডাম। বুঝলেন না, ওঁর নাটকটাও দাবার আর একটা চাল। আমি চাকুরে, লেখাপড়া জানি, আইন আদালতের দ্বারস্থ হতে পারি, তাতে ওঁদের পরিবারের অসম্মান। সেটাই প্রিভেণ্ট করার জন্য ইলা-বোরেট ড্রামা। ছোট ভাইকে শাসনের ভড়ং। এখন যে ভাইটি তাঁকে কলা দেখিয়ে দিব্যি কুলও রাখি শ্যামও রাখি করে বেড়াচ্ছে সে বেলা উনি কোথায়?'

'এটা তুমি ঠিক বলছ না, সতী। একটা অ্যাডাল্টকে কেউ প্রতিদিন চোখে চোখে রাখতে পারে না। আমার তো মনে হয় ওঁর শাসন করাটা সিম্পিয়ার।'

'সিম্পিয়ার না হাতি। তাহলে ছোট ভাইয়ের এমন সাহস হয় কী করে? না, না, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। ভাবছি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাব।'

'চলে যাবে। কোথায়?'

'পণ্ডিচেরী। আমি তো বরাবরই শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত। আই অ্যাম নট অ্যাট অল লাইক দ্যাট হোর। আমার একটা স্পিরিচুয়েল ইনক্লিনেশান আছে। সংসারধর্ম করার কথা, করি। কিন্তু আই কাণ্ট স্টুপ টু দ্যাট লেভেল।'

'কোন লেভেল?'

'বুঝতে পারছেন না। এই অ্যাফেয়ারের আসল কারণই তো তাই। একসঙ্গে বসে ড্রিংকড্রিংক করে, আমি তো কখনো ছুঁই না। তার ওপরে যতসব আন-ন্যাচারাল প্র্যাকটিস। পারভারসান! সে সব তো আমার সঙ্গে চলে না। কোন স্ত্রীর সঙ্গেই চলে না। সেই জন্যই মেন নিড উইমেন লাইক হার, সি ইজ নাথিং বাট অ্যা লো—'

'দেখ, তুমি আবার উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ', তাড়াতাড়ি বাধা দিই। এসব শোওয়াটোওয়ার কথায় আমার একটু অস্বস্তি হয়, যদিও সাহিত্যের ছাত্রী সব রকম জিনিসই অনায়াসে পড়ি। কিন্তু নিজেদের জীবনের প্রত্যক্ষে ভোগস্থ খুবই সীমিত। আমাদের আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে পড়েছিল সেই প্রথমদিককার পশ্চিমি রশ্মি যার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ান পিউরিটানজমের তাপ ছিল অঙ্গাঙ্গী। হিন্দু ডেকাডেন্সকে কবজা করতে গিয়ে স্বভাবজ বিকাশকে ঝলসে আধপোড়া করে

ফেলেছিল। আমরা অবশ্য অনেক মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, আজকাল সুবীরের সঙ্গে বসে জিন্‌টনও খাই। আই ট্রাই মাই বেস্ট টু বি অ্যা গুড কম্পানি।

কী কুৎসিৎ দেখাচ্ছে সতীকে। ঈর্ষা, ঘৃণা মানুষকে এত কদাকার করে ফেলে। আচ্ছা আমিও কি এত জঘন্য হয়ে গিয়েছিলাম? যখন দিল্লিতে রাতের পর রাত লিভিংরুমের ডিভানে চোখ বুজে জেগে কাটাতাম, সুবীর তার মিসট্রেস – হ্যাঁ মিসট্রেস ছাড়া আর কী – কী করছে না করছে মনের পর্দায় না-দেখা ব্লুফিল্মের মত অজানা অথচ ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য মাদকতায় রিল আফটার রিল প্লে হয়ে যেত। কখনো কখনো রাতভর রিওয়াইণ্ড আর রিপ্লে, যতক্ষণ না শ্রান্ত আসন্ন শরীরটাকে দিনের আলো ঠেলে তুলে দিয়েছে। প্রতিদিনের রুটিনে তবু যেন নিষ্কৃতি। নইলে মাথার মধ্যে সেই এক চিন্তা – আমার মধ্যে ফাঁক কোথায়, আমি কিসে কম, কোন জায়গায় আমি ব্যর্থ।

কেন আমি যথেষ্ট নই···

'জানি, ম্যাডাম, জানি', সতী এদিকে বলে যাচ্ছে, মাঝে কয়েক মুহূর্ত চুপ ছিল।

'কিন্তু আই জাস্ট কাণ্ট স্ট্যাণ্ড ইট এনি মোর। সংসার ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন রাস্তা আমার নেই।'

'পাগল না কি। ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নেই? হাউ ক্যান ইউ লিভ দেম? আর এরকম সংসার ত্যাগ তো ত্যাগ নয়, এতো স্রেফ পালানো। ভয় পেয়ে, বাস্তবের মুখোমুখি না হয়ে চম্পট। না, সতী, না, এটা তুমি করতে পারবে না। শক্ত হও। তুমি তো একলা নও। আমি তোমার সঙ্গে থাকব। দেখো, ঠিক পারবে। উই'ল ফাইট টুগেদার।'

ওর পিঠে হাত রেখে আশ্বাস দিই। সতী ঘাড় নেড়ে মাথা নীচু করে বসে থাকে, আধফোটা স্বরে বলে একটু পরে,

'থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।'

'চল, যাওয়া যাক।'

দুজনে উঠে পড়ি।

সতীকে বাস-স্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে সারকিট হাউসে গিয়ে বসি। এখানে বলা আছে, প্রায় দিনই একটা ঘর খুলিয়ে অপেক্ষা করতে বসি, চা'টা খাব। তিন নম্বর ইউনিটে একটা কোয়ার্টার খালি হয়েছে, সুবীরের প্রাইভেট সেক্রেটারি এল আমাকে দেখাতে নিয়ে যেতে। না, বাড়ি পছন্দ হ'ল না, এক তলায় ড্রয়িং ডাইনিং কিচেন, দোতলায় শোবার ঘর। ওপরনীচ করতে হবে, ডাইনিংএর জায়গাটা বড্ড ছোট, কিচেনটা হোপলেস, সি'ড়িটার ধাপ উঁচু উঁচু, অসুবিধাজনক, পোর্টিকো নেই, বাগানের জায়গা কম, গাছফাছও তেমন নেই, সবচেয়ে বড় কথা দক্ষিণটা একেবারে বন্ধ, উত্তরমুখো বাড়ির জানালা সব উত্তর আর পশ্চিম দিকে।

ক্রসভেন্টিলেশানের ব্যবস্থা নেই। অথচ সমুদ্র থেকে আসা দক্ষিণের হাওয়া ভুবনেশ্বরের গ্রেটেস্ট অ্যাট্রাকশান। আজকালকার ইঞ্জিনীয়ার আর্কিটেক্টরা একেবারে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। অথচ সে আমলের কনস্ট্রাকশান দেখ। ঢেনকানল সমুদ্র থেকে বহুদূর, কিন্তু আগেকার তৈরি সারকিট হাউস, ডি. এম. আর এস. পি. বাংলো এমন জায়গায় তৈরি যে নীচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঠিক সোজা সমুদ্রের হাওয়া গরমের দিনে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। এখনো মনে আছে বোলাংগীর সদর এস. ডি. ও. থেকে সুবীর এ. ডি. এম. বালেশ্বর হ'ল। এমন গরম ছিল যে বোলাংগীরে ভোরে রওনা হয়ে সম্বলপুরে পৌঁছে ৯টার সময় যে কলার ছড়াটা কিনেছিলাম চোখের সামনে পচে কালো হয়ে গেল দুপুর হতে না হতে। ঢেনকানলে যখন পৌঁছলাম গরমে একেবারে যেন ঝলসে গেছি। সারকিট হাউসে নেমে একটু হাতমুখ ধুয়ে আবার বেরুবার প্ল্যান। কিন্তু এমন চমৎকার হাওয়া যে সেদিন রাতটা থেকেই গেলাম। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এস. কে. সিং, পাঞ্জাবি, সুবীরের চার বছরের সিনিয়র, বাড়িতে ডিনারে ডাকলেন। খুব আড্ডা হ'ল। তখনও ওড়িশাতে আই. এ. এস. ক্যাডারে একটা সামাজিক বন্ধন ছিল, সকলের মধ্যে মোটামুটি যাতায়াত খাওয়া-দাওয়া চলত, একমাত্র ক্রাইটেরিয়ন স্ত্রীদের চলনসই ইংরিজি বলার ক্ষমতা। এখন বলাবাহুল্য স্ত্রীদের ফরম্যাল কোয়ালিফিকেশান বেড়ে গেছে কিন্তু সে ফেটারনিটি আর নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওড়িয়ারা নিজেদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গ্রামের জীবনটাই সহরে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছে আর আউটসাইডাররা যে যার নিজের কম্যুনিটির বাসিন্দা খোঁজে, কর্মাশিয়েল ফার্মের স্থানীয় প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী কন্ট্র্যাক্টর, ভারত সরকারের অন্যান্য ক্যাডারের চাকুরে ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হ'ল এইসব বাইরের লোকেদের কাছে রাজ্য সরকারের ঢাউস কোয়ার্টারগুলো প্রাসাদ বলে মনে হয়। বোঝানো শক্ত যে কেন বেশিরভাগ বাড়ি এত চাপা, আলোহাওয়া ঢোকে না হোয়েন প্ল্যানার্স হাড অল দ্য স্পেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। যে জাত একদিন কোনার্ক তৈরি করেছিল আজ মধ্যবিত্তের জন্য মোটামুটি আরামপ্রদ ও সুবিধাজনক বাসস্থান তৈরি করতে পারে না। এটা কি ডিক্লাইন না কি গোড়াতেই গলদ? শুধু শোপিসই তৈরি করতে জানে, সভ্যতার আশীর্বাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে নি।

বাড়ি নাকচ করে দিলাম। আমাদের যে কোয়ার্টার অ্যালট্ করা হয়েছে কিন্তু আমরা দখল নিতে পারছি না (কারণ বদলি হয়ে যাওয়া অফিসারটির পরিবার কি কারণে রয়ে গেছেন), সেই বাড়িটির জন্যই অপেক্ষা করব। ফেরার পথে সুবীরকে জানালাম।

'অতঃপর অনির্দিষ্টকাল ডেলিপ্যাসেঞ্জারি', সুবীরের ক্লান্ত মন্তব্য।

'উপায় তো আর নেই।' আমার ততোধিক ক্লান্ত উত্তর।

সেদিন রাত্রে খেতে খেতে সুবীরের মনে পড়ে সতীর কথা।

'কী, তোমাদের সতী সমাচার পালা কতদূর ?'

'বেচারির কষ্টতে তোমরা খুব মজা পাও, না ? পুরুষ জাতটাই এরকম।'

থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে বলি।

'বাঃ এতে পুরুষ নারীর কী আছে। নাটক দেখতে সকলেই মজা পায়। এই যে 'ওথেলো' কত কষ্টের নাটক, তোমরা মেয়েরা কি এনজয় কর না ?'

'তা, কথাটা মিথ্যে বলনি। ইনফ্যাক্ট আমরা কষ্টের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই তো ট্র্যাজেডির ওপর লেকচার শুরু করি। জানো, ওথেলোর ওপর কয়েকটা এক্সট্রা ক্লাস নিচ্ছি সেকেণ্ড ইয়ার অনার্সে। ওটা সতীর অ্যাসাইনমেণ্ট, কিন্তু ওর এমন অবস্থা যে সিরিয়াস পড়ানো ওর দ্বারা হচ্ছে না। কাজেই আমি সামলাচ্ছি। একটি ছেলে আজ একটা ভারি ইণ্টারেস্টিং পয়েণ্ট রেইজ্ করেছিল।'

বাটিতে ডাল, তরকারি, মাছ আলাদা আলাদা তুলে সাজিয়ে দিচ্ছিলাম। সুবীর অবশ্য প্রতিদিনই বলে এত বাটিটাটি দরকার নেই। কিন্তু যেদিনই দেওয়া হয় না, সেদিনই বাটি খোঁজে। ডালে একটু চুমুক দিয়ে বাকিটা পাতে ঢেলে তরকারি একটু তুলে খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে,

'কী পয়েণ্ট ?'

'ও জিজ্ঞাসা করছিল স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ হতেই ওথেলোর এরকম সাংঘাতিক বেহাল অবস্থা হ'ল কেন। এত বড় যোদ্ধা, এত নামধাম প্রতিপত্তি, একেবারে সাফল্যের চূড়ায় উঠেছিল। যেই না মনে হ'ল ডেসডিমোনা অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়েছে অমনি লোকটার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল।'

'সেরকম কিছু আছে না কি শেক্সপীয়ারে ? আমার তো উৎপল দত্তের গলায় উত্তমকুমারের 'ওথেলো' মনে আছে, ইট'স দ্য কজ, ইট'স দ্য কজ···'

'দূর, উত্তম-উৎপলের 'ওথেলো' তো খালি একটা সীন। আগে তো আছে সেই ক্রুশিয়েল 'ওথেলোজ অকুপেশান ইজ গন্।' বেচারার কর্মক্ষেত্রই আর রইল না। থাকবে কী করে ? সে তো মুর, কালো, ইয়োরোপে আউটসাইডার, তার কর্ম, জীবিকাই তাকে আইডেনটিটি দিয়েছিল। তাহলে দেখ শুধু যে সতীই বাড়াবাড়ি করছে এমন নয়, বাঘা বাঘা পুরুষ সিংহেরও পার্টনার এদিকসেদিক করলে ভারসাম্য নষ্ট হয়।'

'অর্থাৎ কিনা স্ত্রীরা সতীসাধ্বী না হলে বেচারা স্বামীদের যা মনোকষ্ট, তাতে বাইরের জগতে প্রচুর অস্ত্রবিধে, কাজকর্মই যদি ঠিক মত না চলে তাহলে সবকিছুর চাকা বন্ধ। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে যুদ্ধবিগ্রহ। একেবারে নটনড়নচড়ন। অতএব পৃথিবীর সব সভ্যদেশে সতীত্বের জয়জয়কার।'

সুবীর এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেন তার অতীতে এতটুকু কালির ছিটে নেই, একেবারে ধবধবে সাদা। এক পত্নীব্রত শ্রীরামচন্দ্র আর কি। যত্ত সব ন্যাকামি। ঝাঁঝ এসে যায়, বলে ফেলি,

'আর মেয়েদের বেলা ? তাদের কাজকর্মের বুঝি কোন গুরুত্ব নেই। ঘর-গৃহস্থালি, ছেলেমেয়েদের মানুষ এগুলোর বুঝি কোন মূল্য নেই সভ্যদেশের সমাজে ? না কি তাদের কষ্টটষ্ট হওয়ার কথাই নয় ?'

লাউঘণ্ট থেকে মাছের মুড়োর শাঁসালো টুকরো একটা তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে সুবীর বলে,

'নাটক নভেলে কোথাও মেয়েদের সেরকম প্রলয়ঙ্করী দুঃখকষ্টের বর্ণনা দেখ নাকি ? পোজেসিভ ইনস্টিংক্ট বোধহয় পুরুষেরই বেশি স্ট্রং, তাই ঈর্ষায় পুরুষের বেশি ক্ষতি ? দেখনা সব ক্রাইম অফ প্যাশান পুরুষরাই করে ? মেয়ে ওথেলো ভাবা যায় ? ইন্সিডেণ্টালি তোমাদের ঐ মোহিনীটির পতিদেবতাটি কী করছেন ? ওথেলোর রোলটা তাকেই তো ভালো মানাত।'

স্যালাডের প্লেটটা এগিয়ে দিই, ভারি তো স্যালাড, শুধু শশার টুকরো।

'তাহলে তো ব্যাপারটা অনেকদিন আগেই খতম হয়ে যেত। অ্যাকর্ডিং টু সতী দ্যাট চ্যাপ ইজ টোটালি স্পাইনলেস। স্ত্রীর কাণ্ডকারখানা সবই জানে, কিন্তু টু শব্দটি করার মুরোদ নেই।'

'কেন, কেন ? এইটা তো ছকে মিলছে না। রহস্য ঘণীভূত হ'ল।'

'কে জানে বাবা স্বামীস্ত্রীর ভেতরের খবর। তবে বিনোদিনীর গতিবিধির ওপর বিলক্ষণ নজর রাখে। টেলিফোনে সতীকে খবর দেয় কবে বিনোদিনী মিঃ পাণ্ডাকে মিট্ করেছে। আরে এই যে আমি অজান্তে ওদের অভিসারে মদৎ দিচ্ছিলাম এটা তো ঐ ভদ্রলোকের গোয়েন্দাগিরিতেই ধরা পড়ল। ওই তো সতীকে বলল আমাকে জিজ্ঞেস করে চেক্ করতে বিনোদিনী কটকে কোথায় গাড়ি থেকে নামে, মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে নাকি হাইওয়েতে, কটকে ঢুকবার মুখে যেখানে হোটেল টোটেল আছে।'

সুবীর বাটি থেকে মাছটা তুলতে তুলতে বলে,

'তার মানে সতীর সঙ্গে বিনোদিনীর স্বামীর নিয়মিত যোগাযোগ আছে ? মারভেলাস্। তা এরা দুজনে এখন ঝুলে গেলেই তো পারে, বেশ বদলাবদলি হয়ে জোড় মিলে যায়।'

'কী যে বল, তোমরা এত ইন্সেন্সিটিভ। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক যেন কাটাকুটি খেলা। একজন ঢ্যারা দিলে অন্যজনকে গোল্লা দিতেই হয়।'

আবার সেই পোনা মাছ তো সুবীর সন্তর্পণে গাদার পিসটা থেকে কাঁটা বাছতে বাছতে যোগ করে,

'আহা, আমি একটা সেন্সিবল অ্যাণ্ড প্র্যাকটিকাল সলিউশান সাজেস্ট

করছিলাম।' বিরক্ত হয়ে চুপ করে যাই। খাওয়াতে মন দিতে চেষ্টা করি। আহা, কী সলিউশান! টিপিক্যাল ব্যুরোক্র্যাটিক অ্যাপ্রোচ টু লাইফ!

তবে আমলাতন্ত্র তো আমার রক্তের মধ্যে। বাবা ছিলেন অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অর্থাৎ অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস্ সার্ভিসে, ভাই আছে ইনকামট্যাক্সে, অর্থাৎ আই. আর. এস, আই. এ. এস তো পেল না। জন্ম থেকে এ পর্যন্ত ঐ একটা দুনিয়াই তো দেখেছি। আমাদের পরিবার কয়েক জেনারেশান ধরে ইংরিজি শিক্ষায় লাভবান ও ইংরেজ ভক্ত। দূর সম্পর্কের কোন ঠাকুর্দা ন্যাশানালিস্ট কী দলেটলে ছিলেন, ন্যাশনালিজমের প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর দরুন পুলিশ রিপোর্টে পরিবারের কার কার চাকরিতে কী কী অসুবিধা হয়েছিল এখনো তার ফিরিস্তি শোনা যায়। আর এক কাকা থার্টিজ-এ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে বছর বিশেক অনেক ঘাটের জল খেয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে এখন ব্যবসায় সেট্‌লড্। 'ফ্রম কম্যুনিজম টু ক্যাপিটালিস' ইত্যাদি টিকাটিপ্পনি সমেত পরিবারে তিনি সহাস্য বিদ্রূপের পাত্র। এরকম কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আত্মীয় স্বজন প্রায় সকলেই সরকারি বেসরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ব্যারিস্টারউকিলও আছেন। মোটকথা আর্ট সাহিত্য, কোন আদর্শবাদ বা-ইজমের কেউ ধার ধারেন না। বরং সুধীর নিজে আমলা হলেও, বাবা প্রফেসর, ওর পরিবারে অনেকেই কেরিয়ারঅন্ত প্রাণ নন্। আমার আমলাতন্ত্রের সমালোচনা কথার পিঠে কথা মাত্র, ওপরওপর। মনেমনে আমিও ঝাঁকের কই।

তাই কি দিল্লিতে সেই বিখ্যাত সোস্যালাইট পারভিন নায়ারের পার্টিতে —মিঃ নায়ার একজন অবশ্যই আছেন, কিন্তু কে ও কী কেউ মনে রাখে না— রাহুল মোদির সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলাম? ভদ্রলোক আই. পি. এস, সে সময়ে র'তে পোস্টেড। পাতলা, লম্বা, শার্প চেহারা, কাঁচা পাকা চুল। সুধীরের এক বছরের জুনিয়র, এরি মধ্যে মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, যেন অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছেন। ইংরিজিতে কবিতা লেখেন। কলকাতার রাইটার্সওয়ার্কশপ থেকে প্রথম বই ছাপা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। এই বছর ও. ইউ. পি একটা কালেকশান ছেপেছে। তারই রিভিউ নিয়ে কথা উঠেছিল, ভদ্রলোক কংগ্র্যাচুলেশান পাচ্ছিলেন এবং আমি ইংরিজির অধ্যাপিকা তাই আলোচনার আবর্তে জড়িয়ে গেলাম। ওরিজিন্যাল বইপড়া লোক এসব পার্টিতে বিশেষ আসেন না বটে কিন্তু রিভিউ নজরেপড়া পাঠক প্রচুর। শুধু প্রতিষ্ঠিত কবি বলে নয় এমনি কথাবার্তায় চাল চলনে ভদ্রলোককে সেন্‌সিটিভ বলে মনে হয়েছিল। ক্রমে ভিড় থেকে বেরিয়ে আমরা এক কোণে বসেছিলাম, আমার রিসার্চ প্রজেক্টের কথা শুনে ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন,

'মিসেস সেন, ইউ রিয়েলি ডোন্ট ফিট্ ইন। আই. এ. এসের স্ত্রী হওয়া কি এনাফ নয়?'

আমিও হেসে ছিলাম।

'কে জানে, হয়তো নয়। আই'ম নট রিয়েলি শিওর।'

পরে আমেরিকান লাইব্রেরিতে দেখা। সম্পূর্ণ কাকতালীয় নয় আমিই বলেছিলাম সপ্তাহে কোন কোন দিন কখন লাইব্রেরিতে থাকি। অনেককাল বাদে সে সপ্তাহে যত্ন নিয়ে সাজপোশাক করেছিলাম। সেলুনে চুলটাকে ট্রিম করে একটা নতুন কায়দায় সেট করিয়েছি। দামি ফেসিয়েল। মনে প্রাণে একটা প্রতীক্ষা তার। হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে আলাপটা এগিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম অফিসের সময়ে পুলিশের লোক লাইব্রেরিতে কেন। উত্তর, ইনভেস্টিগেশানে। বেরিয়ে উই হ্যাড আ কাপ অফ কফি। নানা বিষয় নিয়ে কথা হল; লিট্‌রেচার অ্যাণ্ড লাইফ। ইট ওয়াজ নাইস, ভেরি ভেরি নাইস। বাড়ির সামনে নামিয়ে দেওয়ার আগে যেন কত ক্যাজুয়েলি অফিসের ও বাড়ির টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলেন। ইচ্ছে হলে যেন যোগাযোগ করি। বাড়ি ঢুকলাম যেন নতুন প্রাণ নিয়ে। হ্যাঁ আমিও ডিজায়ারেব্‌ল, একজন না চাইলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় না। আমি ছাড়া যেমন পৃথিবীতে বহু নারী আছে তেমনি সুধীর বাদে পুরুষেরও অভাব নেই। ইট ইজ আ সিম্পল কোয়েশ্চেন অফ বেসিক এরিথমেটিক।

ব্যস ঐ পর্যন্ত। বেসিক এরিথমেটিকটুকু জানা রইল। তবে বেশি এগোই নি। ইচ্ছে হয়েছে বহুবার, প্রায় অদম্য ইচ্ছে। তবু যোগাযোগের চেষ্টা করি নি। টেলিফোন নাম্বারদুটো সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম।

এখনো আমার কাছে আছে।

মাঝে মাঝে ভাবি কেন, কেন রিসিভারটা তুলে নাম্বারটা ডায়াল করতে পারলাম না, অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি টেলিফোনের সামনে। ভদ্রলোক ডিভোর্সি, লেখালেখির জগতে একপা দিয়ে আছেন। তাই কি মনে হল আমার আজন্ম চেনা সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরে দুনিয়ায় বেমানান, অজানা এবং শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন? মনের মধ্যে কোথাও সেই শতশত বছরের হিন্দুস্ত্রীর একনিষ্ঠতা রয়ে গেছে না কি স্রেফ আমলাতান্ত্রিক সতর্ক রক্ষণশীলতা? নিজে কী তাই জানি না, বুঝি না। গ্রিন সিগন্যাল দেখেও গাড়ি কেন হুশ করে চৌরাস্তা পেরিয়ে যেতে পারলো না আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। ছেলের কথা ভাবলাম? না, তা সত্যি নয়। একমাত্র ছেলে হলেও সুপ্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের সুপু বাবারই বেশি ন্যাওটা, অন্তত সে সময়ে ছিল। এধরনের অ্যাফেয়ারের পরিণতি কী হতে পারে ভেবে পিছিয়ে গেলাম কি? না, তাও ঠিক নয়। সত্যি কথা বলতে কি সে সময়ে তো কোন ভাবনা চিন্তা মাথায় ছিল না, ছিল খালি মনেপ্রাণে একটা বিশাল শূন্যতা। যুক্তিতর্ক বিচারের অবস্থাই নয়। কেন যে কী করি বা বলা উচিত করি না তার ব্যাখ্যা নেই। নিজেকে কত

কম জানি।

চুপ করে খাওয়া শেষ করি। সুবীর কখন সতীপ্রসঙ্গ ছেড়ে তার অফিসের কথায় চলে গেছে। যথারীতি নালকোর শ্রমিক সমস্যা। এটা একটা রেগুলার অকারেন্স, সন্তান ধারণক্ষম মেয়েদের মাসে মাসে শরীর খারাপের মত অবধারিত। মুখে অবশ্য বলি না। এক মাসেই শোনা হয়ে গেছে শ্রমিকদের স্ট্র্যাটেজি, প্রোডাকশানের ক্রিটিক্যাল স্টেজে যখন কাজ সমানে করে শেষ করতেই হবে, বন্ধ দিলে বহু কোটি টাকা লোকসান, ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে নেতাদের মনে পড়ে যায় নতুন পুরনো দাবিদাওয়া এবং বলা বাহুল্য অবিলম্বে সেগুলির কয়েকটা না মেটালে কাজ বন্ধ। এবারেও সেই ব্ল্যাকমেইল। সুবীরের কথা কানে ঢোকে,

থ্যাংক গড আমি অন্তত পাবলিক সেক্টারে নেই, হয় পুরো সরকারি নয় পুরো বেসরকারি সংস্থায় এই তলায় লেবারার ওপরে মিনিস্ট্রির সাঁড়াশির চাপে দমবন্ধ হয়ে মরতে হয় না।'

অভ্যাসবশে এর মধ্যে মন দিয়ে শোনার ভান করে এক আধবার হুঁ হ্যাঁ করে গেছি। ঠিক করি সতীর ব্যাপারটা নিয়ে সুবীরের সঙ্গে অনর্থক আলাপ আলোচনায় যাব না।

অন্যের আয়নায় বারবার নিজের চেহারা দেখে লাভ কী।

পুরোদমে পরীক্ষার মরশুম চলছে। ইউনিভার্সিটির বি. এ. আর কলেজের অ্যানুয়েল। প্রতিদিনই প্রায় ডিউটি। আজ সকালে কলেজের গেট পেরুতে না পেরুতে দেখি ইতঃস্তত কলিগদের জটলা, বেশ উত্তেজিত আলোচনার টুকরো কানে আসে। ফিজিক্সের অনাদি সাহু আমাকে দেখেই বলে উঠল,

'এই যে ম্যাডাম এসে গেছেন। কাল কী হয়েছে জানেন?'

'কী?'

সকলে হইহই করে কথা বলে উঠল।

'আরে আস্তে আস্তে, ছেলেমেয়েরা আছে', কলাপসিবল গেটের বাইরে অপেক্ষাকরা ছেলেদের লাইনের দিকে ইংগিত করি। প্রত্যেককে গেটে চেক করা হবে। অনাদিকে নিয়ে বারান্দার অন্য কোণে চলে যাই। গতকাল অ্যানথ্রোপোলজির বিরজাপ্রসাদ পাণ্ডা আর কেমিস্ট্রির সুশান্ত পট্টনায়ক জাজপুরে একটা প্রাইভেট কলেজে ইন্‌স্পেকশানে গিয়েছিল। প্রতি পরীক্ষার সময় ইউনিভার্সিটি থেকে বড় বড় সরকারি কলেজ থেকে এধরণের টিম পাঠানো হয়। সাধারণত উৎসাহী অল্পবয়সীরাই যায়, আমাদের অত এনথু নেই। গতকাল হঠাৎ হাজির হয়ে ওরা প্রচুর ম্যালপ্র্যাকটিস কেস ধরেছে। বলাবাহুল্য কলেজের অথরিটিও ইনভলভড, নইলে এত লার্জস্কেল বিটিং হতে পারে না। ফেরার সময় ওদের ওপর ইঁটপাটকেল বৃষ্টি, বিরজার মাথায় লেগেছে, বেশ কয়েকটা স্টিচ পড়েছে,

সুশান্তও ইনজিওরড, এছাড়া ওদের স্কুটারের সব টায়ার পাংচার। আজকে একজোট হয়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাওয়া হবে। সিকিওরিটির বন্দোবস্ত না থাকলে পরীক্ষার ডিউটি করা যাবে না। বলা বাহুল্য সায় দিই।

'এ সবের আসল কারণ কি জানেন ম্যাডাম! এই হতচ্ছাড়া গুচ্ছের সাবস্ট্যাণ্ডার্ড প্রাইভেট কলেজ করার পারমিশান দেওয়া। যেখানে মনে করুন প্রাইমারি স্কুল ক'টা আছে সন্দেহ, সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে বেশির ভাগ ড্রপ আউট সেখানে হায়ার এডুকেশানের জন্য ডিগ্রি কলেজ খোলার কী জাস্টিফিকেশান?'

আমিও সুর মেলাই।

'যা বলেছেন। পৃথিবীর কোন দেশে এটা হয় না। হায়ার এডুকেশান ইজ নট ওপেন ফর এভরি বডি এনি হোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন এই রকম ভাবে ডিগ্রি পাবে। গাদা গাদা বেকার, সকলেই হোয়াইট কালার জব চায়। এবং চাকরি পেলেও কী করবে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দিনকে দিন অসহ্য হয়ে উঠছে।'

'এসব হচ্ছে পলিটিকস বুঝলেন ম্যাডাম, স্রেফ পলিটিকস। প্রত্যেক এম. এল. এ কলেজ খুলবে এবং দু চার বছর এইভাবে পাশ দেখিয়ে তারপর গভমেণ্ট টেকওভার। ইউ. জি. সি স্কেল, ভাল চাকরিটি বাঁধা। এ একটা র‍্যাকেট হয়ে গেছে।'

'আর যারা চাকরি সার্টিফিকেট দেখিয়েও পাবে না?'

'তারা মন্ত্রী হবে। লিডারদের স্টাণ্ডার্ড দেখেন না?'

আমরা দুজনে যে যার ডিউটিতে চলে যাই। আজকাল সর্বত্র অবনতি অবক্ষয় শব্দগুলো শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আগেই কি দারুণ কিছু ছিল? বাবার কাছে বরাবর শুনতাম যত আনসাকসেসফুল ল'ইয়ার রাজনীতিতে আসেন, ওনলি একসেপশান সি. আর. দাশ। লুক অ্যাট গান্ধী, অ্যাণ্ড হোয়াট অ্যাবাউট নেহরু?

প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে করিডরেই দেখা, উনিও সবই শুনেছেন এবং আমাদের মতই উত্তেজিত। ঠিক হয় উনি ডিপার্টমেণ্টকে লিখবেন আর আমরা, ও. জি. সি. টি. এ কে (অর্থাৎ ওড়িশা গভমেণ্ট কলেজ টিচারস অ্যাসোসিয়েশানকে)। আজকে যেমন গরম তেমনি সর্বত্র সমস্যা আর গণ্ডগোল। আমাদের কলেজে ভাল ছেলেমেয়েরা পড়ে, ফাস্ট ডিভিশান ছাড়া অ্যাপ্লিকেশান ছুঁই না। সাধারণত ডিসিপ্লিনের প্রবলেম হয় না। অথচ আজ রাউণ্ডে বেরিয়ে—আমি স্কোয়াডে ছিলাম—এগজামিনেশান হলে ঢুকেই দেখি একেবারে দরজার কাছেই বসে একটি ছেলে, খাতার তলায় কাগজ। না ধরে উপায় নেই। যেই আমি ও ম্যাথিসের ডঃ শতপথী তার খাতা এবং কাগজ ধরেছি, অমনি ছেলেটি হাতজোড়

করে বলল,

'আইজ্ঞা, ম্যাডাম, স্যার, মু গরীব পিলা, মতে দয়া করন্তু।'

আমাদের সকলেরই রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল, ইয়াকি হচ্ছে, গরীব বলে কপি করতে দিতে হবে। জুলজির ডঃ ত্রিপাঠী বয়স্ক লোক তিনি তো খেপে গিয়ে প্রায় এই মারেন কি সেই মারেন। যথারীতি একগাদা ফর্মালিটি সামলাও, কোথায় ম্যালপ্র্যাকটিস ফর্ম, ছেলেটিকে ধরে বেঁধে খাতায় ও ইনক্রিমিনেটিং ডকুমেন্টে সই, আমাদের সই ইত্যাদি। এত বিরক্ত লাগে যে আর বলার নয়। এর পরে আবার এই রত্নটি বাইরে বেরিয়ে কী করবে কে জানে। এই তো প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট একটি মেয়েকে কপি করতে ধরে পল সায়ান্সের রাজেন্দ্র খুটিয়া কী বিপদেই না পড়েছে, সেই মেয়েটি পরীক্ষার হল থেকে আর বাড়ি ফেরে নি, এদিকে তার দুই দাদা এসে রাজেন্দ্রকে শাসিয়ে গেছে।

যে চাকরি দুই দশক আগেও নিরাপদ এবং সম্মানের ছিল আজ তার এই হাল। রাউণ্ড থেকে ফিরে সবাই দেশের অবস্থা, রাজনৈতিক নেতা, গভমেণ্ট পলিসি ইত্যাদির শ্রাদ্ধ করি। বটানির পিয়ন বংশী দারুণ কফি করে, অর্ডার দেওয়া হয়। ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট, এবারে ফিজিক্সের হেড, ডঃ নারায়ণ মিশ্র। তাঁর কাছে সম্মিলিত দাবী চা কফি পরীক্ষার অ্যাকাউণ্টে যাক। বেচারা ভদ্রলোককে বোধহয় শেষে পার্সোন্যাল অ্যাকাউণ্ট থেকেই দিতে হ'ল।

আর্টস ব্লকে পরীক্ষার খাতা নিতে যাই। হঠাৎ খেয়াল হ'ল সব ডিপার্টমেণ্টের লোকদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে ইংরিজির, সবার ডিউটি প্রায় এক সঙ্গেই পড়ছে কিন্তু সতীকে তো দেখছি না। ডিপার্টমেণ্টওয়াইজ ডিউটি ডিস্ট্রিবিউশান। তিন বেলা পরীক্ষা, ৭-৩০ থেকে ৯-৩০ কলেজের। ১০টা থেকে ১টা আর ২টো থেকে ৫টা ইউনিভার্সিটির। তিন তিনটে শিফ্‌ট চলছে, এর মধ্যে কখনো না কখনো তো একসঙ্গে পড়ার কথা। ওপরে স্টাফরুমে দেখি ডিপার্টমেণ্টের তরুণ সহকর্মী সুরঞ্জন পট্টনায়ক, পিয়ন ধরণীর আনঅফিসিয়াল ক্যান্টিন থেকে সিগারেট আর পান কিনছে। সুরঞ্জন অতি স্মার্ট, চৌকশ, বলা বাহুল্য সাহিত্যিক, ওড়িশাতে ছুএভার ম্যাটারস লেখালেখি করেন। আমরা বাঙালিরা সাহিত্য-ফাহিত্যর জন্য গর্ব করি কিন্তু ডঃ বি. সি. রায় কি জ্যোতি বসু কাব্য লিখছেন বা চীফ সেক্রেটারি জ্ঞানপীঠ পাচ্ছেন এটা সামহাউ ভাবতেই পারি না। হ্যাঁ বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, কিন্তু সেটা একশো বছরেরও বেশি আগেকার কথা। হোয়াইট অ্যাবাউট রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তার পরে দ্য হোল গ্যাং নজরুল, তারাশঙ্কর, মাণিক, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ, বনফুল, নট টু স্পিক অফ দ্য পোস্টট্র্যাগোরা পোয়েটস, জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে অ্যাণ্ড আদার্স। আমলাতন্ত্রের ছায়া কেউ মাড়ায় নি। ওড়িয়াতে এত লোকে লেখে, বিশেষ করে ব্যুরোক্র্যাটরা, শুনে প্রথম প্রথম আশ্চর্য হতাম। কলিগ্‌দের

মধ্যে যারা লেখে না—যেমন মেয়েরা—তাদের জিজ্ঞেস করলে শুনি যাঁরা লেখক তাঁরাই একমাত্র পাঠক। ওড়িয়া ভাষায় বই না কি বিক্রি বিশেষ হয় না। আমি অবশ্য এসব কথায় বিশেষ কান দিই না। বাংলা বই কত বিক্রি হয় কে জানে। আমি তো বাংলাফাংলা আগে পড়তামই না। বরং এখন কলেজ লাইব্রেরি থেকে নিয়ে দু চারটে পড়ি। ওড়িশার অনেক কলেজে বাংলা বই কেনা হয়। কটকে শৈলবালা আর র‍্যাভেনশ'এ তো রীতিমত ভাল কালেকশান। তবে আমাদের সুরঞ্জন যে কেউকেটা লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কটক কেন্দ্রে টিভি প্রোগ্রাম থেকে সুরু করে রাজভবনে গভর্নরের সঙ্গে টি পার্টি, সাহিত্যসভা, ইউ এস ইনফরমেশান সার্ভিস বা ব্রুচিৎ বৃটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রিত বিদেশী অধ্যাপকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—এসবেই সুরঞ্জনকে দেখা যায়। এবারে সে আবার কলেজের এগজামিনেশান কমিটিতে আছে। সব ব্যাপারেই সক্রিয়, ক্লাস নেওয়া ছাড়া। জিজ্ঞেস করি,

'আচ্ছা সুরঞ্জনবাবু, সতীকে তো দেখি না। ওকে কি ইংলিশের অন্যদের সঙ্গে ইনভিজিলেশান ডিউটি দেওয়া হচ্ছে না?'

সুরঞ্জন ফাঁকা ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে একটু অর্থপূর্ণভাবে হাসে।

'সে একটা ব্যাপার আছে, ম্যাডাম।'

'কী ব্যাপার?'

একটু যেন ইতঃস্তত করে সুরঞ্জন, কেমন একটা বাধো বাধো ভাব। আমি ছাড়বার পাত্রী নই। সতীর ওপরে যেন আমার একটা অভিভাবকত্বের অধিকার আছে।

'কী হ'ল? বলছেন না যে? ব্যাপারটা কী একেবারে স্টেট সিকরেট নাকি?'

'কিছু মাইণ্ড করবেন না তো?'

আমি তো অবাক। হেসে বলি,

'মাইণ্ড করব। কেন ওকে বুঝি ডিউটি থেকে রেহাই দিয়েছেন? এইবার আপনাদের একহাত নেব, পার্শিয়ালিটি চলবে না।'

'না, না সে সব নয়। আপনাদের ডিউটি সকালে হলে, আর বাইরের দিকে রুমগুলোতে। আর সতী ম্যাডামের ডিউটি সব আফটারনুনে, ওদিককার মানে ভেতরের দিকে ছোট রুমগুলোতে, পল সায়ান্সের হীরেন স্যারের সঙ্গে।'

ভুঁরু উঁচু করে মিচ্‌কে হাসে সুরঞ্জন। আমি তো কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। ইনভিজিলেশান ডিউটির মধ্যে এত চোখ ঠারাঠারির কী রে বাবা।

'মানেটা কী সোজা করে বলুন তো।'

'মানে বুঝলেন না? হীরেন স্যার সতী ম্যাডামকে একটু অ্যাডমায়ার করেন। জানেন তো ম্যাডামের হাজব্যাণ্ড বিনোদিনীর সঙ্গে খুব চালাচ্ছে? তাই আমরা একটু অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে দিচ্ছি টু নো ইচ আদার বেটার।' ষড়যন্ত্রকারীর

মত ফিশফিশ করে বলে আবার একটু মুচকি হাসে সুরঞ্জন। স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করি,

'সতীর স্বামী কার সঙ্গে কী করছে, ওকে কে পছন্দ করে না করে—এ সব পার্সোনাল ব্যাপার বাইরের লোক জানতে পারল কী করে?'

'বাঃ এতো জানবেই। একি আপনার ডেল্লি বা ক্যালকাটা যে পাশের ফ্ল্যাটে ডিভোর্স হয়ে গেলেও কেউ খবর রাখবে না? ভুবনেশ্বর ইজ আ ভিলেজ, লাইক দ্য রেস্ট অফ ওড়িশা। এখানে সবাই সবার হাঁড়ির খবর রাখে, কে পান্তা ভাত শাক ভাজা দিয়ে খায়, কে চুনোমাছের চচ্চড়ি দিয়ে তাও সবার জানা। আর এত বড় একটা ব্যাপার—আই মীন মিঃ পাণ্ডা আর বিনোদিনীর রোরিং অ্যাফেয়ার—এটা কাকপক্ষী টের পাবে না তা কি কখনো হয় নাকি। আপনি এত বছর এখানে থেকেও সেই ক্যালকাটা বেংগলি রয়ে গেলেন, সবসময় মেট্রোপলিসের টার্মে ভাবেন।'

কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। এ রাজ্যের মানুষদের মনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারলে আমার অনেক সিদ্ধান্ত অন্য রকম হ'ত। ওড়িশাবাস একান্তভাবেই স্ত্রীবরের চাকরির সঙ্গে যুক্ত অতএব যেন আমার কাছে বাধ্যতামূলক। তাই কি মনে মনে এত প্রতিরোধ। কলমের খোঁচায় কি সংহতি হয়। বাংলা জানি বা না জানি আমার হোমস্টেট ওয়েস্ট বেংগল রয়ে গেল; সরকারি সব ফর্মে প্রতিবছর এখনো বাবার ঠিকানা পার্মানেণ্ট অ্যাড্রেস, সেই ১৪বি কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা ১৯ শিকড়টা রয়ে গেছে। অথচ আমি তো মানুষ, এক জায়গায় গাছ গাছালির মত স্থিতু হয়ে থাকার মানে নেই। মোবিলিটি কেন থাকবে না? সুরঞ্জনের মন্তব্যে অপ্রতিভ হই। এদের সব ব্যাপারে সত্যি যথেষ্ট আগ্রহ আছে, প্রশ্ন করি,

'আচ্ছা ঐ পল সায়ান্সের হীরেন স্যার আর আফটারনুন ডিউটি কী বলছিলেন, ওটা কী ব্যাপার?'

'ওহো, ওটাও জানেন না! ওটাও তো এখানকার ট্র্যাডিশনাল আন অফিসিয়েল ম্যাচমেকিং। জানেন তো আফটারনুনে প্রায়ই সব কিছু ঝিমিয়ে যায়? বিশেষ করে ছোট ছোট সাবজেক্টের পরীক্ষায়? সব একটেরে ঘরগুলো স্যার ও ম্যাডামদের জোড়ায় জোড়ায় সমানে দিয়ে আমরা চোখের সামনে কত রোমান্সের সুরু আর শেষ দেখলাম।'

'বটে! আমি তো কোনদিন জানতে পারি নি। অবশ্য এ কলেজে আমি নতুন। একটা এগ জাম্পল দিন তো।'

'আপনি তো ম্যাডাম ইংলিশের লোক, ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজ বিশেষ বোধহয় পড়েন না, তাই না? ওড়িয়া সাহিত্যের ফেমাস্ পোয়েট, ইনফ্যাক্ট হি ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস্ অফ মডার্ন ইণ্ডিয়ান লিটরেচার, একেবারে ইণ্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড—শিবপ্রসাদ মহাপাত্রের নাম শুনেছেন?' মাথা নাড়ি, হ্যাঁ।

আসলে অবশ্য শুনি নি, তবে ওড়িয়ারা সব ব্যাপারে ইণ্ডিয়ার বেস্ট এবং ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লেম করে, ওটা এখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথার মাত্রা, এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান নিয়ে বের করে দিতে হয়।

'শিবপ্রসাদ শুধু যে কবি তাই নয়। একটা রিয়েল ম্যান। একেবারে পুরুষ সিংহ, নাম করা লেডিকিলার ছিলেন ইন হিজ টাইম।'

কী আদিম! হিংস্র জানোয়ার, শিকার ধরা, মারা এ সমস্ত হচ্ছে নরনারীর সম্পর্কের বর্ণনা। মুখে বলি,

'তা আপনারা শিবপ্রসাদ মহাপাত্রের কীর্তিকাহিনী জানলেন কী করে?'

'বাঃ জানব না? আমাদের চোখের সামনে কত কি ঘটে গেল। এই যে ম্যাচমেকিং ট্র্যাডিশানের কথা বলছিলাম না সে তো শিবপ্রসাদকে দিয়েই সুরু। তখন আমি পাশ করে সবে জয়েন করেছি, অ্যাড হকএ। আমারই সঙ্গে ওড়িয়াতে ঢুকে ছিল কুমুদিনী হোতা, একটু মিষ্টি চেহারা ছিল। জাস্ট বিয়ে হয়েছে, স্বামী ব্যাংক অফিসার, অ্যাট দ্যাট মোমেণ্ট সম্বলপুরে পোস্টেড ছিলেন। শিবভাইনার তার ওপর চোখ পড়ল। আমরা সবাই লেগে গেলাম। দুটো পুরো সিজন দুজনকে একটা ছোট রুমে আফটারনুন ডিউটিতে ফেলে দিলাম। যাকে বলে ঘি আর আগুন। ব্যস দি ইনএভিটেবল হ্যাপেন্ড। একেবারে জমাটি রোমান্স। মেয়েটা তো ওড়িয়া সাহিত্যের ছাত্রী, এমনিতেই শিবপ্রসাদের লেখা পড়ে হিরোওয়ারশিপ করত, তারপর তখন শিবভাইনা ওয়াজ অল চার্ম অ্যাণ্ড হি ওয়াজ আ ব্যাচেলর টু। শি ওয়াজ লিটেরালি ক্রেজি ফর হিম।'

'শেষে কী হ'ল?

'শেষে আর কী হবে, যা হয়ে থাকে। শিবভাইনা হ্যাড হিজ ফান অ্যাণ্ড ডিসাইডেড টু ব্রেক অফ। বহরমপুর ইউনিভার্সিটিতে রিডার হয়ে চলে গেলেন। বিয়েটিয়ে করলেন. নওরঙপুরের এক গাঁয়ের মেয়ে, অ্যারেঞ্জড ম্যাচ। হি ইজ ফাইন। আরও দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে, সাহিত্য আকাদমী অ্যাওওয়ার্ড ইন সেভেণ্টিনাইন, এদিকে পি. এইচ. ডি. থিসিসও পাবলিশড, স্টেটসে গিয়ে ছিলেন, এখন ফুল ফ্লেজেড্ প্রফেসর।'

'হোয়াট অ্যাবাউট কুমুদিনী?'

'সেও ইউজুয়েল স্টোরি। শি কুড্ণ্ট প্লে দ্য গেইম, ভীষণ সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে মার্ডাস ব্রেক ডাউন টাউন বাঁধিয়ে সে এক কাণ্ড। স্বামীর কাছে না কি আবার সব কনফেসও করেছিল, জাস্ট ইমাজিন। ফাইন্যালি শি লেফ্ট দ্য জব। তারপর কী হ'ল জানি না। সত্যি ইণ্ডিয়ান উইমেন আর সো ইনহিবিটেড্।'

'আপনারা অন্য কোন দেশের মেয়েদের জানেন? কতদিন থেকেছেন ইয়োরোপ আমেরিকায়?'

থাকি নি। কিন্তু না থাকলে কি আর জানা যায় না? মিডিয়াতে কী

দেখছি? পারমিসিভ সোসাইটি, ফ্রি সেক্স। এ সব সেন্টিমেন্ট ফেন্টিমেন্টের ঝামেলাই নেই।'

'সেখানেও কিন্তু আফটারনুন ইনভিজিলেশান দিয়ে দুজন মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের মত জোড় মেলানো হয় না। হয় কি?'

'ওহো, আপনি সতী ম্যাডাম আর হীরেন স্যারকে ডিউটি দেওয়ার ব্যাপারটায় এত মাইণ্ড করছেন বুঝি?'

দিব্যি মানুষের মত চেহারা সাজপোশাক, কিন্তু আসলে সব হাঙ্গরের পাল, অথাদ্য ঘোলা জলে ঘুরে বেরাচ্ছে কখন কোন চোট খাওয়া প্রাণীর গন্ধ পাবে, আর অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে চিবিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। শক্ত মুখে বলি,

'মাইণ্ড করার কথা নয় কি?'

'আহা চটছেন কেন, ম্যাডাম? আফটার অল আপনার তো কোন কনসার্নই নয়, কবে কোন কুমদিনীর কী হয়েছিল, সতী তার হাজব্যাণ্ড আর বিনোদিনী এই ট্রায়াংগেলে নতুন কোন অ্যাংগল অ্যাডেড হ'ল এতে আপনার গায়ে লাগবার তো কিছু নেই। ইউ আর অ্যাবাভ অল.দিজ, আপনাকে সবাই কত রেসপেক্ট করে—'

রেসপেক্ট কাকে করে, আমাকে না আমার চারিদিকে স্থবীরের পদমর্যাদার কর্মকে? এই তো বটানির সুহাসিনী ঠিক আমার মত চুল কেটে এলে স্টাফ মিটিঙে তাকে নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা, 'মেমসাহেব এল রে' 'দেখ তো ছেলে না মেয়ে' ইত্যাদি।

'থাক থাক, আপনাদের রেসপেক্টের কোন অর্থ নেই, ভয় থেকে ভক্তি। ওতে আমি অন্তত ভুলি না। দেখুন, কুমুদিনী যেমন স্ত্রীলোক, সতী যেমন স্ত্রীলোক, ঠিক তেমনি আই অলসো হ্যাপেন টু বি আ ওম্যান। উই আর অল ইন দ্য সেইম বোট। অল আর উইমেন।'

'তার মানে তো এই নয় যে অল উইমেন আর ইকোয়েল। সাম উইমেন আর মোর ইকোয়েল। কোথায় আপনি আর কোথায় ফর ইন্‌স্ট্যান্স এই বিনোদিনী? আমরা ওকে কী বলি জানেন তো? এভারেডি টর্চ, বিকজ শি ইজ অলওয়েজ রেডি ফর মেন, হা হা হা। শি ইজ অ্যা রিয়েল বিচ্, কত হাত যে ফিরেছে—'

'শিবপ্রসাদের বেলায় পুরুষসিংহ আর বেচারি বিনোদিনী শুধুই নগণ্য বিচ্। ইণ্ডিয়ান উইমেন কেন, আপনারা ইণ্ডিয়ান মেনও কম ইনহিবিটেড নন দেখছি।'

শেষ কথাটি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ি। যত সব ভণ্ড জোচ্চরের দল। শুধু নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী আধুনিক। ওয়েস্টের দিকে জানালা খুলে বসে ব্যাজ

নাড়ছে, দু-চারটে বাড়তি লাইসেন্সের হাড় ছিটকে এসে পড়বে এই আশায়। রাগে গা রি রি করে। গটগট করে স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে আসি।

গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, পেছন থেকে ডাক, 'ম্যাডাম, ম্যাডাম।'

ফিরে দেখি বিনোদিনী, পরনে আগুনে লাল রঙের সিনথেটিক শাড়ি, ক্যাটকেটে হলুদ ব্লাউজ। বৈশাখের দুপুর রোদে চোখে লংকা গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল। শ্যাম্পু করা সামনের কাটাচুলের গুচ্ছ ঘামে নেতিয়ে গেছে, নাকের দুপাশ দিয়ে গড়াচ্ছে তেল, গর্তে বসা চোখের কোলে ঘন কালি।

'নমস্কার, বাড়ি ফিরছেন?'

বিরক্ত লাগল, যত নষ্টের মূল। দায়সারা ভাবে গম্ভীর মুখে ডানহাতটা কপালে ছুঁইয়ে বলি,

'নমস্কার। না, বাড়ি ফেরার কি আর উপায় আছে এত তাড়াতাড়ি। সেই ওঁর সেক্রেটারিয়েট সেরে তবে ফেরা। সন্ধ্যের আগে তো নয়ই।'

'এখন তাহলে কোথায় যাচ্ছেন?'

আরও বিরক্ত লাগে। সবাই কি তোমার মত পরপুরুষের সঙ্গে অভিসারে যায়! একটা দুটো এরকম দলছুট ব্ল্যাকশিপ-এর জন্য সবাইকে হাঁটা হতে হয়। গড়গড় করে বলতে শুরু করি,

'সারকিট হাউসে। ওখানে বলা থাকে। কয়েকঘণ্টার জন্য একটা রুম খুলেটুলে দেয়। কী করব বলুন, স্টাফরুম তো চারটেয় বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও একটা তো বাকি সময়টা কাটাতে হবে। তাছাড়া বেরুই সকাল নটায়, ফিরতে ফিরতে রাত আটটা। কলেজের অবস্থা তো জানেন, স্টাফরুমে অর্ধেক সময় পাখা নেই, মেয়েদের আলাদা বাথরুম নেই, কলে জল কেউ কখনো দেখেনি। খাবারদাবার পাওয়ার প্রশ্নই নেই। এই তো ওয়ার্কিং কনডিশান। ক ঘণ্টা এখানে থাকা যায় বলুন?'

'ঠিক বলেছেন। ইউ. জি. সি-র বরাদ্দ চারঘণ্টা কাটাতেই প্রাণান্ত, বিশেষ করে শরীরটরীর খারাপ হলে যে কী অবস্থা। আমাদের সুষমা পুরী থেকে আসে, বেচারার টিউমার আছে, প্রচণ্ড ব্লিডিং—'

বাধা দিই। এসব ফিজিক্যাল, প্যাথোলজিকাল ডিটেল আমার বিশ্রী লাগে। কেন যে কোন কোন মেয়ে শরীর নিয়ে অবসেস্‌ড।

'হ্যাঁ খুবই অসুবিধা ওর, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। তা আমাকে কিছু বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, একটু ফেবার চাইছিলাম। যা গরম, আর আজ আমি ডেড টায়ার্ড, গাড়ি মিঃ সেনাপতি ট্যুরে নিয়ে গেছেন, রিক্সা ধারে কাছে একটাও দেখছি না। যদি খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাই? রিক্সা পেলেই নিয়ে নেব।'

অপ্রতিভ লাগে, সত্যি, সামান্য অনুরোধ। হাজার হোক ওতো আমার কলিগ। এটুকু না করাটা অভদ্রতা হয়, তাছাড়া ও কার স্বামীর সঙ্গে কী করছে না করছে তাতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে কেন। আমার সঙ্গে তো বরাবর ভালই ব্যবহার করে। তবু সতী যখন অত করে বলেছে, একটু কিন্তু কিন্তু লাগে।

'কোথায় যাবেন?'

'কোথায় আর যাব, বাড়ি। গোরুর গোয়াল আর মেয়েমানুষের স্বামীর ঘর, এছাড়া আর যাওয়ার জায়গা কই।'

খট করে কানে লাগে। এরও তো দিব্যি বোলচাল আছে। ইগনোর করার ভান করি।

'বেশ তো আসুন, এ আর কী এমন কথা।'

দুজনে দুদিক থেকে গাড়ির পেছনের সিটএ উঠে বসি। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে সুরু করে।

'তা এত টায়ার্ড কেন? ডাব্‌ল ডিউটি পড়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'কলেজে একটা সিটিংই ছিল ১০টা—১টা। কিন্তু আমাদের মত ওয়ার্কিং মাদার অ্যাণ্ড হাউসওয়াইফের ডিউটির যে কত সিটিং হিসেব কে নেয়। ঘুম থেকে উঠতে হয় ভোর সাড়ে চারটে, ছেলের জয়েণ্ট এন্‌ট্র্যান্স, আই আইটি সব অ্যাডমিশান টেস্টের প্রিপেরেশান চলছে। তাকে ডাকাডাকি করে তোলা, অ্যালার্ম বাজলে ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দেয়, চা না পেলে উঠবে না। তার জন্য চা করি। চাকরটিতো নবাব, ৭টার আগে বাবু রান্নাঘরে ঢুকবেন না। আর একবার ঘুম ভেঙে গেলে ম্যাডাম আমি আর শুতে পারি না। খাতাফাতা দেখি। তারপর সাতটা থেকে রান্নাবান্নার প্রস্তুতি, নিজে রেডি হওয়া, কলেজ। ফিরে গিয়ে আর একপ্রস্থ সকলের জলখাবারের তদারকি ও রাতের খাওয়া। এদিকে শুতে শুতে রাত বারটা। আমার বোনের মেয়ে আমার কাছে থেকে থ্রি ইয়ার ডিগ্রির প্রথম ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে—ওর বাবা বদলি হয়ে গেছে কি না—সে আবার রাত জেগে ছাড়া পড়তে পারে না। কফি চাই। তাছাড়া আমারই সাবজেক্ট, অতএব কোন্ কোন্ টপিক প্রিপেয়ার করছে দেখতে হয়, পয়েণ্ট বলা, মুখস্ত ধরা, মানে ধরুন আমিই আরেকবার পরীক্ষায় বসছি আর কি।'

মায়া হয়, সত্যি ভারি পরিশ্রম বেচারার। থ্যাংক গড আমাদের একটিই সন্তান এবং দীর্ঘদিন ধরে হোস্টেলে। তার ফাইনাল পরীক্ষার প্রিপেরেশানে, হ্যাঁ আমরা টিউটর-টিউটার যখন যা দরকার রেখেছি কিন্তু নিজেকে এমনভাবে ইনভলভ্‌ড হতে হয় নি। অবশ্য ওর সাবজেক্ট একেবারে আলাদা।

'ইউ রিয়েলি ওয়ার্ক হার্ড। তবে দেখবেন ইউ উইল বি অ্যাম্পলি রিওয়ার্ডেড।

এই তো বড় মেয়ে ডাক্তার হবে, ছেলেটি কোন না কোন জায়গায় ইঞ্জিনীয়ারিংএ পেয়েই যাবে, ছোট মেয়েটিও তো ভাল, তাই না? আর আপনিই তো এদের সাফল্যের মূলে, মানে যাকে বলে ইন্সপিরেশান…'

বিনোদিনী হাত নেড়ে আমাকে কথা শেষ করতে দেয় না।

'দূর ম্যাডাম, ওসব রিওয়ার্ড, ইন্সপিরেশান, ওসব কিছু নয়। মিড্‌ল ক্লাস পেরেণ্টস ছেলেমেয়েদের এই সব পরীক্ষায় বসাতে বাধ্য নইলে লোকে ছি ছি করবে, আর ছেলেমেয়েরাও তাই মনে করে। আপনি ভাবছেন এরা ভবিষ্যতে আমার এই পরিশ্রম মনে রাখবে? নাথিং ম্যাডাম নাথিং। কেউ কিছু মনে রাখে না। যা পায় তাই প্রাপ্য ভাবে।'

'ইউ আর আ সিনিক, বিনোদিনী। সংসারে সবাই কি খালি নেওয়ার তালে আছে?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করি। একটু অপরাধীও লাগে নিজেকে। সুপুকে হোস্টেলে রাখার জন্যই কি কোন অ্যাডমিশান টেস্টে পারল না? অথচ আগরওয়াল, ব্রিলিয়াণ্ট দুটোতেই ওকে এনরোল করা হয়েছিল। ছোটবেলাতে ওর পড়াশুনা আমরা স্বামীস্ত্রী পালা করে দেখতাম। সংসারের ঐ একটা দায়িত্বই যেন আমরা একসঙ্গে বহন করতাম, বাকি তো যে যার ক্ষেত্রে একলা। সুবীর দিল্লি থেকে ওড়িশা ফেরৎ আসার সময় সুপুর ক্লাস এইট। ওকে ডেল্লি পাবলিক স্কুলে রেখে আসা হ'ল। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, কতদিন খেতে পারিনি। সুবীর কিছুতেই শুনল না। ট্রান্সফার কোটা আর আমলাদের দাপটে ওড়িশায় আমাদের ছেলের অন্তত ভর্তির সমস্যা হত না। এখানে না কি ছেলের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ডেল্লি ইজ দ্য ক্যাপিট্যাল, ভুবনেশ্বর, ক্যালকাটা—অল আর জাস্ট প্রভিন্সিয়াল আউটপোস্টস অফ দ্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার। মেইন স্ট্রিম্ এ ছেলেকে রাখতেই হবে। সত্যি তো, যুক্তি না মেনে উপায় নেই। ওড়িশায় আপার ক্লাসের একটা লক্ষণই হ'ল ছেলেমেয়েকে দিল্লিতে রেখে পড়ানো। ইংরেজ আমলে ইংলণ্ডে পাঠানো যেমন স্টেটাস সিমবল ছিল।

বিনোদিনী হাওয়ায় এলোমেলো চুলের গুচ্ছ চোখ থেকে সরাতে সরাতে বলে,

'কনসালি কে কতদূর নেওয়ার দলে আছে বা নেই বলা শক্ত। তবে একটা জিনিস আমার কাছে খুব পরিষ্কার, আমি জানি না আপনি এগ্রি করবেন কিনা, আমরা এডুকেটেড ওয়ার্কিং মাদার হয়ে আমাদের বাড়ি থাকা মা ঠাকুমার চেয়ে বেশি কিছু লাভ করি নি, বরং আমাদের ওপর কাজের চাপ প্রচণ্ড। ওঁরা তো শুধু রাঁধাবাড়ার মধ্যেই থাকতেন, বড় জোর ছেলেমেয়েদের পড়তে বসার তাগিদ দেওয়া, রেডি হয়ে সময়মত স্কুলকলেজ যাওয়া। এর বাইরে কিছু করতে হত না।'

'তা যা বলেছেন। আপনার হাজব্যাণ্ড ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাতে হেল্প

করেন না ?'

'কোথায় আর করেন। ছেলেমেয়েরা ভাল করলে পাঁচজনের কাছে বড়াই করেন, কিন্তু সেই ভাল করানোর পুরো দায়িত্বটা কেবল আমার—তাদের লেখাপড়ার প্রতিদিনের খবরদারি, মাস্টার টিউশান, অসুখবিসুখে ডাক্তার পথ্যি, স্বভাবচরিত্রে নজর রাখা—সব কিছু কর্তব্য খালি আমার। সংসারের কর্তা হচ্ছেন প্র্যাকটিক্যালি অ্যা পেয়িং গেস্ট, কিছু টাকা মাস গেলে ধরিয়ে দেন, তার বদলে তাঁর খাওয়াদাওয়া জামাকাপড়ের দায় আমার, আর কিছু তাঁর করণীয় নেই, মাথাব্যথাও নেই।'

না, আমাদের সংসারে কিন্তু টাকাপয়সার ব্যাপারটা বরাবর সুবীরই দেখে আসছে। আমি রোজগার করি বটে কিন্তু আমার আয়টা তো নেহাৎই বাড়তি, হিসেবের মধ্যে পড়ে না। মাসের প্রথমে মাইনের চেক্‌টা ওরই হাতে দিয়ে দিই, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে জমা করে দেয়। হ্যাঁ, আমাকে জিজ্ঞেস করেই সংসারখরচের টাকা তোলে। সুপুর খরচ ওই পাঠায়, হিসেবপত্রও ওকেই রাখতে হয়। আমি এসবে নাক গলাই না, দরকারমত টাকা পেলেই হ'ল। ইনফ্যাক্ট আমি কোন দিন ব্যাংকে যাই না, সুবীরের প্রাইভেট সেক্রেটারিই যায়।

আমার মাকেও কোনদিন টাকাপয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখি নি। প্রয়োজনমত বাবাকে বলতেন, তবে হ্যাঁ, বাবার রোজগারের চৌহদ্দি ডিঙোতেন না। টাকার দায়িত্ব বাবারই। মাকে কোন দিন চেক কাটতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ আমার মা সেকালের গ্র্যাজুয়েট। সে নিয়ে তাঁর এবং বাবার এখনো যথেষ্ট গর্ব। ইংরিজি ভাল জানেন, সুন্দর উচ্চারণ। আমরা তো ওঁর কাছ থেকেই শিখেছি। ওদের আমলে স্ত্রীশিক্ষা ছিল একান্তভাবে ছেলেমেয়ে স্বামীর স্বার্থে। ঠাকুরমার হাজারটা মেয়েলি ব্রত, স্ত্রী আচার, পরচর্চা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ বছরের ৩৬৫ দিন সংসারে নিয়োগ। বিশেষ করে যে সংসারে আধুনিক শিক্ষাই জীবিকা অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু সেখানে এঁদের ভূমিকা অমূল্য। তাছাড়া স্বাস্থ্যবিধিটা শিখেছিলেন, সুস্থ জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত দিয়েই মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতেন। আর ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে ইংরিজি শেখার মাহাত্ম্য তো রক্তে এসে গিয়েছিল।

গেয়াল করি বিনোদিনী একেবারে কথার তোড় ছুটিয়েছে।

'বুঝলেন ম্যাডাম, প্রতিদিনের সংসার যে বিশাল ব্যাপার। এই রান্নাটাই ধরুন না। মিস্টারের আলাদা খাওয়া, উনি ডায়বেটিসের রুগী। ছোটবেলা থেকে, তখন ধরা পড়েনি। বিয়ের পরপর ডায়েবেটিক কোমা হয়ে যায়। তারপর থেকে সারাটা জীবন ধরাকাটের মধ্যে। আমি আবার একটু খেতেটেতে ভালবাসি, ছেলেমেয়েদেরও রুগীর খাবার রোচে না। কাজেই আমাদের জন্য আরেক প্রস্থ রান্না। এদিকে শাশুড়ি আছেন, ওঁর একাদশী, সংক্রান্তি, ব্রত উপবাস

মানামানি আছে, আমাকেও ওঁর সঙ্গে করতে হয়। সে জন্য আলাদা আয়োজন। আর আমাদের ওড়িয়াদের 'ওমা' অর্থাৎ ব্রত মানেই কিছু না কিছু পিঠা, বাড়িতে বাটাবাটি দিনরাত চলছে। এইতো চৈত্র সংক্রান্তি গেল। সে এক পর্ব। আপনাদেরও তো আছে, বঙ্গালি ওড়িয়াতে বিশেষ ডিফারেন্স নেই।'

অস্বস্তি বোধ করি। কলকাতার বাঙালি বিশেষ করে যারা নিজেদের উদার মনে করে এবং শিক্ষিত ওড়িয়া দুশ্রেণীর মুখেই একথাটি সারাজীবন শুনে আসছি।

'দেখুন, বঙ্গালি বলে তো কোন একটা এন্‌টিটি নেই, মাল্টিক্লাস সোসাইটি আমাদের। মোটামুটি বলতে গেলে আরবান এডুকেটেড ফ্যামিলিতে এখন ব্রততত আর বিশেষ মানা হয় না।'

'তাই নাকি। ছাট্‌স স্ট্রেঞ্জ। আমরা তো পড়ে আসছি ট্যাগোর ইণ্ডিয়ান ট্র্যাডিশান আপহোল্ড করতেন, স্বামী বিবেকানন্দ—'

'আসলে ওখানে বোধহয় একটু মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে। ফেমাস বেংগলিরা যে ইণ্ডিয়ান ট্র্যাডিশানের কথা বলেন সেটা মেইনলি আইডিয়ার। এই বেদান্তটেদান্ত ফিলজফিক ডিসিপ্লিনের, সেটা প্রতিদিনের প্র্যাকটিসড, মানে আচরিত পৌরাণিক হিন্দু রিচুয়ালিজম থেকে অ্যাকচুয়েলি বেরিয়ে আসার জ্যাস্টফিকেশান। ট্যাগোর ওয়াজ আ ব্রাহ্ম, বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণের ভক্ত। ইটস কোয়াইট আ লংওয়ে ফ্রম অর্থডক্স হিন্দুইজম।'

'রিয়েলি ? আমরা কিন্তু অতশত বুঝিই না। তবে ব্রততত তুলে দিয়ে ভালই করেছেন, ঝামেলার হাত থেকে রেহাই। আমাদের তো 'পিঠাপনার' জন্য বিড়ি বেটেই জীবন গেল। 'বিড়িডালি' বাংলায় আছে তো ?'

'হ্যাঁ, কলাইয়ের ডাল বলি। বড়িটড়ির ব্যবহার হয়, আর গ্রামদেশে রান্না করে খায়। আমাদের বাড়িতে অবশ্য কখনো হয় না। মুগ মুসুর খাই বেশি, কখনো ছোলা বা মটর ডাল হয়, অড়হর আপনারা খুব খান না ? ওটা আবার আমাদের কমই ব্যবহার। তোমাদের পিঠে কিন্তু সবই মিষ্টি, মেইনলি চালের গুঁড়ো, নারকেল, দুধ, খোয়া ক্ষীর এসব লাগে। আমি নিজে অবশ্য কিছুই জানি না কিন্তু ছোটবেলায় আত্মীয়স্বজন কি পাড়া পড়শীদের বাড়িতে দুচারবার গেয়েছি, গল্পেও শুনেছি।'

'আমাদের সবরকমই হয় এবং প্রতিদিনের ব্যাপার। তবে নারকেলটারকেল স্পেশাল আইটেম। এটাতো ধরুন শুধু রান্নার একটা পদ কি বড়জোর জলখাবার। এছাড়া আমাদের ওড়িয়াদের কি যে ঝামেলার সংসার আপনি ভাবতে পারবেন না। গাঁ থেকে অনবরত আত্মীয়স্বজন আসা রয়েছে, দূর সম্পর্কের এমন কি যাকে বলে গ্রামসম্পর্কের হলেও আমাদের এখানেই সব ওঠে। তাদের খাওয়াদাওয়া থেকে সুরু করে ভুবনেশ্বরে যে কাজে এসেছে তার ব্যবস্থা সব করতে হয়।'

'ভুবনেশ্বরে কী এত কাজ সকলের ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'বলেন কি ম্যাডাম, সব কিছুর জন্যই তো কটক ভুবনেশ্বরে আসতে হয়—ভাল কলেজে অ্যাডমিশান, চাকরির ইণ্টারভিউ, মন্ত্রীদের ধরাকরা, চিকিৎসা, মামলা মকদ্দমার ফাইনাল স্টেজ—সবকিছুর জন্য এখানে। এবং সব ব্যাপারেই সেই আমাকে মাথা ঘামাতে হয়।'

আমি তো তাজ্জব। জন্ম থেকে দেখে এসেছি পরিবার মানে বাবা মা ছেলেমেয়ে, ব্যস। বিয়েটিয়ে গোছের বড় অনুষ্ঠান ছাড়া আমার দুই কাকা ও এক পিসিমা বা তাঁদের ছেলেমেয়েরা কেউ কখনো আমাদের বাড়িতে রাত্রিবাস করেছেন বলে মনে পড়ে না। ঠাকুর্দা মারা গেছেন আমার ছোটবেলায়, ঠাকুমা কাকাদের কাছেই পালা করে থাকতেন। কাকিমারা মায়ের মত অত শিক্ষিতা অতএব আধুনিকা ছিলেন না বলে, নাকি বাবার বদলির চাকরিতে ঠাকুমার সুবিধা হ'ত না—কোনটা আসল কারণ জানি না। আত্মীয়স্বজনের আসাযাওয়া মানে ক্যাজুয়েল ভিজিটস। আমাদের বাড়ি ইংলিশম্যান্স কাস্‌ল না হলেও এরকম অবারিতদ্বার ধর্মশালা কখনোই ছিল না। তাই বোধহয় মুখ ফস্কে বলে ফেলি,

'ও বাবা। এ তো এলাহি ব্যাপার। বিশাল সেট আপ মেইনটেইন করতে হয় আপনাকে। ঝামেলা আর খরচ দুই প্রচুর।'

'সেট আপ আর কি। কোয়ার্টারটা দোতলা, একটু জায়গা আছে, তাতে আমরাই পাঁচজন, যে যেখানে পারে শোয়, যা বাড়িতে রান্না হয় খায়। সেরকম গেস্টরুম রেখে গেস্টের পরিচর্যা আউট অফ কোয়েশ্চেন। ওটা এক্সপেক্টেডও নয়। খরচের ম্যাডাম কোন হিসেব নেই। গাঁ থেকে চালডাল মুড়িচিঁড়ে গরুর খাবার সব আসে। এছাড়া উনি যখন যান বা কেউ এলে গেলে—এই কটক জেলার জাজপুর সাবডিভিশনেই তো শ্বশুরবাড়ি—'পণিপরিবা' মানে তরিতরকারি, মাছটাছ আসে। আর গাঁ থেকে যারা এসে ওঠে তাঁরাও তো নিজেদের জমির কিছু না কিছু নিয়ে আসে। তবু প্রতিদিনের কাঁচা বাজারটা তো করতে হয়। তাই বা কম কী, বলুন ?'

মাথা নাড়ি, সত্যি, কী সাংঘাতিক অবস্থা। এরকমভাবে সংসার আমার অভিজ্ঞতা এবং কল্পনা দুয়েরই বাইরে। এ তো সেই উপন্যাসে পড়া পল্লীসমাজের মত ব্যাপারস্যাপার। জিজ্ঞেস করি,

'গরুর খাবার কি বলছিলেন, গরু রেখেছেন নাকি ?'

'না রেখে উপায় কি বলুন। কাজেও লাগে পুণ্যও হয়। তবে একটা ফ্যামিলি মেম্বারের মত, তার খাওয়াদাওয়া, অসুখবিসুখ, প্রেগনেন্সি ডেলিভারি সবই দেখতে হয়। ২৪ ঘণ্টা লোক লাগে।'

'এখন তো সরকারি ডেয়ারির দুধ পাওয়া যায়। এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যান

কেন ?'

'ওসব ডেয়ারির দুধ ম্যাডাম আমাদের ওড়িয়াদের চলে না। ছেলেমেয়েরা ছোঁবেই না। এই বড় মেয়ে যে মেডিক্যালে আছে, তার তো রোজ কমপ্লেইন দুধদই নিয়ে, ছুটিছাটাতে বাড়ি এলে সরটা পুরো তার চাই।'

'আসলে ছোটবেলা থেকে বোধহয় অভ্যাস করিয়েছেন।'

'সে তো বটেই। আসলে কি জানেন মা-শাশুড়ি এরা তো সেই গাঁয়ের জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, একেবারে হাঘরে ছাড়া সকলের গরু থাকার কথা, নইলে ছেলেপুলে খাবে কি। সেই মেন্‌টালিটি চলে এসেছে আর কি। এরা সহরে থাকলেও গাঁয়ের সবকিছুই ট্রান্সপ্লান্ট করতে চেষ্টা করে। ন্যাচারালি, কারণ সকলের জমিজমা আছে, সংসারের মোটা খরচ ওখান থেকেই আসে, চাকরিটা বাড়তি। তাই গাঁয়ের ওবলিগেশানও মানতে হয়।'

আমাদের গ্রাম তো শুধু স্কুলের পড়ার বইয়ের ছবি। হ্যাঁ ওরিজিন্যাল গ্রাম একটা ছিল বটে, পূর্ববঙ্গে। সে কবেকার কথা, জ্ঞান হওয়ার আগে দেখা, তারপর দেশভাগ, মাটি থেকে উৎখাত। অবশ্য কলকাতায় সংসার অনেক বছর আগে থেকে, ইনফ্যাক্ট বেশ কয়েক দশকের কিন্তু 'দেশে'র অর্থাৎ গাঁয়ের সঙ্গে যোগসূত্র বাবাদের আমলেও ছিল। আমাদের তা নেই। তাতে কি লাভক্ষতি কিছু আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম আ সেন্স অফ ডিপ্রাইভেশান হুইচ মাইট ওয়েল বি ইলিউসারি ? এই যে বিনোদিনীর গাঁয়ের সঙ্গে এত যোগ এতে কি সে আমার চেয়ে সুখী বা তৃপ্ত বা সফল ?

'আপনি যাবেন কোন দিকে ?'

'চার নম্বর ইউনিটে, রবীন্দ্রমণ্ডপের কাছে।'

'তাহলে তো বেশি দূর নয়। চলুন আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি। আপনি একটু ড্রাইভারকে ডিরেকশানটা দিয়ে দেবেন।'

মোড় থেকে ডানদিকে যেতে বলল বিনোদিনী।

একটু নড়েচড়ে বসি, এরই মধ্যে ঘামে ব্লাউজটা পিঠে সেঁটে গেছে। হাওয়া গরম, চারিদিকে শুকনো রুক্ষ চেহারা, আকাশে কোন রঙ নেই, না সাদা, না নীল, না ধূসর। তবুতো দিল্লি থেকে ফিরে দেখছি ভুবনেশ্বরে রাস্তায় ঘাটে, সেক্রেটারিয়েটের সামনের মাঠটায় প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে। ষাট বা সত্তরের দশকে তো মরুভূমি ছিল। আর্লি সেভেনটিজএ যখন স্ত্রীর এখানে পোস্টেড ছিল বাবা মা বেড়াতে এসেছিলেন। ফাঁকা শহর, চওড়া চওড়া রাস্তা, জমিওয়ালা আলাদা আলাদা বাড়ি, কলকাতার ঘিঞ্জি গলির পরে ভালই লেগেছিল। কিন্তু চারিদিকে তখন ন্যাড়া মাঠ আর যেন সবই বন্ধ্যা। বাবামায়ের সেই চল্লিশের দশকে পুরী থেকে প্রায় অ্যাডভেঞ্চার করে ভুবনেশ্বরে আসার স্মৃতি রীতিমত ধাক্কা খেয়েছিল। কোথায় গেল সেই ঘন জঙ্গল ? আমরা ষাটের দশকের

শেষে এসে এরকমই দেখেছি। লাল শুকনো মাটি, বিশেষ কিছু ফলেও না। এতদিন বাদে দিল্লি থেকে এসে দেখছি আবার গাছপালা লাগানো হয়েছে, সবুজ হচ্ছে ভুবনেশ্বর। আর দুচার বছরেই ভোল পাল্টে যাবে।

রবীন্দ্রমণ্ডপ এসে গেল। ভুবনেশ্বরে বেশির ভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখানে হয়। জঘন্য হল, সরু সরু সোজা সোজা চেয়ার, কোন অডিটোরিয়মে এমনটি দেখিনি। অসম্ভব গরম। যারা নাটকটাটক করেন তাদের স্টেজে ডায়লগ বলতে বলতে ঘামে মেকআপ নষ্ট হয়ে যায়। আমরা শীতকাল ছাড়া পারতপক্ষে যাই না।

'এবারে বাঁ দিকে', বিনোদিনীর ডিরেক্‌শান।

কিছু মন্তব্য করা দরকার, ও বেচারা অনেক কথা বলেছে।

'সব মিলিয়ে সংসার তাহলে আপনার ফুলটাইম জব। কলেজের চাকরিটা নিছক বাড়তি পরিশ্রম।'

'সে তো একশোবার। তবে সত্যি কথা বলতে কি অনেকদিন পর্যন্ত এতটা পরিশ্রম মনে হত না। শাশুড়ি সমর্থ ছিলেন, সংসারের আসল বোঝাটা তিনিই বয়েছেন। আমার ছেলেমেয়েদের জন্মের পর প্রথম ক'টা বছর তাঁর হেফাজতেই কেটেছে। আমাকে তাদের ঝক্কি প্রায় পোহাতেই হয় নি।'

'সত্যি মা বা শাশুড়ি একজন কারো সাহায্য না পেলে আমাদের দেশে মেয়েরা চাকরি করতে পারে না। আমাদের তো আর ক্রেশ, ডেকেয়ার সেন্টার নেই। আপনার চাকরিতে ওঁর আপত্তি নেই তার মানে?'

'একেবারেই না, বরং ওঁরই উৎসাহে বিয়ের পরে আমার এম. এ. পড়া। আমার চাকরিতে ওঁর আগ্রহ আমার চেয়ে বেশি তো কম নয়। অথচ মজা কি জানেন উনি নিজে একেবারে নিরক্ষর ছিলেন, হ্যাঁ ম্যাডাম, ইল্‌লিটারেট। নিজের জীবনে ঠেকে শিখেছেন লেখাপড়া না জানাটা কত বড় হ্যাণ্ডিক্যাপ। মেয়ে তো নেই, চার ছেলের বৌদের মধ্যে আমারই বি. এ. ডিগ্রি ছিল আর একটু আধটু লেখাপড়ার শখও ছিল। তাই আমার জন্য উনি খুব করেছেন। আমার মা-ও বোধহয় এত করেননি।'

'খুব ভাল কথা। আমার শাশুড়িও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? এই যে শাশুড়ি-বৌ চুলোচুলির কথা শুনি, এসবই হাইলি একজাজ্যারেটেড। অতিরঞ্জিত। বেশির ভাগই ভালমন্দে মেশামেশি। আপনি আর আমি একটু বেশি লাকি।'

'সবই ইন্‌ডিভিজুয়েলের ওপর ডিপেণ্ড করে। ওড়িয়ার শান্তি মিশ্রকে জানেন তো? ওঁর যখন দ্বিতীয়বারেও মেয়ে হ'ল শাশুড়ি ওঁকে আঁতুড়ে খেতে দিতেন না মেয়ে জন্ম দেবার অপরাধে। কলেজের কলিগরা দেখতে যেত সঙ্গে ফল, সেদ্ধ ডিম লুকিয়ে ব্যাগে নিয়ে। সব রকমই আছে সংসারে। আমাদের বিয়েটা হ'ল

একটা জুয়া। কার ভাগ্যে কী জোটে কেউ আগে থেকে জানতে পারে না। তবে শান্তি অপার স্বামীটি খুব ভাল, যেমন কনসিডারেট তেমনি মডার্ণ। একদিকে না পেলেও অন্যদিকে পুষিয়ে গেছে। আমার বরাত ঠিক উল্টো।'

আলোচনাটা বিপজ্জনকভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না। জিজ্ঞাসা করি,

'কেন? আপনার স্বামী কি আপনার চাকরি করাতে আপত্তি করেন?'

'আপত্তি করবেন কোন দুঃখে? এতে তো তারই ষোলআনা লাভ। বৌ যদি সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে বাড়তি পরিশ্রম করে রোজগার ঘরে আনে তাতে আপত্তি করবে এমন একটিও ভারতীয় পুরুষ আপনি দেখেছেন? নিজেদের কুটোটি নাড়তে হবে না, পায়ের ওপর পা দিয়ে কর্তা বসে থাকবেন নৈবেদ্যর ওপর কলাটি—অথচ সংসারে বাড়তি টাকা আসবে নিয়মিত—এতে খুশি নয় এমন কোন পুরুষ আছে? আমাদের মত ওয়ার্কিং হাউস ওয়াইফদের স্বামীরা তো প্রিভিলেজড্ ক্লাস। দায় কমে গেছে, অধিকার ষোলআনার জায়গায় আঠার আনা হয়েছে। এই তো আমার তিন জা বাড়িতে থাকেন, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা টিউশান, ডাক্তারবদ্যি সব স্বামীরা করেন, বাজারহাট তো বটেই। আমরাই হচ্ছি গাধা। আগে অন্তত সংসারে পরিশ্রমের বদলে খাওয়াপরা, কখনো-সখনো একআধটু গয়নাগাটি, সম্ভব হলে একফালি জমি বা বাড়ি, বুড়ো বয়সে তীর্থদর্শন স্বামীর কাছে পাওনা হ'ত। এখন সেসব গেছে। মেহনত দশগুণ পাওনা নীল, শূন্য। এই যে দেখছেন শাড়িটা, এও আমার নিজের রোজগারে কেনা। একেই আবার ঘটা করে বলা হয় ইকনমিক ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স। পুরুষদের মডার্ণ হওয়াটাও এক্সপ্লয়টেশানের মুখোশ। যত্ত সব ধাপ্পাবাজি।'

শি ইজ রিয়েলি বিটার। দোষও দেওয়া যায় না। ওর কথাগুলো অল্পবিস্তর আমাদের সবার জীবনেই খাটে না কি? জন্ম থেকেই আমরা সংসারের জন্য নিবেদিত। আমার মা যে লেখাপড়া শিখে একমনে আমাদের এত আধুনিকভাবে মানুষ করেছিলেন তার বদলে কী পেয়েছেন? ট্র্যাজিশানাল সেট আপে মেয়েদের অন্তঃপুরেও একটা নিজস্ব আলাদা জীবন থাকে, সেখানে উইথ অল ইটস ফল্‌টস একাকীত্ব অন্তত থাকে না; ভালমন্দে মেশামেশি পাঁচটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে আচার বিচার ব্রত পালা পার্বনে। সেসব উপলক্ষে সংসারের কাছে তাদের দাবী মেটানোর সামাজিক-পারিবারিক দায় থাকে। অর্থাৎ দুবেলা খাওয়া ও ছেলে-মানুষের বাইরে একটা কোন জগৎ—তা সেটা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পরনিন্দা পরচর্চায় কলুষিত হোক না কেন—তবু একটা ডাইভারসন তো থাকে। আমাদের মায়েরা তো কোনটাই পেলেন না। আগের দিনের মত যৌথ পরিবারের মানুষের সাহচর্য, ধর্মকে উপলক্ষ করে দৈনন্দিন গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি, মোটা দাগের শাড়ি গয়নায় পুরস্কার। আবার আজ আমরা অন্তত ছোট পরিবারের দমবন্ধ করা

চার দেওয়ালের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছি। চাকরির মারফৎ বাইরের জগতের সঙ্গে প্রতিদিন কিছু না কিছু আদান প্রদান হচ্ছে, কথা বলার লোক পাচ্ছি। বিনোদিনী নিজের উপার্জনে শাড়ি কিনতে হচ্ছে বলে খেদ। মা তো রীতিমত বড় চাকুরের স্ত্রী ছিলেন, ক'টা শাড়ি তাঁকে বাবার কাছ থেকে উপহার পেতে দেখেছি? গয়না তো সেই বিয়ের সময় দাদু যা দিয়েছিলেন। বাবাদের জেনারেশনে শিক্ষিত পুরুষ শাড়ি গয়নাকে নিছক মেয়েলি ব্যাপার হিসেবে অগ্রাহ্য করতেন। অথচ স্ত্রীদের হাতে তাদের নিজস্ব কোন শখ মেটাবার জন্য কি কোনটাকা দিতেন। স্ত্রীকে টাকা দেওয়া মানে শুধুই সংসার খরচ, স্ত্রীর হাতখরচের প্রশ্ন কি কখনো উঠেছে? ধরেই নেওয়া হত ছেলেমেয়ে হওয়ার পর সব সখ-আহ্লাদই একমাত্র সন্তানকে কেন্দ্র করে। তাই কি প্রতিদিন আমার বা দিদির চুল, সাজপোশাক নিয়ে মা এত ইন্‌ভলভ্‌ড থাকতেন? কোন বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন মানে মায়ের ক'দিন ঘুম নেই—কে কোন গয়না পরব, কোন শাড়ি ব্লাউজ, দরকার হলে সুবিধা থাকলে নতুন কেনা—এইসবে কী উৎসাহ। আমাদের মধ্যে দিয়ে নিজেরই অতৃপ্ত বাসনা কামনার উপলব্ধি।

মায়ের নিজস্ব কিছু না-থাকাটা ধরেই নিয়েছিলাম বলে বোধহয় সুবীরের একলার নামে দিল্লিতে ফ্ল্যাট কেনাতে কিছুই মনে করি নি। ওর সম্পত্তি ডিক্লেরেশানে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের সেভিংস কাজে লাগানো হয়েছিল। প্রত্যেক বছরই ওর মাইনে থেকে জি পি এফ বাবদ কাটানো অংকটা বেড়ে চলেছে, আমার বেলাতে সেই মিনিমাম ৮½% রয়ে গেছে। ওর মোটা টাকার ইন্‌সিওরেন্স, আমার সেই পাঁচ হাজার টাকার। তাও ওরই দূর সম্পর্কের এক গরীব ভাই ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে আমাকে ধরে-বেধে করিয়েছিল। প্রতি বছর এন্ এস সি বা এন্ এস এস কেনা হচ্ছে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকায় কিন্তু ওর একার নামে। সত্যি কথা বলতে কি আমি কোনদিন আপত্তি করি নি। ওর মাইনে বেশি, ইনকাম ট্যাক্সের রেট বেশি, কাজেই ছাড় পাওয়ার জন্য এসব তো করতেই হয়। যখন সেই দিল্লি এপিসোড চলছিল, যখন বাইরে থেকে আক্রমণ এল তখন খেয়াল করলাম আত্মরক্ষার কোন অস্ত্রই মজুত রাখি নি। এত বছর চাকরি করে নিজস্ব কোন সঞ্চয়, কোন ইনভেস্টমেন্ট নেই, দীর্ঘকালের মোটামুটি ভদ্র চাকরি করেও মাথা গোঁজবার জায়গা—নিজের সম্মান নিয়ে একটা দিন থাকার জায়গা পর্যন্ত করার ক্ষমতা নেই।···হোয়াট অ্যা টোটাল ফেইলিওর! জীবনের এতগুলো বছর খালি অর্থহীন অপচয়।

না, একটু ভুল বলছি। একটা সম্পত্তি আছে। সমানেই বাড়ছে—শাড়ির সংখ্যা। মিথ্যে কথা বলব কেন, সুবীর ইজ অ্যা গুড হ্যাজব্যাণ্ড—অবশ্য প্রচুর দামি দামি শাড়ি কেনাটাই যদি স্বামীর কাছে একমাত্র প্রাপ্তব্য মনে করা হয়। ওয়েল, আমার বাবা তো সেটুকুও করতেন না। ফ্যাক্ট ইজ পুজো, জন্মদিন, ম্যারেজ

অ্যানিভার্সারি—সব মনে করে সুবীর শাড়ি কেনে। হি ইজ ভেরি র‍্যাশনাল অ্যাণ্ড অফ কোর্স ভেরি ভেরি কারেক্ট, জাস্ট হোয়াট অ্যা ব্যুরোক্র্যাট ইজ সাপোজড্ টু বি। যেমন অফিসে তেমনি বাড়িতে—রুলস অ্যাণ্ড রেগুলেশানস সব মেনে চলে। এবং সরকারি অসংখ্য নিয়মকানুনন যেমন সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে কোন কাজে আসে না সুবীরের কেনা দামি দামি, ভারি ভারি, চড়াচড়া রঙের শাড়িগুলোও তেমনি আমার কলেজে পরার উপযোগী হয় না। শুধু আলমারিতে জায়গা দখল করে থাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আমি অবশ্য সুবীরকে এধরণের শাড়ি কিনতে বহুবার বারণ করেছি। তবু কেনে। কারণ আমার পছন্দ বা প্রয়োজনের মুখ চেয়ে সুবীর উপহার দেয় না। দেয় নিজেকে খুশি করতে। অন্যের জন্য যা করি তা আসলে নিজেদেরই তৃপ্তির আশায়।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনি বিনোদিনী বলছে,

'বাঁ দিকে টার্ন। ব্যস, এইখানে থাম। ম্যাডাম, আমি তাহলে চলি।'

টাইপ ফোর কোয়ার্টার। গেটের ওপরে বোর্ডে ওড়িয়াতে লেখা, ডঃ হরিপ্রসাদ মহান্তি। অবাক হয়ে যাই, এ তো বিনোদিনীর স্বামী হতে পারে না। ওর পদবী তো 'সেনাপতি'। মনে পড়ল সতী না বলেছিল বিনোদিনীর বাড়ি ওদের পাড়াতেই, অ্যাকচুয়েলি একই রো-তে। সেটা তো ইউনিট নাইন, আর এটা ইউনিট ফোর। সন্দেহ হয়, এখানেও কিছু লটরপটর আছে নাকি।

'আপনার বাড়ি এটা?'

'না-না ম্যাডাম, আমার বাড়ি নয়। এটা আমাদের কলেজের কেমিস্ট্রির হেড-এর বাড়ি। আমার ছেলে এখানে এসেছে টিউশনে, ওর স্কুটার আছে, একসঙ্গে ফিরব। বাড়ি তো সেই ইউনিট নাইনে, আপনি তো যাবেন সারকিট হাউস, তাই এইটা নিয়ারেস্ট পয়েন্ট অফ অ্যাডভানটেজ বলে এইখানে নামিয়ে দিতে বললাম। থ্যাংকস।'

'না, না থ্যাংক্‌স এর কী আছে। একবার দেখে নিন ছেলে আছে কি না।' আমার সন্দেহ তখনো যায় নি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, ঐ যে ওর স্কুটারটা।' সামনে দাঁড়ানো গোটা দুয়েক সাইকেল আর তিনটে স্কুটারের মধ্যে একটায় আঙুল দেখায় বিনোদিনী। আমরা কথা বলতে বলতে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দুটি ছেলে, একজন বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে যায়।

'এই যে আমার ছেলে। সৌম্য আয় ম্যাডামকে চিনিস তো? নমস্কার কর।' নমস্কারের পালা সেরে গাড়ি ঘোরাতে বলি। যাক বাবা আজকে অন্তত সতীর কষ্টের দায়ভাগ নেই। একটা কথা স্বীকার করতেই হয়, ওড়িয়াদের সবার মৌখিক ভদ্রতা শিষ্টাচার আছে। দেখা হলে নমস্কার করে, বিদায়ের সময়ও। বাঙালিদের তো এসব সৌজন্যবোধ কবে হারিয়ে গেছে।

আজ যা গরম মাঝরাতের আগে ঘরে ঢোকা যাবে না মনে হচ্ছে। বাড়ির পেছনে পাঁচিলে ঘেরা একটা বেশ বড় বাঁধানো আঙিনা আছে। আমাদের প্রায়ই আলোচনার বিষয় ওখানে শোওয়া সম্ভব কি না। ওড়িশায় গরম যদিও প্রচণ্ড কিন্তু উত্তর ভারতের মত রাতে খোলা জায়গায় স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে শোওয়ার রেওয়াজ নেই। এর কারণ সম্পর্কে প্রচুর জল্পনাকল্পনা করা হয়—আবহাওয়া ততটা শুকনো নয়, শেষরাতে হিম পড়ে, পোকামাকড় কাঁকড়া বিছে সাপখোপ প্রচুর, লোকে স্বভাবত ভীতু, এমন কি এদের পান্তা ভাত—যাকে খানিকটা গেঁজিয়ে 'তোরাণী' বলে খাওয়ার অভ্যাসের দরুন গরম কম লাগে ইত্যাদি। যথারীতি ওড়িশায় গরমের অবধারিত কষ্টের প্রসঙ্গ ওঠে। বলাবাহুল্য কোন সমাধান হয় না। এবারে আরও একটি অন্তহীন সমস্যার অবতারণা—কাজের লোকের অপদার্থতা। এতটুকুটুকু কলা ছাড়া আর ফল নাকি নেই বাজারে। আমের টিকিটি নেই। এমনিতেই তো জাতের আম বিশেষ পাওয়া যায় না—দক্ষিণ থেকে চালান বেগুনফুলিই ভরসা—পাতি ল্যাংড়ার মত যে দু-একটা জাতের আম অন্যান্যবার দেখা যায় এবারে তাও ওঠে নি। সবজির মধ্যে এনেছে বুড়ো চিচিংগে আর সাদাটে কুমড়ো। এত বিরক্ত লাগে। সেই পোনামাছ, পেটটা সবুজ সবুজ, পিত্তিফিত্তি গলিয়ে এনেছে আর কি, এই গরমে ঝোল ছাড়া কিছু খাওয়া যায় না আর এই মাছ তো ধনেজিরে দিয়ে রাঁধলে মুখে দেওয়া যাবে না। সর্ষে দিয়ে করলাম।

'বাবার চিঠির উত্তর দিয়েছ?' খাবার বাড়তে বাড়তে জিজ্ঞাসা করি।

'কেন, তুমি দাও নি?' সুবীরের পাল্টা প্রশ্ন।

'বাঃ লিখেছেন তোমাকে আর জবাব দেব আমি।' বিরক্ত হই। আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বরাবর আমিই রেখেছি, আজকাল দেখছি ওর বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দায়িত্বটাও আমার ঘাড়ে চাপছে।

'আমি তো উপলক্ষ মাত্র, আসলে তো সংসারের খবরাখবর চান। সেটা বাড়ির গিন্নি ভাল দিতে পারে না কি?'

'সে ধরণের সাংসারিক খুঁটিনাটি জানতে চাইলে উনি লিখতেন না, মা লিখতেন। এবারে ভুবনেশ্বরে কোয়ার্টার পেলেই বাবা মাকে আনিও। অনেকদিন তো আসেন নি। কটকের এই বাড়ির যা ছিরি এখন তো আনা যায় না। ভুবনেশ্বর সহরটা অন্তত মডার্ণ, খোলামেলা, বড় বড় রাস্তা, আর এখন গাছপালাও হয়েছে, আগের মত মরুভূমি নেই। কলকাতা থেকে দুদিনের জন্য বেড়াতে এলে ভালই লাগবে। দাদাদেরও বললে হয়। ওঁদের তো চিল্কা গোপালপুর সাইডটা দেখাই হয় নি।'

'আগে বাড়ি পাই তারপর ওসব ভাবা যাবে'খন। কবে যে পাব তারই ঠিক নেই। তোমার তো আবার যে সে বাড়ি পছন্দ নয়। ইউ আর অলওয়েজ আ

পারফেকশানিস্ট।'

বল এখন আসে আমার কোর্টে। ছেড়ে দেবার পাত্রী নই, দড়াম করে ফিরিয়ে দিই,

'কী পারফেকশান! একটা টু বেডরুম, ড্রয়িং ডাইনিং বারান্দা ও দুটি বাথরুম সহ একতলা বাড়ি এই তো। হ্যাঁ সামনে গুচ্ছের জায়গা, কখনো বা এক্সট্রা বাথরুম ও অফিসরুম। ছোট ছোট অকেজো ঘর, স্টোর, প্যান্ট্রি, কিচেনের তো স্ট্যাণ্ডার্ডই নেই, একটা আউট হাউস। যে কোন টাইপ সেভেন বাড়ি—ব্যস? সেটা কি আমাদের ন্যায্য পাওনা নয়?'

'সব সময় কি আর দেনা পাওনার কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে পৃথিবী চলে। কখনো কখনো একটু ছাড়তে হয়।'

ভাবলাম জিজ্ঞেস করি সে কবে কতটুকু ছেড়েছে। ব্যুরোক্র্যাটের জীবনদর্শন। চিঠি লেখার দায়িত্বটা আমার ওপরে চালান করতে না পেরে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে।

'পেটেন্ট নিয়ে ফ্যাল, একেবারে ওরিজিন্যাল আইডিয়া।' মৃদু হেসে বল লাইন পার করে দিই।

সমান সমান। দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুজনের তরোয়ালই একে অন্যের সঙ্গে লেগে গেছে, কে আগে ঝট বেরিয়ে এসে সোজা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবে।

গায়ে ঘাম জমে থাকা ঠাণ্ডা বোতলটা থেকে গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে সুবীর বলে,

'তোমাদের সতী সমাচার নাটকে নতুন অঙ্ক কিছু হ'ল না?'

আটকে যাওয়া তরোয়াল দুটো খুলে যায়। দুজনেরই পিছুহটা, তৃতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত নিরাপদ আলোচ্য বিষয়। আমি সোৎসাহে বলি,

'আজকে আমার ওম্যানটির সঙ্গেই অনেক কথা হ'ল। বেচারার ওপর বড্ড প্রেশার। জান—ওদের সেই গাঁয়ের বাড়ির মত ঝামেলার সংসার। পাঁচরকম খাওয়া, আত্মীয়কুটুম্ব আসছে যাচ্ছে, গোসেবা, তারওপর স্বামীটি কিছুই প্রায় দেখে না। খানিক টাকা ধরিয়ে দিয়েই খালাস।'

থালাতেই তুলে দিই চিচিংগের তরকারি। সুবীর খেতে সুরু করে বলে,

'বাঃ সেরকমই তো বেশিরভাগ সংসারে হয়। আমাদের দেশে পুরুষমানুষ আবার সংসারে কে কবে হাত লাগিয়েছে।'

মাছটা ভাগ করে ওরটা বাটিতে দিই। আমারটা থালাতেই নেব, বাসন বাড়িয়ে কী হবে।

'হাত লাগানোর কথা হচ্ছে না, মাথা ঘামানোর কথা হচ্ছে।' ইচ্ছে করেই যোগ করি, 'তাছাড়া ভদ্রলোকের বরাবর ডায়বেটিস, সেই ছোটবেলা থেকে। তার মানে বেচারী বিনোদিনীর কপালে অল ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লে। ওয়ান ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হার। স্ত্রী চরিত্র দেবতারা না জানলেও সায়ান্স জানে।'

'মানে তুমি বলছ ডিসস্যাটিসফাইড স্ত্রী পরপুরুষের নিকে নজর দেয় ?' মুহূর্তের জন্য থাওয়া থামিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে সুবীর জিজ্ঞাসা করে।

'ন্যাচারালি। সেও তো মানুষ, তারও ইমোশনাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল ডিমাণ্ড আছে। শুধু বংশরক্ষা আর সংসার চালনার যন্ত্র তো নয়।'

'কী সব সাংঘাতিক কথা। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধান দিয়েছিলেন হিন্দু নারীর স্বামীর সংসারই হচ্ছে গুরুগৃহ আর পতি সেবাই বেদাভ্যাস। অন্য কোন কিছু শিখিয়েছ কি গেছ।'

'শুধু হিন্দুদের নয়, প্রাচীনকালে অন্য দেশেও এধরণের ধারণা ছিল। কোথায় যেন পড়ছিলাম কনফুশিয়াস নাকি বলেছেন আ ভারচুয়াস ওম্যান হ্যাজ নো টালেণ্ট। সাধ্বী নারীর কোন গুণ থাকে না, দরকারই বা কী। ঘরের বৌ, ছেলের মা ধোপার হিসেবটুকু লিখতে পারলেই হ'ল। পতিতা গণিকারা শিখবে চৌষট্টি কলা।'

'ও বাবা, রেড লাইট। ডেনজার সিগন্যাল, থেমে যাচ্ছি—ব্যস। মাছটা গ্র্যাণ্ড হয়েছে, তুমিই বেঁধেছ বুঝি? আরেক পিস নেওয়া যাবে, না কি কালকের বরাদ্দ?'

এ মাছের যা ছিরি, তার আবার গ্র্যাণ্ড রান্না! তবে মিথ্যে কথা শুনতে ভাল লাগে।

'না, না, সেরকম কিছু নয়। নাও না আরেকটা, কী নেবে, পেটি না গাদা? আচ্ছা এই বড় গাদাটাই নাও, তুমি তো গাদা ভালবাস।'

'কখন রাঁধলে, সেই তো সকালে আমার সঙ্গে বেরিয়েছ, ফিরলে আমার সঙ্গে এই রাত্রিবেলা।'

'আমরা চাকুরে মেয়েরা হচ্ছি সুপার পাওয়ার। তোমাদের, পুরুষদের মত আট ঘণ্টা কাজেই নেতিয়ে পড়ি না।'

'শান্তি! শান্তি! মুখে চাবি দিলাম। বাব্বা, প্রশংসা করলেও দোষ।'

অতঃপর অল কোয়ায়েট অন দ্য ডোমেস্টিক ফ্রন্ট।

কলেজের কম্পাউণ্ডে ঢুকছি, দেখি রাস্তা প্রায় আটকে দুটো স্কুটারে বসা জনা পাঁচ-ছয় ছেলে। উগ্র সাজপোশাক, বিরাট ঢলা ঢলা জামা, পায়ে দামি স্নিকার, আধুনিক সিনেমা স্টারের কায়দায় চুল কাটা। বোতাম খোলা বুকে দেখা যাচ্ছে লম্বা চেন সহ বিরাট চকরাবকরা মেটালের লকেট। খুব হাসি ঠাট্টা চলছে। একটি যেন চেনা মুখ, হ্যাঁ, সেই সুকান্ত ছেলেটি না, ভাল করে তাকালাম। কয়েকবার হর্ণ দেওয়ার পর রাস্তা ছাড়ল। কলেজের বিল্ডিং-এ কোলাপসিবল গেট আধখোলা, দারোয়ান ও স্কোয়াডের চার্জে অধ্যাপকরা পাহারায়। আমাকে দেখে রাস্তা করে দিলেন। কেমিস্ট্রির ডঃ সুবল রাউত রায়ও আমার সঙ্গে ঢুকলেন।

'গেটে দেখলেন ম্যাডাম কী চলছে?'

'হ্যাঁ, এই গ্রুপটা ভারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে না ম্যাডাম হয়ে গেছে। কোন কোন বাপ মায়ের কপাল পুড়ছে তো জানি না তবে ওর মধ্যে একটা তো আমাদের সতী ম্যাডামের ছেলে কমল।'

'তাই নাকি? আর ইউ শিওর?'

'অফ কোর্স। ফিজিক্সে অনার্স, কেমিস্ট্রি পাস। তাছাড়া প্লাস ট্'র সময় আমার কাছে টিউশান করেছে। তখন দিব্যি ভাল ছেলে ছিল, আনফরচুনেটলি জয়েণ্ট এণ্ট্রান্সে পেল না, এবছর আবার বসার কথা।'

'বসবে?'

'কে জানে। বসলেও ফল কী হবে তো দেখতেই পাচ্ছেন। বেচারা সতী ম্যাডাম। উনি নিজে এত সিন্সিয়ার, এত এডুকেটেড, আর ছেলেটা দেখুন। সবই ভাগ্য। জন্ম দিয়েছেন, কর্ম তো আর দেননি।'

সহানুভূতি দেখাই। এখন আমার ডিউটি সকাল বিকেল অল্টারনেট করে পড়ছে, বোধহয় সুরঞ্জনের সঙ্গে সেদিন কথাবার্তার ফল। সতীর সঙ্গে মাঝে মাঝে একসঙ্গে পরীক্ষার ডিউটি পড়ে। ওকে ছেলের সম্বন্ধে কিছু বলিনি। কী লাভ, যদি না জেনে থাকে তো নিশ্চিন্তে আছে। আমার ভূমিকা শ্রোতার, প্রশ্ন করলে জবাব দিই, আগ বাড়িয়ে উপদেশ দিতে যাব কেন।

তবে প্রায়ই বলে পরিবারে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আরও কমে যাচ্ছে। বড় ছেলে আর বাবার মধ্যে কথাবার্তা তো বন্ধ হয়েই গিয়েছিল, এখন প্রায় দেখা-সাক্ষাৎও নেই।

'স্বামীকে তো হারিয়েইছি এখন ছেলেটাও নষ্ট হতে চলেছে। বই নিয়ে বসে না, সমানে অনার্স ক্লাস কামাই করছে, প্র্যাকটিকাল মিস করছে। সারাটা দিন বাইরে আর বাইরে। বাড়িতে প্রায় থাকে না। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে গুম্ হয়ে যায়।'

'তোমার সঙ্গে এমনি কোন কথাবার্তা গল্পটল্প করে না?'

'ঐ এক টপিক। আজ বাবা এইখানে গেল, কাল টেলিফোনে এতক্ষণ কথা বলল, পরশু গাড়ি অমুক হোটেলের সামনে এত ঘণ্টা ছিল। দিনরাত বাপের ওপরে স্পাইং। অনেক বলেছি, ছাখ এতে লাভ কী। বাবা কী করছে না করছে সেটা তার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী, তুই তার মধ্যে যাস কেন? তোকে তো কিছু বলছে না বা তোর পাওনাগণ্ডায় তো কিছু কম পড়ছে না। এভাবে চলে লাভ কী? পরীক্ষাটা খারাপ হবে। গতবার ব্যাডলাক চান্স পাস নি। এবারে তো আরও চেষ্টা করতে হবে। তোর সামনে কেরিয়ার আছে। কোন উত্তর নেই। বেশি চাপাচাপি করলে কী বলেন জানেন? থ্রো আউট ছাট ফেলো। আই অ্যাম অ্যাশেম্ড অফ হিম। বন্ধুবান্ধব সবাই হাসাহাসি করে, আমি কারো কাছে মুখ

দেখাতে পারি না। চল, আমরা দুজনে আলাদা থাকি। আমি যাহোক একটা কেরানিগিরি জুটিয়ে নেব, দুটো ফার্স্ট ডিভিশান তো আছে। তোমার আর আমার চলে যাবে।'

'তোমার ছেলে তো তোমার প্রতি খুব অ্যাটাচড্। তবে দেখ, ঠাণ্ডা মাথায় ভাব। এটা অভিমানের কথা, কাজের কথা নয়। ছেলের ভবিষ্যৎটাতো ভাববে। তাছাড়া তোমার তো একটি মেয়ে আছে, আর একটি ছেলেও তো আছে, তাই না? তারা তো এসব কিছুই জানে না। তাদের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক নিশ্চয় ভাল?'

সতী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'তবে? তাদের তো তুমি বাবার স্নেহ থেকে, আশ্রয় থেকে, সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করতে পার না। মা হয়ে তুমি একটি সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে কেন?'

আমার বাবা-মা যেমন আমার প্রতি সর্বদা করে থাকেন। জামাইবাবু শুধু আচার ব্যবহারে অতি ভদ্র নন, দিদি ভাইবোনদের মধ্যে বড়, তার স্বামী হিসেবে জ্যেষ্ঠের মত কর্তব্যপালন করতে চেষ্টা করেন, প্রায়ই শ্বশুরশাশুড়ির খবরাখবর নেন, বিয়েথাওয়া অনুষ্ঠানে অনায়াসে অভিভাবকের ভূমিকায় থাকেন। কিন্তু বাবা-মার মুখে সর্বদা সুখ্যাতি ছোট জামাইয়ের, যে পারতপক্ষে শ্বশুরবাড়ির চৌকাঠ মাড়ায় না। সম্পর্ক অতি আলগা, ওপর ওপর। অবশ্য সুবীর নিজের বাড়িতেও বিশেষ যায়টায় না, কলকাতা অনেকদিন থেকেই তার অসহ্য লাগে, যা ভিড়, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ময়লার স্তূপ।

অথচ ও মানুষ হয়েছিল কালীঘাটের গলিতে।

'সবই তো জানি ম্যাডাম', সতীর বর্তমানে ফিরে আসি, শুনি,

'আমি এভাবে আর পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় হঠাৎ দুম করে কিছু একটা করে ফেলি। সকালে কফির কাপটা হাতে তুলে দিতে গিয়ে ইচ্ছে হয় কাপশুদ্ধ গরম কফিটা মুখে ছুঁড়ে দিই। কিন্তু দিতে পারি না। কাপটা বাড়িয়ে সংসারের আর পাঁচটা কথা বলি। আসল কথা তুলতেই পারি না। জানেন, আমার না আবার মাঝে মাঝে কীরকম একটা ভয় হয়, ভীষণ ভয় হয়। মুখ খুলতে পারি না। মনে হয় একদম চুপ করে থাকি, যা হচ্ছে হোক, আমি তো শুধু রান্নাখাওয়া, ধর্মকর্ম নিয়েই সংসার করতে পারি। অথচ আবার মনে হয়, না পারি না। সহ্য হচ্ছে না। নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। আই অ্যাম ওয়ার্থলেস, রিয়েলি ওয়ার্থলেস।'

ওয়ার্থলেস! আমিও নিজেকে তাই মনে করতাম না কি? তবে সতীর মত তখন আমার এসব কথা বলার লোক কেউ ছিল না। দিল্লি প্রবাসের দ্বিতীয় বছরের শেষাশেষি বড়দিনের ছুটি কলকাতায় কাটিয়ে স্বপুকে নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে

ফিরছি। এবারে যাতায়াতের টিকিট একসঙ্গে করা হয়নি ফেরার তারিখ ঠিক ছিল না। সুবীরের বোন কৃষ্ণা এসেছিল বাচ্চাদের নিয়ে, দিদিও ছিল তার দুই মেয়ের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ি বাপেরবাড়ি মিলিয়ে হৈ চৈ করে খুব ভাল কাটছিল ছুটির দিনগুলো। স্বপু ইনফ্যাক্ট বেশি এনজয় করছিল, বাড়িতে তো একা থাকে। ওর স্কুল খোলার দুদিন আগে শনিবার ফেরা ঠিক হ'ল। সুবীরকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে অথচ দিল্লি স্টেশনে নেমে দেখি, আশ্চর্য কেউ নেই। ও তো এসব ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার, নির্ঘাৎ টেলিগ্রাম পায়নি। বাবা অবশ্য দু'চারবার বলেছিলেন টেলিফোনে খবর দিতে, আজকাল পোস্টাল সার্ভিস একেবারেই ডিপেনডেবল নয়। কিন্তু রিটায়ার্ড বাবার খরচ বাড়াতে সর্বদা সঙ্কোচ হয়, সুবীর তো অনায়াসে টেলিফোন করতে পারত, কিন্তু করেনি। বোধহয় লাইন পায়নি। কে জানে। সবাইকে নিয়ে এত মেতেছিলাম যে খেয়ালই করিনি ওর নীরবতা। স্টেশনে নেমে প্রথমে একটু নার্ভাস লাগল। একা, সঙ্গে টুকরোটাকরা মালও আছে কয়েকটা। সাহস করে স্বপুকে নিয়ে কুলিসহ স্টেশনের বাইরে এলাম। প্রচুর অটো, একটায় উঠে গেলাম, আধঘণ্টায়। স্বপু আর আমি দুজনেই থ্রিলড, আজ একটা জব্বর সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।

ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবিটা ব্যাগ খুলে বের করলাম, ওটা সর্বদা সঙ্গে থাকে— ইয়েল লক, চাবি ভুল করে ভেতরে রেখে বেরুলে দরজা খুলতে হলে খাস গডরেজ কোম্পানির লোক ডাকতে হবে। তাই সুবীর ও আমি দুজনে দুটো চাবি সর্বদা সঙ্গে রাখি। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে ঢুকলাম। আরে, সকালবেলা অথচ একফোঁটা রোদের দেখা নেই, জানালাগুলো মোটা পর্দা টানা, টেবিলল্যাম্প দুটোর শেডঘেরা আলোয় চারিদিক ছায়াছায়া। প্যাসেজ থেকে বাঁদিকে লিভিংরুমে ঢুকি। সেন্টার টেবলে কফির সরঞ্জাম সাজানো। একদিকে বসে সুবীর, পরনে শোবার পাজামা-পাঞ্জাবি, ইস্তিরিভাঙা, গায়ে গরম শাল। পাশে লম্বা সোফাটায় পা টানটান মেলে দিয়ে আধশোওয়া একটি মেয়ে। স্কিন কালারের মোজা ছুঁয়ে আছে স্বচ্ছ গা-দেখানো নাইটি, ওপরে আলগোছে ফেলা সাদা পাখীর পালকের মত হাল্কা বিলিতি স্কার্ট, ফর্সা রঙ, উত্তর ভারতের ছাঁচে একটু কাঠকাঠ মাঝারি মাপের নাকমুখচোখ, ঠিক ঠিক জায়গায় ভারি ও পাতলা শরীরে অল্প বয়সের ঔদ্ধত্য। সেট ও কনডিসান করা সোজা অবিন্যস্ত চুলদুঁদুদিকে কাঁধ বেয়ে বুকের ওপর ছড়িয়ে আছে। চোখেমুখে তখনো ঘুমথেকেওঠা ফোলাফোলা ভাব, তেলতেলে নাকের পাটা, দুজনের মৃদু হাসি, হিন্দি ইংরিজি কথার টুকরো, ভাবভঙ্গি চাউনিতে অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

স্বপু সঙ্গে, আমি ভি আই পি স্কাইব্যাগ হাতে থমকে দাঁড়ালাম। চমকে তাকাল ওরা, মেয়েটির মুখের সামনে ধরা কফির কাপ, সুবীর তারটা সবে টেবিল থেকে তুলেছে। আমি দাঁড়িয়েই থাকি, কী ভাবব, কী বলব কিছুই সেই মুহূর্তে মাথায় আসছে না।

আমরা চারজন যেন একটা ফ্রিজ শট্।

সুপু দৌড়ে যায়, কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলে,

'বাবা স্টেশানে আসনি কেন? আমরা কেমন একলা চলে এলাম। দেখ, তোমার জন্য দিদু নলেনগুড়ের সন্দেশ পাঠিয়েছে।'

অন্য হাতে ধরা গাঙ্গুরামের বাক্সটা দেখায়।

আমি স্যুটকেস আর কিট ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে যাই। সরে যাওয়া পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি আমারই ড্রেসিংটেবিলে রাখা অচেনা ভি আই পি টয়লেট বক্স, যেরকমটি এয়ারপোর্টে এয়ারহোস্টেসদের চলতে ফিরতে হাতে ধরা দেখা যায়। জোড়া খাটে কম্বল চাদর ইতঃস্তত ছড়ানো, ব্যবহার করা।

না, ওঘরে নয়। দ্রুত পায়ে এগিয়ে সুপুর ঘরে ঢুকে যাই। লাগোয়া বাথরুমে খানিকটা সময় কাটিয়ে এসে সুপুর সরু খাটের ওপর বসে থাকি। আচ্ছা, এখন আমার কী করণীয়? ঝগড়া? কান্নাকাটি? একটা জব্বর সিন্? কৈফিয়ৎ তলব—কোথায়, কীভাবে, কেন ব্যাপারটা এতদূর গড়াল? হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগল নিজেকে, পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত গোটা শরীরে একটা অদ্ভুত চেষ্টাহীনতা। এসব নাটকফাটক করে লাভ কী? সুবীর সাবালক, স্বামী ও পিতা। সে যা করছে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় করছে। অন্য একটি নারী আজ তার জীবনে, যে তার এতই কাম্য যে আমার বিছানায় স্থান নিয়েছে—এই সত্যটাই কি যথেষ্ট নয়? তাকে চায়, অতএব আমাকে চায় না। ব্যস, দ্যাট্স অল।

আমি এখন কী চাই? এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি। উঠে জানালার সামনে দাঁড়াই। যেন মন্ত্রবলে গ্রিলের মধ্যে দিয়ে নিজেকে গলিয়ে নিয়ে উড়ে চলে যেতে পারব। কিন্তু এই প্রবাসে কার কাছে, কোথায় যাব? করবটা কী? চাকরি তো না থাকারই মত, ছুটিতে আছি, তাহলে, কোন সমাধান মাথায় আসে না। নিজের ওপর ঘেন্না হয়। আমি এত ওয়ার্থলেস!

সতীকে বলি, 'না, খবরদার না। নিজেকে ওয়ার্থলেস মনে করবে না। ছি, নিজেকে এত ছোট ভাবছ কেন বলতো? তুমি অপদার্থ অকর্মণ্য কিছু নও, একটা মোটামুটি ভদ্র, স্থায়ী, সরকারী চাকরি তোমার আছে। তুমি না বলছিলে নয়াপল্লীতে জমি কিনেছ? এখন তো জায়গাটা ডেভেলপড হয়ে গেছে, ভাল ভাল বাড়ি হচ্ছে। নিজের নামে একটা বাড়ি কর না কেন? হাউস বিল্ডিং লোন পেতে পার, তুমি এনটাইটেল্ড। তাহলেই তো মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে থাকার চেষ্টা করতে পারবে।'

সে চেষ্টা আমি কখনো করতে পারি নি, হয়তো পারবও না। নিজস্ব একখানি ঘর ও বাঁধা যথেষ্ট উপার্জন—নারীসত্তার সন্ধানে দুটি মাইল পোস্টের একটাই শুধু

পেরুতে পারলাম।

'অত সোজা ভেবেছেন? আমরা কলেজস্কুলের মাস্টাররা সরকারের পুওর রিলেটিভ। আগে বুরোক্র্যাট—কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম—ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার সবাই লোন পাবে, সবশেষে আমরা। তারওপর আবার একসঙ্গে দেবে না, ইনস্টলমেণ্টে। ওতে বাড়ির কাজ হয়?'

'কিন্তু সতী, আমাদের মধ্যে অনেকেই তো করছে, বিশেষ করে পুরুষরা। তারা সবাই কী করে পারছে?'

'দেখুন ম্যাডাম, আমরা পুরুষের কাজ করি বটে কিন্তু পুরুষের মত করে করি না। এদের প্রায় প্রত্যেকের চাকরি ছাড়া অন্য উপার্জন আছে। টিউশন, নোটবুক, টেক্সটবই—তাই তো একটা টেক্সট বেশিদিন প্রেসক্রাইবড্ থাকে না, সবাইকেই তো করে খেতে হবে—নয়তো নানারকম ব্যবসা। এরা কতরকম পরীক্ষার খাতা দেখে জানেন? সব চাকরির পরীক্ষায় ইংরিজি একটা পেপার থাকে। আপনি আমি কোনদিন দেখি? না, কারণ ওগুলোতে অনেক বেশি টাকা। এদের লেটেস্ট হচ্ছে গাড়ি কেনা। কার লোন নেওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে জানেন? অথচ একজনকেও গাড়িতে আসতে দেখবেন না, সব সেই দু'চাকা। এক একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড অ্যামবাসাডার কিনে ভাড়াতে লাগিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন এজেন্সিকে। আপনি আমি পারব?'

'যা বলেছ।'

আমি মাথা নাড়ি। না, আমাদের মত চাকুরে মেয়েরা কোনদিন পুরুষের সমকক্ষ হতে পারবে না।

সতী বলে যায়, 'তাছাড়া আমার সুপারভাইজ করার লোক কোথায়? দৌড়া-দৌড়ি কে করবে? ওদের চেলা, ভক্ত, পুরনো বেকার ছাত্র থাকে, স্যারকে খুশি করার নানা কারণ তাদের আছে। অফিসের ক্লার্কগুলোকে দেখুন না, কীরকম তেলায় করিয়েকম্মে স্যারেদের। আমাদের বেলা ব্যাটারা রুল দেখায়। আমার দ্বারা হবে না ম্যাডাম, কিছুই হবে না। তাছাড়া বাড়ি করলেও লাভটা কি? ওতো দুদিন বাদেই ভুবনেশ্বরে পোস্টেড হবে, তখন আমার বাড়িতেই থাকবে।'

'থাকলেও সেটা অন্যরকম হবে, মিঃ পাণ্ডা তোমার বাড়িতে থাকবেন তুমি তাঁর বাড়িতে থাকবে না। তোমার ছেলের কাছে এ তফাৎটা অনেকখানি। সে জানবে তোমারও মর্যাদা আছে। দেখ বাইরের জগতে, সামাজিক অর্থ নৈতিক বাস্তবে নিজের উপার্জনে সম্পত্তি অর্জনের একটা মূল্য আছে। তোমার নিজের সেলফ কনফিডেন্স হবে। নিজেকে এত দুর্বছাই করছ কেন?' সতী উত্তর দেয় না। আমি প্রসঙ্গটা পাল্টাই।

'দেখছ, কী চলছে? দু দুটো পরীক্ষা ক্যান্সেলড হয়ে গেল। কোয়েশ্চেন-পেপার ফাঁস। তার মানে নির্ঘাৎ রিএক্সজামিনেশান হবে আর সামার ভেকেশানে

ডিউটি করতে হবে।'

'তা যা বলেছেন। আগে ১লা মে-তে নিয়ম করে কলেজ বন্ধ হত, খুলত ১লা জুলাই। এখন তো পুরো মে মাসটা পরীক্ষা আর খাতা দেখা চলতে থাকে। গরমের ছুটি কই?'

'গ্লাস টু ভ্যালুয়েশান কবে থেকে সুরু?'

'এই তো সামনের সোমবার থেকে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছেন? স্টাফরুমে দেখছিলাম একটা বাঞ্চ পড়ে আছে, আপনার নামেও এসেছে।'

উঃ আর পারা যায় না। গ্লাস টু পরীক্ষা, ইনভিজিলেশান, খাতা দেখা; আবার দু খেপ বি. এ. পরীক্ষা, ইনভিজিলেশান, খাতা; এছাড়া কলেজের অ্যানুয়েলের হ্যাপা তো আছেই। শিক্ষার কাঠামো যেমন যান্ত্রিক তেমনি প্রাণহীন আমাদের ভূমিকা। পড়ানো, পরীক্ষা নেওয়া সবই মাইওলেস মেকানিক্যাল ওয়ার্ক, যেন একটা বিশাল কারখানায় এসেম্‌ব্লি লাইনের প্রোডাকশান। প্রতিবারের মত এবারেও প্রশ্ন তৈরি শেষমুহূর্তে, তাড়াহুড়োয়, না ভেবেচিন্তে। 'আচ্ছা, বি. এ. সেকেণ্ড ইয়ারের প্রোজ কতদূর হয়েছে কেউ জানে? এই যে শতপথী, আপনি তো একটা সেকশানে পড়ান, দিন তো গোটা অষ্টেক কমপ্রিহেনশান কোয়েশ্চেন। কী বললেন? টেক্সট না দেখে বলতে পারবেন না? অন্য সেকশানে কতদূর হয়েছে জানেন না। প্রথম তিনটে চ্যাপটার থেকে যা হোক দিয়ে দেব? ঠিক আছে।' পিওন ধরিকে দিয়ে সেকেণ্ডইয়ারের কয়েকটা ছাত্রকে পাকড়াও করা হ'ল। 'ইংরিজি প্রোজ টেক্স নিয়ে এসো তো।' এল। ঝটাপট লটারির টিকিটের মত শর্ট কোয়েশ্চেন বেছে দিয়ে দেওয়া হ'ল। 'ডঃ বিশোয়াল কই?' বলতে না বলতে তার প্রবেশ। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর ওপর দুটো প্রশ্ন দিন তো। একটা চিরকুটে বিশোয়াল লিখে ছিল। হেড জোরে জোরে পড়লেন, ডিসকাস অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ আ রোমান্টিক কমেডি অর হোয়াট আর দ্য স্যালিয়েন্ট ফিচারস্ অফ আ শেক্সপিয়ারিয়ান কমেডি? ডিসকাস উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু—আরে দুটোই যে জেনারেল কোয়েশ্চেন হয়ে গেল। টেক্সচুয়েল কিছু দিন।'

'টেক্সট বেশিদূর হয় নি, ওই স্যার দিয়ে দিন', নির্বিকার উত্তর বিশোয়ালের। তবু যাহোক বিশোয়াল অন্তত হাজির আছে। আজ প্রশ্নপত্র তৈরি করে জমা দেবার শেষ তারিখ। এস. পি. অর্থাৎ সুরঞ্জন পট্টনায়েকের তো টিকিটি দেখা নেই। তার ভাগের কোয়েশ্চেন কই? অনার্সে মডার্ন পোয়েট্রি ও পড়ায়, বছরের পর বছর পড়িয়ে আসছে কারুণ ও ওড়িয়া সাহিত্যের নামকরা কবি, অতএব হপকিনস ইয়েটস এলিয়ট অডেন ও স্পেণ্ডার পড়ানো ওর একচেটিয়া অধিকার। অন্য কাউকে পড়াতে দেবে না। অথচ ক্লাসে কতদূর কী করিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেও বিশেষ সদুত্তর পাওয়া গেল না। খোলা হ'ল প্রোগ্রেস রেজিস্টার। এতে

ক্লাস অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাঠ্য বইয়ের কার কী, কতটুকু ও কখন পড়ানোর কথা সেশানের শুরুতে লেখা হয় এবং সেইমত পড়ানো চলছে কিনা নথিভুক্ত থাকে। দেখা গেল অতি সুন্দর গোটা গোটা হস্তাক্ষরে সুরঞ্জন পাঠ্য কবিতাগুলোর নাম ও পড়াবার সম্ভাব্য তারিখ লিখে রেখেছে এবং তার মুখোমুখি পৃষ্ঠায় অর্থাৎ অ্যাকচুয়েল প্রোগ্রেসে শুধু একটি তারিখ ও এন্ট্রি—'ডিস্‌কাসড্ ইনট্রোডাকশান টু মডার্ন পোয়েট্রি।' ব্যস, পৃষ্ঠার বাকিটা ফাঁকা। অতঃপর নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত কথাকাটাকাটি, রাগারাগি, 'নেক্সট সেশানে মডার্ন পোয়েট্রি অন্য কাউকে দিতে হবে,' বৃথা সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষমেষ প্রশ্ন দেওয়া হ'ল, 'রাইট আ নোট অন দ্য ক্যারেকটারিস্টিকস অফ মডার্ন পোয়েট্রি উইথ রেফারেন্স টু দ্য পোয়েমস ইউ হ্যাভ রেড।' যেমন প্রশ্নের ছিরি, উত্তরও তেমনি আসবে। ভাসাভাসা, সুপারফিসিয়াল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। তখন আমরা আজকালকার ছেলেমেয়েদের স্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ে শোক প্রকাশ করব।

কেন যে চাকরিবাকরির মধ্যে আদৌ এলাম।

সত্যি আমার চাকরি করাটা একেবারে কাকতালীয়। আমরা বোনেরা ভাইয়ের মত পড়াশুনায় সাধারণের ওপরে ছিলাম বটে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ যে ভাইয়ের চেয়ে আলাদা সেটা গোড়া থেকেই কী করে জানি না মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। দিদির রূপের ঘরে ঘাটতি, তেমন 'ভাল' বিয়ে হওয়া শক্ত, চাকরি তার ক্ষেত্রে একটা বাড়তি কোয়ালিফিকেশান হতে পারে। কিন্তু আমার মাঝারি চেহারা, অতএব সেরকম ভবিতব্য হিসেবে ছিল না। ধরেই নেওয়া হয়েছিল 'জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত' পুরুষের শিক্ষিতা স্ত্রী হিসেবে চারদেয়ালের মধ্যে একটি ছোট পরিবারে রাজত্ব করব। বিয়ের পর বলাংগীরে আমাদের প্রথম সংসার। সুবীর তখন এস. ডি. ও। স্থানীয় সরকারি কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি—ডি. এম. কী কারণে যেন অ্যাভেইলেবল ছিলেন না। পশ্চিম ওড়িশার কলেজ মাত্রেই স্টাফ শার্টজের সমস্যা। প্রিন্সিপ্যাল দুঃখ প্রকাশ করলেন, অর্ধেক বিষয়ে না কি ক্লাসই হয় না। আমি এম. এ. পাশ শুনে ভদ্রলোকই সাজেস্ট করলেন, ম্যাডাম যখন কোয়ালিফাইড, পড়ানোর লাইনে আসুন না। সংসারে তো সেরকম দায়দায়িত্ব নেই। দেখা গেল সুবীরেরও যথেষ্ট উৎসাহ স্ত্রীর চাকরিতে, বাড়তি উপার্জন হবে, আর অধ্যাপনা রেসপেক্টেবল দ্য ফর উইমেন, অ্যাপ্লাই করে দিলাম এডুকেশান জব ডিপার্টমেণ্টের অধীনে ডাইরেক্টোরেটে। অ্যাড হকএ নিযুক্ত হলাম। যদিও স্টুডেণ্টদের স্ট্যাণ্ডার্ড অত্যন্ত নীচু, বিশেষ করে আদিবাসীদের—তাদের মাথায় তো কোন বিষয়ই ঢোকে না, বিদেশী ভাষার তো প্রশ্নই ওঠে না, তবুও অচেনা জায়গায় সম্পূর্ণ একলা থাকার চেয়ে কলেজে পড়ানোর কাজটা ভাল মনে হয়েছিল, ভাল লেগেও ছিল। স্টুডেণ্ট ও কলিগদের সঙ্গে যোগাযোগে বাস্তবের সঙ্গে ইণ্টার-

অ্যাকশানের সুযোগ পাওয়া যায়। আদা জল খেয়ে লেগে গেলাম ওড়িয়া শিখতে, কারণ এস. ই. লেভেল ওড়িয়া পাশের সার্টিফিকেট থাকা গেজেটেড চাকরির পূর্বসর্ত। কোনক্রমে পাশ করে গেলাম। এর মধ্যে খবরের কাগজে ওড়িশা এডুকেশনাল সার্ভিসে বিভিন্ন বিষয়ে লেকচারার চেয়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। যথাযথভাবে আবেদন করেছিলাম, ওড়িশা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরি পাকা হল। তবে ওড়িয়াচর্চার ওখানেই ইতি। এখন তো লেখা দূরের কথা পড়তেও প্রায় পারি না। যদিও ওড়িয়ারা সবসময় বাংলার সঙ্গে মিল সাবাস্ত করতে চায়, আমার কাছে কিন্তু ওড়িয়া সমাজের ও ওড়িয়া মানসের বহু বৈশিষ্টের মত ওড়িয়া লিপির গোল গোল ছাঁদটিও দক্ষিণ ভারতের ধারা অনুযায়ী বলে মনে হয়। তবে বাংলাই বা আমি কতটুকু শিখতে পারলাম।

আমার শাশুড়িকে দেখে আমি প্রথম বাংলা লেখার মহিমা বুঝতে পেরেছিলাম। স্কুলকলেজের ছাপমারা সার্টিফিকেট ওর নেই, কিন্তু আজীবন বাংলাচর্চা করে দিব্যি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে গেছেন। আমার মায়ের মত আদ্যিকালের পাওয়া ডিগ্রিটুকু সম্বল করে থেকে পিছিয়ে যান নি। তাঁর অধ্যাপক স্বামীর কাজকর্ম, গবেষণা, স্কলারস্থপারভিশান—সব কিছুতে তার মনোযোগ দেখে প্রথম প্রথম আমি অবাক হয়ে যেতাম। বাবার চাকরির জগৎ আমার মায়ের কাছে তো প্রায় মঙ্গলগ্রহ ছিল। আমার চাকরিতে মা কোনদিনই বিশেষ সন্তুষ্ট নন, বরং চাকুরে স্ত্রীর দ্বারা পতিসেবা ঠিকমত হয় কিনা সে বিষয়ে দেখা হলে তো বটেই এমন কি চিঠিতেও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকেন। বাবাও প্রতিবার কলকাতা থেকে ফেরার সময় বলবেন, 'দেখো তোমার চাকরির জন্য সুবীরের যেন কোন অসুবিধা না হয়। চাকরি করছ বলে যেন ভুলো না সংসারই তোমার পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপরে ছাদ।'

ভুলি নি। তবে প্রবাসে নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান সংসারে চাকরিটাই ছিল নিঃশ্বাস নেবার বাইরের জানালা। দীর্ঘ পাঁচবছর পর যখন সুপু হল, তখন চাকরিটা নিয়ে দ্বিধায় পড়েছিলাম। বাবা-মা তো ধরেই নিয়েছিলেন কাজ ছেড়ে দেব। সুপু তিন মাসের হওয়ার আগে ওড়িশায় ফিরতেই দিলেন না। মেটারনিটি লিভএর মেয়াদ শেষ করে বাড়তি ছুটি নিয়ে যখন নিজের সংসারে ছেলে কোলে ফিরলাম তখন মুস্কিল আসান হলেন আমার শাশুড়ি। কলকাতা থেকে একটি বিশ্বাসী ঝি সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির সকলের অসুবিধা সত্ত্বেও আমার কাছে দীর্ঘ ছ'মাস থেকে নাতি মানুষ করাতে হাত লাগালেন। সুবীর তখন ডি. এম. পুরী। আমি ওখানকার মহিলা কলেজে। প্রিন্সিপালটি ভাল, কলিগরা সিমপ্যাথেটিক, সকলেরই তো এই স্টেজ গেছে। অর্থাৎ পাকেচক্রে চাকরিটা বজায় রইল।

তবু সব মিলিয়ে বরাবরই মনে হয় চাকরিটা আমার জীবনে এলেবেলে ব্যাপার, করলেও হয় না করলেও হয়।

তার জন্য এই কাঠফাটা রোদে তেতেপুড়ে সত্তর কিলোমিটার যাতায়াত করে

যন্ত্রের মত অর্থহীন খাটা পোষায় ?

বাড়ি ফিরে চানটান করে লনএ বসেছি। শ্রীমান রাজু খবর দিল মালী তুলসাইয়ার বৌ কান্নাকাটি করছে, তার দুবছরের ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। তুলসাইয়া দুদিনের ছুটি নিয়ে গাঁয়ে গেছে, তার জমি নিয়ে কি ঝামেলা হয়েছে, তহসিলদারের সঙ্গে কাজ আছে। ইতিমধ্যে ছেলেটার কাল থেকে জ্বর। আজ দুপুর থেকে বাড়ছে।

'একবার গিয়ে দেখে আসি', সুবীরের দিকে চেয়ে বলি।

'হ্যাঁ দেখে এস। সেরকম কিছু মনে হলে ডঃ মিশ্রকে ফোন করে দিও।'

গেলাম। বাড়ি থেকে বেশ দূর সারভেণ্টস কোয়ার্টার, ছোটবড় গোটা তিনেক ঘর, রান্নাঘর, একফালি বারান্দা, আলাদা জলকল তো বটেই সব মিলিয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট। অন্ধকারে টর্চ হাতে রাজুর সঙ্গে এগোই। কোয়ার্টারের সামনের জমিতে দেখি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ময়লা আবর্জনা। খোলা রান্নাঘরে যেমনতেমন করে রাখা কালিঝুল হাড়ি কড়াই ডেকচি। মেজাজ বিগড়ে যায়। রাজুর পেছন পেছন ঘরে ঢুকি। টিমটিমে একটা বাল্ব জলছে, জানালাদরজা সব বন্ধ। একটা তক্তপোষের ওপর আধময়লা বিছানায় হাড়জিরজিরে ছেলেটা মুহ্যমান পড়ে আছে, প্রায় মুখ অব্দি টানা নোংরা আধছেঁড়া কাঁথাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে আর মেঝেতে বসা তুলসাইয়ার বৌ কাঁথাটাকে আবার টেনে ঢেকে দিচ্ছে। আমাকে দেখে একগলা ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সমস্ত ঘরটায় ঘাম ময়লা আর রোগের গন্ধ, দম বন্ধ হয়ে আসে।

জিজ্ঞাসা করলাম কত জ্বর জানে কিনা। মিনমিন করে নীচু গলায় জবাব আসে—না, জানে না। ছেলের বাপ তো বাড়ি নেই, কে মাপবে, তবে খুব জ্বর, চোখ মেলছে না।

ছেলেকে মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিয়েছে কি না জানতে চাইলাম।

না, দেয় নি। জ্বর বলে জল ছোঁয়ায় নি।

দরজা জানালা বন্ধ কেন ?

ঠাণ্ডা লাগবে তাই।

পথ্যি কি দিয়েছ।

সকালে পাউরুটি দিয়েছিল, ছেলে খেতে পারে নি।

না, বার্লিটার্লি কিছু দেয় নি। ঘরে বার্লি নেই। কিনতে কে যাবে, ছেলের বাপ তো বাড়ি নেই।

না, ওষুধ কিছু পড়ে নি। ডাক্তারের কাছে কে যাবে, ছেলের বাপ তো বাড়ি নেই।

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল, ইচ্ছে হ'ল ঘোমটাটা হ্যাঁচকা মেরে খুলে দিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে দিই। ছেলের বাপ বাড়ি নেই বলে ছেলের মা ঠুঁটো জগন্নাথটি

হয়ে বসে থাকবে তো ছেলে পেটে ধরেছিল কেন। না, পেটে ধরাতে ক্ষতি নেই। এই তো ক'মাসের মেয়েও একটা কোলে।

মেজাজ সামলে জ্বর হলে কী কী করণীয় বলে যাই, জানালা খুলে দিক, ভাল করে মাথা ধোয়াক, গা মুছে দিয়ে হাল্কা কাপড় একটা শুধু গায়ে দিয়ে রাখুক, বাতাস করুক মাথায়, জলপট্টি—ওমা, এ দেখি নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়েই আছে কোন রিঅ্যাকশানই নেই। কোলের মেয়েটা ট্যা ট্যা করে কেঁদে দুহাতে ব্লাউজ ধরে টানছে। শ্রীমান রাজু দৃশ্যটির আগাগোড়া দর্শক এবং ইণ্টারপ্রেটার—অর্থাৎ আমার বর্তমান, আধুনিক জগৎ এবং তুলসাইয়াদের চিরন্তন, আদিম অস্তিত্বের মধ্যে সেতু।

এবারে সে মৃদু হাস্যে জানাল তুলসাইয়ার বৌকে এসব বলে কোন লাভ নেই, সে কিছুই করতে পারবে না, ছেলের বাপ তো বাড়ি নেই।

রাগ করে কী হবে। দেশেগাঁয়ে নিজেদের মধ্যে এরা হয়তো এইভাবেই থাকে, বাঁচে বা মরে। কিন্তু আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটা বাচ্চা এভাবে বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় পড়ে থাকবে সে তো হতে পারে না। এস. সি. বি মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর ড. সুধাংশু মিশ্র আমাদের জরজারিতে দেখেন। তাকেই টেলিফোন করলাম। ভাগ্যবশত ভদ্রলোকের এদিক দিয়ে কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, কাজেই যাওয়ার পথে ক'মিনিট মোটরবাইকটি থামিয়ে বাচ্চাটাকে দেখতে এলেন। ওষুধ লিখে দিয়ে রাজুকে খাওয়াবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তুলসাইয়ার বৌয়ের পক্ষে নাকি ওষুধ টুষুধ ঠিকমত ঘণ্টাঘরে মাপমত খাওয়ানোও সম্ভব নয়। সে শুধু একগলা ঘোমটার আড়ালে ইনিয়েবিনিয়ে কেঁদে গেল, তার ছেলে কি আর বাঁচবে, আগে দুটো মেয়ে গেছে, তার ভাগ্যই খারাপ ইত্যাদি।

ভাবলাম বলি—তার মত গুণবতী মায়ের ছেলেমেয়ে বাঁচলেই আশ্চর্য।

ডঃ মিশ্র এক ধমকে তার কান্না বন্ধ করে দিলেন, ওষুধ ঠিকমত পড়লেই সেরে যাবে।

আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে হেসে বললেন,

'আপনি ম্যাডাম মিছিমিছি এক্সাইটেড হচ্ছেন। এদের দ্বারা রোগীর সেবাযত্ন হয় না। কিচ্ছু জানে না, বললেও শুনবে না, শিখবে না। প্রতিদিন আউটডোরে দেখে দেখে গরীবের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। ইনফ্যাণ্ট মরটালিটির জন্য এরা কি কম দায়ী ভাবেন? যত দোষ আমাদের হয়। শুধু ইলিটারেট লোয়ার ক্লাসে নয়, অর্ডিনারি মিড্‌ল ক্লাস ফ্যামিলিতেও কারো রোগের সেবা সম্বন্ধে এলিমেণ্টারি নলেজ নেই। এই তো গতকালই এক টাইফয়েড পেসেণ্ট দেখতে গিয়েছিলাম—ইনডাস্ট্রিজ ডাইরেক্টোরেটে আপার ডিভিশান ক্লার্ক—ঠিক এইভাবে ফেলে রেখেছে। পেশেণ্টের প্রতিদিন স্পঞ্জিং, মাথা ধোওয়া, জামাকাপড়

ইত্যাদি দরকার বলাতে তার স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বলে কি জানেন,

'বাপা লো, তেবে তো নর্স লাগিব, এত্তে টংকা কাঁহ।

'দিস ইজ দ্য কণ্ডিশান অফ দি এডুকেটেড পাবলিক।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জন্ম থেকে দেখে আসছি প্রত্যেক স্ত্রী, প্রত্যেক মা পরিবারের সবার রোগেকষ্টে সেবায় নিখুঁত ও তৎপর। জ্বর মানেই তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পথ্য সবকিছুতে মায়ের কত বেশি নজর, কত পুঙ্খানুপুঙ্খ যত্ন। বাড়ির ঝিদের মধ্যেও দেখেছি। বাঙালি জীবনে ও মানসে নারীর ভূমিকা কি ভারতের আম জনতার থেকে এতই ভিন্ন? কে জানে। তবে তুলসাইয়ার বৌ যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্ত্রীলোকের প্রতিনিধি হয় তবে নারীমুক্তি নিয়ে গলাবাজি করে কি হবে। এসব স্ত্রীলোক তো পুরুষের 'আধিপত্য' থেকে মুক্ত হলে একদিনও বাঁচবে না। দাসত্বই এদের টিকে থাকার একমাত্র উপায়। তথাকথিত অত্যাচারিত ও নিপীড়িতরা অনেক সময়েই নিজেদের জালে বন্দী। অজ্ঞ, অলস ও অপদার্থের প্রথম সংগ্রাম তো নিজের বিরুদ্ধে। সেইখানে জয়লাভ করলে তারপর অন্য কথা।

সুধীর ও আমি গলা মিলিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের শ্রাদ্ধ করি। তৃতীয় বিশ্ব মানেই যে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ব এই একটা বিষয়ে আমরা স্বামীস্ত্রী পুরোপুরি একমত।

অ্যানুয়েল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। গরমের ছুটির আগেই খাতা দেখে নম্বর দিয়ে দিতে হবে। একজামিনেশান সেকশানে খাতার বাণ্ডিল নিতে গিয়ে ডিপার্টমেণ্টের সীমা মহান্তি ও সতীর সঙ্গে দেখা।

'নমস্কার, নমস্কার। দেখছেন আমাদের তিনজনেরই প্লাস টু ফার্স্ট ইয়ার সায়ান্স। যত খাটুনির কাজ ম্যাডামদের ঘাড়ে। শর্ট কোয়েশ্চেন, গ্রামার, সব পাঁচ পাঁচ নম্বরের অজস্র কোয়েশ্চেন, অ্যানসার খুঁজে বের করে আলাদা আলাদা নম্বর দিয়ে অ্যাডিশান করতে কী অবস্থা। আমি তো ক্যালকুলেটার কিনেছি।'

সীমা আমাদের অনেক ছোট, সম্বলপুরের মেয়ে।

'যা বলেছ। তা আমাদেরই দেওয়া কেন? স্যারেরা সব গেলেন কই?'

সতী মৃদু হেসে রেজিস্টার সই করে বাণ্ডিল খুলে খাতা গুনতে গুনতে শুনছিল। সীমা উত্তর দেয়,

'জানেন না বুঝি? স্টুডেণ্টরা কমপ্লেন করেছিল ফার্স্ট টারমিনালে নাকি খাতা না দেখে সব নম্বর দিয়েছে, ৩০-এর তলায় কেউ নেই, হায়েস্ট ৫৫। কী অন্যায় বলুন তো? আমাদের কলেজে হাই ফার্স্ট ডিভিশান ছাড়া কেউ সায়ান্সে অ্যাডমিশান পায় না।'

'সত্যি অন্যায়', আমিও আমার নামের ও খাতার অঙ্কের পাশে রিসিভড্ লিখে সই করি। বাণ্ডিল খুলে গোনার মত ধৈর্য নেই। 'তা এরা খাতা ঠিকমত দেখে নাই বা কেন?'

সতী এবারে মুখ খোলে,

'কখন দেখবে, তেনাদের সময় কোথায়। সব যে যার নিজের নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। কেউ আছে টিউশান-একজামিনেশান র‍্যাকেটে, নিজের ছাত্রছাত্রীদের যেন তেন প্রকারেন এক্সপেক্টেড নম্বর জুটিয়ে দিতে হবে। কেউ বিখ্যাত হবেন লেখা-লেখি ছাপা, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডের জন্য তদবির করা, সভাসমিতি খবরের কাগজ টিভি লাইমলাইটে থাকা চাই। কেউ বা নোট বই টেক্সট বই বোর্ড অফ স্টাডিজ এই চক্করে। নিদেন পক্ষে পান চিবিয়ে স্যুটার চড়ে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে কি ডাইরেক্টোরেটে সেকশান অফিসার বা আপার ডিভিশান ক্লার্কদের সঙ্গে আড্ডা মারছে। কত লোক আবার নানা ব্যবসাও ধরেছে। কেমিস্ট্রির সত্যনারায়ণ সোঁয়াই ইটের ভাটি করেছে, জানেন না ?

না, জানি না। আমার বাঙালি মধ্যবিত্তের ধরা-বাঁধা ছকে অধ্যাপনার কমার্শিয়ালাইজেশানেও ধরা-বাঁধা—টিউশনি ও নোটবুক। এদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং দিন দিন এত ভিন্নভিন্ন দিকে বিস্তৃততর হচ্ছে যে নিজেকে সম্পূর্ণ বেমানান লাগে। আমি সত্যি বহিরাগত। হেসে বলি,

'তাহলে তো দে শুড বি গ্রেটফুল, ম্যাডামরা বোঝাটা বইছেন।'

'গ্রেটফুল! কী বলে বেড়ায় জানেন ? লেডি-লেকচারাররা জেনারেল ক্লাস কনট্রোল করতে পারে না। পুরুষ জাতটাই বদমাশ।'

সীমাও সতীর কথায় হাসে। বাণ্ডিল হাতে ছাতা খুলে হাঁটতে শুরু করে। ও বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কলেজের কাছে, নিজের ও ছেলেমেয়েদের যাতায়াতের সমস্যা সমাধানের এই একমাত্র উপায়। যদিও বাড়িটা খুবই অসুবিধাজনক, জল প্রায় নেই। ভুবনেশ্বরে বেশির ভাগ মাঝারি প্রাইভেট বাড়িতে এই অবস্থা। এতটুকু সহরে জলসরবরাহ ঠিকমত নেই, পরে লোক বাড়লে কী হবে কে জানে।

সতীকে নিয়ে গাড়িতে উঠি। আজকে আগে ফেরার সুযোগ আছে। কলেজের গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে গাড়ি জোরে চলতে সুরু করলে সতী বলে,

'ম্যাডাম, আপনার একটু অ্যাডভাইস চাই।'

'কী ব্যাপার বল তো ?'

'আচ্ছা সরকারি চাকুরেদের, বিশেষ করে যাদের গেজেটেড র‍্যাংক, তাদের জন্য তো কনডাক্ট রুলস আছে, মরাল টারপিচিউড তো একটা সিরিয়াস ল্যাপস, তাই না ?'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা হেলাই, হ্যাঁ।

কিছু বলি না।

সতীই বলে চলে, 'আমি যদি স্ত্রী হিসেবে কমপ্লেন করি তো মিঃ পাণ্ডাকে নিশ্চয় দূরে কোথাও, কালাহাণ্ডি কি কোরাপুটে বদলি করে দেবে, তাই না ?

ব্যাট উইল কোর্স হিম টু এণ্ড দিস অ্যাফেয়ার। আর একটা শিক্ষাও হবে। ইণ্ডিয়ান ওম্যান বলে আমি কি পা মোছার পাপোষ ?'

সতী থেমে গিয়ে আমার মুখে দিকে চেয়ে থাকে, উত্তরের অপেক্ষায় এবারে কথা বলতেই হয়।

'না তা নিশ্চয়ই নও। শিক্ষাও হবে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস, ঠাণ্ডা মাথায় র‍্যাশনালি জিনিসটা ভাবতে চেষ্টা কর। মিঃ পাণ্ডার এই ইনক্যাটুয়েশান ক'দিনের, আজ বাদে কাল আপনি থেকেই শেষ হয়ে যাবে। দিস সর্ট অফ থিং ক্যান নেভার কনটিনিউ ইনডেফিনিটলি। কিন্তু তুমি নালিশ করলে ওঁর সি. সি. আর. এ অর্থাৎ ক্যারেকটার কনফিডেন্সশিয়াল রেকর্ডে এন্ট্রি হয়ে যেতে পারে এবং সেই এন্ট্রি ওপরওয়ালার অ্যাডভার্স কমেণ্টের চেয়েও অনেক বেশি হার্টফুল, কারণ তাঁর তো এ ক্ষেত্রে রিপ্রেজেণ্টেশানের সুযোগ বা উপায় থাকবে না। এক্সপাঞ্জড হবার চান্স নেই, অর্থাৎ একটা পার্মানেণ্ট ড্যামেজ, ভবিষ্যতে তার অনেক কনসিকোয়েন্স হতে পারে। প্রোমোশনের বেলায় মুস্কিল হবে। মিঃ পাণ্ডাও নিশ্চয় জানতে পারবেন। তখন তোমরা একই ছাদের তলায় থাকবে কী করে ?'

আমরা যেমন করে আছি।

সে রাত্রির পর সুবীরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সকালে উঠে সংসারের কাজ দেখা ও করা—সুপু ও সুবীরের ব্রেকফাস্ট, প্যাকড় লাঞ্চ / টিফিন, সুপুকে স্কুলের জন্য রেডি করা, স্কুলে চলে গেলে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতাম। সুবীরের যদি সাংসারিক কোন কথা বলার থাকত সুপুর উপস্থিতিতে ভাববাচ্যে হত। মাস গেলে সংসারের টাকাটাও সুপুর ব্রেকফাস্টের সময় টেবিলে রাখা থাকত। বাড়ি খালি হলে শোবার ঘরে ঢুকে জামাকাপড় বের করে নিয়ে আবার সুপুর বাথরুমে স্নানটান করে খেয়ে বেরিয়ে পড়তাম লাইব্রেরির নামে। ছাড়াছাড়া এটা সেটা পড়তাম, আমার গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে যার যোগ স্থাপন করা শক্ত। এই সময়ে কেন জানি না বাংলা পড়ার ইচ্ছেটা একেবারে চলে গেল। অবশ্য বাংলা চর্চা দিল্লিতে খুব সোজা নয়। অন্য অনেক 'ইজম'এর মত ইণ্ডিয়ান মাল্টিলিংগুয়ালিজমও শুধুমাত্র নামে। রাজধানী একান্তভাবে পাঞ্জাবি-হিন্দি কেন্দ্রিক। খোদ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নামি বাংলার প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সবে কলকাতা থেকে ফিরেছেন, একখানা চটি কবিতার বই প্রকাশের জন্য কলকাতার একজন ছোট প্রকাশকের শরণ নিতে হয়েছে বলে দুঃখ করছিলেন। এই তো বাস্তব। হিন্দি ছাড়া বাকি সব ভারতীয় ভাষাই প্রান্তবাসী।

তাই কি আমার সংসারেও উত্তর ভারতের অদৃশ্য দাপট ? আমি স্ত্রী এবং মা হয়েও কোন ক্রমে টিকে আছি। হ্যাঁ টিকেই তো আছি। এভাবে বাঁচাকে আর

কী বলে? দিনের বেলা কত সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, উদ্দেশ্যবিহীন। কোন ভাবনাচিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা নেই। নেই যেন বোধ ভাসি। বাড়ি ফিরি, ক্লান্ত অবসন্ন। ঠিক সুপুর স্কুল থেকে ফেরার সময়। সুপু বা বলা উচিত সুপুর দৈনন্দিন রুটিন ছিল আমার বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র, সুস্থ স্বাভাবিকত্বর একমাত্র প্রকাশ। সুবীরের ফিরতে ফিরতে অধিকাংশ দিনই রাত হত। ততক্ষণে আমার সংসারের কাজ শেষ, সুপুর ও আমার খাওয়া দাওয়া সারা হয়ে যেত। ছেলের ঘরে দরজা বন্ধ করে জেগে শুয়ে আছি। অন্ধকারে পরিচিত শব্দের প্রতীক্ষায়। সুবীরের বাড়ি ফেরা, টেবিলে রাখা রাতের খাওয়া, বেশির ভাগ সময়েই ফ্রিজে তুলে দেওয়া, বাথরুমে ফ্লাশের জল। শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে অর্থাৎ সুবীর শুয়ে পড়লে বাইরের ঘরে ডিভানে এসে শুতাম। সুপুর সরু খাটে দুজন বেখাপ্পা।

এভাবে বেশিদিন চলল না। কয়েক মাসের মধ্যে ভাই এল দিল্লিতে—ওতো ইণ্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস মানে ইনকাম ট্যাক্সে আছে—প্রতিবারের মত এবারও আমার এখানেই উঠল। যথারীতি তার শয্যা বাইরের ঘরে ডিভানে। আমি সুপুর সরু খাটেই আশ্রয় নিই। যেদিন চলে গেল সেদিন রাতে সুপু ঘুমিয়ে পড়লে সুবীর এসে বলল,

'একটু বাইরের ঘরে এস, কথা আছে।'

উঠে গেলাম। অজানা আতঙ্কে হাত পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'বল।' বুকের ভেতরটা শিরশিরে বরফ বরফ।

'আমি জানি আমারই দোষ, কিন্তু আই অ্যাম নট দি ওনলি হাজব্যাণ্ড হু ইজ ইন দিস কাইণ্ড অফ সিচুয়েশান। কিন্তু তুমি যে ভাবে চলছ সেটা তো নরম্যাল নয়।'

'কী করতে হবে আমাকে?'

'এই যে তোমার নিজের ভাইয়ের সামনে তুমি এ দুদিন কী করলে। প্রায় কথাই বললে না, সুপুর ঘরে সব সময় শুচ্ছ, ও ঘরে। এগুলো কি নরম্যাল? ও তো নিশ্চয় কিছু সন্দেহ করে গেল। হোয়াই ডোণ্ট ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড যে ব্যাপারটা সেরকম গুরুতর নয়?'

'গুরুতর নয় মানে?'

'মানে ইট রিয়েলি চেঞ্জেস নাথিং, জাস্ট আ পাসিং এপিসোড···আই মীন ইট্‌স জাস্ট লাইক···কী বলব···যেমন ধর একটা ভাইরাস ইনফেকশান। ইট উইল রান ইট্‌স ওন কোর্স অ্যাণ্ড দেন এভরিথিং উইলি বি নরম্যাল এগেইন। বাট অ্যাট দ্য প্রেজেণ্ট মোমেণ্ট···এই মুহূর্তে আই মাস্ট···মাস্ট হ্যাভ হার। এখন ওকে ছাড়া থাকতে পারি না। ইউ মাস্ট লেট মি হ্যাভ হার···দেখ ক'দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আই প্রমিজ।'

হঠাৎ নিজেকে ভীষণ বোকা আর ভীতু মনে হ'ল। এই লোকটাকে আমি এত ভয় করছিলাম। এ তো একটা মেয়ের সঙ্গে শোবার জন্য আমার পায়ে পড়তে পারে, কিন্তু বাইরের খোলনলচের মায়া ছাড়তে পারে না। ছাড়তে পারে না বিনে মাইনের হাউসকীপারের শ্রম ও যত্নের নিয়মিত দৈনিক সাচ্ছন্দ্য। আমি কিছু না বলে সুবীরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও চোখ নামিয়ে নিল।

যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ।

আচ্ছা এই যে পুরুষটি, দিব্যি শাঁসেজলে তেলচুকচুকে, ওল্ড স্পাইস আফটার শেভ, দামি ট্যালকম পাউডারে মাজা ঘসা, একে আমি কতটুকু জানি? শুধু এইটুকু আজ বুঝি যে তার লোভের কাছে কোন মূল্যবোধ দাঁড়ায় না। সেই বানের জলে খড়কুটো। অতঃপর ক'দিন ধরে বসে বসে বারবার মুসাবিদা করি, হোম মিনিস্ট্রির আণ্ডারে ডিপার্টমেণ্ট অফ পারসোনেল, পেনশন ইত্যাদির এস্টাব্লিশমেণ্ট অফিসার—অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি র‍্যাংক—তাঁকে অ্যাড্রেস করে একটা পিটিশান: আমি শ্রীমতী চিত্রা সেন, অমুক ডিপার্টমেণ্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারি সুবীর সেন আই. এ. এস-এর ধর্মপত্নী, আমার বক্তব্য এই যে আমার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত কারণ আমার স্বামীর বর্তমান আচরণ তাঁর অফিশিয়েল পজিশানের অনুপযুক্ত, যদিও তাঁর কার্যকলাপ পদমর্যাদা ভাঙিয়েই—ইত্যাদি ইত্যাদি। সাতদিন ধরে কতবার লিখলাম, কাটলাম, বাতিল করলাম, আবার লিখলাম। শেষে একটা পছন্দমত ড্রাফট হ'ল। টাইপ করাতে বেরোই। টাইপিস্ট পাওয়াও ঝামেলা। তারপর জেরক্স।

যে রাতে সুবীরের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখলাম, সে-রাতেই মাথার কাছে টেবিলে চিঠির কপি ও কিছু ইতঃস্তত কাগজ রেখে শুলাম—যেন কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি। সেদিন সুবীর এসে সোজা শুয়ে পড়ল, টোপ গিলল না।

পর পর কয়েক রাত চিঠির কপি চোখের সামনে রাখলাম। একদিন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি, সকালে উঠে দেখি কপিটা নেই।

আমার বা সুবীরের কারোরই আচরণে বোঝা গেল না গতানুগতিকের বাইরে কিছু ঘটেছে।

মাস দুয়েক পরে শুনি সুবীর সুপুকে বলছে, স্পষ্টই আমাকে লক্ষ্য করে,

'আমি বদলি হয়ে যাচ্ছি, ব্যাক টু ওড়িশা।'

সুপু এরই মধ্যে আমলাতান্ত্রিক জীবনচর্যায় যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করে ফেলেছে। কাজেই তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল,

'সে কি, তুমি না বলছিলে দিল্লিতে রয়ে যাবে, ওড়িশায় আর ফিরবে না!'

'হ্যাঁ,···বলেছিলাম বটে। কিন্তু আমার তো এখনো অনেক বছর সার্ভিস বাকি আছে, নতুন পলিসিতে একটানা এতদিন সেণ্ট্রাল গভমেণ্টে থাকা যাবে না। তাছাড়া তোমার মার চাকরি ওড়িশাতে, ওর তো ফেলোশিপ শেষ হয়ে গেল বলে, ওকে জয়েন করতে হবে। এতদিনের চাকরি ছাড়বে কেন?'

যেন স্ত্রীর কেরিয়ারে নিবেদিত প্রাণ !

সুপু আবার প্রশ্ন করে,

'আমি তবে আবার ভুবনেশ্বর স্টুয়ার্টে পড়ব ?'

'না, তোমাকে ভাল স্কুলে পড়তে হবে। দিল্লি পাবলিক স্কুলের মত ইন্‌স্টিটিউশান ভুবনেশ্বরে কোথায় ?'

সুপুর মুখ ম্লান হয়ে যায়।

'তা হলে আমি হোস্টেলে থাকব ?'

'নিশ্চয়ই।' সুপুকে দিল্লি রেখে এসে বহুদিন কোন খাবারে স্বাদ পেতাম না। এখনো ওর পছন্দের কিশমিশ দেওয়া দই মাছ বা চিংড়ির মালাইকারি খেতে পারি না।

হোস্টেল থেকে প্রথম প্রথম সুপুর চিঠি আসত বাংলায়, তারপর ইংরিজি বাংলা মিশিয়ে, এখন শুধু ইংরিজিতেই লেখে। প্রথমে কিছুদিন বাংলা লিখতে বলতাম, রাগ করে সুপু চিঠি লেখাই বন্ধ করে দিত। সুবীর বিরক্ত হত।

'ইণ্ডিয়াতে বাংলা বাংলা করে কী হবে ? মিডলক্লাস চাকুরিজীবীর জীবনে বাংলার প্রয়োজন কোথায় দেখাতে পার ?'

'না, দেখাতে পারি না।'

এখন ছুটিতে এলে মা-ছেলের কথাবার্তা চলে বাংলা-ইংরিজি-হিন্দি এক খিচুড়ি ভাষায়। কেমন যেন পর-পর লাগে।

ছেলেকে হারিয়ে স্বামীকে ফেরৎ পাওয়ায় সুখ নেই। হয়তো জীবনে লাভক্ষতি জয়পরাজয়ের হিসেব এমনই জটিল।

হয়তো বা এমনই অর্থহীন।

সতীর গলা কানে আসে। নিজের থেকে অন্যে, দুঃখী থেকে দর্শকের ভূমিকায় ফিরে আসি। উত্তেজিত হয়ে বলে যাচ্ছে সতী,

'তাহলে বারণ করছেন ? বলছেন কিছুই করবার নেই, মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া ? তবে তো ঠাকুমা দিদিমারাই ভাল ছিলেন। জন্ম থেকেই জানতেন সহ্য করতে হবে, সইতেন। সইতে না পারলে মরে যেতেন, ব্যস। আপনি কী বলেন ? সেই পাতাল প্রবেশই একমাত্র মুক্তির উপায় ?'

সতীর কথাগুলো বড় আঁতে ঘা দেয়। ল্যাজকাটা শেয়ালের মত অন্য স্ত্রীদেরও মাথা হেঁট হোক চাইছি।

'দেখ সতী, আমি তোমাকে পথ দেখাতে পারি না। সত্যি আমার সেরকম যোগ্যতা নেই। তবে আমিও স্ত্রীলোক, অনেক দিক থেকে তোমারই মত—' সতী চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকায়।

'সে কি, আপনাকেও আমার মত সিচুয়েশান ফেস করতে হয়েছে ?'

সতীর প্রশ্নের জবাব দিই না, আত্মসম্মানে বাঁধে। ও আমার কাছে মুখ খুললেও

আমি ওর কাছে মন খুলতে পারি না। এড়িয়ে যাই।

'দেখ, মেনে নেওয়া সব সময়ই সোজা। প্রতিবাদ করাটাই কঠিন। মেনে নেওয়ার প্র্যাক্‌টিকাল অ্যাডভানটেজ প্রচুর, প্রতিবাদ করায় কোন মেটিরিয়েল লাভ নেই। তোমার আমার বয়সে কি সেনসিটিভিটি, প্রিন্সিপল নিয়ে বাঁচা যায় ? ও সব গল্পে উপন্যাসেই ভাল।'

'আপনিও একথা বলছেন ? আমি ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে অন্তত মর্যাল সাপোর্ট পাব।'

'নিশ্চয়ই, তুমি যাই ঠিক কর না কেন আমার সাপোর্ট পাবে।'

সতীর হাত ধরে বলি, 'দেখ, সতী, তোমাকে আমি মিথ্যে উৎসাহ দিয়ে মাতাতে চাই না। অন্যের প্রতি অবিচারে প্রতিবাদ করা, রুখে দাঁড়ানোর উপদেশ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা নয় কি ? মনে মনে একটা পরোক্ষ সন্তোষ হয়, যেন আমার যুদ্ধ অন্যে লড়ছে। দেখ, যার সমস্যা তাকেই সমাধান খুঁজতে হয়। নিজের মত করে। যার লড়াই তাকেই লড়তে হয়। অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে লড়াই আত্মপ্রবঞ্চনা। লেবার লিডারদের মত যেখানে কাজ করি না সেই কারখানায় আন্দোলন করে ইউনিয়নবাজিই হয়, শোষণের অবসান হয় না। তাই বলছিলাম তোমার অবস্থাটা সব দিক থেকে ভেবে দেখ। স্ত্রী হিসেবে তুমি যা পাচ্ছ বা পাচ্ছ না, মা হিসেবে, একটা যৌথ পরিবারের বধূ হিসেবে, কলেজে চাকরির ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে পুষিয়ে যাচ্ছে কি না। অর্থাৎ তোমার নিজেকে প্রমাণ করার ক্ষেত্র তো বিরাট, বিছানাই তো একমাত্র জায়গা নয়।'

আমার কাছে তাহলে বিছানাটা এত বিশাল, সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল কেন ? যৌথ পরিবারের ভিত আলগা হয়ে গিয়েছিল বলে না কি চাকরির অনিশ্চয়তা, না প্রবাসের একাকীত্ব ? এককথায় জাতীয় সংহতির পরিণাম।

সতী একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে,

'কনসোলেশান দিচ্ছেন ?'

'তা ঠিক নয়, সতী। আমি তোমাকে তোমার নিজের জায়গায় নিজের সমাজে একটা পুরো মানুষ হিসাবে দেখতে চাইছি। আমার তো মনে হয় সংসারে কোথাও একটা অদৃশ্য ন্যায় বিচার আছে, শেষমেষ একটা ভারসাম্যে পৌঁছে যায়।'

'সে বিশ্বাস আমার আর নেই, ম্যাডাম।'

'তুমি দেখ, আছে।'

অ্যাসুয়েলের রেজাল্ট ফাইনালাইজ হচ্ছে, ট্যাবুলেটাররা ব্যস্ত। সতী ডিপার্টমেণ্টাল রুমে ধুলোময়লার মধ্যে পাখাছাড়া ঘামতে ঘামতে রেজিস্টারে নম্বর তুলছে। আমি উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করি,

'কী ব্যাপার, একা একা গাধার খাটুনি কেন খাটছ? আর. কে. পি. তোমার সঙ্গে আছে না ট্যাবুলেশানে? সে কোথায় গেল?'

সতী মুখ বিকৃত করে বলল,

'বাড়ি করছে, কনট্র্যাকটারের পেছনে লাগতে গেছে।'

'বা, যে কাজের জন্য মাইনে পাচ্ছে সেটি কে করবে?'

'কাকে কী বলবেন ম্যাডাম, এই ভাবেই চলবে।'

খারাপ লাগল, কী অন্যায় কথা। বসে মার্কফয়েলগুলো নিয়ে রোল নম্বর আর মার্কস ডাকতে থাকি, এতে লিখতে সুবিধা।

কাজ শেষ হলে ঘাম মুছে রেজিস্টার তুলে রেখে দুজনে বসি। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, তাকানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে সতী একদিন আমাকে বলেছিল ছেলে পরীক্ষায় বসে নি, প্রমোশন পাবে না। আমাদের কলেজে রি-অ্যাডমিশানের কোন ব্যবস্থা নেই, অতএব কলেজ ছাড়তে হবে। সতী খুব আপসেট। শুধু যে একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল তাই নয় ভবিষ্যতে চাকরির সম্ভাবনাতেও দাগ পড়ল। সরকারি চাকরি ছাড়া ওড়িয়া মধ্যবিত্তের আর ক'টাই বা জীবিকার রাস্তা? আর বর্ণহিন্দুর বেলায় সর্বত্র বয়সে কড়াকড়ি। আপাতত ভয় অন্য কলেজে আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গ। যদি ড্রাগট্রাগ ধরে বসে। এখন ছেলেকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা যে স্বামীর কথা প্রথমে তুলল না।

'আপনি তো ম্যাডাম বলছিলেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কর কথা। এই তো দেখুন তার অবস্থা। বেশি কিছু বলতে গেলে মেজাজ করে, বলে আমাদেরই দোষ। অন্য সংসারে নাকি এরকম হয় না। ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে যে সব সহ্য করব, তার প্রতিদান তো এই। আসলে গোড়ায় গলদ থাকলে ওপর ওপর যাই কর তাই কর ঠিক আর হয় না।'

'ছেলেকে বোঝাও। পড়াশুনা না করে কাকে কী শিক্ষা দিচ্ছে? নিজেরই তো ক্ষতি। তাছাড়া সে ভাল ছেলে, বরাবর হাইফার্স্ট ডিভিশান পেয়ে এসেছে, তার তো সমস্ত ভবিষ্যৎ সামনে।'

'কে শুনছে এসব কথা? আপনি কি ভাবেন এ সব আমি বলি না?'

'কী উত্তর দেয়?'

'কিছুই না। অথবা কাটাকাটা কথা বলে, ওর ব্যাপার ও বুঝবে আমার অত মাথাব্যথা কেন। ভাবুন, আমি মা, ছেলেকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা হবে না তো কি রাস্তার লোকের হবে? কত শান্ত নম্র ছিল, দিনকে দিন রুক্ষ উদ্ধত হয়ে উঠছে। বিয়ে থাওয়া হলে বৌয়ের সঙ্গে কী ব্যবহার করবে সে তো বুঝতেই পারছি। বলে কিনা, বাবাকে কিছু বলার সাহস নেই তাই আমার পেছনে টিকটিক করছ। এইভাবেই ম্যাডাম এই সিসটেম কনটিনিউ করে। মা সহ্য করছে, স্ত্রী সহ্য করবে।'

'এখন সমাজতন্ত্রের কথা থাক সতী, ছেলেটাকে আগে ঠিক কর। সত্যি তোমার সমস্যার আর শেষ নেই। একটা থেকে আরও কত হবে কে জানে।'

'আমি আর কিছু ভাবি না। যা হওয়ার তাই হবে। ভাগ্যই সব।'

অনেকদিন বাদে আজ রাতে খেতে বসে সতীর কথা উঠল। ওর ছেলেকে নিয়ে সমস্যার কথাটা বললাম। সুবীর বেশ বিরক্ত হ'ল।

'এরা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাপের নিজস্ব ব্যাপারে ছেলের নাক গলানো কেন? জীবনের কতগুলো ক্ষেত্রে প্রাইভেসি লাগে, ছেলের বাপ হয়েছে বলে কি নিজস্ব চাহিদা থাকবে না! ওয়েস্টার্নাইজেশানের ফলে ছেলেমেয়েদের ঔদ্ধত্য বেড়েই চলেছে। ফ্যামিলি বলে আর কিছু থাকবে না।'

আমার গলায় একদলা তেতো তেতো কী যেন সমস্ত মুখের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কলেজে এতক্ষণ না খেয়ে থাকায় নির্ঘাৎ পিত্তি পড়েছে। তেতো গলায় বলি,

'তা ফ্যামিলির ভিত যদি সেই সামন্ততান্ত্রিক ছাঁচের কর্তাভজা হয় তাহলে তা এভোলিউশানের স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে যাবে না কি? স্ত্রী মনোবৃত্তি অনুসারিণী সতী সাধ্বী হবে, ছেলে ব্রহ্মচারী থেকে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম জপবে আর স্বামী বা বাপের বেলা অবারিত ভোগের অধিকার—তোমাদের হিন্দুদের পিতৃতন্ত্র আর যাই হোক না কেন কোন নীতিবোধের ধার ধারে না।'

'পরিবারের দায় যে নেয় কিছু বাড়তি সুবিধা তার প্রাপ্য হয় বৈকি। কথায় বলে না যে গরু দুধ দেয় তার লাথি সহ্য করতে হয়।'

'দুধ তো দুজনে দিলেও লাথি মারার অধিকার কিন্তু একজনেরই।

'দেখ চাকরির অত বড়াই ক'র না। মেয়েদের চাকরি, বিশেষ করে তোমাদের মত মেয়েদের চাকরি, এখনো লার্জলি সাপ্লিমেন্টারি ইনকাম, তাতে সংসারে চাকচিক্য বাড়ে, হাত খরচে স্বাধীনতা থাকে। তার বেশি কিছু নয়। তাও আজ আছে কাল নেই।'

সমস্ত মুখটা এখন টকটকও লাগছে। কিছু খাওয়া দরকার কিন্তু খাবার কথা ভাবলে গা গুলোচ্ছে। সুবীর তো সর্বদা রাত করেই খায়। ফট করে মুখে এসে যায়

'রোজগারই কি পরিবারের দায় বহনে একমাত্র পরিচয়? টাকা আনলেই কি সংসার চলে? ছেলেমেয়ে মানুষ হয়? তোমার নিজের মা তো সারা জীবনে একটি আধলাও কখনো উপার্জন করেন নি, তা হলে তিনি কি তোমাদের জন্য কিছুই করেন নি। কোন দায়িত্ব নেন নি?'

'এই দেখ, আবার তুমি অন্যের ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছ। আচ্ছা

তোমরা মেয়েরা একটু অবজেকটিভ হতে পার না কেন? আমার কথা এখানে আসে কী করে? যাক, সতীর ব্যাপারে অযথা তর্ক করে নিজেদের অশান্তি বাড়াবার কোন মানে হয় না। মাছ কোন কোন পিস নেব? মুড়োটা নেওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও।' চামচ দিয়ে মুড়োটা তুলে দিই সুবীরের থালায়। 'যে কোন পিস নাও, আর কে আছে, আমরা দুজনেই তো শুধু খাবার লোক।'

'সুপুর চিঠি এসেছে নাকি?' মুড়ো থেকে পরিপাটি করে মাছের অংশটুকু ছাড়াতে ছাড়াতে সুবীর জিজ্ঞাসা করে। 'ওদের পরীক্ষা-টরীক্ষা ছিল না? কবে আসবে কিছু লিখেছে কি?'

দিল্লি পাবলিক স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করেও সুপু যখন আই. আই. টি বা কোন ভাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অ্যাডমিশান পেল না, তখন সুবীর অফিসিয়ালি একলাখ টাকা ক্যাপিটেশান ফি দিয়ে ব্যাংগালোরে এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ইলেক্টনিকসে ভর্তি করে দিয়েছে। যদিও ছোটবেলায় বাবারই খুব ভক্ত ছিল কিন্তু সেই দিল্লিতে হোস্টেলে রেখে আসার সময় থেকে চিঠিপত্রে যোগাযোগটা আমারই সংগে। কলেজে ঢোকার পর থেকে সব ছুটিতে বাড়িতে আসেও না। যদিও বা আসে ক'দিন বাদেই চলে যায়। বেশির ভাগ সময় তার কাটে ট্রেকিংএ।

'ওদের তো কিছু না কিছু টেস্ট লেগেই আছে। খুব খাটায়।'

'সে তো হবেই। তোমাদের এইসব জেনারেল স্ট্রিম-এর কলেজ তো নয়। অর্ধেক দিন ক্লাস হবে না। মাস্টাররা নিজেদের ধান্দায় ব্যস্ত, মাস গেলে মাইনে ছাড়া কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই—এ সব মামা বাড়ির আবদার ওখানে চলে না। তোমরা তো সরকারের ঘরজামাই। রিসার্চের নাম করে বছরের পর বছর পেইড হলিডে। ক্লাসে কী কর না কর কেই বা দেখছে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো নিল্।'

দিল্লি থেকে ফেরার পর আমার চাকরি নিয়ে দুচ্ছাই করার বরাবরের স্বভাবটা সুবীরের আরও জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে ফেলোশিপ পেয়ে আমার থিসিস না করতে পারাটা ওর আক্রমণের অভ্রান্ত লক্ষ্য। শুনতে শুনতে আমার প্রায়ই মধ্যযুগীয় বিলিতি আমোদের কথা পড়ে যায়—মাঠের চারিদিকে দর্শকেরা খুব মজা করে দেখছে একটা খুঁটে বাঁধা শুয়োরকে একপাল শিকারী কুকুর খাবলা খাবলা কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে, মধ্যযুগ থেকে আমরা কি খুব বেশি দূর এগিয়েছি? হয়তো একটু। হাসি পায়। উত্তর দিই,

'আমাদের দেশে অ্যাকাউন্টেবল আর কে বল? কর্তব্য পালনের কৈফিয়ৎ তো শুধু সংসারেই তাও স্ত্রী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ।'

'কর্মক্ষেত্রে আমরা দায়িত্ব নিই না বলছ?'

'নিলে কী আর আমাদের দেশের এই অবস্থা হ'ত। জাতীয় চরিত্র ছেলে-মেয়ের সকলের মধ্যেই সমান। আমি মেয়ে বলে কলেজে পড়াই আর তুমি ছেলে বলে ব্যুরোক্র্যাট তা কিন্তু ঠিক নয়। আমার পুরুষ কলিগরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। দেশে উপার্জন ও বণ্টন তোমাদের হাতে, তোমাদেরই মনগড়া সব ইডিওলজির ফানুস, সমাজবাদ, সাম্যবাদ—সব। তাতে আজ এই অবস্থা কেন?'

'যাক, খেতে বসে আর ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান নাই বা প্র্যাকটিস করলে। বক্তৃতাটক্তৃতা তোমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তুলে রেখ। জানোই তো আমি একটু শান্তিতে থাকতে ভালবাসি। বিশেষ করে খাবার সময়। আগেকার দিনে স্ত্রী বা মায়েরা বাড়ির পুরুষমানুষ খেতে বসলে এটা খাও ওটা খাও বলে সাধ্যসাধনা করতেন। এখন যাতে না খায় তারই চেষ্টা করা হয়।'

'কেন, তোমার যা ইচ্ছে খাও না বারণ করছে কে?'

'আর খেয়ে কাজ নেই, যথেষ্ট হয়েছে।'

শব্দ করে চেয়ারটা ঠেলে সুবীর উঠে পড়ে।

আজ কটকে ফেরার পথে প্রচণ্ড জ্যামে ঝাড়া দু-দুটি ঘণ্টা আটকে গেলাম। দৈনিক কটক ভুবনেশ্বর যাতায়াতের এটি গতানুগতিক বিপর্যয়। এই এক্সপ্রেস-ওয়েটি শুধু দুটি শহরের যোগসূত্র নয় ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে পূর্বে যাবার হাইওয়েগুলির সঙ্গে যুক্ত। এর ওপরে চলে দূর পাল্লার মালবোঝাই রাক্ষুসে আকারের ট্রাক, এক রাজ্যের কারখানা থেকে অন্য রাজ্যে পাঠানো বিভিন্ন আকৃতির গাড়ি ও তার চ্যাসিস, রাজ্যের ভেতর সমস্ত জেলাগামী বাস ইত্যাদি ভারি যানবাহন। এরই পাশাপাশি দুটি শহরের ও মধ্যবর্তী গ্রামগুলির নিয়মিত যাত্রীদের ক্যান্টার, মোটরগাড়ি, দু'চাকার বাহন। অথচ রাস্তাটির প্রস্থ মোটে দুটি সারি গাড়ি যাওয়ার উপযোগী। এদিকের দুদিকে জমি আবার অনেক জায়গাতেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীনালা পুকুর ক্ষেত মাঠে। দুর্ঘটনার সংখ্যা কেন আরও বেশি হয় না সেটাই আশ্চর্য।

আজ বিকেলে কুয়াখাই নদীর ব্রীজটি পেরোবার পরই একটি মালবোঝাই ট্রাক একখানা মারুতি ভ্যানকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে উল্টোদিক থেকে ঠিক সমান হাই স্পিডএ আসা একটি বাসের একেবারে সামনে। তিনটেতেই ব্রেক লাগতে লাগতে মারুতি ধাক্কা মারল ট্রাককে বাঁ পাশে পেছন থেকে এবং বাস ট্রাকের ওপর এসে পড়ল সামনে ডানদিক থেকে। ফলাফল সহজেই অনুমেয়, তবে কেউমরেটরে নি। খবর পেয়ে পুলিশ এসে জখম মানুষ, বাস ও ট্রাক সরাতে সরাতে ইতিমধ্যে রাস্তায় আড়াআড়ি চার চারটে লাইন যানবাহন সারি দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা যখন রণক্ষেত্রে পৌঁছালাম তখন মারুতি ট্রাক বাস ইত্যাদি সরানোর পালা সবে শেষ। উত্তর অর্থাৎ কটকের দিক থেকে

আসা গাড়ির ড্রাইভার আরোহী বনাম দক্ষিণ অর্থাৎ ভুবনেশ্বরের দিক থেকে যাওয়া গাড়ির ড্রাইভার আরোহী দুটি বিরোধী পক্ষের জুলুম ঝগড়া উচ্চগ্রামে চালু। কে, কীভাবে, কেন এবং কাকে রাস্তা ছাড়বে। গরমে গাড়ির ভেতর বসা শক্ত। ভাগ্যিস রাস্তার একধারে থেমেছে আমাদের গাড়িটা। দরজাটা খুলে দিই। আশেপাশে অন্যান্য অনেক যাত্রীর মত সুবীরও তার দিকের দরজা খুলে নেমে বাইরে দাঁড়ায়।

'নমস্কার, স্যার, ভাল আছেন?' আধো অন্ধকারে একটি ভারিক্কি মাঝবয়সী সফরি স্যুট পরা মূর্তি।

'মিঃ বাজোরিয়া না কি? নমস্কার। তারপর কাজ কারবার কেমন চলছে?'

'আপনার দয়ায় স্যার একরকম চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'আর বলেন কেন, বাড়ি ফিরছি, মানে কটক। ভুবনেশ্বরে এখনো কোয়ার্টার পাই নি।'

'তাহলে তো স্যার ভারি কষ্ট। আপনাদের মত সিনিয়র অফিসার যদি বাড়ি না পান তাহলে সরকারের কাজ চলবে কী করে?

'সরকারের কাজ ঠিকই চলে। আপনি পুরনো লোক জানেন তো সব।'

'আজ বিকেলে সেক্রেটারিয়েটে জোর গুজব ট্রান্সফারের একটা চেন্ হচ্ছে। আপনার কোন চেঞ্জ আছে না কি?'

'মনে হয় না। এখানে তো ছ'মাসও হয় নি।'

'কিন্তু স্যার আপনার পক্ষে এটা বড্ড ছোট ডিপার্টমেণ্ট, ফিনান্স, ইন্ডাস্ট্রি, সব ইম্পর্টেণ্ট জায়গায় আপনার চেয়ে কত জুনিয়র অফিসার সব বসে আছেন।

'আই অ্যাম পারফেক্টলি হ্যাপি হিয়ার।'

'আপনি স্যার বঙ্গালি, জেণ্টেলম্যান, তাই ওকথা বলছেন। আমাদের কিন্তু চোখে লাগে। সবই তো স্যার বুঝতে পারি, দিন দিন কী অবস্থা হচ্ছে। যতসব ফালতু পোস্ট আর ফ্রিকোয়েণ্ট ট্রান্সফার আউট সাইডারদের জন্য। যেমন ধরুন এই রেভিনিউ—ল্যাণ্ড রিফর্মস্ কমিশনার, সেটলমেণ্ট কমিশনার, কনসোলিডেশান কমিশনার, ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস, সেক্রেটারি বোর্ড অফ রেভিনিউ প্লাস মেম্বার বোর্ড তো ওপরে আছেনই—সব জায়গাতেই প্রায় বাইরের লোক বা তারা যাদের ভুবনেশ্বরে সমান র‍্যাংকের পাওয়ারফুল পোস্টে রাখার ইচ্ছে নেই। বেশির ভাগ দিন গোনে কত তাড়াতাড়ি ভুবনেশ্বর ফিরে যাবে। তাদের বাড়ি নেই বা থাকলেও ভুবনেশ্বরের তুলনায় থার্ড রেট। এই ভাবে কি স্যার কাজকর্ম হয়? এরপরে তো সান্ অফ দ্য সয়েল ছাড়া আর সবাই সেকেণ্ডক্লাস সিটিজেন হয়ে যাবে।'

'লেট আস্ নট অ্যান্টিসিপেট থিংস। তারপর এখন কি বাড়ি ফিরছেন?'

সুবীরের গলা ঠাণ্ডা, যেন তার গায়েই লাগেনি খোঁচাটা। হি ইজ ডিটার-

মিন্ড টু রিমেন্ কারেক্ট। প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করবে না।

'হ্যাঁ স্যার। আমাদেরও প্রায় ডেলি কটক ভুবনেশ্বর করতে হয়। কটকই তো কাজ কারবারের সেণ্টার, আমরা ওখানে দু'জেনারেশান ধরে সেটলড্। আমার ঠাকুর্দার বাবা এসেছিলেন নাইন্টিন্থ সেনচুরিতে, হান্ড্রেড ইয়ারস প্রায় হতে চলল। তখন কটকই সব। এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশান একজায়গায়, আরেক জায়গায় কারবার। সয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।'

'সে তো সওয়াতেই হবে, চেঞ্জ ইজ দ্য ল অফ লাইফ। তা নতুন ব্যবসা কিছু সুরু করলেন না কি?'

'না করে তো স্যার উপায় নেই। ব্যবসার নিয়ম তো জানেন, হয় বাড়বে নাহয় কমবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কখনো থাকবে না। তবে আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা জোয়ান, তারা নয়া বিজিনেস করছে।'

'সে তো ভাল কথা, কোথায় করছে?'

'বড়া লেড়কা তো পাঁচ সাল হল হিমাচলে কারবার স্টার্ট করে দিয়েছে। ভালই করছে। ছোটা এম. পি.তে লাস্ট ইয়ার গেল, ওখানেই কাজ করার প্ল্যান।'

'সে কি, আপনারা ওড়িশাতে আর ইনভেস্ট করছেন না?'

'মাপ করবেন স্যার, আর পারব না। মঞ্চেশ্বরে ফ্যাক্টরি ক্লোজডাউন করতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। পুরনো যা যা বাপ দাদা সুরু করেছিলেন আমি ব্যস সেটুকু চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে কী করে কী করব বলুন? যেমন পলিটিক্স, তেমন ব্যুরোক্রেসি—স্যার প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার অনেক কলিগ মিনিস্টারদেরও ওপর দিয়ে যান—তার ওপর লেবারারদের এফিসিয়েন্সির যা লেভেল। সবাইকে খুশি করে প্রডাক্টের দাম যা পড়ে তাতে দুনিয়াতে কোথাও কম্পিট করা যায় না। স্যার, সেদিন আর নেই, এখন সব জায়গায় কম্পিটিশান।'

'রাস্তা বোধহয় ক্লিয়ার হ'ল। আচ্ছা, মিঃ বাজোরিয়া আবার দেখা হবে।'

অর্থাৎ এই বিপজ্জনক বিষয়ে আর কথাবার্তা নয়।

'কোন দরকার হলে স্যার সেবা করবার মওকা দিবেন।'

'সে দেখা যাবে···আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার···।'

জ্যামএর সামনের রোয়ে বোধহয় গাড়ি চলতে সুরু করেছে, একে একে ইঞ্জিন স্টার্ট করার শব্দ, হেডলাইটের আলো। আমাদের পালা আসতে এখনো দেরি। সুবীর ফিরে আসে। অন্ধকারও বুঝতে পারি তার মুখ থমথমে। ভেতরে ব'সে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে,

'তোমার চাকরির জন্য আমরা চিরটা কাল এইখানে আটকা পড়ে থাকব। স্টাক ফর এভার ইন দিস স্টেট।'

মনে করিয়ে দিতে পারতাম সুবীরের চাকরির জন্যই আমাদের আদৌ এ রাজ্যে আসা এবং থাকা। আমার কাজটা তার পরের ঘটনা, অর্থাৎ কারণ নয়, ফল মাত্র। কিন্তু কিছুই বলি না। বিবাহের মন্ত সুবিধা হল সারাজীবন একজন রেডিমেড স্কেপ গোট পাওয়া যায় যার ওপর নিজের সব হতাশার বোঝা চাপিয়ে বেচারী আমি-র নিষ্কৃতি। ভুলে যাই আমরা প্রত্যেকে ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তে আবদ্ধ, তার সর্বাঙ্গীণ দায় আমাদের প্রত্যেকের ওপরে বর্তায়। ব্যক্তি তো নিঃসঙ্গ দ্বীপ নয়, কম বেশি সর্বদা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত যার থেকে তার পরিচয়, তার সত্তা। সুবীর নিজেকে একান্তভাবে আই. এ. এস. গোষ্ঠীর একজন মনে করে, চাকরি তার ব্যক্তিসত্তা জুড়ে আছে। ওড়িশার বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙালিত্ব একটা বিরাট প্রতিবন্ধ হওয়ায় তার মনে সর্বদা ক্ষোভ। সে বাঙালি, প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স ফার্স্ট ক্লাস না হয়ে ওড়িয়া র‍্যাভেনশ কলেজ—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল সায়ান্স বা ইতিহাসের ছাত্র হল না কেন, তাহলে যে ওড়িশা আই. এ. এস. ক্যাডারের চূড়ায় খাঁটি কুলীন হয়ে বসতে পারত আর তার উচ্চাশার রাস্তা এই রকম সরু বিপজ্জনক স্টেট হাইওয়ে না হয়ে বিশাল চওড়া ও নিরাপদ ন্যাশনাল হাইওয়ে হতে পারত।

আমি বাবা সাধারণ মেয়ে, আই মীন প্রায় সাধারণ। উচ্চাশার ধার ধারি না। কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধের মাথাব্যথা নেই। আমার ওড়িয়া সহকর্মিণীরা ইউ. জি. সি. টিচার ফেলোশিপে তিন বছর কাটিয়ে আরেক বছর চাইলেই পেয়েছে। আমি কোন অজ্ঞাত কারণে পাইনি। ওড়িয়া ভাষায় পাশ সার্টিফিকেট না দেখাতে পারা পর্যন্ত আমাকে ওড়িয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইন্টারভিউতে ডাকেনি। তা সত্ত্বেও ওড়িয়া হওয়ার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না। এইতো কিছুদিন আগে ফিলজফির সুমিতা মিশ্র স্টাফরুমে হাতমুখ নেড়ে গল্প করছিল ফেমাস ফিল্ম বলে সে ছেলেপুলে নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' দেখতে গিয়েছিল। হলে বসে বসে দেখে কি,

'গোটিএ স্ত্রীলোকঙ্ক ঝুলুচি তো ঝুলুচি, ঝুলুচি তো ঝুলুচি। কী বোরিং।'

মাধবীর সেই দেশবিদেশে সমাদৃত দোলনায় দোলা দৃশ্যটির অপরূপ ওড়িয়া মূল্যায়নে আমার একটিই প্রতিক্রিয়া, ভাগ্যিস ওড়িয়া হয়ে জন্মাই নি। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কিছু না জানলেও বাঙালি জীবনচর্চা তো বিসর্জন দিইনি। তাই সতী যখন শক্ত মুখে খবর দিল সে স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য মন্ত্র নিয়েছে এবং মাছ ছোঁয় না, কড়া নিরামিশাষী তখন রীতিমত অস্বস্তি লেগেছিল।

সধবার স্বামীসুখের প্রতীক মাছ খাওয়া, নিরামিশ বিধবার কৃচ্ছ্রসাধনের অঙ্গ।

আপাতদৃষ্টিতে সবই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। কিন্তু এই রকম আজন্ম পরিচিত সহস্র তুচ্ছতাই আমাদের সত্তার আশ্রয় নয় কি?

বাড়ি ফিরে শুনি ভুবনেশ্বর থেকে সুমনা মানে আই. এ. এস. ওয়াইভ্স অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারি সুমনা মিত্র টেলিফোন করেছিল, নম্বর দিয়ে রেখেছে, ফিরে এলেই যেন ফোন করি। করলাম। অ্যাসোসিয়েশানের মিটিং—অর্থাৎ হাই টি, ভালমন্দ খাওয়া—আগামীকাল বুধবার বেলা সাড়ে চারটে, মিসেস স্বর্ণ হোতার বাড়ি। কো-হোস্টেস মিসেস নীতা পাড়ি, মিসেস ভাটিয়া চাট রান্না বা বানানোর ডেমস্ট্রেশান দেবেন, যেন অতি অবশ্যই যাই। 'না' করতে যাচ্ছিলাম, সুবীর ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বলতে বলল। যাবার চেষ্টা করব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছেড়ে দিলাম।

'তোমাকে তো ইন এনি কেস সন্ধে অব্দি থাকতেই হবে, সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে ভাল খেয়ে সময়টা কাটাও না কেন?'

উত্তর দিই না। কাকে বোঝাব কলেজের জামা কাপড়ে পরীক্ষার ডিউটি বা লেকচার সেরে, ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে এক ঘর বিশ্রামে-তাজা, নিখুঁত প্রসাধন ও দামি শাড়ি ব্লাউজে টিপটপ ঘরণী স্ত্রীদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে আমার গায়ে জ্বর আসে। তার ওপর চাট বানানো অর্থাৎ একটা জলখাবারের জন্য এত ফ্যাচাং কে করবে।

সত্যি একাত্ম হওয়ার মত আমার কোন গোষ্ঠী নেই।

আজ এই সিজনে পরীক্ষার শেষ দিন। এবেলা ডিউটিটা হয়ে গেলে—বাব্বা, যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে। গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে চারিদিক তাকিয়ে দেখি শুকনো মাঠ প্রচণ্ড রোদে ঝা ঝা করছে, দূরে গোটাকতক বড় বড় গাছ কোনক্রমে ঝিমোচ্ছে। গরমও এবার একখানা পড়েছে বটে। কোয়েশ্চেন পেপার নিতে গিয়ে দেখি পরীক্ষার ইনচার্জ ফিজিক্সের ডঃ নারায়ণ মিশ্র গম্ভীর মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন,

'এই যে ম্যাডাম, আপনি এসে গেছেন। দেখুন না কী বিপদেই পড়েছি।'

'নমস্কার স্যার, নমস্কার ম্যাডাম, কী হ'ল',—পিছন ফিরে দেখি বিনোদিনীও হাজির।

'আরে নমস্কার, ডিউটি নাকি?' জিজ্ঞাসা করি।

'আমাদের দুজনের তো আজ একই সঙ্গে, ৩৬ নম্বর রুম-এ, লিস্ট দেখেননি?'

'নিজের নামটা খালি দেখেছি', হেসে বলি।

'ওটা পাল্টে ৩৬ আর ৩৭ হয়েছে, চিত্রা ম্যাডামের ৩৬ আর বিনোদিনী ম্যাডামের ৩৭।' ডঃ মিশ্র গোমড়া মুখে খবর দেন।

'কেন কেন, আমরা দুজনে একসঙ্গে তো ভালই ছিলাম', সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীর প্রতিবাদ।

'সেই কথাই তো ম্যাডাম বলছিলাম যে বিপদে পড়েছি। আপনাদের দু'

জনকে দিয়েছিলাম রুম নাম্বার ৩৬, বিষ্ণুপ্রসাদ পাড়ি আর সৌরমোহন নায়েককে দেওয়া হয়েছিল ৩৭। কাল এরা দুজনে এসে খুব রাগারাগি, তারা কখনো একই ঘরে ডিউটি করে না, আমি কি জানি না তাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ। আচ্ছা আপনারাই বলুন, আমরা এখানে সবাই কলিগস, এর বাইরে কার সঙ্গে কার ভাব, কার ঝগড়া কী করে খবর রাখব আর কেনই বা রাখব? দিস ইজ অফিসিয়েল ডিউটি অ্যাণ্ড উই আর অল ইন সার্ভিস। আপনারা ম্যাডাম একটু কো-অপারেট করুন। ৩৬ নম্বর চিত্রা ম্যাডাম আপনার ডিপার্টমেণ্টের বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে থাকুন আর বিনোদিনী ম্যাডাম পলসায়ান্সের সৌরমোহনের সঙ্গে ৩৭-এ। প্লিজ।' আমাদের এক এক প্যাকেট কোয়েশ্চেন পেপার ধরিয়ে দিতে দিতে ডঃ মিশ্র বলেন।

'অফ কোর্স, এ আর কি। তবে স্যার, ৩৬ আর ৩৭ রুম দুটো তো ছোট ছোট, একজন করে থাকলেই তো হয়, স্যারেদের দিয়ে দিন না এক একটা, তারা আলাদা থাকলেই তো হ'ল।' বিনোদিনী অতি ঝাণ্টু মেয়ে, আমিও সায় দিই।

'না, ম্যাডাম তা হয় না, জানেনই তো একা ইনভিজিলেটর রাখা যায় না, রেগুলেশান আছে, দু'জন করে থাকতেই হবে।' ডঃ মিশ্র কর্তব্যে অটল। বিনোদিনীও ছাড়বে না,

'তাহলে এক কাজ করুন স্যার, আমাদের দু' জনকে রিলিভার করে দিন। ঐ ঘরগুলোতে তো আমাদের বসারও জায়গা নেই, এই বয়সে তিন ঘণ্টা দাঁড়ানো স্যার, আপনিই বলুন।'

'এরা দুজন ইয়াংম্যান, একটু কষ্ট করবেন আর কি',—আমি যোগ করি। আমাদের নাছোড়বান্দা দেখে ডঃ মিশ্র কিন্তু কিন্তু করে শেষে রাজী হলেন।

ধন্যবাদ দিয়ে বিজয়গর্বে দু'জনে ঘর থেকে বেরোই। এক সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বিনোদিনী বলে,

'এই সব পুরুষগুলোর কাণ্ড দেখেছেন? যেমন ফাঁকিবাজ আর তেমনি কন্দীবাজ।'

'কী কাণ্ড?'

'ও, আপনি বোধহয় জানেন না আপনাদের ইংলিশের বিষ্ণুপ্রসাদ আর পল সায়ান্সের সৌর-র ব্যাপার?'

'না।'

'আর্টস ব্লক থেকে বড় রাস্তায় যেতে ওদের দুজনের পাশাপাশি কোয়ার্টার। একই বাউণ্ডারি ওয়াল-এর একদিকে আপনাদের বিষ্ণুপ্রসাদ অ্যাসবেসটসের ছাদ দিয়ে একটা ঘর করেছে—ওখানে ছেলেমেয়েদের টিউশান নেয়, ও টিউশান এক্সপার্ট জানেন তো?—আর দেওয়ালের ওপাশে সৌর একটা কাউশেড তুলে

জার্সি গরু রেখেছে, দুধ বেচে লাল হচ্ছে। দুজনের নামেই নাকি ভিজিলেন্সে নালিশ গেছে। কে করেছে ভগবান জানেন। ওড়িশা, ম্যাডাম, পিটিশানবাজির স্বর্গ। বিষ্ণুপ্রসাদ আর সৌর দুজনে দুজনকে সমানে সন্দেহ করে। প্রায়ই কথা কাটাকাটি, একদিন তুমুল ঝগড়া, হাতাহাতি, শেষমেষ কথাবার্তা বন্ধ। কলেজসুদ্ধ সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করে, আপনি জানতেন না?'

'না', মৃদু হেসে বলি। অবশ্য ডিপার্টমেণ্টে বিষ্ণুপ্রসাদকে নিয়ে অন্যদের হাসিঠাট্টা করতে দেখেছি, ও নাকি ক্লাসটাসস নেয় না, প্রথমেই বলে দেয় অনার্স পড়ানোতে কোন ইণ্টারেস্ট নেই, ওকে যেন কমার্সটমার্সের জেনারেল ইংলিশ দেওয়া হয়। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ডি পি আই অধ্যাপকদের দায়িত্ব এবং কাজকর্ম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে লেসেনপ্ল্যান ও প্রোগ্রেস রেজিস্টার নামে কিছু নিছক পেপারওয়ার্ক সুরু করেছিলেন। অ্যাকাডেমিক সেশানের আরম্ভে একটি রেজিস্টারে প্রত্যেকটি ক্লাসে কে কি কতটা করে পড়াবে, তার বক্তৃতার নম্বর দিয়ে দিয়ে একদিকে যোজনা এবং মুখোমুখি পৃষ্ঠায় বাস্তবে কতটা করে পড়ানো হ'ল এবং যদি কোন ক্লাসে হ'ল না তার কৈফিয়ৎ লেখা হয়। আমাদের ডিপার্টমেণ্টে বিষ্ণুপ্রসাদের প্ল্যান এবং প্রোগ্রেস রেকর্ড সবচেয়ে নিখুঁত ও আপটুডেট, আমি নিজে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। পরিষ্কার সুন্দর হাতের লেখায় যেদিন যেটা তার পড়াবার প্ল্যান ছিল সেদিনই সেই কার্যটি সমাধা হয়েছে—একমাত্র ব্যতিক্রম যেসব দিন কলেজে কোন কারণে ক্লাস সাসপেণ্ডেড অথবা ওর দু'চারটে ক্যাজুয়েল লিভ্। অথচ ও নাকি আদৌ ক্লাসেই যায় না। ছেলেমেয়েরা নালিশ করে না কারণ তাদের বেশির ভাগকেই ও বাড়িতে পড়ায় এবং পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর পাওয়ায়। এর নেট রেজাল্ট হ'ল এই লেসেনপ্ল্যান ইত্যাদিতে সকলেরই প্রায় ঘেন্না ধরে গেছে।

বিনোদিনীর মুখে বিষ্ণুপ্রসাদেরই সঙ্গে সৌরমোহনের ঝগড়ার বিবরণে অবাক হই না, কোন মন্তব্যও করি না। এখানে এধরনের বিবাদ বিসংবাদ সব সময় চলে। দুদিন বাদে আবার হলায়গলায়। অনেকটা বাচ্চাদের আড়ি-ভাব সম্পর্কের মত। যে যার ঘরে যাই। একটু পরে বিষ্ণুপ্রসাদ আসে। ঘণ্টা পড়ে। ছেলেমেয়েদের কোয়েশ্চেন পেপার বিলিয়ে মিনিটদশেক অপেক্ষার পর দুজনে বিহিত কর্ম সুরু করি—প্রত্যেকটি ক্যানডিডেটের অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশান নম্বর, কলেজ আইডেনটিটি কার্ড ইত্যাদি চেক করে পরীক্ষার খাতায় সই করি, অ্যাটেনডেন্স শিটএ প্রত্যেকের রোলনম্বর, খাতার নম্বর ও সই নিই এবং অ্যাবসেন্টি স্টেটমেণ্ট তৈরি সেরে বিষ্ণুপ্রসাদকে বলি আমি স্টাফরুম-এ আছি, রিসিভার তো, দরকার হলে যেন ডাকে। পেঁচার মত মুখ করে রইল তো ভারি বয়ে গেল। বিনোদিনী ঠিক বলে, এই পুরুষরা এমন ফাঁকিবাজ, একটানা তিন ঘণ্টা ডিউটিতে পাওয়াই শক্ত, বিশেষ করে যারা আর্টস পড়ায় এবং বয়স কম।

আরম্ভ হবার আধঘণ্টা পরই 'এই আসছি' বলে ছু মারে তারপর সেই পরীক্ষা শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে পান চিবোতে চিবোতে হাজির হয়। দু চাকা বাহন যেন এদের পায়ের সঙ্গে সাঁটা। আর আমরা মেয়েরা ঠায় দাঁড়িয়ে, ক্যানডিডেট কেউ অ্যাবসেণ্ট থাকলে তার সিট্‌টায় একমাত্র মাঝেমাঝে পা-কে বিশ্রাম দিতে পারি। তিনঘণ্টা ধরে দারোয়ানি, কে কথা বলল, কে পাশে ঝুঁকে লিখছে, কে কার কাছ ঘেসে বসছে। এছাড়া হাজার বায়নাক্কা—এই জল, এই বাথরুম, তারওপর অ্যাডিশনাল পেপার, তার হিসেব, সুতো এবং সেসব বলে বলে সেলাই করানো। ঘণ্টা পড়লে একটা প্যাণ্ডোমোনিয়াম। খাতা কালেক্ট করে সিরিয়ালি সাজাও, তারপর ইনচার্জকে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি। আজ রিলিভার হয়ে খুব আরাম।

সায়ান্সের স্টাফরুমে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পাখার তলায় বসি। কিছুক্ষণ বাদে হেলতে দুলতে বিনোদিনীর প্রবেশ। আমরা দুজনেই হেসে ফেলি, মনে মনে একই চিন্তা, স্যারেদের ওপর একহাত নেওয়া হয়েছে। পাশে এসে বসে।

'বুঝলেন ম্যাডাম পুরুষজাতটাকে বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এমনিতেই তো প্রিভিলেজড সেক্স। অন্তত কাজকর্ম একটু করুক।'

'আপনি কি পুরো পুরুষজাতটার ওপরেই খাপ্পা, না কি শুধু এদের ওপর?' হেসে জিজ্ঞাসা করি।

'পুরো জাতটার ওপর। যেমন স্বার্থপর তেমনি অলস, খালি নিজের সুখটুকু জানে।'

'ওরকম সুইপিং জেনেরালাইজেশান কি করা ঠিক? অনেককে তো বাড়ির কাজেও যেতে হয়, এই তো ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়া, বাজার-দোকান। ভুবনেশ্বরে তো কোন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিসটেম নেই। স্ত্রীরা তো বেশির ভাগই বাড়িতে বাঁধা পড়ে থাকেন।'

'ও সব আর ক'বছর। ছেলেমেয়ে আজকাল ক'টা, তারপর প্রত্যেকেই তো সাইকেল-টাইকেল শিখে যায় ঝটপট। বাজার তো ভারি, মোটা খাবার সকলেরই গাঁ থেকে আসে, তরিতরকারি দুচারটে যা কেনে বৌয়ের কাছে তার দ্বিগুণ দাম বলে। বাজারেও দু'পয়সা হয়ে যায়।'

'নিজের পয়সা থেকে হাতসাফাই?' আমি হাসতে থাকি।

'পাছে বৌ বেশি চায়। যত কম দিয়ে পারা যায়। জাতটাই ওরকম, যতই লেখাপড়া শিখুক, বড় চাকরি করুক। বাইরে সভ্যভব্য ভান দেখাক, আ ম্যান অলওয়েজ রিমেন্‌স আ ব্রুট। নিজের সুখের বাইরে কিছু জানে না।'

'বাপ রে, আপনি তো দেখছি একেবারে যুদ্ধং দেহি, যাকে বলে মিলিট্যাণ্ট ফেমিনিস্ট।'

'কী করি বলুন, সারা জীবন তো এই যুদ্ধ করেই গেল, ঘরে এবং বাইরে।

একটা বেংগলি ফিল্ম এসেছিল কিছুদিন আগে, 'পরমা' দেখেছেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তবে এখানে নয় কলকাতায়।'

'দারুণ ফিল্ম না?'

সায় দিই। আমারও ভাল লেগেছিল 'পরমা', রাণীকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

'এই পরমা'র স্বামীটি হচ্ছে টিপিক্যাল ইণ্ডিয়ান মেল, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কী ভাল, চেহারা শিক্ষাদীক্ষা পরিবার চাকরি। অথচ লুক অ্যাট দি ওয়ে হি স্লিপস উইথ হিজ ওয়াইফ। অফিসের কথা বলতে বলতে, যেন বাথরুম করছে। নিজের সুখটি হয়ে গেল, ব্যস। ডোণ্ট ইউ থিংক দিস কাইণ্ড অফ সেলফিসনেস ইজ ভালগার? হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ! হিন্দু ম্যারেজ? এ বিয়ের মানে কি?'

বিনোদিনী হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে যায় যেন আমিই পরমার স্বামীর উকিল। তার পক্ষে সওয়ালজবাব করছিলাম, তার সব ইন অ্যাডিকোয়েসির সাফাই গাইছিলাম। ওকে শান্ত করার জন্য বলি,

'তা যা বলেছেন, মানে কোন কিছুরই নেই। অ্যাণ্ড দ্যাট সর্ট অফ হাজব্যাণ্ড ইজ আ বিট অফ আ পিগ্‌।'

'অথচ তার সঙ্গে পরমা-র সেই বৃষ্টিতে ভেজার সিনটা মনে করুন, ওখানে তো সেক্স নেই, কিন্তু কত স্যাটিসফাইং।'

সায় দিই, যদিও ওই দৃশ্যটা বর্ষার সময় কলকাতার কলেজের ছেলেমেয়েদের মেলামেশার একটা ঝলক বলে আমার কাছে লেগেছিল। পরমার বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা। একটু প্যাথেটিক। তবে তথাকথিত ভাল বিয়ে হওয়া মেয়েদের অতৃপ্তির হদিশ দিতে চেষ্টা করেছে। সেটাই বা ক'টা ফিল্ম করে?

'বাট বিনোদিনী, এখানে একটা আমার কোয়েশ্চেন আছে। আপনার মতে পুরুষজাতটাই আন স্যাটিসফ্যাক্টারি, ফাইন। কিন্তু পরমা-র প্রেমিকটিও তো পুরুষ। তাহলে তার ছোঁওয়াতেই ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠল কী করে, জাস্ট বিকজ সে পরপুরুষ অমনি পিড়িং পিড়িং করে সেতার বাজনা সুরু হয়ে গেল?'

বিনোদিনী কী একটা বলতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিয়ে বলে যাই,

'দেখুন বিয়েতে যে পুরুষ, বিয়ের বাইরেও সেই একই পুরুষ, স্নার অর লেটার হতাশা আসতে বাধ্য। ইন ফ্যাক্ট ফিল্মটাতেও ঠিক সেইটাই হল নাকি? যে কারণেই হোক না কেন ছোকরাটি বেপাত্তা হয়ে গেল কিন্তু পরমার সর্বনাশটি করে। আপনার নিশ্চয় মনে আছে তার সেই ম্যাগাজিনটি পরমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় পাঠানো? যেখানে তার তোলা পরমার হাফন্যুড ছবি ছাপা হয়েছিল? এমন কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত যে আমাদের সমাজে পরিবারে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে

সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ফল কী হ'ল? পরমা একলা, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রইল।'

'কিন্তু ম্যাডাম ছোকরাটি ইনটেনশানালি ক্ষতি করতে চায় নি, অনেকদিন ফরেনে ছিল তো কাজেই আমাদের হিন্দু ফ্যামিলির—'

'চালচলন সংস্কার, নারীর সতীত্বের ওপর জোর, সব ভুলে গেছে, তাই তো? ওসব বিদেশ স্বদেশের তফাৎ অনেক বাড়ানো। অ্যাডাল্‌ট্রি ইজ অ্যাডাল্‌ট্রি এভরিহোয়ার ইন দি ওয়ার্লড। পারমিসিভ সোসাইটি-ফোসাইটি ছেলেদের আরও সুবিধা এবং আরও কম দায়িত্ব নেবার ফন্দীবাজি। মেয়েদের কোন লাভ নেই, বিশেষ করে বিবাহিতা স্ত্রীর।'

'তাহলে আপনি কি বলেন বিয়ের বাইরে মেয়েদের পা বাড়ানোই পাপ?'

বিনোদিনী যেমন হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ শান্ত গম্ভীর হয়ে যায়।

'অফ কোর্স নট। আমি পাপপুণ্যের কথা বলছিই না। অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রেমের তুলনা নেই। আমার কথা হ'ল তার জন্য কাকে কতখানি মূল্য দিতে হয়, কতটা ঝুঁকি নেওয়া পোষায়! পুরুষ জাতটার যদি গোড়াতেই গলদ তাহলে পরমা-র পরম কোথায় পাওয়া যায়? বা আদৌ পাওয়া সম্ভব কি? দেখুন আমার তো মনে হয় সেই আদিকালের রাধাকেষ্ট থেকে সুরু করে পরমা পর্যন্ত এধরনের নারীপুরুষ সম্পর্ক হাইলি রোমান্টিসাইজড, বাস্তবে সব সম্পর্কই শেষে কানা গলি।'

'আপনি তো দেখছি ম্যাডাম একজন রিয়েল সিনিক। চলুন, কফি খাওয়া যাক।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বিনোদিনী।

'চলুন।' আমিও উঠি।

দুজনে বটানির ল্যাব-এর দিকে হাঁটা লাগাই। ওখানকার পিয়ন বংশী এ কলেজে সবচেয়ে ভাল চা-কফি বানায়।

আজ ক্লোজিং ডে। প্রথমে স্টাফ কাউন্সিল, তারপর লাঞ্চ। অ্যানুয়েল পরীক্ষার ফলাফল আলোচনা করে পাশফেলের নিষ্পত্তি হচ্ছে এজেণ্ডা। ট্যাবুলেটাররা বিশাল রেজিস্টার ধরে গম্ভীর মুখে প্রথম সারিতে বসে, যার যখন ডাক আসছে উঠে গিয়ে প্রিন্সিপালের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন। অন্য কারো কিছু মাথাব্যথা নেই, সবাই রিল্যাক্সড, ছুটির মেজাজে কারণ পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা যত কম নম্বরই পেয়ে থাক না কেন অনেক এবং বৃথা বাকবিতণ্ডার পর প্রত্যেক বছর সবাই প্রমোশন পায়, কারণ রি-অ্যাডমিশান দেওয়া সম্ভব নয়, সিটএর চাহিদা প্রচণ্ড। তাই হল এবারও, একমাত্র যারা হাফইয়ার্লি ও অ্যানুয়েল কোন পরীক্ষাতেই বসে নি তারা ছাড়া সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে

গেল। সত্যি, যারা খাতা না দেখে নম্বর দেয় তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

এজেণ্ডা শেষ হওয়ার পর ইকনমিক্সের রীডার ডক্টর শকুন্তলা মিশ্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে একটা অভিযোগ আনলেন—কলেজে অধিকাংশ অফিসিয়েল কম্যুনিকেশান ও নোটিসে মুষ্টিমেয় যে ক'জন মহিলা পি. এইচ-ডি আছেন তাঁদের নামের আগে সম্মানসূচক 'ডক্টর' লাগানো হয় না, তাঁরা 'শ্রীমতী' রয়ে যান, পুরুষদের বেলায় কিন্তু কখনোই এটা হয় না, তাঁদের পি. এইচ-ডি-রা সর্বদা সর্বত্র 'ডক্টর'। এমন কি কলেজ ক্যালেণ্ডারেও এই ভুলটি দিব্যি বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসছে, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের মনেও এই ধারণাটি বদ্ধমূল করে দেওয়া যে ম্যাডামদের কোয়ালিফিকেশান স্যারেদের চেয়ে কম।

প্রিন্সিপাল ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, বিভিন্ন কমিটির ইনচার্জকে ভুল সংশোধন করতে অনুরোধ জানালেন, অফিসেও অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মিটিং ভাঙার পর দেখি ডক্টর মিশ্র হিস্ট্রির রবি সামল আর কেমিস্ট্রির ডঃ বিদ্যুৎ পারির সঙ্গে উত্তেজিত গলায় কথা বলছেন,

'ব্যবস্থা আর কী নেবেন! অফিসে, এগজামিনেশান সেকশানে হাজার বার রাগারাগি করেছি। শুধু আমি নই, ওড়িয়ার ডঃ মিনতি রথ, ম্যাথমেটিক্সের ডঃ করুণা ত্রিপাঠী, কেমিস্ট্রির ডঃ অনসূয়া পতি, আমরা সবাই বলেছি। কী লাভ? সেই এক গাল হেসে বলবে, 'ভুল হেই গেলা, আচ্ছা হউক, আউ কেবে হব নি।' তারপর আবার সেই শ্রীমতী, আবার রাগারাগি, আবার এক উত্তর।'

রবি সামন্ত আস্তে আস্তে বললেন, 'ওরা অত ডক্টরটক্টর বোঝে না।'

'খুব বোঝে, সবাই বোঝে', দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন মহিলা। 'শুধু তো কেরানিরা নয় আমাদের কলিগরা কী? আমি মনে করুন সেমিনারের চার্জে, আর এই তো লাস্ট সেমিনারে গেস্ট স্পীকার র‍্যাভেনশ' কলেজের প্রফেসর রাধানাথ মিশ্রর কাছে আমার নিজের হেড আমাকে ইনট্রোডিউস করলেন সেই 'মিসেস শকুন্তলা মিশ্র' হিসেবে। অথচ এই সেদিনের 'মাগর' না 'মগধ' কোন ইউনিভার্সিটির পি. এইচ-ডি হরি, আই মীন হরিহর পট্টনায়েকের বেলায় 'ডক্টর' যোগ করতে ভুল হ'ল না। এই তো আমাদের সম্মান।'

ডঃ সামল হেসে বললেন,

'আপনি অযথা রাগছেন ম্যাডাম। বিয়েটা পি. এইচ-ডির চেয়ে বড় জিনিস। 'শ্রীমতী' ডেকে আপনাকে সম্মানই জানানো হয়।'

'আপনাদের সঙ্গে কথা বলারও মানে হয় না।'

থমথমে মুখ করে ভদ্রমহিলা গট্‌গট্ করে এগিয়ে যান।

বেচারা। খুব খারাপ লাগে। সংসার ছেলেমেয়ে চাকরি সব সামলে এত পরিশ্রম করে একটা ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথচ তার কোন সম্মান নেই। এই তো ওড়িয়া উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মূল্যবোধ।

দেহের বাইরে মেয়েদের কোন ভূমিকার সমাদর তো দূরের কথা স্বীকৃতি পর্যন্ত এরা দিতে পারে না, দিতে চায় না। অবশ্য সংস্কৃতে 'শ্রীমতী' কথাটার মানে আদৌ 'বিবাহিতা' কি না আমার জানা নেই। এখানে কার আছে? কী হবে মাথা ঘামিয়ে।

আজ ছুটি হবে, জোর করে মনটা অন্যদিকে নিয়ে যাই। আর্টস ব্লকের হলএ যথারিতি 'ফিষ্টি' অর্থাৎ খাওয়ার আয়োজন। পুরো স্টাফ হাজির। বিনোদিনী খুব সেজেছে, ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করছে, সে তো কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন। ভারি সিল্কের শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে হাঁকডাক, পরিবেশনে হাত লাগানো সবই করে বেড়াচ্ছে। আমিষভোজীদের পংক্তিতে বসি। সতী দূরে নিরামিষের সারিতে। খাওয়া শেষে হল থেকে বেরুলে আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল,

'ম্যাডাম, আমি একটা ডিসিশান নিয়েছি।'

'কি ডিসিশান?'

'আলাদা থাকব। আপনি ঠিকই সাজেশান দিয়েছিলেন। নয়াপল্লীতে যে জমিটা আছে সেখানে বাড়ি করব। লোনএর জন্য ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে ফর্ম আনতে হবে, আমি অফিসে সব খোঁজ নিয়েছি। একজন আর্কিটেক্টও লাগিয়েছি বাড়ির প্ল্যান তৈরি করার জন্য। আপনি একটু হেল্প করবেন।'

'অফ কোর্স। ফর্ম যোগাড় করা তো? সে হয়ে যাবে।'

পরদিনই সুবীরের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে টেলিফোন করে ফিনান্স থেকে ফর্ম নিয়ে ড্রাইভারের হাতে আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলি। ভদ্রলোক প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন কারণ এখানে অন্যান্য আই. এ. এস, বা যে কোন উচ্চপদের পুরুষের স্ত্রীদের মত আমি অফিসে সরাসরি টেলিফোন করে স্বামীর অধঃস্তনদের ওপর কর্তাতি করি না। ড্রাইভারের হাতেই ফর্ম সতীকে পৌঁছবার বন্দোবস্তও করে দিলাম। সতী সৎপথে, নিজের উপার্জনে, নিজের ক্ষমতায় মাথা উঁচু করে থাকলে ওর ছেলেটারও মনে হয় ভাল হবে। বাবা-মার মধ্যে একজনকে তো অন্তত শ্রদ্ধার যোগ্য পাবে। সতী টেলিফোনে আমাকে খবর দেয়, বাড়ির প্ল্যান হয়ে গেছে। লোন অ্যাপ্লিকেশান নিয়ম অনুযায়ী করে দিয়েছে। কাকে কি ধরাকরা করতে হবে তাও খোঁজ নিয়েছে। লেগে যেতে উৎসাহ দিই। মাথার ওপর ছাদটা নিজের চেষ্টায় তোলা তো নিশ্চয় গৌরবের।

আমি কি কখনো এরকম একটি ছাদ তুলতে পারব? আমার কী টাকা আছে

না আছে তার হিসেবই বা কই। সবই তো জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে। সবচেয়ে বড় কথা টাকা যদিই বা হিসেবটিসেব করে সুবীরের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটা সমঝোতায় আসি কিন্তু আমার মূল সমস্যাটা তো সতীর চেয়ে আলাদা—আমি কোথায় ছাদ তুলব? আমার পায়ের তলায় মাটি কোথায়? কলকাতায়? সেখানকার সঙ্গে তো সম্পর্ক প্রায় চুকে গেছে। ভুবনেশ্বরে? এখানে তো চিরকাল বহিরাগত হয়েই রইলাম। তাহলে কি শেষেমেশ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে? টাস্কযমুনার অজস্র কলোনির একটিতে আরও একটি ছিন্নমূল যুক্ত হবে? সেখানে আমার কিছু করার মানে হয় না, সুবীর তো একটা করেইছে। তাছাড়া দিল্লিকে কোনদিনই আপনার বলে মনে করতে পারি না।

ক'দিন বাদে সকালে বিনোদিনীর ফোন।

'কী ব্যাপার?'

'আপনাকে ডিসটার্ব করলাম, ভেরি সরি, মনে কিছু করবেন না।'

'না, না, মনে করবার কী আছে। এখন ক্লাস নেই, দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কেউ ফোট-টোন করলে ভালই লাগে। তা আপনি কি ভুবনেশ্বর থেকে বলছেন?'

'না, না, আমি কটক থেকেই বলছি। এখানে আমার বাপের বাড়ি তো। আপনার ওখানে একটু যাব ভাবছিলাম, আপনি কি ফ্রি আছেন?'

এ আবার কি! কলেজের কেউ সাধারণত আমার বাড়িতে আসে না, কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। অন্তরঙ্গতা নেই, কর্মক্ষেত্রই সবরকম আদানপ্রদানের যোগসূত্র। তবে কেউ আসতে চাইলে তো আর 'না' করা যায় না।

'হ্যাঁ, আজকে ফ্রি। আসুন না।'

'তাহলে আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

'বেশ।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ভাবতে বসি বিনোদিনীর আসার উদ্দেশ্য কী। নেহাৎ বন্ধুত্ব? হঠাৎ আমারই সঙ্গে কেন? সেদিনের আলাপ-সালাপ ঘনিষ্টতার ভূমিকা মনে করছে নাকি? একটু বিরক্ত লাগল। সতীর সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশি, পাকেচক্রে আমি তারই দুঃখের ভাগীদার। বিনোদিনীর সেই আদার ওম্যান-এর ভূমিকা, ঘরভাঙানী পরজ্ঞালানী হিন্দি সিনেমার ভ্যাম্প। ঠিক করলাম মুখের ওপর না হোক ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেব তার কীর্তিকলাপ আমার জানতে বাকি নেই।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিনোদিনী হাজির। পরনে জংলা ছাপা সবুজ ফিনফিনে শিফন সাদা ব্লাউজের সঙ্গে যে আহামরি মানিয়েছে তা নয় তবে গাঢ় রঙের পাতলা শাড়ির তলায় হাল্কা রঙের কনট্রাস্ট ব্লাউজে গা-টা খুবই স্পষ্ট। আজকে

আবার এখানকার মহিলাদের ঢংএ আঁচল বাঁ দিকের কাঁধ থেকে ডান দিকের কাঁধে এনে হাত ও গলা ঢেকে বুকের ওপর ফেলা। মেজাজটা আরও খিঁচড়ে গেল, আহা মাথায় ঘোমটা এদিকে যেন ইয়েতে কাপড় নেই। বাইরের ঘরে বসাই। ঠাণ্ডা সরবৎ দিতে বলি। বাগানে প্রচুর আম হয়েছে, জাত ভাল নয় — কেন যে এরা এত রদ্দি কোয়ালিটির ফলফুলুড়ি লাগায় কে জানে। কিছু সেদ্ধ করে ফ্রিজে রেখেছি। চিনি দিয়ে সরবৎ হিসেবে ভালই লাগে।

'তারপর ? কী খবর ? হঠাৎ কী মনে করে ?'

'প্লাস টু অলটারনেটিভ ইংলিশ খাতা আপনি দেখেছেন তাই না ? আমার মেয়ে দিয়েছে তো।'

'হ্যাঁ, অল্‌টি আমি দেখেছ। কেন মার্কস নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে না কি ?'

'না, না, সে সব কিছু নয়। মেয়ে তেমন ভাল করে নি, তাই আপনার পরামর্শ চাইছিলাম। খাতা তো নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে। কী প্রবলেম একটু কাইণ্ডলি দেখবেন ? আসলে ইংলিশে ও ভাল, কনভেণ্টে পড়েছে, আই সি এস ই-তে ভাল নম্বর পেয়েছিল, তাই এবারে কেন এরকম করল, ছেলেমানুষ তো তাই একটু আপসেট…'

'না, না, এতে মনে করবার কী আছে। আসলে কী হয় জানেন অলটারনেটিভ ইংলিশ নেয় মডার্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজের বদলে, অর্থাৎ বেশির ভাগই যারা ইংলিশে ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজের চেয়ে বেশি ভাল তারা। এখন এরা তো প্রায় সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া। কলেজের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ওড়িয়া মিডিয়াম থেকে। এখানে দু' স্কুল একসঙ্গে হয়। অনেক সময় তাদের প্রতি তাচ্ছিল্যে ইংরিজি পড়াটা নেগলেক্ট করে। তাছাড়া স্টেট কাউন্সিলে কোয়েশ্চেনের নেচার সম্পূর্ণ আলাদা, ওরা সেটা আয়ত্ত করার চেষ্টাই করে না। এই দুই কারণে ইংলিশে ভাল হওয়া সত্ত্বেও এরা কম নম্বর পায়।'

'ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। আমিও দেখি জেনারেল ইংলিশের তো কথাই নেই অল্‌টি নিয়ে ও প্রায় বসেই না। ও দুটো নাকি পরীক্ষার আগের দিন দেখে নিলেই চলবে।'

ওর মেয়ের রোলনম্বর নিয়ে তার খাতাটা খুঁজে নিয়ে আসি। খাতা খুলে বিনোদিনীকে এক এক করে ভুলগুলো দেখাই, গ্রামারের টারমিনোলজি বুঝতে পারে নি, প্রেসির জায়গায় সামারি লিখেছে, কমপ্রিহেনশানের শর্ট আনসারগুলো বড় হয়ে গেছে ইত্যাদি।

ঠিক হয়, কলেজ খোলার আগে মেয়েকে আমার কাছে পাঠাবে, আমি কিভাবে পড়তে হবে দেখিয়ে দেব।

'আপনি ভাববেন না, ক্লাসেও আমি পারফরম্যান্স ডিসকাস করি। এগুলো তো শুধু ওর একলার প্রবলেম নয়, বহু ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েরা এরকম অজস্র ভুল করে। সবাইকেই শোধরাতে হয়।'

'কিন্তু সেকেণ্ডইয়ারে কি আপনার ক্লাস থাকবে ওদের সঙ্গে ?'

'হাঁ, এবারে ঠিক হয়েছে যে যার ফার্স্ট ইয়ারে অল্‌টি ক্লাস সেকেণ্ড ইয়ারে কনটিনিউ করবে, নইলে সিলেবাস শেষ করার দায়িত্ব ফিল্ম করা যায় না।'

'তাহলে ম্যাডাম আর কোন প্রবলেম নেই।'

খাতা রেখে এসে বসি। এবারে একটু খোঁচা দিয়ে দেখা যাক।

'তারপর, আর সব খবর কী ? 'পরমা'র মত আর কোন ফিল্ম দেখলেন ?'

'খবর আর কী, এই চলছে। 'পরমা'র মত ফিল্ম কি আর রোজ পাওয়া যায় ?'

'তাহলে যে যার জীবনেই পরমা হওয়ার চেষ্টা করা যাক, কী বলুন ?'

'চেষ্টা করে কী আর হয়, আপনিই হতে হয়।' বিনোদিনী একটু হাসে, যেন অর্থপূর্ণ।

'আপনার তো বেশ অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে', ইঙ্গিতটা আরও স্পষ্ট করি।

'থাকলেই বা ক্ষতি কি ?' বিনোদিনী কম গেলুড়ে নয়।

'আমি তো বাইরের লোক, আপনাদের সমাজে আউটসাইডার, আমার আর কী। তবে বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড মি, অনেকে নানা রকম কথা বলে আপনার সম্পর্কে। প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড, কথাটা কানে এল বলে ভাবলাম আপনার জানা উচিত যে আপনি রীতিমত আলোচনার বিষয়।'

'কী ব্যাপার বলুন তো ? না, না মাইণ্ড করব কেন…' একটু থতমত খেয়ে যায় বিনোদিনী।

'আপনার নামে নানারকম কথা বলছেন আমাদের কোন কোন কলিগ।'

'ও সব পুরুষ লেকচারারদের কথা বলছেন তো ?' বিনোদিনী একেবারে রাগে গরগর করে ওঠে। 'হুঁ, ওদের কথা আর বলবেন না। পাত্তা পায় না তো তাই কেচ্ছা করেই স্যাটিসফ্যাকশান। এতটুকু তু করলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এসে পা চাটবে। পুরুষদের সাইকোলজি বোঝেন না।' তার গলায় যেমন তিক্ততা তেমনি তাচ্ছিল্য, চোখেমুখে উত্তেজনা।

'শুধু পুরুষেরা নয়,' আমি আস্তে করে যোগ করি।

'ও !' বিনোদিনী একটু থমকে যায়। আমি চুপ করে থাকি, দেখি কী বলে। বক্তব্যটা যেন মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে সে সুরু করে,

'দেখুন ম্যাডাম, পৃথিবীতে সকলের আশাআকাঙ্ক্ষা চাহিদা সমান নয়। কারো কম কারো বেশি। অধিকাংশেরই মাঝারি মাপের, পেলে ভাল না পেলে

হাহুতাশ করে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে না। যাদের বেশি তারা সবার চক্ষুশূল হয়। কী করা যায় বলুন—জন্মগত প্রকৃতি, স্বভাবকে তো সারা জীবন দাবিয়ে রাখা যায় না।'

'কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে নিজের পাওনাগণ্ডার মধ্যে থাকতে হয়। অন্যের প্রাপ্য কেড়ে নিলে চলবে কি করে। আফটার অল মর‍্যালিটি মানেই তো অন্যের প্রতি কনসিডারেশান। রাম যদি শ্যামের স্ত্রীর সঙ্গে শোয় তাহলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কিছু এসে যায় না, কিন্তু বেচারা শ্যামের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, মনে শান্তি থাকে না। অতএব দাও শ্যাল্ট নট কমিট অ্যাডালট্রি।'

'শ্যামের স্ত্রী কেন রামের সঙ্গে শোয় সেটা ভেবে দেখেছেন? টাকার জন্য যদি না হয় তাহলে নিশ্চয় অভিজ্ঞতাটুকুর জন্য? নিজের বাড়িতে পেট ভরে খেতে পেলে বাইরের খাবার খেতে চাইবে কেন? রামের বেলায়ও একই কথা খাটে।'

'ডু ইউ মীন টু সে একজন স্পাউসের মধ্যে গলদ বা কোন কিছু কম থাকলেই তার পার্টনার বাইরে তৃপ্তি খোঁজে? এটা একটু ওভার সিম্প্লিফিকেশান হচ্ছে না কি? লোকে স্রেফ মুখ বদলাবার জন্যও বাইরে হোটেল রেস্টুরেন্টে খায়।'

'একজাক্টলি। অর্থাৎ বাইরে খাওয়ার যে স্পেশাল টেস্ট সেটা বাড়িতে মেলে না। ধরুন রেস্টুরেন্টের ডেকর, আলো, মিউজিক, আইটেম বাছবার স্বাধীনতা, স্বাদের নতুনত্ব—সবই মাটার করে। অত খরচের ব্যাপারে যাওয়ার দরকার কি, সন্ধ্যায় মাস্টার ক্যান্টিনের সামনে দেখুন কত লোক চাট্ খাচ্ছে। তারা কি মনে করেন বাড়িতে খেতে পায় না?'

'দেখুন, খাওয়া আর নারীপুরুষের সম্পর্ক তো এক পর্যায়ে পড়ে না। লেট আস্ নট লুজ আওয়ার পারস্পেক্টিভ। সেক্সটা তো একটা অবজেক্ট নয় পাওভাজি বা ফুচকার মত, এখানে মানুষের টোটাল পার্সোন্যালিটি ইনভল্‌ভড। ভাল লাগার সব অনুভূতিই মাথায়, শরীরে নয়।'

'তাহলে তো আমাদের ঐ আপনি যাকে ন্যায্য প্রাপ্য বলছেন অর্থাৎ সেই ইনস্টিটিউশান অফ ম্যারেজ। স্পেশালি হিন্দু ম্যারেজে হাজ অ্যাবসোলিউটলি নো মিনিং। ও তো প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক। স্বামী এই এই দাবি করবে, স্ত্রী এই এই দাবি মেটাবে। সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত থাকে না। খালি 'তু তা বে বা' করে কথা।' বিনোদিনীর সমস্ত মুখে আক্রোশ।

অবাক হয়ে যাই। স্ত্রীকে তুইতোকারি বা খিস্তি শুধু বস্তি এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষরা করে বলে আজন্ম শিক্ষা পেয়ে এসেছি। ভদ্রলোক আর ছোটলোকে পার্থক্য বাঙালি সমাজে ঠিক এইখানটায়। অবশ্য এখানে এতদিনের বসবাসে কোন কোন ওড়িয়া পরিবারের সঙ্গে সাময়িক একটু আধটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে

তাতে ওড়িয়া স্বামীদের স্ত্রীকে 'তুই' বলতে শুনেছি। কিন্তু সেটা ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বলেই ভেবে এসেছি, যেমন এখানে মা ছেলেমেয়েকে 'তুই' বলে এবং ছেলে-মেয়েও মাকে 'তুই' বলে। সুপু তো এদের দেখাদেখি প্রথম কথা বলতে শিখে আমাকে 'তুই' বলত, পরে আস্তে আস্তে 'তুমি'তে উঠেছে। এটা আমরা কোন দিন খুব সিরিয়াসলি নিইনি, হাসিঠাট্টার বিষয় ভেবে এসেছি। এখন মনে হ'ল যে কোন ওড়িয়া স্ত্রীকে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তুইতোকারি করতে শুনিনি। অর্থাৎ এখানে একটা উঁচুনীচু ব্যাপার বোধহয় রয়ে গেছে। যাই হোক ভিন্ন সমাজের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক এতই নিভৃত যে বাইরে থেকে বোধহয় বিচার করা যায় না। কাজেই বিনোদিনীর ক্ষোভে সহানুভূতিও দেখাতে পারি না। এত অচেনা এলাকা। বিনোদিনী বলে চলে,

'সব সময় সেবাদাসী হয়ে লাথিঝাঁটা খেয়ে কেন থাকব বলতে পারেন? পুরুষ জাতটার একটা মজার গুণ হ'ল স্বামী হিসেবে যেমন প্রভুত্ব খাটায়, প্রেমিক হিসেবে ঠিক তেমন দাসত্ব করে। কত ভাল ভাল কথা, রঙ্গরস, মন যোগানো যাকে আপনাদের ইংরিজিতে বলে হোল ওয়ার্কস।'

'আপনি বলছেন সেটাই লাভ, বিছানাটা জাস্ট আ পার্ট অফ দ্য হোল প্যাকেজ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সেকথা আর বলতে। দেখুন ম্যাডাম আমার কোন প্রিটেন-শান নেই, আই অ্যাম হোয়াট আই অ্যাম। আমার যেমন খেতে ভাল লাগে, সাজতে ভাল লাগে, তেমনি পুরুষের সঙ্গে বসে গল্প করতে ভাল লাগে, শুতে ভাল লাগে। আমার শরীরের যা চাহিদা, মনের যা চাহিদা আমার সংসার তা মেটাতে পারে না। সামাজিক বন্ধনে আমার তৃপ্তি নেই। আমি তৃপ্তি চাই। কেন চাইব না বলতে পারেন? কর্তব্য কি শুধু অন্যের প্রতি, নিজের প্রতি কর্তব্য নেই? সুখের সন্ধান করার অধিকার সকলের।'

আচ্ছা, সুবীর ও সেই মেয়েটি—তারাও নিশ্চয়ই সুখের সন্ধানই করছিল। তার মানে বিনোদিনীর মত সুবীরও সংসারে অর্থাৎ আমার সঙ্গে সম্পর্কে তৃপ্তি পায়নি। আমার দৈহিক মানসিক চাহিদা অবশ্য বিনোদিনীর মত নয়, আমি মানুষটা সবদিক থেকেই মাঝারি মাপের, অল্পেই তুষ্টি। বিয়ের আগে পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার তেমন সুযোগ পাইনি, খুঁজিও নি। পুজো প্যাণ্ডেলে পাড়ার দাদা, মাসতুতো পিসতুতো ভাই বোনেদের বিয়েতে যুবক বরযাত্রী, বন্ধুর ভাই বা এম. এ. ক্লাসের সহপাঠী—মোটামুটি পুরুষের সঙ্গে পরিচয়ের এই ছিল চৌহদ্দী। হাল্কা নেহাৎ নির্দোষ রসালাপ হাসিঠাট্টা ও সহপাঠীদের ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা বিষয়ক আলোচনা—এর বেশি কোন দিন সম্পর্ক এগোয়নি। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে এমনকি ষাটেরও গোড়ার দিকে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে যা স্বাভাবিক ও গতানুগতিক। বিয়েও হয়েছে সেই স্বাভাবিক ও গতানুগতিক

ধারায়—সম্বন্ধ করে জাতকুল মিলিয়ে। তবে হ্যাঁ আমাদের পরিবারে শিক্ষাদীক্ষা আছে, একেবারে ছাঁদনাতলায় প্রথম স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টি বিনিময় নয়। ড্রয়িংরুমে সুবীরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। একদিন পার্ক স্ট্রিটে চা খাওয়া, দু'দিন জলসায় যাওয়া। না, প্রাকবিবাহ দেহের সম্পর্ক হয়নি, ইন ফ্যাক্ট তার প্রশ্নই ওঠেনি। তাতে কোন ক্ষোভ ছিল না। সাহিত্যে দেহের গুরুত্বের কথা পড়লেও চার পাশের জীবনে সেরকম দেখিনি, ভাবিওনি। হ্যাঁ মেয়েদের মা হতে হয়, অ্যাণ্ড দাটস অল অ্যাবাউট ইট। মাকে দেখেছি প্রতিদিনের তুচ্ছতার চাকাতে ঘুরেই যেন পরিতৃপ্ত, যেন এতেই মেয়েদের—মায়ের মত সে আমলের শিক্ষিতাদেরও —জীবনের পরিপূর্ণতা। আমার বেলাতে সাংঘাতিক বৈপ্লবিক কিছু বদল হবে বলে আশা বা আশঙ্কা কিছুই ছিল না। মায়ের সঙ্গে আমার তফাৎ তো শুধু চাকরিটাতে, আর হ্যাঁ, আমার সন্তানের সংখ্যা মোটে এক, তাও আমার 'আর. এইচ. নেগেটিভ' বলে—ইদানীং অবশ্য এটার প্রতিবিধান বেরিয়ে গেছে। তাই সুবীরের অ্যাফেয়ারে যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম তাতে নিজেই সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলাম। তারপর কতকাল একটা তীব্র অনাসক্তি, প্রায় বিরাগই বলা যেতে পারে, আমার সমস্ত দেহমনকে অসাড় করে রেখেছিল। এখনো সে বরফ গলেনি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিনোদিনী নিজেই আবার মুখ খোলে,

'দেখুন ম্যাডাম, উই লিভ ওনলি ওয়ান্‌স। পরজন্মে কী আছে কে জানে। যা পাবার এ জীবনে, আজকে, এখনি পেতে হবে। আপনি আমার কথায় রাগ করছেন না কি?'

'না, না রাগ করব কেন। দেখ', নিজের অজান্তেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে গেলাম, 'তোমাকে আমি নিন্দে করছি না, প্লিজ ভুল বুঝো না। আমি খালি কনফিডেন্‌শিয়ালি জানাতে চাইছিলাম তোমার অনেক শত্রু আছে, অনেকে তোমার ওপর চটা, এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে। তোমার পারসোনাল ব্যাপারে আমি কেন নাক গলাব বল, আমার স্বার্থ ই বা কী?'

বিনোদিনী যেন খানিকটা স্বস্তি পায়, শান্ত স্বরে এবারে বলে,

'সে তো জানি, তাই আপনার মুখ থেকে এসব শুনে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে ছিলাম। দেখুন ম্যাডাম, আমি কারো বাড়াভাতে ছাই দিতে যাই না, কাউকে স্ত্রীপুত্র পরিবার ভাসিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে ঘর করতে বলি না। আই অফার ফ্রি চয়েস। একটা জিনিস জেনে রাখবেন ফ্রাস্ট্রেশান শুধু আমাদের মত মেয়েদেরই নেই, বহু পুরুষেরও সেই এক হতাশা, এক অসন্তোষ আছে। স্বীকার করতেই হবে, এক হাতে তালি কখনো বাজে না।'

মাথা নেড়ে সায় দিতে হয়, কিন্তু মনে বড্ড আঘাত লাগে। সুবীরও কি এই রকম হতাশার কবলে? আমরা মেয়েরাও তো নিখুঁত নই, পুরুষের মত

আমরাও হয়তো ইনঅ্যাডিকোয়েট। বিশেষ করে আমি। ভাবতে ইচ্ছে করে না। বিনোদিনীকে বলি,

'হয়তো ম্যারেজ অ্যাজ অ্যান ইন্‌স্টিটিউশান নারীপুরুষ দুজনের কাছেই কখনো কখনো অপ্রেসিভ হয়ে ওঠে—'

বিনোদিনী আমাকে শেষ না করতে দিয়ে যোগ করে,

'কিন্তু শুধু পুরুষেরই বিয়ের চৌকাটের বাইরে পা দেওয়া মোর অর লেস অ্যাকসেপ্‌টেড, আমাদের নয়, কারণ আমরা সোস্যালি অর্থাৎ পোলিটিকালি তাদের হাতধরা, ডিপেন্‌ডেণ্ট। আমার লাইফটা দেখুন। দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম—পড়ানো, এক্সট্রাকারিক্যুলার, ছেলেমেয়ে শাশুড়ি, আত্মীয় স্বজন, দুবেলা রাঁধা বাড়া খাওয়ার বন্দোবস্ত—সব কিছু করেও আমার এতটুকু এনজয়মেণ্ট ডিউ হয় না। আপনি কী মনে করেন, জীবন শুধুই একতরফা কর্তব্য, আপনার আমার কি প্রাপ্য কিছুই নেই? আপনি কী ভাবেন জানি না, ইন এনি কেস, আই লাভ লাইফ অ্যাণ্ড আই মীন টু এনজয় ইট। কে কী বলে না বলে তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

বিনোদিনী এতক্ষণে সরবৎটা শেষ করে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আমি হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চেষ্টা করি।

'দ্যাট্‌স ফাইন। আই মাস্ট সে বিনোদিনী ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল। আই ডু অ্যাডমায়ার ইউ। তুমিই হচ্ছ আমাদের আদর্শ, সত্যিকারের মুক্ত নারী। ব্রাভো চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।' ওর পিঠ চাপড়ে দিই। সত্যি আমি বিনোদিনীকে বাহবা দিই। ও যেভাবে লোকলজ্জাভয় ছেড়েছুড়ে দু'হাতে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে রস নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কয়েক মুহূর্তের তৃপ্তি তো পাচ্ছে। ক্ষণিকের মূল্যই বা কম কি। তীব্রতাই তো সুখের মাপ। পাথর অনড় অচল অনুভূতিহীন, সতীত্বের মত। আমি যা পারি নি বিনোদিনী তাই পারে। আমার যেখানে বাধা অলঙ্ঘনীয় মনে হয়, সে দিব্যি হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে একলাফে পেরিয়ে যায়। সুখের জন্য যে কোমর বেঁধে চেষ্টা করে সুখ তাই তার কপালে জোটে। আমরা যারা ভাল মেয়ে, ভাল স্ত্রী হয়ে সুখের আশায় বসে থাকি, সুখ আমাদের পাশ কাটিয়ে কখন চলে যায়। সুবীরকে বিনোদিনী আসার কথা কিছু বলি না।

বি. এ. পরীক্ষার সেন্‌ট্রাল ভ্যালুয়েশান সুরু হয়েছে। অর্থাৎ কি না পরীক্ষার খাতা কয়েকটি কলেজে পরীক্ষকেরা একসঙ্গে বসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখে দিচ্ছেন। এতে রেজাল্ট তাড়াতাড়ি বের করা যায়। খাতা বাড়ি বাড়ি পাঠানো আবার ফেরৎ আসার সমস্যা থাকে না। অবশ্য যথাযথ গোপনীয়তা থাকে কিনা সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল। আমাদের কলেজ বলাই বাহুল্য একটা বড় সেণ্টার।

ভুবনেশ্বরের তো বটেই। কাছাকাছি কলেজের অধ্যাপকরাও আসেন এখানে খাতা দেখতে। কটক থেকে যাতায়াত করে এই চাঁদিফাটা গরমে ঠায় বেঞ্চিতে বসে ৬/৭ ঘণ্টা খাতা দেখা এক শাস্তি। তবে কয়েক বছর দেখি নি তাই এবারে অন্তত সপ্তাহ খানেক না দেখলেই নয়। সুবীরের ঘোর আপত্তি ছিল, 'কী দরকার সারাদিন এই গরমে সামান্য কটা টাকার জন্য মেকানিক্যাল কাজ করা। বিকালে তো নির্ঘাৎ মেজাজ খারাপ, মাথা ধরা এই সব হবে। শখ করে ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়া কেন।' শখ করে নিই না, দায়ে পড়ে নিই। খাতা দেখা পড়ানোর অঙ্গ। চাকরি করতে এসে এটা করব না সেটা করব না বললে তো চলে না। এই তো ইতিমধ্যে বেশ চারদিকে চাউর হয়ে গেছে যে চিত্রা ম্যাডাম খাতাটাতা দেখেন না। ভেকেশানের দিন ভাইস প্রিন্সিপাল যেন কত ক্যাজুয়েলি বললেন, 'ম্যাডাম বোধ হয় ছুটিতে বাইরে-টাইরে যাবেন, আপনার তো আর খাতা দেখার পাট নেই।' তাড়াতাড়ি উত্তর দিই, 'না না, থাকবে না কেন, এই তো ফাইনাল ডিগ্রির খাতা দেখছি। বাইরে যাবই বা কী করে, ওঁর তো সেক্রেটারিয়েট থেকে নিষ্কৃতি নেই, তাছাড়া ছেলে আসবে ছুটিতে।'

মোলায়েম আপাত নির্দোষ কথার পেছনে কত ঠেস থাকে তা তো সুবীরের বোঝার ইচ্ছে নেই। প্রথম প্রথম উত্তেজিত হয়ে বাড়িতে এসে বলতাম, সুবীর বিরক্ত হত, 'অত কথায় কথায় গায়ে ফোস্কা পড়লে চাকরি করা যায় না। আমরা এই সব এম. এল. এ-মিনিস্টারদের হ্যাঁপা পোহাই কী করে কোন ধারণা আছে?' না, নেই। সত্যি, এত বছর, এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও সুবীরের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হল না। এমন কি যখন বাড়ি আর অফিস প্রায় এক ছিল সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময়ও ওর জগৎ আমার কাছে ভাসাভাসা অবাস্তব ছিল। প্রতিদিনই নানা সমস্যার কথা শুনতাম এবং শুধুই শুনতাম, কোন মন্তব্য কখনো করি নি। কারণ কী বলব বুঝতে পারতাম না। অফিসের ব্যাপারে বাবাকে কোনদিন মায়ের পরামর্শ নিতে দেখিনি। স্বামীর কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে আমার গ্র্যাজুয়েট মা অন্দরমহলেই সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। কই কারো তো কোনো অসুবিধা হয় নি, দিব্যি তো চলে গেছে। কলেজে আসার পথে ভুবনেশ্বরের বাড়িটার কাজকর্ম কতদূর এগোল দেখে আসি। আমাদের পাওনা কোয়ার্টারটি এতদিনে তো খালি হয়েছে, ছেলেমেয়ের পরীক্ষা শেষ অব্দি বাড়ি রাখার মেয়াদ ছিল, ফুরনোর পরপরই প্রাক্তন বাসিন্দা পরিবারকে নিয়ে গেছেন। সরজমিনে বাড়ির হাল দেখে সুবীরকে সাফ বলে দিয়েছি চুনকাম তো বটেই সঙ্গে ঘরগুলোতে আরো দু' পোচ ডিসটেম্পার, বাথরুম ও কিচেন আগাপাস্তালা সংস্কার, জানালাদরজা গ্রিল সারাই ও রঙ না হলে ও বাড়িতে পা দেওয়া যাবে না।

কলেজে খাতা দেখার পাট চুকতে না চুকতে সুরু হবে আমার বাঁধাছাঁদার

পালা। কটক থেকে ভুবনেশ্বরে আসা কেউ বদলি বলেই মনে করে না অথচ সেই পুরো সংসারটি তুলে এনে আবার বসাতে হয়। সমস্ত আসবাবপত্র—শোবার, বসবার, খাবার—থেকে সুরু করে রান্না খাওয়ার সরঞ্জাম, বাসনকোসন, জামাকাপড় পর্দা চাদর বইকাগজপত্র ফ্রিজ টিভি রেকর্ডার প্লেয়ার মিক্সি এবং অজস্র টুকিটাকি বাঁধা ছাঁদা এবং প্রত্যেকটি খুলে খুলে নতুন জায়গায় যথাস্থানে রাখা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুবিধা হল মনে মনে ছক করা আছে কী কী লাগবে—প্যাকিং বাক্স, খবরের কাগজ, খড়, চট, দড়ি মার্কিং ইংক এবং সবশেষে কোথায় কি রাখা হ'ল তার লিস্ট যেটির স্থান হবে আমার হাতব্যাগে। এই মহাভারত পর্ব কতবার জীবনে করেছি এবং আরো কতবার করতে হবে কে জানে। কোথায় যেন একটা গান না কি শুনেছিলাম, মনে আছে ক'টা লাইন—

হে ভবেশ হে শঙ্কর
সবারে দিয়েছ শুধু ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।

আজ বি এ পরীক্ষার খাতা দেখা সুরু। সাধারণত ইংরিজি বা ওড়িয়া দিয়ে শুভারম্ভ। এ ছুটিতে সবচেয়ে বেশি খাতা, অবশ্য পাঠ্য বিষয় তো। প্রচুর পরীক্ষক নানা জায়গা থেকে এসেছেন। বেশ একটা মেলা-মেলা ভাব। একতলায় কলেজের পিয়নদের মধ্যেই কেউ সাময়িক ক্যান্টিন খুলে ফেলেছে। এই সুযোগে তাদের দু-পয়সা বাড়তি আমদানি, আর সত্যি কথা বলতে কি আমাদেরও প্রয়োজন। এ তল্লাটে মুখে দেবার মত কোন কিছু পাওয়াই দুর্ঘট।

কলেজে পৌঁছতে না পৌঁছতে সতীর সঙ্গে দেখা। চোখে মুখে উত্তেজনা, কাছে এসে চাপা গলায় বলে গেল, 'কথা আছে, খুব জরুরি। দুপুর দুটো নাগাদ গোটা বিশেক খাতা কোন ক্রমে শেষ করে তলায় নামলাম। একটু চা-টা খাওয়া দরকার। এ সময়টা আনঅফিসিয়েল টিফিন টাইম। একটানা ছ'ঘণ্টা খাতা দেখা তো সম্ভব নয়। মাস্টারি করে করে কথা বলা এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা অধিকাংশ অধ্যাপকদেরই পোষায় না। সকলেরই মত চা ও আড্ডা ছাড়া আমাদের পেট ফুলে যায়। সতীকে ইশারা করে এসেছিলাম। চায়ের অর্ডার দিতে না দিতে সতী হাজির।

'কী খাবেন ম্যাডাম? 'বড়া'? খান না, গরম গরম ভেজেছে।'

কলাই ডাল বেঁটে সামান্য গেঁজিয়ে পেঁয়াজ লংকা কুচি দিয়ে 'বড়া' এখানে জলখাবার হিসেবে খুব চলে, আমাদের সিঙ্গাড়ার মত।

'না, না, সতী থাক। এই গরমে আর ভাজাভুজি ভাল লাগছে না।'

'তাহলে 'মিঠা' কিছু খান। এই সুবোলঅ দেখ তো 'মিঠা' কী আছে। ম্যাডাম বঙ্গালি, মিঠা ভালবাসেন। খালি 'ছেনাপোড়অ' আছে? তা ম্যাডাম

খান না ছুপিস, এটা ওড়িয়া মিঠা জানেন তো, একেবারে হার্মলেস।'

মাথা নেড়ে রাজি হই, সত্যি জিনিসটা উপাদেয়। প্রথম যখন ওড়িশায় এসেছিলাম শুধু লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছেই পাওয়া যেত, এখন অন্যত্র মিষ্টির দোকানেও বিক্রি হয়। গোল সাইজের, ছানাতে একটু সুজি মিশিয়ে মিষ্টি, কিশমিশ ইত্যাদি দিয়ে কাঠের আগুনে বেক্ করে। আজকাল তাই সিদ্ধ কেকও বলে। ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি। কলকাতা থেকে কেউ বেড়াতে এলে আমাদের বাড়ির স্ট্যাণ্ডার্ড সুইটডিশ।

আজ সতীর চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। চোখেমুখে খুশি উপছে পড়ছে, উৎসাহের শেষ নেই। এ যেন অন্য সতী।

'মিঠার সঙ্গে চা ভাল লাগবে? একটু মিক্সচার খান না সঙ্গে?'

চানাচুরটার চেহারা দেখে বড্ড তেলতেলে আর ঝাল মনে হ'ল।

'না, না, থাক। আচ্ছা একটা বিস্কুট দাও তো।'

সতী দুটো 'বড়া' নেয় আর আমি একটা 'ছেনাপোড়'। খেতে খেতে বলতে সুরু করে সতী,

'সে এক রীতিমত নাটক হয়ে গেছে, ম্যাডাম, নাটক। যাকে বলে 'পালা'।'

'ব্যাপার কী? নতুন কিছু ঘটল না কি?'

'নতুন বলে নতুন। তবে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আনএক্সপেক্টেড কিছু নয়। এমনটাই হওয়ার ছিল। অন্যায় তো চিরকাল চলতে পারে না। নইলে এতদিন ধরে হিন্দুসমাজ টিঁকেছে কী করে? ধর্মের জয় হবেই। জানেন তো আমার বরাবরই ধর্মে ভক্তি।'

গম্ভীর মুখে মাথা হেলাই। সতীর যে কখন ধর্মে ভক্তি আর কখন অভক্তি সেটা নির্ভর করে তার স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী নির্বাচনের ওপর। আর হিন্দুসমাজের টেঁকাটেঁকি! ফসিলও তো টিঁকে থাকে কিন্তু বেঁচে থাকে না। টেঁকা আর বাঁচা কি এক? সতীকে এ সব প্রশ্ন করে লাভ নেই। তার দুনিয়ায় সমাজ-সংস্কারের ঢেউ বাইরে থেকে তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে গেছে। নিজেকে সংযত রেখে বলি,

'খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। এখানে বলবে না কি স্টাফরুম-এ যাবে?'

এটা নিউ সায়ান্স ব্লক। এখানকার ছোট স্টাফরুমটা ভ্যালুয়েশানের সময় খুলে রাখা হয় পরীক্ষকদের সাময়িক প্রয়োজনের কথা ভেবে। আমরা দুজনে ঘরে ঢুকি। একটুক্ষণ অন্তত পাখার তলায় আরাম করা যাবে। খাতা দেখার গ্যালারিগুলোতে ছাত্রশক্তি তো কবেই পাখার ব্লেড বেঁকিয়েচুরিয়ে এক একটি ফুলের কুঁড়ি করে রেখেছে। পাখাগুলো খুলে দিয়ে সতী বসে। তারপর সুরু করে,

'বিনোদিনীর বড় মেয়ে কটক মেডিক্যালে জানেন তো? সেই মেয়ে যাকে

দেখার নাম করে আপনার কাছে লিফ্‌ট চাইত। তার সামার ভেকেশান হ'ল। কিন্তু যে দিন হওয়ার কথা ছিল তার একদিন আগে। মেয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে তার বাবার গাড়িতে কটক থেকে ভুবনেশ্বর রওনা দিয়েছে। টাউন ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পড়বার মুখে যে 'অলঙ্কার' হোটেলটা আছে, সেইখানে গাড়ি থামিয়ে মোড়ের মাথায় গোলগপ্পা না বোম্বাই চাট্, কী একটা খেতে নেমেছে। আজকাল-কার টিন্‌এজার জানেন তো, স্ন্যাক্স আর সফ্‌ট ড্রিংকের ওপরই আছে, মেইন্ মিলএর বেলায় এই এতটুকু খাওয়া, আর সর্বদা কানে ঠুলি দেওয়া টেপ বাজবে, ব্যস, তাহলেই স্বর্গ। যাই হোক, মেয়ে তো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে খাচ্ছে এমন সময় দেখে কি তার মাতৃদেবী, সঙ্গে ইনি, তার পাণ্ডা মউসা। দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাসিমুখে কথা বলতে বলতে দূরে রাখা মারুতিতে উঠল। একেই বলে নিয়তি, বুঝলেন ম্যাডাম। কোথায় মেডিকেল কলেজ হস্টেল আর কোথায় 'অলঙ্কার' হোটেল। এত জায়গা থাকতে কি না 'অলঙ্কার' হোটেল, আর এখানেই চাট্ খেতে নামল মেয়ে। আর ঠিক এই দিনে এই মুহূর্তে তার মা বেরুল সঙ্গে নাগরকে নিয়ে। সংসারে ন্যায়ধর্ম কোথায় যাবে বলুন? আমি রোজ সকালে স্নান করে পুজো না দিয়ে জলগ্রহণ করি না, কলেজে যত কাজের প্রেশার থাকুক না কেন সব ব্রতউপবাস পালন করি, ভগবান কি আমার মুখ রাখবেন না? একটা নষ্ট মেয়েমানুষ দিনের পরদিন সমাজকে কলা দেখিয়ে পরের স্বামীর সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করে যাবে? ধরা পড়বি তো পড় নিজের মেয়ের কাছে। হুঁ হুঁ, এদিকে তো খুব ডাঁট মেয়েকে নিয়ে, মেয়ে তার ডাক্তার—'

'আসল ঘটনাটা কী ঘটল?' বিরক্ত হয়ে বাধা দিই। সতীর এই সমানে বিনোদিনীর শ্রাদ্ধকরা আমার বিশ্রী লাগে। নিজে স্বামীটিকে সামলাতে পারে না, যত দোষ অন্যের। তাছাড়া স্বামী যেন একেবারে কচি খোকাটি। শিশু ভোলানাথ, আহা।'

'সেই ঘটনাটাই তো বলছি, আর বলছিটা কী। মেয়ে ডাক্তারি পড়ে বলেই ওরকম বেখাপ্পা সময়ে মাকে পরপুরুষের সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরকম গায়ে ঢলে ঢলে গাড়িতে উঠতে দেখে ছুয়ে ছুয়ে চার করে ফেলল। আসল ব্যাপারটা ক্যাচ্, তবু মা বলে কথা, বাইরে থেকে শুধু একবার চোখের দেখাতেই এমন জঘন্য ব্যাপার কোন সন্তান বিশ্বাস করতে পারে বলুন? মেয়ে চুপচাপ বন্ধুর সঙ্গে ভুবনেশ্বরে বাড়িতে পৌঁছাল। একটু বাদেই মা-র প্রত্যাবর্তন। রিক্সায়। টাউনে পৌঁছেই দুজনে আলাদা হয়ে গেছে আর কি। মেয়ে জিজ্ঞাসা করে মা কোথায় গিয়েছিলে। মা অমনি লম্বা ফিরিস্তি দিল, কলেজে বি. এ. পরীক্ষার ভ্যালুয়েশান চলছে—কী মিথ্যেবাদী দেখুন, ইংরিজি ওড়িয়া শেষ হ'ল না, ইতিহাস তো আরম্ভই হয় নি। তারপর কোন 'মাউসী'র বাড়ি কোন

'ভউনী'কে দেখার ছিল, টুকিটাকি স্টেশনারি বাজার সেরে পরিশ্রান্ত কর্তব্য-পরায়ণা চারুবে মাতার সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন। ন্যাকার ডিম একেবারে। মেয়ের কিছুই বলার নেই কারণ হাতে স্টেশনারি প্যাকেটটি ধরা। চালাক কি কম ভেবেছেন। এক নম্বরের শয়তান। বাপ বাড়ি ফিরলে মেয়ে সব বলল। বাপটা কী করল জানেন? ব্যাটা একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া, চোখের চামড়া নেই, মানসম্মান জ্ঞান নেই। অকপটে স্বীকার যে তার সবই জানা। আরও বলে কি না, পাণ্ডা আংকেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার নতুন কিছু নয়, তার মা সারাজীবনই এ খেলা খেলে যাচ্ছে। স্বামী হিসেবে তার এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। কারণ লোকে হাসবে। দেখুন, কী যুক্তি।'

'তা তুমি এত সব কথা জানলে কী করে?' আমি এবারে ওকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'সেইটাই তো ম্যাডাম বলতে এসেছি। নাটক তো সেইখানে।'

রঙ্গমঞ্চ থেকে আমরা নিভে যাই। আলো পড়ে বিনোদিনী-সতীর পরিবারে। এবারে অ্যাকশান ওদের।

সেদিন রাতে প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ বিনোদিনীর বড় মেয়ে মৃণালিনী সতীর বাড়ি গিয়ে হাজির। প্রথমেই সতীকে ধরে সরাসরি প্রশ্ন,

'মাউসী, আপনি সব জানেন?'

সতী দেখে মেয়েটির মুখেচোখে প্রবল উত্তেজনা, তেলছাড়া ফ্যাশানে-ছাঁটা চুল এলোমেলো হয়ে ঘামগড়ানো মুখে এখানে সেখানে সেঁটে যাচ্ছে, জামাকাপড় লাট, যেন এই গরমে সারাদিন ধরে গায়ে আছে। প্রশ্নটা শুনেই সতীর কেমন কেমন লেগেছে। সাবধানে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে,

'কীসের সব জানি?'

'এই মউসা আর মায়ের অ্যাফেয়ার।'

সতী যেমন অবাক তেমন অপ্রস্তুত। মেয়ের বয়সী কারো সঙ্গে এসব কী আলোচনা করবে ভেবে পায় না। চুপ করে থাকে।

'কী, উত্তর দিচ্ছেন না যে?' আরও জোরে আরও উত্তেজিত প্রশ্ন। এবারে অগত্যা সতী ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে।

'ও। আপনিও তাহলে সবই জানেন। এদিকে বাবাও জানে। স্ট্রেঞ্জ! আপনারা দুজনে চুপচাপ সব টলারেট করে যাচ্ছেন, কেন কেন?'

সতী প্রথমে কোন উত্তর দেয় না। তারপর আস্তে আস্তে বলে,

'অনেক অশান্তি হয়েছে এ নিয়ে। তোমার মউসা আমার কথা শোনেন না।'

'বটে! শোনেন না! মউসা আছেন বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক হ'ল ফিরেছেন।'

'সে তো জানি। আর সেইজন্যই তো এসেছি। আমি তো কটক থেকে ভুবনেশ্বরে আসার পথে 'অলঙ্কার' হোটেল থেকে ওদের দুজনকে একসঙ্গে বেরুতে দেখলাম—'

অতঃপর মেয়েটির মুখে বিস্তারিত বর্ণনা।

সতী শোনে। তার কাছে নতুন কিছু নয়। এমন কত অভিসারের বৃত্তান্ত তার কানে এসেছে। মেয়েটির উপস্থিতি তার লজ্জা আর একটু বাড়াল এই যা।

'তা আমার এতে কী করার আছে বল?'

'কী করার আছে! মউসাকে একটু ডেকে দিন তো', মেয়েটি নাছোড়বান্দা।

সতী ওপরে অর্ধেক উঠে বিমলকে ডাকে। ওরা দুজনে তলায় নামতে নামতে সতীর বড় ছেলে তার সন্ধ্যার রাউণ্ড সেরে ফিরেছে। মৃণালিনীর সে সমবয়সী, দুই পরিবারের যাতায়াতের ফলে যথেষ্ট চেনাজানা।

'হাই, মিনি।'

'হাই, মিলু।'

বিমল ড্রয়িং রুম-এ ঢুকে দুজনকে দেখে যেন সবই খুব স্বাভাবিক এমন সহজ ভঙ্গিতে বলে,

'আরে মিনি যে! কী খবর, কলেজ ছুটি হয়ে গেল?'

সতীর ছেলে কমল বুকের ওপর আড়াআড়ি করে এ হাত ও হাতের মধ্যে রেখে দাঁড়ায়, দেখবে কী ঘটতে চলেছে। পোষা কুকুরের মত ছেলেমেয়েরাও বাপমা-র আচরণে অস্বাভাবিকতার গন্ধ চট্ করে ধরতে পারে। জোর করে হেসে বিমল বলে চলে,

'তা সেবারের ভেকেশানের মত তোমাদের চেস্ খেলা হবে নাকি?'

'খেলা? আমরা ছেলেমেয়েরা আর কী খেলব বলুন, খেলা তো আপনারা মানে বাবা-মা'রা যা খেলছেন তাই মোর দ্যান এনাফ।' একেবারে ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেয়েটি।

বিমল তো হতভম্ব, এমন সরাসরি আক্রমণ এবং এত অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সে বোধহয় কখনো কল্পনাই করে নি। মিনি শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে বদ্ধপরিকর, আবার কামান দাগে,

'ছি, ছি, আপনারা এত শেমলেস, এত ইমমর‍্যাল! আজকে আপনাকে আর মাকে আমি নিজে হোটেল থেকে বেরুতে দেখেছি, দিনদুপুরে। আপনারা নিজেদের নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন যে আমাকে চোখেই পড়ে নি।'

আত্মপক্ষ সমর্থনে তৎপর হয় বিমল,

'দেখ, দুজন মানুষকে একত্র দেখলেই কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অনেক কারণ তো—'

'হ্যাঁ অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ইন দিস কেস, একটি ছাড়া আর অন্য

কোন কারণ নেই।'

মেয়েটির বয়স কম হলে কী হবে, একেবারে পাকা বাঁশ, এতটুকু নোয়ানো যায় না। উঁচু গলায় প্রায় চীৎকার করে একটানা বলতে থাকে,

'মা তো আদৌ যে কটকে গিয়েছিল সেটাই চেপে যেতে চেষ্টা করছে, সে খবর রাখেন? দুজনে কে কী মিথ্যে কথা বলবেন আগে থেকে পরামর্শ করেন না? কেনই বা করবেন। আপনাদের তো কাউকে কেয়ার করার দরকার নেই। বাড়িতে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবার সবই জানা, কিছুই তাঁর করার নেই। গড্ অ্যালোন নোজ হোয়াই। এখানেও সেই একই স্টোরি। মাউসীও জানেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন না। ওয়াণ্ডারফুল! গ্রেট হিন্দু পেরেণ্টস! আপনারা নিজেদের কী ভাবেন বলুন তো? হু ডু ইউ থিংক ইউ আর? বাবা-মা হয়েছেন বলে যা খুশি তাই করবেন? আপনাদের নিজেদের সুখটাই সব তাই না? আর আমরা ছেলেমেয়েরা? হোয়াট অ্যাবাউট আস? আপনাদের কি একবারও মনে হয় আমরা আপনাদের কী ভাবছি? শুধু যে বাইরের লোকের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি তাই নয় আপনারা তো আমাদের কাছেও ছোট হয়ে যাচ্ছেন। বাট্ ইউ কেয়ার টু ইটস। আমরা বাবামাদের রেসপেক্ট করতে চিরকাল বাধ্য থাকব। কেন? না, আমরা ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড দিস ইজ গ্রেট ইণ্ডিয়ান হেরিটেজ, তাই না? আপনারা যদি আমাদের রেসপেক্টের যোগ্য না হন, কেন রেসপেক্ট করব, বলতে পারেন? শুধু জন্ম দিয়েছেন বলে? দুবেলা খেতে পরতে দিচ্ছেন বলে? আপনাদের নিজেদের আচরণে মর‍্যালিটির প্রশ্ন নেই, না? আচ্ছা, আমরা ছেলেমেয়েরা যদি আপনাদের মত এনজয় করতে চাই, সাপোজ উই অলসো ওয়াণ্ট আ গুড্ টাইম, নো স্ট্রিং অ্যাটাচড্, দেন? সে বেলা তো পারলে আপনারা ঘরে বন্ধ করে রেখে দেন, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সেক্স বানান করা বারণ। এদিকে নিজেদের বেলা স্বাধীনতার শেষ নেই। আপনারা যেমন হিপ্পোক্রিট তেমন সেল্‌ফিশ। আপনাদের কী মর‍্যাল রাইট আছে আমাদের বাবা-মা হওয়ার?'

গড়গড় করে একটানা বলতে বলতে রাগে ক্ষোভে লজ্জায় কান্না এসে যায় মেয়েটার। এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার আওয়াজ। দেখতে না দেখতে ঝড়ের বেগে ঢোকে বিনোদিনী, সেও ততোধিক উত্তেজিত, ঝলমলে হলদে ছাপা শিফন শাড়িতে তার ক্লান্তমুখে বয়সের ছাপ যেন আরও প্রকট।

'এই যে মিনি, তুই এত রাত্রে এখানে কেন মা? চল্ বাড়ি চল্, লক্ষ্মী মেয়ে। একি কান্নাকাটি করছিস কেন? অন্যলোকের বাড়িতে এরকম করে না, ছি।' বিনোদিনী দুহাতে মেয়েকে ধরতে যায়।

'না, তুমি আমাকে ছোঁবে না। ডোণ্ট টাচ মি।' প্রায় লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায় মিনি। 'আমার জন্য তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। দিনের পর

দিন ইউ হ্যাভ মেইড দ্য হোল ফ্যামিলি অ্যা লাফিং স্টক। কী করে তুমি এরকম করতে পারলে বল তো? বল, বল।'

'শোন্ শোন্, বাড়ি চল্। আমি তোকে সব বুঝিয়ে দেব। তুই আমার বড় মেয়ে, এত বুদ্ধি, ডাক্তার হবি, আর তুই কিনা আমার কথায় বিশ্বাস করবি না? চল্ বাড়ি চল্। হঠাৎ কী না কী দেখে নিজের মায়ের ওপর অবিচার করবি! আয় আমার সঙ্গে আয়।'

'না আমি যাব না। মোটেও যাব না। আজ আমি এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। কী বলতে চাও তুমি? অস্বীকার করতে পার তোমার সঙ্গে মউসার রিলেশানের কথা? এই তো মউসা এখানে আছেন, আপনিই বলুন, ডিনাই করতে পারেন? পারেন না, তাই না? তবে? তুমি তাহলে কী করতে পার আমাদের জন্য, বল, বল, বল?'

বিনোদিনী কয়েক মুহূর্ত থমকে যায়, তারপর সামলে নিয়ে শান্তস্বরে বলে,

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তোরা যা চাস, তাই হবে।'

সতীর দিকে তাকিয়ে বিমলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে,

'এই রইল তোমার স্বামী। ফিরিয়ে দিলাম। মেয়ের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আর ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার থাকবে না।'

সতী আর থাকতে পারল না, আজ তার দিন এসেছে শোধ তুলে ছাড়বে।

'এমন ভঙ্গী করছ বিনোদিনী যেন কত দয়া করছ আমাকে। কী মনে কর কি, হ্যাঁ? আমার স্বামীর সঙ্গে শুয়েছ বলেই কি তুমি আমার ওপরে এক হাত নিয়েছ? ফিরিয়ে দিচ্ছ মানেটা কী? মানুষটা কি তোমার ছিল? পুরুষমানুষ চিরকালই নষ্ট মেয়েছেলেকে ভোগ করে থাকে তাতে তার স্ত্রীর সম্মানে ঘা পড়ে না, বুঝলে? স্বামীর জন্য আমাকে মাথা হেঁট করতে হবে না, দেখে নিও আমি ছেলের বিয়ে দেব সমান ঘরে। মান্যগন্য সবাই এসে দাঁড়াবেন সে বিয়েতে। কিন্তু তুমি চিরকাল কলঙ্কিনী হয়ে থাকবে, তোমার ঐ সাধের ডাক্তার মেয়েকে পার করতেও ঘোল খেতে হবে—'

কমল তার মায়ের কথার মধ্যে সমানে হাত ধরে টানছে আর বলে যাচ্ছে,

'থাক, থাক, মা। চুপ কর, চল ওপরে চল।'

ওদিকে মিনিও তার মাকে হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বিনোদিনী ক'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে 'ও, ভারি সতী মাহাত্ম্য জাহির করা হচ্ছে। সাত পাকে বাঁধা স্বামীকে সামলাতে পার না আবার মুখে লম্বাচওড়া বুলি। যাও, যাও, হারানিধিকে পায়ে শেকল পরিয়ে দাঁড়ে বসিয়ে রাখ গে—'

'আঃ মা হচ্ছে কি?' মিনি আরও জোরে বিনোদিনীকে টানে, কিন্তু তার মুখ বন্ধ করতে পারে না। বিনোদিনী বলে চলে,

'—দুটো করে রোজ ছোলা দিতে ভুলো না, রাধাকেষ্ট বলবে তো। যত্ত সব—'

কথা শেষ হয় না, এবারে মেয়ে প্রায় হ্যাঁচকা টানে মাকে সদর দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যায়। বাইরে থেকে বিনোদিনীর গলার রেশ ভেসে আসে, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। বিমল আগাগোড়া কাঠের পুতুলের মত বসে। তার মাথা নীচু। কমল তার মাকে ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।' ওপরে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যাবে।

এণ্ড অফ অ্যাকশান অ্যাট ভুবনেশ্বর। আলো এবারে কটকে, আমার আর সুবীরের ওপর।

'বাঃ চমৎকার', হেসে মন্তব্য করে সুবীর, 'সতীলক্ষ্মীর জয়জয়কার। একেবারে জেমিনীর মহান পারিবারিক চিত্র।'

টেবিলে খাবার দিতে দিতে ঘটনাটা বর্ণনা করছিলাম।

'যা, বলেছ, একেবারে হিন্দি ছবি, থার্ডক্লাস মেলোড্রামা।'

সতীর বিনোদিনীকে বলা কথাগুলো আমার মোটেই ভাল লাগে নি। সব দোষ যেন একা বিনোদিনীর, তার নিজের স্বামীটি যেন ধোওয়া তুলসী পাতা। তার যেন কোন দায়িত্বই নেই। মজা করল দুজনে মিলে অথচ কলঙ্ক একা বিনোদিনীর। এত শিক্ষিত হয়ে সতী কী করে এরকম বস্তাপচা আদ্যিকালের সেই পুরুষমুখো ভঙ্গি নিতে পারে—আশ্চর্য। অথচ আমার কাছে তো আধুনিক মনটন নিয়ে কত বড় বড় কথা বলত। যারা নিজেরা অন্যায় সহ্য করে তারা কখনো অন্যের প্রতি ন্যায় দেখাতে পারে না। চুপ করে ভাবি।

'যাক তোমার সখীর তাহলে দুখরজনীর অবসান। এবারে সে সুয়োরাণী। মিষ্টি খাওয়াতে বলেছ তো? নিদেন পক্ষে ওদের সেই 'ছেনা পোড়অ'?'

'কী যে বল, তোমার সবটাতেই ঠাট্টা।'

'কেন ঠাট্টার কি। এত বড় একটা হারানো জিনিস ফেরৎ পেল, স্বামী বলে কথা, হিন্দু নারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। হারিয়ে গেলে চলবে কী করে? এর তো ইনসিওরেন্স পর্যন্ত নেই।'

সুবীরের গলার কি তিক্ততার আভাস না কি? আমিও যে ওকে ফিরে পেয়েছিলাম সেটা মনের তলায়ও নেই, না, আছে? চুপ করে শুনি।

'নাঃ ইট কল্‌স ফর আ সেলিব্রেশান। দাও, সতীলক্ষ্মীর অনারে আজ আর একটা ড্রিংক দাও।'

কাঁটা বেঁধা নিয়েই যথাসম্ভব হাল্কা গলায় বলি,

'বারে, খাবার দিয়ে দিয়েছি যে। তোমার তো দুটো হয়ে গেছে। কোটা

খতম।'

'আজকে এক্সট্রা কোটা প্লিজ।'

'এটাই লাস্ট।'

পাশের ট্রলিতে রাখা হুইস্কির বোতল থেকে একটা ছোট পেগ মেপে দিই, নিজেও নিই। আই অ্যাম আ গুড কমপানি, নট আ স্পয়েল স্পোর্ট।

'চিয়ার্স! টু দ্য গ্রেট হিন্দু ওয়াইফ।'

সুবীর গেলাসটা তুলে ধরে, আমারটাও তুলে ঠক করে ঠেকাই,

'চিয়ার্স।'

গরমের ছুটির পর কলেজ খুলেছে। আর্টস্ ব্লকের স্টাফরুম সরগরম। কারা সব ভাল ছেলে হয়ে হায়দ্রাবাদে অ্যামেরিকান স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টারে পড়াশুনা করতে গিয়েছিল, এবং সেখানকার মুক্ত আবহাওয়ায় ক'টি কংকোয়েস্ট ক রে এসেছে, খাতা দেখে কার কত রেকর্ড রোজগার হল এবং তরুণরা, ঈষৎ চাপা গলায় সে রোজগারের কতটা স্ত্রীকে লুকিয়ে বোতল দেবীর পায়ে উৎসর্গ করতে পারল ইত্যাদি আলোচনা চলছে। মেয়েরা স্মিতহাস্যে শ্রোতামাত্র কারণ তাদের পরিবার ছেড়ে ছুটিতে পড়াশুনা করতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। খাতা দেখা নিয়মমাফিক এবং বাড়তি টাকাটা বোতলের বদলে হয়তো বা শাড়ি কেনাতে লাগানো হয়েছে। সতী এককোণে চুপচাপ বসে। সেই শুকনো পাকানো খয়া চেহারা, চোখে লাগা শাড়ি, ফিট-না-করা ব্লাউজ, শিরা ওঠা হাতে চলচলে সোনার কঙ্কন আর একরাশ বেমানান কাঁচের চুড়ি। ঠোঁটের দুপাশে নাক থেকে নেমে আসা রেখা দুটো আরও সুস্পষ্ট! চশমার পুরু কাঁচেও ঢাকা পড়ে নি চোখের কোণে কালি। টেনে বাঁধা চুলে কপালটা আরও চওড়া দেখাচ্ছে। ঘণ্টা পড়ল। যে যার রেজিস্টার নিয়ে ক্লাসের দিকে রওনা হই। সতীও বেরোয়। করিডরে দুজনে পাশাপাশি হাঁটি।

'নমস্কার ম্যাডাম।'

'নমস্কার, নমস্কার। কী খবর, সব ভাল তো?'

'এই বেঁচে আছি আর কি।'

'কেন, শুধু বেঁচে আছি কেন? সব তো মিটেটিটে গেছে, এখন তো আবার আগের মত সুখে থাকার কথা।'

'তা কি হয় ম্যাডাম।'

না হওয়ার কি। তোমাদের মাঝখানে তো এখন আর তৃতীয় কেউ নেই।'

'কিন্তু একদিন যে ছিল সেই সত্যিটা যে রয়ে গেছে, মিথ্যে কোন দিনই হবে না। যে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে তাকে ফিরে পাব কী করে?'

আমিই কি ফিরে পেয়েছি?

আলগোছে ওর পিঠে হাত রেখে বলি,
'চল, ক্লাসে যাই।'
যে যার ক্লাসে ঢুকি।

কয়েক মাসের মধ্যে সুবীরের আবার দিল্লি বদলি। জানতামই না যে ও দিল্লি যাওয়ার জন্য নাম দিয়েছে। অবশ্য অবাক হইনি। জানা কথা ওড়িশাতে বহিরাগতদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, অতএব যে পার চল দিল্লি। আমার দু'বছর স্টাডি লিভ পাওনা ছিল। এবারে নিয়ে নিলাম। দু'বছরের মাইনেটা তো পাওয়া গেল। এরপর হাফ পে লিভ। এখন লিভ উইদাউট পে চলছে। এইসব করে যত দিন চাকরির সুতোটা আঁকড়ে রাখা যায়। সুবীর তো আর বোধহয় ওড়িশায় ফিরবে না।

একদিক দিয়ে ভালই হ'ল। সেই সুবাদে চাকরি থেকে সময়ের আগে অবসর নেওয়া যাবে। মেরহোত্রা কমিটির রেকমেণ্ডেশানে ইউ. জি. সি. আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু ডক্টরেট ছাড়া প্রোমোশন বন্ধ—অবশ্য এ চাকরিতে এমনিতেই প্রোমোশনের বিশেষ ব্যাপার নেই, সারা জীবনে হয়তো একটা—সেই একটাও এখন বন্ধ হয়ে গেল। থিসিস লেখার মত মানসিক অনুশাসন আমার নেই, অত দৌড়ঝাঁপ পরিশ্রম এই বয়সে পোষায় না। তাছাড়া আমার চাকরিটা তো সেরকম সিরিয়াস কিছু নয় যে মনপ্রাণ দিয়ে তার জন্য খাটব। দিল্লিতে সুবীরের কল্যাণে একটা পাবলিশিং ফার্মে এডিটার হয়ে গেছি, কাজে অবশ্য স্রেফ প্রুফ রীডার। এ ছাড়া 'সহেলী' নামে একটি নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত। নিজের পরিবারে নিকটজনের মধ্যে, সংসারের চার দেওয়ালের গণ্ডিতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা বড় শক্ত। তার চেয়ে রাস্তায় নেমে নিঃসম্পর্কীয়দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রূপ কানোয়ারের সহমরণ, শাহবানুর খোরপোশ বা কাজু বাদাম শিল্পে নারী শ্রমিকের শোষণ নিয়ে আন্দোলন করা বোধহয় সহজ। তাতে নিজেদের জীবনকে বদলানোর দুরূহ প্রচেষ্টা লাগে না।

স্টাডি লিভ শেষে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম জয়েন করে আবার ছুটি নিতে। কলেজে গিয়ে দেখি অনেক নতুন মুখ। পুরনোরা বদলি হয়ে গেছে, কেউ কেউ বা বদলি এড়াবার জন্য ছুটিতে। সতী ও বিনোদিনী কেউ নেই। সতী স্থানীয় মহিলা কলেজে, আমার মত ওরও প্রমোশন হয়নি। বিনোদিনী তো আগেই বহরমপুর না সম্বলপুর কোথা থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিটা হাতিয়ে রেখেছিল—কাজেই দিব্যি রীডার পোস্ট পেয়ে গেছে। ওড়িয়া পত্র-পত্রিকায় জাতীয়তাবাদ, হিন্দুধর্ম ইত্যাদির ওপর লেখালেখা ছাপছে, এখানে ওখানে নাকি ভাষণটাষণও দিতে সুরু করেছে। সুখরঞ্জন সহাস্যে মন্তব্য করল,

'দেখবেন, ম্যাডাম, নেক্সট্ ইলেকশানে নির্ঘাৎ বি. জে. পি-র ক্যাণ্ডিডেট।'

সত্যি বিনোদিনীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, ওকে রোখে কার সাধ্যি। স্টাফরুমে পুরনোদের মধ্যে ইকনমিক্স-এর কল্যাণী পতি-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ন্যুয়া পল্লীতে ওর বাড়ির পাশেই নাকি সতী বিশাল বাড়ি করেছে। ধন্য বটে সতীর স্বামী, দিন নেই রাত নেই নিজে দাঁড়িয়ে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির তদারকি করেছেন। মোটা টাকা বাড়ি ভাড়া পায় সতী। তবে টাকা লাগেও তো। বড় ছেলেটার লেখাপড়া হ'ল না একেবারে বখে গেল, অনেক কষ্টে ধরে-বেঁধে তাকে একটা ভিডিও শপ-এ বসিয়েছে। বাবা-মা এত ভাল অথচ ছেলেটা যে কেন এরকম হয়ে গেল। সমবেদনা জানাই। কলিগদের মধ্যে যাদের ছেলেমেয়েরা ভাল করেছে তাদের মধ্যে প্রথমেই বিনোদিনীর নাম করে সবাই। বড় মেয়ে তার এখান থেকে ডাক্তার হয়ে ব্যাঙ্গালোরে নিওরো-সার্জারিতে স্পেশালাইজ করছে, ছেলে আর. ই. সি রাউড়কেল্লায়, ছোট মেয়ে অ্যানথ্রোপলজিতে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, অবশ্য বি. এ. ফার্স্ট পার্ট সবে, তবে ফাইন্যালেও ডেফিনিটলি পেয়ে যাবে। সত্যি বিনোদিনীর মত সফল ও সার্থক জীবন ক'জনের। সায় দিই।

আঙ্গাদের একমাত্র সন্তান সুপ্রাপ্ত আমাদের কাছে আর ফেরেনি। ব্যাংগালোর থেকে পাশ করে আমেরিকায় চলে গেছে। ওখানেই বোধহয় থেকে যাবে।

এখন শুধু আমি আর সুবীর। শেষ প্রমোশনটা সুবীর পায়নি, হি জাস্ট মিস্‌ড্ দ্য বাস। মজা হ'ল ওড়িশাতে যেসস ঝড়তি পড়তি বহিরাগতরা রয়ে গিয়েছেন তাঁদের সকলেরই ভাগ্যে একে একে শিকে ছিঁড়েছে, শেষ পর্যন্ত কেউই আর্থিক ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হননি। আরও মজা হল এবারে ভুবনেশ্বরে শুনে এলাম শুধু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সরকারি কলেজে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের পদোন্নতি হবে। অর্থাৎ ওখানে থাকলে আমার কপালেও জুটে যেত। চলে এসেছি, তাই পেলাম না। এখন পরস্পরের ওপর দোষারোপের পালা শেষ, পরিবারে অখণ্ড শান্তি।

দুজনে একা, এক ছাদের তলায় একই বিছানায় একই অর্থহীনতার বন্ধনে বাঁধা।

হয়তো বা অন্তরাও।

BIVAV
SPECIAL AUTUMN NUMBER
64th Issue
Price : Rs. 30.00 | Oct-Dec. 1995 | Reg. No.
Vol. 18. No. 1. | Published in Sept. 1995 | R. N. No. 30017/76
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO. ISSN 0970-1885

৪৫ বছরে পৌঁছে
আরো যত্নশীল
প্রকাশনায় অঙ্গীকারবদ্ধ

মনের নিরন্তর প্রসারে
যারাই আস্থাশীল, তাদের জন্য—
অভিধান,
ধ্রুপদী সাহিত্য,
শিশু-কিশোর সাহিত্য
এবং
বিচিত্র রচনার সমাহার

সাহিত্য সংসদ
শিশুসাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলকাতা ৭০০০০৯